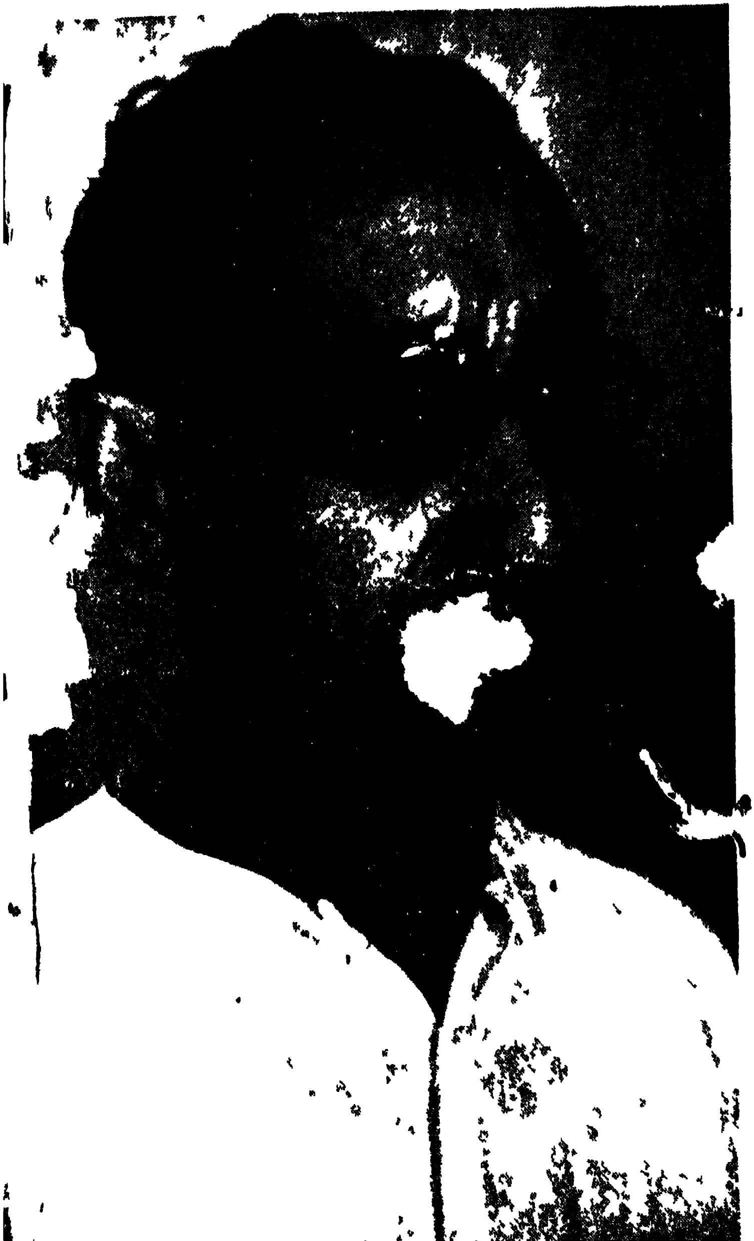
দ্বি-পঞ্চাশৎ

শ্রীবিভূতিভূষণ-মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১

আশ্বিন, ১৩৫২ সাল



়রেশনের মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে। গুরু-লঘু জ্ঞান হারানো কি, আর ল্যান্সডাউন-বিপিনপালের প্রভেদ না বোঝা বলিব না তো কি বলিব ?

?—ও প্রশ্ন তুলিয়া আর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবেন না। বার মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করুন দেখি—একবার গালে নিন, একবার ও গালে· কেমন? অভিজাত্যের ছ না?—ল্যান্সডাউন ঐ জিনিস। "It stands for or aristocracy Lansdowne is Lansdowne oupled with your Bepin Pauls or Bhopen ত্ব আর আভিজাত্যের প্রতীক ল্যান্সডাউন ল্যান্স-মাদের ঐ বিপিন পাল কি ভূপেন বোসেদের মিশ)।

নয়, একজন অ্যারিস্টোক্র্যাটেরই। ব্যারিস্টার S Molek) শ্বশুরের পয়সায় বৈঠকখানা রোড থেকে মনে যে সব উচ্চাশা জন্মগ্রহণ করে তাহার মধ্যে কটি। বহুদিন ঠাই হয় নাই, সম্প্রতি কর্পোরেশন দেওয়ায় একটি ছোটখাট বাড়ি ু াছেন। বনেদী —আহা, তবুও তো ল্যান্সডাউনই। নতুন-পুরানোর াগবে ?

াওয়া গেল কংগ্রেসী কর্পোরেশনের মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে, স্তাটির নামকরণ হইবে বিপিনচন্দ্র পাল রোড।

বীতে একটু উষ্ণ গুঞ্জন তুলিবার চেষ্টা করিল। তাহার সর কাঁধে হাতটা চাপিয়া প্রশ্ন করিল, "শুনছ, হ্যা, যেটাকে বলছি আমরা এখন, কর্পোরেশন সেটার নাম রোড!"

'উনের বাসিন্দা, ঘুরিয়া পাশনেটা নাক থেকে সবাইয়া y don't mean that!" (তাই নাকি? ঠাট্টা

hing less, see—" (মোটেই নয়, দেখ বরং)—
ংবাদপত্রটার একটা স্থানে নখ টিপিয়া রঞ্জনের সামনে

ধরিল। রঞ্জন চশমাটা আবার যথাস্থানে বসাইয়া ভীতভাবে বলিল, "I wo what they are up to next with their Khaddar mentali (ওদের এই খদ্দরী মন নিয়ে ওরা এর পরে যে আরও কি করে বসবে ভাবি!)

রঞ্জন একটা মোকদ্দমার নথি ঘাঁটিতেছিল, ঘুরিয়া আবার মনঃসংযোগ

মৌলিক মনের উত্তেজনায় একজন প্রবীণ সাহেব-ব্যারিস্টারকে দুঃসংবাদটা। সাহেব মৃদু হাসিয়া তাহার কাঁধে লঘু আঘাত করিয়া ব "সোব চরখা হৈয়া যাবে মিস্টার মোলেক, I will live to see tha (মরব না—দেখে যাব।)...হাঃ—হাঃ—হাঃ...

প্রাচীন এডভোকেট মিস্টার রায়চৌধুরীও নূতন রাস্তায় বাড়ি করিয়াছে উৎসাহভরে মৌলিক তাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিল। ব্যস্ত ছিলেন, বলি "সত্যি নাকি? একটু ভাল করে খোঁজ নাও তো। আমিও পালের না সেদিন সাজেস্ট করেছিলাম একজন কাউন্সিলারের কাছে...নামটা মনে আ না..."

একজন ছোকরা ব্যারিস্টার আলোচনাটা শুনিতেছিল। মিস্ রায়চৌধুরী চলিয়া গেলে মৌলিক অবজ্ঞাভরে বলিল, "That's what I c vernacular mentality!" (একেই নিছক দেশী-মনোভাব বলি!)

কোর্টে জমিল না, জমিবার কথাও নয়। বাড়ি আসিয়া কিন্তু মৌ সদ্য সদ্য এক তুমুল আন্দোলন স্বরু করিয়া দিল। রাস্তার দুধারে যাহারা ব তুলিয়াছে তাহাদের অনেকের সহিতই সেই দিনই দেখা করিয়া ফেলিল, বিপদের কথাটা জানাইল। উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, নানারক লোক। অনেকে জানিত, তাহার মধ্যে কয়েকজন মনে মনে একটু নিরা হইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিবার স্বযোগ বা যৌক্তিকতা খুঁ পাইতেছিল না, সঙ্গী পাইয়া তাহারা স্পষ্টভাবে নৈরাশ্য জানাইল এবং চ যাহারা গায়ে মাখে নাই, উদাসীন ছিল—অর্থাৎ যাহাদের ল্যান্সডাউন, কি বি পাল, কি সওদাগর মুন্সি—যে কোন একটা নাম হইলেই চলিত তাহা আভিজাত্যের নেশায় মাতিয়া উঠিল। দু'একজন আর্মেনিয়ান সাহেব তাহারা তো যোগ দিলই। একজন মাড়োয়ারী খানিকটা জমি লইয়া খান বাড়ি তুলিতেছে, সে একটু পিছনে থাকিয়া বলিল, "হামি ও সব অ্যাড্রিস্টো বেশি সমঝে না; মকান্‌কা ভ্যালুয়েশন ঘাটনেসে ড্যামিজ-স্থট্ লে আবে

্যান্দোলনটা কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিল। কিন্তু বেশ ভূত না করিয়া ফেলা পর্যন্ত লাগসই হইতেছে না। মৌলিকপ্রমুখ কয়েকজন মাথা ঘামাইতে লাগিল এবং তাহাদের ঘর্মাক্ত মস্তকের উষ্ণতায় সমস্ত হাওয়াটা উত্তপ্ত করিয়া তুলিল।

রঞ্জন এর মধ্যে ছিল, বলিল, "I have a brain wave Biraj Let us take a leaf out of the Huq ministry's book!" (আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, বিরাজ,—এসো, হক মিনিস্ট্রির পন্থা অবলম্বন করা যাক) "মানে কর্পোরেশনের ইউরোপীয়ান গ্রুপকে ভাঙাও, What are they here for if not to help us out of such scrapes?" (এই রকম সব বিপদ থেকে ওরা যদি আমাদের টেনে না তুলতে পারে তো আছে কি করতে?)

মৌলিক বিপুল বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "You are a brick, Ranjan!" (তুমি একখানি রত্ন!)…"কিন্তু কথা হচ্ছে, How to do it?" (ওটা ঘটানো যায় কি করে?)

রঞ্জন বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে খুঁটিতে খুঁটিতে গূঢ় সংকেতের সহিত বলিল, "ভাবা হয়ে গেছে, Dinner,—Lansdowne Dinner!" (ল্যান্সডাউন ভোজ!)

মৌলিক বিস্ময়ে, প্রশংসায়, হর্ষে খানিকক্ষণ একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল, তারপর একটু নিরুৎসাহ হইয়া বলিল, "কিন্তু টাকা?"

"তাও ভেবে রেখেছি,—ফাদার-ইন্-ল—পরমপূজনীয় শ্বশুরঠাকুর গৌরীসেন-কল্পেষু…" —বলিয়া সামনে পিছনে দুলিয়া দুলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মৌলিক একটু হাসিল, তারপরে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল, "No go" (হবার নয়)।…"তবে দাঁড়াও—হয়েছে—আমার প্রতিভাও এবার জেগে উঠেছে—শেঠজিকে ধরা যাক—সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না—যদি হিসেব খতিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় ডিনারের দামটা শেষ পর্যন্ত বাড়ির ভ্যালুয়েশনকে পুষ্ট করবে, শেঠজি ঠিক নেমে পড়বে। দিব্যি প্ল্যান—ল্যান্সডাউন ডিনার!—স্পীচেজ—ল্যান্সডাউন জিন্দাবাদ!—ডাউন উইথ বিপিন পাল!…কিন্তু তোমার প্ল্যানটাকে আরও মডিফায়েড করতে হবে।—ইউরোপীয়ান গ্রুপকে [illegible] ধরলে হবে না, খরচও অনেক।…Here the original genius

the Maulik brand comes in (এইখানে মৌলিক-মার্কা প্রতিভার আবির্ভাব)।...মৌলিক মানে, অরিজিনাল, জানই। আমি ঠিক করে ফেলেছি মনে মনে,—ম্যাকার্থি হে, তোমার শ্বশুরের বাড়ির প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ি। মস্ত বড় মার্চেন্ট আর ইউরোপীয়া ইউজ ইনফ্লুয়েন্স, আর এবভ অল—স্কচ, বাঙাল. ডাণ্ডীতে বাড়ি, ে াকা-নারায়ণগঞ্জের বাঙাল বলতে পার ; মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকি া করে ছাড়বে না। ফাদার-ইন্-ল'র সঙ্গে খুব দহরম-মহরম— চনে, ধরা সহজ হবে। ল্যান্সডাউন ডিনার!—গেস্ট অব অ্যনার ম্যাকার্থি, কে, টি, এট্সেট্‌রা এট্সেট্‌রা!—ভব ক্রিশ্চান ডকরেশনস্‌গুলো জেনে নিতে হবে...Severe condemnation of Corporation methods! (কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতির তীব্র নিন্দা) হেডলাইন দিয়ে 'স্টেটস্‌ম্যানে' বেরুবে। কর্পোরেশনের একেবা পর্যন্ত নেড়ে ছেড়ে দেব। Mr. Zakahria will simply have to his shoes! Bepin Paul, indeed!" (মিঃ জাকেরিয়ার খ লাগিয়ে দেবে।...বিপিন পাল—বটে!)

সকলের পরামর্শে তাহাই ঠিক হইল। একজন ইউরোপীয়ানকে যদি ইউরোপীয়ান যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় তো সেই ভাল ; তাহা হইতে সব ইউরোপীয়ানদের ডাকিয়া একটা হল্লা করিয়া ফেলা সম এদিকে, ডিনারের সুবিধাও অনেক. সব মাথাকে একত্রিত করিতে রসনাকে লুব্ধ করার চেয়ে ভাল ফন্দি আর নাই।

শেঠজি বাঙালীর বাচ্ছা মৌলিক-রঞ্জনের চেয়ে হিসাব জিনিসটা বোঝে, ফাঁকা আওয়াজের ওপর সমস্ত ডিনারের খরচটা গছিয়া লইবা নয়, তবুও একটা মোটা চাঁদা দিল, বাকি টাকাটা নিজেদের মধ্যেই হইল ; বৈঠকখানা রোডের যে ভদ্রলোকটি মৌলিকের হস্তে কন্যা করিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারও কিছু খসিল।

ম্যাকার্থির ভারটা মৌলিক নিজে লইল এবং শ্বশুরের একটা চিঠি ল একদিন বাসায় দেখা করিল। লোকটা বুড়ো ঘাঘী, তেত্রিশ বৎসর যা বিচিত্র ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া অটুট একাগ্রতার সঙ্গে এদেশের মাটির করিয়া আসিয়াছে। অনেক অভিজ্ঞতা।...খুব সহানুভূতি দেখাইল। "ইয়ং ম্যান্, তোমাদের মধ্যে এ রকম civic sense (নাগরিক মনোবৃত্তি

আমি আবার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশান্বিত হচ্ছি। আমার সাহায্যের ওপ তোমরা পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে পার ; ইউরোপীয়ান গ্রুপ যে শেষ রেখা পর্য লড়বে এ একরকম আমি কথাই দিচ্ছি তোমায়—তাদের না জিগ্যেস করেই।· ল্যান্সডাউন ডিনারে অধ্যক্ষতা করতে বলবার জন্যে ধন্যবাদ ;—আর কে ে আসবেন ?"

মৌলিক নাম করিতে লাগিল। গোটা চার পাঁচ শুনিয়া সাহেব বলিল, "ন কোন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক আছেন কিনা ?"

মৌলিক একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না, তাঁদের যোগ্যত প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকেই ডেকেছি আমরা। প্রথম বারেই সবাইকে ডে একটা তুলকালাম করা সবার মত হল না।"

সাহেবের মুখটায় একটু ছায়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল—মৌলিক বোধ হ ক্ষ্য করিবারও সময় পাইল না। বলিল, "বেশ, তা আমি নিশ্চয় যাব, আ ·মার—সহানুভূতির কথা বললামই—একচুলও নড়চড় হবে না···ধন্যবাদ মিস্টা ঃৌলেক্, রাইট্‌ইও ; তোমার শ্বশুরকে আমার অভিবাদন জানিও।"

ঘরের বাহির পর্যন্ত আসিয়া উষ্ণ করমর্দনের সঙ্গে বিদায় দিল।

মৌলিক আসিয়া বলিল, "কেল্লা ফতে !"

ডিনা্র হইল মৌলিকের বাড়িতে। একটু খুঁৎ থাকিয়া গেল, ম্যাকার্থি সাহে আসিতে পারিল না, একটা চিঠি লিখিয়া জানাইল, সে হঠাৎ একটু অসুস্থ হইয় পড়িয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

ডিনার কিন্তু নিতান্ত অসফল হইল না। খুব চোখা চোখা স্পীচ হইল ম্যাকর্থি থাকিলে বোধ হয় একজন সাহেবের সামনেই যাহারা তাহার মাতৃভাষা কোর্বানি করিতে কুণ্ঠিত হইত তাহারা পর্যন্ত প্রাণ খুলিয়া বক্তৃতা করিল। ঠি হইল, রাস্তা তো বিপিন পালের নাম দিয়া কলুষিত করিতে দেওয়া হইবেই না অধিকন্তু আশেপাশে ল্যান্সডাউন রোডের সংলগ্ন কোণ-কান যেখানে যা আছে সমস্তগুলাকে যোগ্যতা অনুযায়ী ল্যান্সডাউন স্পার (Lansdowne Spur) ল্যান্সডাউন ক্রেসেণ্ট (Lansdowne Crescent), ল্যান্সডাউন কর্নার (Lans· downe Corner) প্রভৃতি উপযুক্ত নাম দিয়া আভিজাত্য-গৌরব-মণ্ডিত করিতে হইবে। কংগ্রেসী কর্পোরেশন উত্তর কলিকাতা তাহাদের ঘোষ-বোস-মিত্তির-পালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলুক, পূর্বে দক্ষিণেও তাহাদের ঔদ্ধত্য চরিতার্থ করিবার অনন্ত

পথ খোলা আছে ; কিন্তু তাহারা যদি ল্যান্সডাউন রোডের পবিত্র গণ্ডির
া বাড়াইতে যায় তো তাহাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য পরিতাপের আ
াকিবে না। বুঝিয়া-সুঝিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া অগ্রসর হোক!… ইউরো
্রুপের সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য ম্যাকার্থিকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।
অসুস্থ হইয়া পড়ার জন্য সকলেই বিশেষ দুঃখিত। স্থির হইল এই দু
কথা এবং সমবেত মণ্ডলীর আন্তরিক ধন্যবাদ মিস্টার মৌলিক গিয়া
্যাকার্থি সাহেবকে জানাইবেন, এবং এও বলিবেন তিনি শারীরিক অসুস্থ
াকিলেও তাঁহার আশাময়ী বাণী ল্যান্সডাউন ডিনারের সাফল্যে পূর্ণভ
াহায্য করিয়াছে।

পরদিন সকালেই মৌলিক হাজিরা দিল। সাহেব বিশেষ দুঃখ প্র
করিল,—একেবারে শেষ মুহূর্তে তাহার শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িল
কিন্তু মিস্টার মোলেক এবং বিপিনপাল-বিরোধী মহোদয়েরা যেন জা
ইউরোপীয়ান গ্রুপের সাহায্য সম্বন্ধে তিনি যে কথা দিয়াছেন তাহার নড়
হইবে না। একটু সুযোগও সামনে আছে,—সামনের শনিবার পেলি
তাহাদের ডাণ্ডী ডিনার (Dundee Dinner) ; কর্পোরেশনের ইউরোপী
কাউনসিলারদের অনেকেই উপস্থিত থাকিবেন—কথাটা সেখানেই পাড়িবে।

কাঁচ-পোকার কবলে পড়িয়া আরশোলা কাঁচ-পোকা হইয়া যায়।—ইচ্
ছায়, কি অনিচ্ছায় হয় জানি না, তবে নাকি, হয়। মানবসমাজের একপ্র
অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটে। সাহেবের সংসর্গে আসিলে বাঙালী সাহেব হই
যায়,—ঠিক হইয়া যায় বলিতে পারি না, তবে ভাবে—হইয়া গিয়া
সাহেব-কাঁচপোকাকে আয়াস করিতে হয় না,—দুবার একটু দেখা
দুটা মিষ্ট কথা—বারদুয়েক করমর্দন—এইতেই রূপান্তরের পালা আরম্ভ
যায়।…

পেলিটিতে 'ডাণ্ডী ডিনার!'—কী সম্মোহন শব্দটার মধ্যে!…মৌলিক এ
মাথাটা নীচু করিল, তাহার পর অন্তরের লালসা চাপিতে না পারিয়া মু
তুলিয়া একটু অপ্রতিভ-ভাবে বলিয়া ফেলিল, "সেখানে—ইয়ে—আমার নি
তাঁদের অনুরোধ করবার সুবিধা হতে পারে না, স্যার?"…

ম্যাকার্থির মুখে ছায়াটা যেন এবার একটু গাঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু তখ
সামলাইয়া লইয়া উৎসাহের সহিত বলিল, "Oh yes! To be sure, M
Molek, you *will* have a card ; in fact, we would feel honoured

(হ্যাঁ, নিশ্চয়, তুমিও একটি নিমন্ত্রণ-পত্র পাবে ; আসলে তুমি উপস্থিত হলে আমরা গৌরবান্বিত হব।)

আবার ঘরের বাহির পর্যন্ত আসিয়া করমর্দন করিয়া বিদায় দিল।

শনিবার রাত্রি। ডিনার হলের দরজার সামনে নিখুঁত ডিনার-স্যুট-পরা একটি বাঙালী যুবক উপস্থিত হইল। বেয়ারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া একটু বিস্মিতভাবে সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব লোগকা ডিনার হ্যায় হুজুর।" যুবক পকেট হইতে কার্ড বাহির করিয়া হাতে দিল। বেয়ারা আর একটা সেলাম করিয়া বলিল, "তব্ ভি, সাহেব নেহি হোনেসে মানা হ্যায় হুজুর।"

মৌলিকের ভ্রূজোড়া অধৈর্যতায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কয়েক জায়গায় ট্র্যাফিক পুলিসের হাতে অতিরিক্ত রকম বাধা পাইয়া তাহার দেরি হইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিল, পকেট হইতে একটা পাঁচটাকার নোট বেয়ারার হাতে দিয়া বলিল, "কার্ডঠো ম্যাকথি সাহেবকো দেও। হাম ইঁহা ঠাডা হ্যায়।"

ম্যাকার্থির চোখে, গালে তখন রং ধরিতে সুরু হইয়াছে। কার্ডটা হাতে লইয়া একবার দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ইংরাজী—অথবা খাঁটি স্কচ ভাষায়—কি একটা বলিল, তাহার পর বেয়ারার দিকে চাহিয়া হিন্দিতেই বলিল, "বেঙ্গলী বাবুকো বোলো—খালি হিণ্ডুস্টানীকা ডিনারমে অস্‌লি সাহেব লোগ নেহি যাটা, ইসিবাস্টে হামারা বেমারি হুয়া-ঠা ; অওর অস্‌লি সাহেব লোগকা ডিনারমে হিণ্ডুস্টানী নেহি আ সাক্‌টা—বাবুকা ভি বিমারি-কা চিট্‌ঠি আনা চাহটা-ঠা। যাও।" (বাঙালী বাবুকে বল যে খাঁটি হিন্দুস্থানীদের ভোজে সাহেবরা যেতে পারে না, সেই জন্যেই আমার অসুখ হয়েছিল, তেমনি খাঁটি সাহেবদের ভোজেও হিন্দুস্থানীদের প্রবেশ নিষেধ, বাবুরও অসুখের চিঠি আসা উচিত ছিল)।

আবার ঘুরিয়া ডাকিয়া বলিল, "ইউ! সুনো,—বাবুকো বোলো—সাহেব-লোগ হেল্‌প করেগা, মডট্ করেগা, ইস বাস্টে কে অস্‌লি সাহেব ল্যান্সডাউনকে সাঠ কোই কালা আডমিকা নাম নেহি মিল্ সাক্‌টা। যাও,—গেট এওয়ে!" (শোন, বাবুকে বল যে সাহেবেরা সাহায্য করবে,—এই জন্যে যে, খাঁটি সাহেব ল্যান্সডাউনের নামের সঙ্গে কোন 'কালা-আদমি'র নাম মিশতে পারে না। যাও!)

আবার একটা খাঁটি স্কচ গালাগাল দাঁতে পিষিয়া, ঘুরিয়া ডিনারে প্রবৃত্ত হইল।

স্বয়ংবর

১

শিবপুরের স্টীমার-ঘাট। জেটীর কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,—গন্‌শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে।

ছয়টা বাহান্নর স্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাট একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয় তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড় বড় কুণ্ডল, গায়ে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের একটা নীল চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরাইল।

স্টীমার ছাড়িয়া গেলে গন্‌শারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল, "এদের খুব ছেলেবেলায়ই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোঁৎনা জিজ্ঞাসা করিল, "গণৎকারের কাছে তো গেছলি গন্‌শা; কি বললে র‍্যা?"

গন্‌শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া দূরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্‌শার আজন্মের একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।...না গেলেই ছেল ভাল,—ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে পড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠেছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা..."

রাজেন বলিল, "যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্‌শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তু-তুই কি বলতে চাস এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে?..."

রাজেন বলিল, "না, তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে-তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গণৎকারদের কথা—তুই বিশ্বাস করিস? এই দোষ খণ্ডানোর কথা?"

গন্‌শা কোন উত্তর দিল না। ঘোঁৎনা বলিল, "বিশ্বাস না করে কি করবে?

শানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এতদিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্র-গুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগগিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরোনো পাপী হাতে পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা খেরোর খাতায় লিখে নিচ্ছেন; পনের টাকা ফী—বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নির ভিড লেগে গেছে। বল্—তারা ঠকবার লোক!"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাত দিয়ে দিত। এখন শুনছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা!"

গন্‌শা একটা বিড়ি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল, "সত্যিই যদি আর-জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই? তীর্থ-টির্থ করা, গঙ্গাস্নান করা···আর বিড়ি-সিগারেটগুলোও ছাড়্ গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো?···"

কে. গুপ্ত বলিল, "গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড যোগও আসছে—দশহরা···"

ঘোঁৎনা, "ঠিক হয়েছে রে!"—বলিয়া এ-ধারের রেলিং থেকে ও-ধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল, "সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলন্টিয়ার দল গডছে। চল্ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে দুটো পুণ্যির ধাক্কায়···"

গোরাচাঁদ বলিল, "আর ওদের বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না···"

রাজেন বলিল, "তাহলে দেখ্‌না গন্‌শা, ন্যায়রত্ন মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা ···অন্তত গণৎকারের কথাটা হাতে হাতে মিলিয়ে দেখবার মস্ত একটা সুবিধে।"

গন্‌শা বোধ হয় পুণ্য অর্জনের হাতেখড়ি হিসাবে অর্ধদগ্ধ বিড়িটা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "নে-রেবে ভলন্টিয়ার? যাই তো কিন্তু স-সবাই যাব।"

ঘোঁৎনা বলিল, "লুফে নেবে গনেশের দল শুনলে। শিবপুরের দলের এরাই

তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এসো-না ; একটা সৎ কাজ।···তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আর ওরা নিচ্ছে না, বন্ধ করে দিয়েছে।"

২

পরের দিন সকালে ছয় জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হইবার জন্য বাহির হইল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাড়ার রাস্তা ধরিয়া বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিয়া একটা দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-দিয়া ঘেরা, সামনে ছটাকখানেক বাগান। ঘোঁৎনা বলিল, "এই তো সতের নম্বর।"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়িটাই ? লোকজন কাউকে তো দেখছি না !"

ঘোঁৎনা উত্তর করিল, "নম্বর তো সতের ঠিকই রয়েছে। আয় না দেখাই যাক।" বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পিছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল, "একটা হাঁক দে না ঘোঁৎনা।"

ঘোঁৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল, "তুই দে না। ঘোঁৎনা পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তারপর বলবি গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে চল্··· আবদার !"

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "প-পথ দেখিয়ে কোন্ চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল্ তো ? ভ-ভলন্টিয়ার তো গিজ্ গিজ্ করছে দেখছি !"

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের ?"

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোঁৎনা বলিল, "আজ্ঞে, চাই না কিছু।"

"তবে ?"

"একবার নীচে আসবেন ?"

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহির হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল, "কিছু চাই না, অথচ নীচে আসতে হবে—মানে ?"

রাজেন ঘোৎনাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বল্ না, চটিয়ে তুলছিস যে।

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল "আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে, তাই ভলন্টিয়ার…"

আরও রুক্ষস্বর এবং বিকৃতভঙ্গিতে উত্তর হইল, "তাই আমায় ভলন্টিয়ারি করতে হবে…? তা রাজি আছি—বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিয়ে।"

গোরাচাঁদ বাড়ির সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলেব নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোঁৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ইয়ে…ভ-ভলন্টিয়ার তো আমরা…দশহরার মেলায় গঙ্গার ঘাটে…"

"বাড়িটাতে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব ?" গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, "ভজুয়া !…"

বাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল, "চল্, বুঝতেই পারা যাচ্ছে এ বাড়ি নয়। সব কথার উল্টো মানে করছে…"

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি ?"

গন্‌শা ভেঙচাইয়া বলিল, "তুই আর কথা ক'স নি গোরে ; ঘেন্না ধরালি ! পা-প্পালালি কি বলে র‍্যা ? এদিকে ভলন্টিয়ারি করার শখও আছে !"

গোরাচাঁদ পূর্বে পূর্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া থাকে ; সে দলের মাঝখানে একটি নির্বিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে ; কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোঁৎনা নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই বলিল, "কেন যে এমনটা হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহলে কি হয় বলুন তো শুনি? তেষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না, সে কথা বলছি না, বলছি, বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বললাম সতের?...আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধরে নিয়ে আসবেন?"

কে গুপ্তের প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেন আর উত্থাপন করিল না।

কে. গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনের কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল, "তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এখনও ফোটে নি গণেশ, নইলে.."

গন্‌শার মনটা অত্যন্ত খিঁচড়াইয়া ছিল, উষ্মার সহিত বলিল, "ন-হ্লেলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলণ্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-ববুদ্ধির ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে..."

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল, "না আমি সে কথা বলছি না; বলছিলাম, ধরুন, যাকে আপনি জিগ্যেস করেছিলেন সেও তো ভুল বলতে পারে..."

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের সুরে বলিল, "পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিগ্যেস করতে যাব কেন শুনি? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন মশাই?"

কে. গুপ্ত আবার চুপ করিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তাহলে শুধু গঙ্গাস্নানই করে নে গন্‌শা। দশহরার দিন ভোর থেকে এসে সব গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা করে দেবেন না?—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেও একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হবে না?—অত বুড়ীটুড়ি, কচি ছেলেমেয়ে সব আসবে। আমার

হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিয়ে দেব।"

রাজেন বলিল, "হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলন্টিয়ার হয়েই যে সেবা করতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয় নি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "স্ত্রী স্বামীর সেবা করে কি-করে? সে তো আর ভলন্টিযার নয় ?"

গন্‌শাব মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওযার কথাটা ঘুরিতেছিল ; বিরক্তভাবে বলিল, "ধ্যাৎ, আর ঠা-টুঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দয়াই হবে তো আজ ছ বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন ?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবিব পকেটে তুইটি হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "নিন ঘোঁতন বাবু, এবার কি বলবেন বলুন !"

আব সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া একটা তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল, "কি শুনতে চান বলুন।"

"আপনি বাড়িটা রাধানাথ মিত্তিবের গলিতে বলেছিলেন না ?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয় না কি ?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলির মোড ফিরিয়াছে, আর সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সেই মোড়ে একটা জরাজীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায় না ; ক্রমাগত ঠকিয়া কে. গুপ্তের নজর ঐদিকে ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন।'

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে হইতেছিল কে. গুপ্তকে চিবাইয়া খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "তাই তো দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গন্‌শা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির তুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ, তখন গলিতেও বেশি তফাৎ হবে না ?"

দলের মধ্যে এক ঘোঁৎনাই গন্‌শাকে সব সময় খাতির করে না, রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ত্রিলোচন তু-জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া

বলিল, "শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগড়া করতে লাগলি। আমার একটা মতলব এসেছে—থাম্ দিকিন তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "এই কইপুকুরের কাছাকাছি ন্যায়রত্ন মশায় থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—পুরুতমানুষ, শিবপুর-বাজেশিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয় পুরোহিতবাড়ির সন্দেশ, কলা, নারিকেল-নাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল, "মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেয়েছে বেজায়।"

রাজেন বলিল, "তাহলে সামনে কেমন দিন-টিন আছে, সেটাও একবার দেখিয়ে নেওয়া যায়।"

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয় নাই। রুক্ষস্বরে বলিল, "খুব মতলব খাড়া করেছিস্—সতের নম্বর বাড়ির জন্যে ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজ, ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজবার জন্যে শিম্মিদের বাড়ি খোঁজ, তা-তাদের বাড়ি খোঁজবার জন্যে…"

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিন জনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওই ন্যায়রত্ন মশাই আসছেন!—নাম করতেই!"

৩

সত্যিই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গায়ে ন্যায়রত্ন মহাশয় সামনের একটা বাড়ির বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোরাচাঁদ ভিন্ন। ঘোঁৎনা অগ্রসর হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কানের উপযোগী আওয়াজ করিয়া বলিল, "প্রণাম হই ন্যায়রত্ন মশাই!"

সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "প্রণাম।"

আরও কাছে কানটা আনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, "ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কিনা, কাহিল হয়ে রয়েছি বলে কানটা একটু…"

গন্‌শা বলিল, "ক-কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌না বাপু।…'কাহিল হয়ে রয়েছি!'…কবে যে কা-কাহিল কম তা তো বুঝি না!"

রাজেন বলিল, "পেন্নামের হাঙ্গামা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড না একেবারে—তোরও যেমন ভক্তির রোখ চেপে গেছে!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তার চেয়ে ওঁর বাড়িই নিয়ে চল্ ওঁকে; মাঝরাস্তার চেঁচামেচির করার চেয়ে বরং···একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ···"

ঘোঁৎনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই প্রণাম করছি।"

"দীর্ঘজীবী হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায় এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে!···গণেশ?"

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল, "রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন? ঘোঁৎনা বে-বেশি ওস্তাদি করতে গিয়ে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চ-চ্চরকি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিয়া রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল, "জিগ্যেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে তো মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "এ এক দোসরা ফ্যাসাদে পড়া গেল। 'রাধানাথের গলি চেনেন?'—না, সে তো মারা গেছে!"

এমন অবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয় কখনও কখনও চটিয়াও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইয়া ত্রিলোচন বলিল, "মারা গেছেন শুনে বড় কষ্ট হল। তাঁর গলিটা চেনেন?" রাস্তাটার উপর ইশারায় হাতটা চালাইয়া বলিল, "গলি—গলি!"

"ও বুঝেছি, সে তো এখানে নয়। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ি চলে যাব। তারু চৌধুরীর খুড়ীর বড় কঠিন পীড়া শুনছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে একবার বলে দেখি।···এই তো গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যতুনাথের পরিবার? আহা, যতু চৌধুরী ছিল···"

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইয়া গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেছলাম—ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট করে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাঠফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিয়ে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চটিয়া হাত-পা নাড়িয়া গন্‌শাকে বলিল, "দেখ্

তো বে-আক্কেলপনা !—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তন-পার্টি বেরুবে সব ঠিকঠাক করছি—কদ্দিনকার আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চান্দ্রায়ণ করে চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা! এ কি শত্রুতা বল্ দিকিন!...এর ওপরও যদি যেতে চায় তো বলব পাঁচটা সাহেব ডাক্তারে ঘিরে আছে, তাদের কুকুর নিয়ে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ করে পুরুতদের।...কদ্দিন পরে একটা চান্স !—শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে।"

গন্‌শা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই বোকা, বুঝিস না! ও চা-চ্চান্দ্রায়ণ করলে আরও শীগগির টেঁসে যাবে বরং। একে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ংকর ভুলো মন, একটা বিম্নিটিম্নি হবেই, ভ-ভ্-ভগবান্ না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাঃ, ঠাট্টা করছিস্! ওদিকে একজন মরতে বসেছে আর গন্‌শার যেন স্ফূর্তি বেড়ে গেছে! যাঃ..."

গন্‌শা ভারিক্কে হইয়া বলিল, "গ-গ্ গন্‌শা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না।"

রাস্তার ডানদিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই রাধু মিত্তিরের গলি, আমি তাহলে চললাম। তাহলে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোরাচাঁদ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হল না, অপর একদিন দেখে আসব'খন।"

গন্‌শার অভিমত শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিতভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং আর দ্বিধা না-করিয়া ফিরিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল. "একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই, দরকারী কথা— ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল! ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জেঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিগ্যেস করলেন?—সে সময় একটা কথা বলে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বললেন, গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার ন্যায়রত্ন ঠাকুরকে ডেকে দিস্; সেরে তো উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নাই—তাঁর দয়ার শরীর, একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত, দেবতার সমান কিনা।...তাহলে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?"

৪

গঙ্গা, দশহরা। এবার যোগটা বিশেষ বড গোছের ; অত্যন্ত ভিড হইয়াছে। একে ভিড তায় ছোট বড অনেকগুলি ভলন্টিয়ারের দল ; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ি হইতেই সেবার জন্য পিছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিযা স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার আরও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের—মনটা প্রায়ই বড খিঁচড়াইয়া রহিয়াছে।

ভলন্টিয়ারদের সকলেরই চেষ্টা—অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিয়া মেযে-পুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশ-পথের মুখে, বাছাইযের জন্য ভিড জমিয়া উঠিয়াছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড-গরুর আমদানি হয়। অন্যান্য বার তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতিবিধিতেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড মেয়েদের নির্দিষ্ট পথে কোন্ দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গাই নয় বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী-ভলন্টিযার মর্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়।

লোকে—বিশেষ করিযা বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জন করিতেছে, সেটুকু অভিশাপে সন্থ সন্থ ব্যয়িত করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে। ওরা শিবপুরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্তভাবে গঠনকার্য করিতে চাহিয়াছিল। সকাল বিকাল মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপা-পুকুরে সাঁতার। যাহারা সাঁতার জানিত, তাহাদের অনেকের সর্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশির ভাগ সাজি-মাটিগোলা পানাকুপুরের জল উদরস্থ করিয়া পীডিত হইয়া পড়ে। এখন কয়েকজন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলন্টিয়াররা রটাইতেছে "কাশি-ই ওদের ব্যাজ!"

গন্শা প্রভৃতি পুণ্যার্জনের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল, এমন সময় খবর পাইল সমস্ত ভলন্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং কার্য-কুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে একজন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল, "মেডেল পেলে আবার অনেক সময় প্রেমও হয়ে যায়

গন্‌শা ; ধর্‌, কোন বড লোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে, তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও, ওটা আর ছাড়া হয় না।

গন্‌শা, ঘোঁৎনা আর রাজেন জেটির উপব দাঁডাইয়া আছে। উপকারের সুবিধাও হইতেছে না এবং কি ভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধাবণা ছিল এমন বড বড যোগে লোকে খুব ডুবিয়া মরে ; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারই মাথা আবার জল ফুঁডিয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পডিতেছে। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁডাইয়াছে যে পুণ্য অর্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দু'বার আক্রোশের দাঁত-কডমডানি শোনা গেল ; কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘোঁৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই ; তাহারা তিন জনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিডের মধ্যে ঘুরিয়া বেডাইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পডিতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পডিয়াছে এমন নয়। একটি বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচুনীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া পডিয়া যায় ; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স-খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল ; একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁডিয়া লইয়া পালাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজ-পরা একটি ভলন্টিয়ার তাহাকে ধরিল ; এমন কি, একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করেতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাবাড হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁডিয়া কোথা হইতে শিবপুরের একটি ভলন্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোডা অদিষ্টে···"

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গন্‌শাটার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হল মনে করে বুক বাঁধতে পারত। এ যেন দেখছি একেবারে মুষডে পডবে বেচারা।"

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া সম্মুখে

এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুক-ভাবে প্রশ্ন করিল, “তিলে, দেখেছিস ?”

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল, “কি র‍্যা ?”

“ওই যে মেয়েটা·· ?”

“হুঁ, তা কি ?”

“ইডিয়ট—দেখতে পাচ্ছিস না ?—নিশ্চয় কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, না হলে ওরকম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চারি দিকে চাইবে কেন ?”

“তাহলে নিয়ে আসব গন্শাদের ডেকে ?”

“হ্যাঁ, এমন না হলে আর বুদ্ধি। আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক। ওকে হাত করে বরঞ্চ গন্শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক।”

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া, কাহারও কাঁকালের নীচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া দুইজনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়াই চলিল—কেহ গাল দিল, কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়া উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দু'জনের মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে ইটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুকনা কাপড়, নামাবলী আর ঘটি কোলের কাছে করিয়া বসিয়া ছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল, “কি হয়েছে তোমার, খুকি ?”

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দু'জনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, “বল কি হয়েছে তোমার, কিছু ভয় নেই।”

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল, “ভয় কি ? আমরা ভলণ্টিয়ার, এই দেখ।” বলিয়া বুকে পিন্-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্না মুখে ব্যাজটার দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, “তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি ?”

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, “মার সঙ্গে ?···বাবার সঙ্গে ?···ঠাকুরমার সঙ্গে ?”

মেয়েটি মুখ চুন করিয়া একটু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “না, দিদিমার সঙ্গে।”

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণে ছেলেয়, মেয়েয়, বুড়োয়, অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে মেয়েটির ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে।...তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমাব মার কাছে রেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিযা বলিল, "আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি..."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল ; বলিল, "সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাবু ?—তা ছাড়া দিদিমা আর কার লবযুবতী হয়ে থাকে বলুন না !"

মেয়েটি এতক্ষণ কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো !"—বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিযা উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পডিয়া নানাবিধ প্রশ্নেব আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কি ? অঝোব-ঝোবে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা "দিদিমাকে এনে দাও...দিদিমার কাছে যাব !..."

খাঁটি, দুর্লভ অ্যাক্সিডেণ্ট। আবিষ্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার মোডলিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল, "আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজে-শিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পডেছে, ওর আর কোন ভয় নেই।...কোন্‌খানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু ?"

মেয়েটি একদিকে ঘুরিয়া দাঁডাইতে যেখানে ভিডটা পৃথক হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওই খানটায়... ওগো দিদিমা গো !"

বৃত্তটা আবার জুডিয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল, "ওখানে তো জল বেশি নয়, তবে..."

একজন বয়ঃস্থগোছের লোক বলিল, "কাল পূর্ণ হলে, বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে..."

শিবপুরের হাতের জলে-ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা জাগিয়াছিল ; বলিল, "মিরগি ছিল সে বুড়ির, না হলে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে !"

একজন পরামর্শ দিল, "তাহলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা

দরকার ; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?”

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল, “পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই ? জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান।” কে গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল, “যান তো, গন্‌শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে—(ভিড়ের দিকে চাহিয়া) রাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে—বলে যান যে শীগগির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক।”

কে একজন বলিল, “তাই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতে এসতে বুড়ি ত্যাতক্ষণ উলুবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে! এখন মেয়েটাকে ঘরে লিযে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।”

ত্রিলোচন গনশার অবর্তমানে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন শিবপুরের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিস আছে। বলিল, “তবে গন্‌শাকেই শীগগির ডেকে আনুন। ·· আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে ? আজ বাঁচাও, কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার·· চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুনি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।”

গোরাচাঁদ বলিল, “হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে দু’বার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত-প্রাণ।”

গোরাচাদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, “এখানে কি ব্যা গোরে ?”

গন্‌শার আওয়াজ, মুহূর্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকি-দুই-জন।

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “একটা পেয়েছি গন্‌শা!”

গোরাচাঁদ বলিল, “তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।”

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, “কাদের মেয়ে ?”

গোরাচাঁদ স্ফূর্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল, “ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।”

“ডু-ড্ডুবে মরেছে। কোন্‌খানে ?”

ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, “ওই ওখানটায় বলছে খুকি।”

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারি আমার চোটের ভলণ্টিযার সব!"

গন্‌শা বলিল, "একমুঠো তি-ত্তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড! জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের ভরসায় বসে থাকবে? চল্ ঘোঁৎনা—"

ভিড ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "আর তোরা দু'জন মেয়েটাকে আগলা, তিলে আর গোরা।"

ইটের গাঁথুনির পরেই ভয়ানক কাদা, পিছল, ভিড। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জেটির পণ্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চার জনে অগ্রসর হইল। ভিডের মধ্য হইতে কয়েকজন সঙ্গ লইল; তাহাদের কথাবার্ত্তায় দু'চার জন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গন্‌শা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "এইখানে, তিলে?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গন্‌শাদের ঘিরিয়া দু'টো ভিড জমিয়া গিয়াছে, অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরেজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "ইয়েস, দেযার!"

ঘোঁৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন ডাঙায় সকলের জামা লইয়া থাকিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গন্‌শা আবার গঙ্গামুখো হইতে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, "ওখানে ভিড কিসের বাছা?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের চেহারা, গলার স্বর ভাঙা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু—সের-তিনেক জল ধরে।

গন্‌শা, শুধু গন্‌শা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়ে বসে ছিল—কিছু হয় নি তো তার?"

কে. গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ংগম করিতে পারে না, তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়ে-গোছের চেহারা দেখিলে খুশি হয়, একটু আলাপ করিতে চায়; অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, সে তো বেশ আছে—আমাদের সেবা-সংঘের হেফাজতে; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্যন্ত আমাদের মনটা..."

"কে ডুবে মরেছে ?"—এক মুহূর্তে মূর্তি আর স্বরে যে পরিবর্তন হইল তা সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির উপর মুঠাটা কড কড করিয়া উঠিল।

সকলে, এমন কি কে. গুপ্ত পর্যন্ত শঙ্কিতভাবে তুই-পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে ? খেস্তিব দিদিমা ? তাই বুঝি বলিয়েছিস তাকে দিয়ে ? ভলন্টিযার সব, না ?—উব্‌গার হচ্ছে ? খেস্তিব দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীব মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌বা ? এই কে তোর মুণ্ডুপাত কবছে—?"

বাঁ-হাতটা বাঘের পাঞ্জাব মত কে. গুপ্তর মস্তক লক্ষ্য কবিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাচে অভ্যস্ত থাকায একটা গোঁত্তা মাবিয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তর পিছনেই রাজেনের উপর গিয়া পডিল। সে কবি বলিয়া বাবরি বাখে, মুঠাটা কডাক্কড করিয়া জমিয়া বসিল তাহার মাথায়।

—"ঠিক ধবেছি—এ-ই সদ্দাব ! বল্ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস ?"

রাজেন ঝাঁকানিব মধ্যে আর্তভাবে ডাকিল, গন্‌শা ! গণেশ !!"

গন্‌শা জলে নামিয়া পডিযাছিল—তিন জনেই ; উত্তব করিল, "এক থাবলা পাঁক তুলে মাথায দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিয়া, বরং উগ্রতর করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "বটে, পাঁক দিযে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরি করে ? মিবগি রুগী করে ? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি ?—তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয় না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস্।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসর হইযা আসিল, সভয় ভক্তির সহিত যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে মাঠান, দা'ঠাউব ওনাকে নিজের মাথায় পাঁক দিতে বলতেছে আর কি, এঁটেল মাটিব পাঁক পেছল কিনা…"

"কে তুই ? তুই নিজে এসে দে না। আয়…কই, এগুচ্ছিস্ না যে ?"

লোকটা তাডাতাড়ি পিছনের ভিডে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায় মুষ্টিটা বোধ হয় একটু আলগা হইয়া গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল ; কিন্তু পিছল, আর গঙ্গার ঢালুর জন্য আর সামলাইতে পারিল না, ওলট-পালট খাইয়া, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিয়া, কাহারও আহ্নিক নষ্ট করিয়া গঙ্গার গর্ভে গিয়া পড়িল এবং প্রচণ্ড হুংকারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব সাঁতার দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁড়িয়া উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে

আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে সামনাসামনি হইয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবারে মাঝগঙ্গামুখো হইল। ততক্ষণে চারি দিকে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড় ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করিয়া বলিতেছে কচি মেয়ের গলার হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্শা একবার জাহাজের জেটির উপর উঠিয়া এক রকম তীব্র সাংকেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশির মত করিয়া তার মধ্য দিয়া তারস্বরে প্রশ্ন করিল, "ডেড উঁয়োম্যান্ গট?"

গন্শা উত্তর করিল, "নট ডেড, ডা-ড্ডাইং রাজেন;—রাজেনকে মেরে ফেলছে, চুলের মুঠি ধ'রে; তো-ত্তোরা সেইখানে চলে আয়—মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে; নো মিরগি। ম্যান-ট্রেডমার্ক উওম্যান! এক্কেবারে বেটাছেলে-মার্কা!..."

... ...

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে।

ভাঁটার জন্য জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি সাইজের গাধা-বোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই; অর্থাৎ গাধা-বোটের লোক নাই, আছে গন্শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই—আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলন্টিয়ারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়, কোমরের নীচে! বাঁধিবার কিছু না থাকায় কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া দিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুটা লটপট করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না আসিলে উঠিবে না। উঠিবার যো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।

চারু-শিল্প

(সাধ)

মেয়ে দেখা হইল।

খাসা মেয়ে, বেশ আঁটসাট গড়ন; সমস্ত শরীরটাতে স্বাস্থ্যের শ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাথায় একটু দীর্ঘ, গায়ে মেদের বাহুল্য নাই, তবে হাড়কাঠ সাধারণ মেয়ের চেয়ে মোটা, তাহাতে শরীরটি একটু ভারী দেখায়—'সখী ধর ধর' গোছের একেবারেই নয়। হ্যাঁ ঠিক, এই ধরনের মেয়ে এখন দরকার বাংলার ঘরে ঘরে।...মাখনাটার কপাল ভাল।

পাশের ঘরে জলযোগের ব্যবস্থা—

ঠিক জলযোগ বলিলে ভুল হইবে—লুচি, ছোলার দাল, দই-মাছ, মাংসের কোর্মা, চপ; ওদিকে রাবড়ি, মিষ্টান্ন, দই। বলিলাম, "করেছেন কি!—আপনাদের জামাই আবার ভয়ানক মিতাহারী—সব তো পড়েই থাকবে।"

'মিতাহারী'—মাখনার গালাগাল; তবু এ মিথ্যাটুকু বলিলাম মাখনাকে একটা ইঙ্গিত করিবার জন্য।—জানি ও বোধ হয় গ্রাহ্য করিবে না; তবু, একেবারে পাতে পিঁপড়া না কাঁদিয়া যায়...অন্তত, কোন জিনিস চাহিয়া না বসে বেহায়াব মত।

মেয়ের কাকা বলিলেন, "এর মধ্যে রুনুর রান্নার হাতও টের পাবেন। কোর্মা আর মাছটা ওকে দিয়েই রাঁধানো হয়েছে।...আপনি মশাই মোটেই খাচ্ছেন না যে! ওকি?"

আমার অত বেশি ভদ্রতা করা অভ্যাস নয়, আর রান্নাও সত্যই চমৎকার হইয়াছে, তবে এক্ষেত্রে মাখনের চোখের সামনেই একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া রাখিবার জন্য আমি সত্যই নিতান্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিতেছিলাম। কিন্তু হতভাগাকে শেখানো কি এত সহজ? আমার দিকে হঠাৎ মুখটা বাড়াইয়া আনিল, এবং আমি কানটা আগাইয়া নিলে নিম্নস্বরে বলিল, "একবার মাংসটা... তুই নিজের জন্যে চা না...তাহলেই..."

মেয়ের মেজভাই, কাকা দুইজনে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "কি, কি? কিছু চাই নাকি? বল, এতে আর লজ্জা কি?"

লজ্জায়, রাগে আমার কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলাম, আজ্ঞে না, চাইবে কি! ও বলছে...থাক্ সে কথা...না, সত্যিই চমৎকার হাত রান্নার..."

কাকা, মেজভাইয়ের সঙ্গে আরও দুই একজন উৎসুক হইয়া উঠিল, "কি, কি বলছেন উনি ?"

হাসিয়া বলিলাম, "দুষ্টুমি আর কি, এখন থেকেই ! বলছে মাংসটা আলুনি হয়েছে। শোনেন কেন ; সম্পূর্ণ মিছে কথা , চমৎকার রান্না, আর বলে কিনা আলুনি !"

"না, না, শীগগির নুন নিয়ে এসো, যাও , হতে পারে আলুনি, ছেলেমানুষ তো..."

বলিলাম, "ও একটু নুন খায় বেশি।"

এক ছোকরা নুন লইয়া আসিল। বলিলাম, "দাও বাটিতে।" মাখনাকে বলিলাম, "নে, মিশিয়ে নে।"

নিরুপায় ভাবে মিলাইতে মিলাইতে মাখনা আমার পানে আড়চোখে এমন একটা কটাক্ষ হানিল যে, যুগের দোষ না থাকিলে তখনই একপিণ্ড আঙ্গারে পরিণত হইয়া যাইতাম।

যাহোক, সে ফাঁড়াটা কিন্তু ঐ করিয়া কাটিল। কোন রকমে মান বাঁচিল।

বাহিরে আসিয়া সকলে বসিলাম। এ সব ব্যাপারে যেমন হইয়া থাকে—মেয়ের গুণ-গানই চলিতে লাগিল। পাড়ার বর্ষীয়ান্ আরও কয়েকজন আসিয়া যোগদান করিলেন।—স্বাস্থ্যে, কর্মিষ্ঠতায়, চরিত্রের মাধুর্যে এমন মেয়ে এ তল্লাটে নাই। ঐ তো ছেলেমানুষ মেয়ে, গ্রামে কোন একটা কাজকর্ম যাগযজ্ঞ হইলে সমস্ত হিড়িকটা একলাই সামলাইবার ক্ষমতা রাখে—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা—যখন শ্বশুর-গৃহে যাইবে, গ্রামখানিকে একেবারে অন্ধকার করিয়া যাইবে... ।

আমি কিন্তু এদিকে গলদ্‌ঘর্ম হইতেছিলাম। মাখন মাঝে মাঝে আমার পাঁজরার নীচে আঙুল দিয়া এক একবার খোঁচা দিতেছে, এখনই অসামাজিক কিছু একটা করিয়া বসিবে, কি বেফাঁস কোন একটা কথা বলিয়া বসিবে। প্রথমটা অগ্রাহ্য করিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া থাকা আর নিরাপদ নয় দেখিয়া অবশেষে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিছু বলবি নাকি ?"—এবং যাহা বলিবে তাহা একেবারে প্রকাশ্যে না বলিয়া বসে এইজন্য কানটা বাড়াইয়া দিলাম। মাখন মুখটা আগাইয়া আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "সেই যে তোক বলেছিলাম—গান, বোনাটোনা..."

হতভাগার উপর বেজায় রাগ হইল। এ মেয়ে কি গান আর উলবোনা

লইয়া থাকিবার মেয়ে? এ রত্ন কি ধাতে গড়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই, মিছামিছি বুজরুকি করিতে যাইতেছে। চাপা গলায় বলিলাম, "চুপ কর্।"

সকলে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল,—বর বলে কি?…"উনি কোন কথা বলতে চান কি?—তা বলুন, লজ্জা কি?"

লজ্জা যে ওর নাই সেটা কি ওরা এখনও টের পাইল না?

"পানে নিশ্চয় চুন কম হয়েছে"—বলিয়া যে ছোকরা নুন জোগাইয়াছিল সে উঠিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইল; মুখ পোড়াইবার একটু লোভ হইলেও…

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, ও উঠতে চাইছে, জিগ্যেস করছে—গাড়ির দেরি কত?"

মাখন আর এবারে চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজিই বলিয়া উঠিল, "না, আমি বলছিলাম· "

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল; লজ্জা কি?

"কোন রকম শিল্পটিল্প…"

গলার আওয়াজে রাগটা যাহাতে প্রকাশ হইয়া না পড়ে সেরূপ চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু বোধ হয় সমর্থ হইলাম না। মুখটা একটু নীচু করিয়া বলিলাম, "ও! ফিস্ ফিস্ করে বুঝি তাই বলছিলি? আমি মনে করি…তা অমন হাতের রান্না—ওব চেয়ে বড় শিল্প…"

মাখনা বলিল, "না, আমি চাড়ু-শিল্পের কথা বলছি।"

গা আমার পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল। চাড়ু-শিল্প! কথাটা জোগাড় করিল কোথা হইতে? ওর মুখে তো এই প্রথম শুনিলাম।

দেখিলাম সকলেই চুপচাপ। শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—কূলের কাছে আসিয়া তরী বুঝি ডুবিল। আমিও বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম—জানি তো, ও ছোঁড়ার মাথায় একটা খেয়াল বসিয়া গেলে আর সহজে মেটানো যায় না। খানিক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল। মুখটা তুলিয়া বলিলাম, "ও! আপনারা বুঝি ধরতেই পারেন নি কথাটা? তাই চুপ করে রয়েছেন? ও বলছে—এই বোনাটোনা, ছবি আঁকা, রুমালে ফুলপাতা তোলা, এই সব আর কি! শহরে আজকাল এ খুব চলেছে কিনা। তা এ সবে যে মেয়ের হাত কি রকম পাকা সে তো আমি ওর আঙুলের গড়ন দেখেই বুঝেছি…"

মেয়ের দাদার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "যান তো, নিয়ে আসুন তো নমুনা সব, আর হ্যাঁ—শুনুন।"

মাখনের কানে কানে বলিলাম, "দাঁড়া, এই সঙ্গে তোর শিল্পের সেরা শিল্পও আনিয়ে দিচ্ছি।"—বলিয়া একটু টিপিয়া দিলাম।

উঠিয়া গিয়া কনের দাদাকে একপ্রান্তে ডাকিয়া বলিলাম, "ও মেয়ের ওসব বাজে কাজের সময় কোথায় মশাই? আমি তো বুঝি। পরে ও হতভাগাও বুঝবে কদর। আপাতত আপনি এক কাজ করুন।—বাড়িতে উলের কাজ, কি রুমালে নাম তোলা—এসব আছে কিছু?"

ছোকরা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "রুনুর নিজের হাতের নেই, শিখতেই চায় না; সেজকাকীর—"

আমি তাহার কাঁধে দুইটা লঘু আঘাত করিয়া বলিলাম, "সেজকাকীরই হোক, কি বড় জেঠাইয়েরই হোক—কিচ্ছু যায় আসে না—হাতের কাছে যা পান উঠিয়ে নিয়ে আসুন।" তারপর তাহার কুণ্ঠার কারণটা বুঝিতে পারিয়া তাহার পরিহিত খদ্দরের পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলাম, "আর দোহাই আপনার—সত্যি কথাটা বলে যেন ভেস্তে দেবেন না! এর পরে খদ্দরের ওপর না হয় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন। হ্যাঁ, আর এককথা—একটি কাগজে রুনুদেবীর নিজের হাতে লেখা তাঁর নামটি দয়া করে নিয়ে আসবেন, নৈলে ভাববে ওকে ঠকাবার উপায় বাংলাতেই আপনাকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এনে দিন—বিয়ে পাকা—এ আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি।"

(পরিণাম)

বছর দেড়েকের পরের কথা বলিতেছি।

আমি মাখনের বিয়ের সময়টায় ছিলাম; তার পরেই কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাদের এই দেড় বছরের ছাড়াছাড়ি। এতদিন পরে আবার হঠাৎ দেখা।

দুপুরবেলা কাঠ-ফাটা রোদ, রাস্তায় এক পা চলে কাহার সাধ্য! জায়গায় জায়গায় পীচ গলিয়া উপরকার স্তর ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে হাওয়া দিতেছে—যেন আগুনের অদৃশ্য শিখা।

দেখিলাম রাস্তা দিয়া আমাদের মাখনের মত কে যেন হন হন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে বুঝিলাম মাখনই! কিন্তু এত বদলাইয়াছে মাখনা—ভাল করিয়া যেন চেনা যায় না! রোগা হইয়া গিয়াছে, চুলগুলো উস্কখুস্ক,

মুখে কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। বাঁ কাঁথে প্রকাণ্ড ছবির ফ্রেমের মত কি একটা কাগজে মোড়া। অবশ্য বেশ সুসংস্কৃত মার্জিত চেহারা মাখনার কখনই ছিল না, কিন্তু অনবদ্য স্বাস্থ্য আর নিশ্চিন্ত সন্তোষের একটা দীপ্তি ওর চেহারায় চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি। এই কি সেই মাখন!

ও জানিত না যে আমি আসিয়াছি, তাই হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আমি ডাক দিতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একটু চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "শৈলেন যে! কবে এলি?"

বলিলাম, "আজই। আয় বোস্।—তারপর? এই রোদে, ঠিক-দুপুরে চলেছিস কোথায়? আর শরীর তোর এমন কেন? কিছু অসুখ-বিসুখ—"

"নাঃ" বলিয়া মাখন কথাটাকে যেন একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেহারা যে ইহাতে সায় দিতেছে না সেটা ভাল ভাবেই জানে বলিয়া, অস্বীকার করার পর যেন আরও নিস্প্রভ হইয়া গেল। কোথাও কিছু একটা গলদ আছে বুঝিতে পারিয়া আমি আর ও প্রসঙ্গটা চালাইলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর হাতে ওটা কি মাখন?"

মাখন যেন এতে আরও একটু জড়সড় হইয়া উঠিল; মোড়কটা বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া বলিল, "ও কিছু নয়।—তারপর, ছিলি কেমন?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমাদের থাকা আর না থাকা! তোর নিজের কথা বল্। গিন্নী কি রকম হল? ঠিক কথা, ভুলেই যাচ্ছিলাম—কেমন কোর্মা-কালিয়া খাচ্ছিস্? না, তোর বউকে দেখতে গিয়ে যা চপ খেয়েছিলাম মাখন, এখনও যেন মুখে লেগে রয়েছে। এখন হাত নিশ্চয় আরও পেকেছে, একদিন খাওয়ানো চাই, কবে আসব বল্ দিকিন?"

উত্তরে মাখন লজ্জিতভাবে একটু ম্লান হাসি হাসিল মাত্র।

বলিলাম, "হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না।—না নেমন্তন্ন করিস্ এমনি গিয়ে জবরদস্তি খেয়ে আসব একদিন। কেন, বিয়েটা না হয় তুই-ই করেছিস, কিন্তু আমাদের কি কোন হক্ নেই? যোগাযোগটা ঘটাল কে?"

মাখন একটু থামিয়া বলিল, "আজ রাত্তিরেই আয় না, শৈল, অনেক দিন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিনি দু'জনে। ও কিন্তু আর একেবারেই সময় পায় না রাঁধবার ভাই। যখন রাঁধত তখন তুই রইলিনি—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "সময় পায় না?

"এখন মনটা অন্যদিকে গেছে কিনা।"

"অন্যদিকে!—কোন্ দিকে?"

"আজকাল বোনা, রেশমের ফুল তোলা এই সব নিয়েই থাকে যে; হেঁসেলের দিকে আর যাবার ফুরসৎই পায় না।"

আমার ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল,—'চারু-শিল্প।'

বলিলাম, "তাহলে তো খাসা আছিস্। হাত কেমন হয়েছে বউয়ের?"

মাখন আবার একটু হাসিল;—একটা অপ্রতিভ হাসি, যেন কি একটা বলিতে—কি করিতে চাহিতেছে, অথচ মন-স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বলিলাম, "চপ-কোর্মাও উড়িয়ে আসব, আর তোর বউয়ের হাতের কাজও দেখে আসব সেই সঙ্গে, বলে রাখবি গিয়ে। আজ আর নয়,—বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়বে। এক হপ্তা সময় দিলাম। এক আধখানা নমুনা আমায়ও দিতে হবে কিন্তু, ঘরে টাঙিয়ে রাখব।"

মাখন কোন কথা না বলিয়া ফ্রেমের মত সেই জিনিসটির কাগজেব মোড়কটা ধীরে ধীরে খুলিয়া সেটা আমার দিকে ঠেলিয়া দিল।

কালো নীল আর বেগুন রঙের উলে বোনা প্রায় তিন ফুট আড়াই ফুট মাপের কি একটা জিনিস!—কোন একটা জানোয়ার বলিয়া মনে করা মুস্কিল, কেননা মুখ, চোখ, কান বাহির করা শক্ত; কোন ঝাঁকড়া একটা ফুলের গাছ মনে করায় বিপদ্ আছে, কেননা কোথায় যেন তিনটি পায়ের আভাস পাওয়া যায়; এক একবার মনে হয় একটা মানুষ যেন হাতে মাথা টিপিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহাই বা হয় কেমন করিয়া? পিছনে একটা ল্যাজের মত কি একটা রহিয়াছে যে!—গাছ নয়, মানুষ নয়, জন্তুজানোয়ার নয়, আসবাব-পত্রের সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপারটা তাহা হইলে কি? ওদিকে মাখনা নিশ্চয় একটা প্রশংসার উচ্ছ্বাস আশা করিতেছে; কিন্তু কিসের প্রশংসা করিতেছি না বুঝিয়া, কি প্রশংসা করিব?

মাখন বলিল, "শনিবার টাউনহলে এক্জিবিশান কিনা···আরও গড়ছে বৌ—অষ্টপ্রহর খেটে।"

আর চুপ করিয়া থাকা নিষ্ঠুরতা, আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "হয়েছেও চমৎকার!—বাঃ!"

মাখন লজ্জিত ভাবে বলিল, "যাঃ ঠাট্টা করছিস।"

"ঠাট্টা!"—আশ্চর্য হইয়া মাখনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মাখন স্থির সপ্রশংস দৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর

আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "পাবে প্রাইজ মনে করিস ? আমার তো আশা হয় না।"

বলিলাম, "মারে কে! এ রকম জিনিস ক'টাই বা আসবে এক্‌জিবিশানে শুনি ?"

মাখন হাসিয়া ফেলিল ; বুঝিলাম তাহার সব সন্দেহ কাটিয়া গিয়াছে।

বলিল, "দেড টাকার উল আছে এতে শৈলেন, আর ক'টা দোকান ঘুরে রং মিশিয়ে কিনতে কি কম খাটুনিটা হয়েছে!"

"অথচ তুই বলছিস প্রাইজ পাবে না!—নগদ দেড়টা টাকার উল কি একটা হাসি-ঠাট্টা না কি ? হুঁ!"

ঠাট্টাটা বুঝিল না মাখনা, নিজের গড়া স্বর্গলোকে বেশ আছে! তবুও কিন্তু কষ্ট হইল ওর দশা দেখিয়া। মাখনা নিশ্চয় ভাল করিয়া খাইতে পায় না ; বরাবরই একটু ভাল রান্নার, ভাল জিনিসের পক্ষপাতী ছিল বেচারা! তাহার পর এই অযথা প্রাণান্ত মেহনৎ—রোদ নাই, বৃষ্টি নাই, উল মিলাইয়া বেড়ানো—টাকার অপব্যয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম।

রীতিমত রোগা হইয়া গিয়াছে। মাখনা হইল রোগা—তাও অমন গৃহিণী পাইয়া—রান্নায় যে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী! কি কোর্মাই না রাঁধিয়াছিল সেদিন! আর সেই রুয়ের পেটি দিয়া দই-মাছ! ব্যক্তিগতভাবে নিজেও যেন একটা বঞ্চনার সন্তাপ অনুভব করিতেছি। এই দেড বৎসরের মধ্যে যখনই মাখনার কথা মনে পড়িয়াছে—দেখিয়াছি ঐ সেই হৃষ্টপুষ্ট সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা বৌ ষোডশোপচারে অন্নব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিতেছে, আর পরিতোষের আহারে মাখনলালের চেহারা আরও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া মাঝে মাঝে ভাগ বসানো যাইবে।...হায়রে বরাৎ, অমন কোর্মার জায়গায় এই উলের পিণ্ড! খাল কাটিয়া কুমীর ঢোকাইল ঘরে মখনা!

বলিলাম, "মাখন, বউয়ের রান্নার দিকেও একটু খেয়াল রাখিস—তোকে দেখলেই মনে হয় ঠাকুরের বকেয়া ডাল চচ্চড়ি ছাড়া আর দেড় বছর তোর পেটে কিছু পড়েনি..."

কাকেই বা বলা ?

মখনা তাহার 'চাড়ু-শিল্প'টা আবার সযত্নে কাগজে মুড়িতেছিল, স্মিতহাস্যের সহিত আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যিই প্রাইজ পাবে বলে তোর মনে হয় শৈলেন ?"

বলিলাম, "অনিবার্য ; কিন্তু আমি বলছিলাম অমন রান্নার হাত আজকালকার দিনে—পুরুষদের এই পোড়াকপালের যুগে—লাখে একটি মেলে না…"

মাখন ফ্রেমটা কাঁকালে লইয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল।

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "উঠলি যে! ব'স্, আমি শরবতের কথা বলে দিলাম। আর রোদটা একটু পড়ুক—রোদের দিকে যে চাওয়া যায় না—চোখ ঠিকরে পড়ে!"

মাখন ততক্ষণে রোদের দিকে পা বাড়াইয়াছে, ঘুরিয়া বলিল, "আজ থাক্ ভাই, অন্য একদিন খাব'খন। এখনই পেনোর দোকানে না দিয়ে এলে পরশু শনিবার পর্যন্ত বেঁধে দিতে পারবে না কিনা। বৌ ওদিকে আরও তিনখানা প্রায় শেষ করে এনেছে।…সত্যি বলছিস তো, পাবে প্রাইজ?"

আবার সেই আগুনের হলকার মধ্যে নামিয়া পড়িল।

মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি

১

শেষ পর্যন্ত মুরারি ডাক্তারকে ডাকাই স্থির হইল।

মেয়ের মনটা শুধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। বলিল, "ওপাড়া থেকে সাধন ডাক্তারকে ডাকলে ভাল হত না তারু কাকা? অবিশ্যি মুরারি কাকা খুবই ভাল, কিন্তু আমার যেমন অদেষ্ট…"

তারিণী খুড়ো হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর সেদো এসে তোর অদেষ্ট পালটে দেবে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন জানিস?"

তিনি নিজেও জানেন না বলিয়া আবার হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিল, "তখন থেকে 'সাধন-ডাক্তার, সাধন-ডাক্তার' যে করছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন তো তারু কাকা, সাধন ডাক্তারের খাঁই আর হ্যাপা মেটানো কি চাড্ডিখানি কথা? কলেজের পাশ-করা ডাক্তার, বোধ হয় এমন একটা ওষুধের নাম করে বসবে, রোগী ছেড়ে ছোট কলকাতা ওষুধ খুঁজতে! ও যাবে কাছা-কোঁচা এঁটে? আমায় দ্বারা তো হবে না, বলে নিজের শরীর নিয়েই প্রাণান্ত। আর এই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করা, বছরে বছরে একটি করে বেড়েই

চলেছে, নিজেদের পাড়ার ডাক্তারকে আমাদের মত ছাপোষা গেরস্থর অবহেলা করা চলে ? আপনিই বলুন না কাকা।"

দোরের পাশ হইতে উত্তর আসিল, "চুপ করতে বল, আর ছেলেগুলোর অকল্যাণ কামনা করতে হবে না।···আসুন তাহলে মুরারি কাকা, আমার কপালে যা আছে হবে।"

তারু খুড়ো বলিলেন, "ভালই হবে বাছা। মুরারির অনেক গুণ, রোগী হাতে তুলে দিলাম, তারপর নিশ্চিন্তি ; আর ওসব পাশ-করা ডাক্তারদের কি যে বলে, ইযেও অনেক—বোগী দেখবি, রোগী দেখ, তা নয়, তাব পেচ্ছাব যাচ কবিয়ে আনাও, তার রক্ত দেখব—আর লোকটা বেজায অর্থপিশাচও বাছা, আমার নিজেব ভোগা কিনা ; সে সব কথা তুলতে হলে···" কি ভাবিয়া আর না তুলিয়া খুড়ো আরও ঘন ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

দোরের পাশ থেকে উহাবই মধ্যে একটু উষ্মার সহিত আপত্তি হইল, "তা হলে উনি যেন একাই আসেন, আমি ভলন্টিয়ার-ছোঁড়াদের দরজা মাড়াতে দোব না, তা বলে দিচ্ছি—অলুক্ষুণে !"

প্রত্যেক গ্রামেই দু'একজন লোক থাকে—প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ—সমস্ত গ্রাম যাহাদের মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে।—লোভের বিষয় শ্রাদ্ধের দিনটি। বসিয়া বসিয়া সবার চোখের সামনে সে টাকা করিতেছে, খবচের বেলায় কিন্তু হাতটান। যেমন প্রাযই হইয়া থাকে এসব ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের হাত বেশ দরাজ। এখন বিশেষ সুবিধা পাইতেছে না কিন্তু খরচের জন্য যে তাহাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করে, নানা ছুতানাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের বাশটানা হাতের প্রথম শ্রাদ্ধটা তারা ভাল করিয়া করিবে—গ্রামের সে একটা মস্ত বড আশা ও উৎসবের দিন।

পরেশ চক্রবর্তী কতকটা এই ধরনের মানুষ। তাঁর পরমায়ু লইয়া গ্রামের চেয়ে আবার তাঁর বাড়ির মধ্যে বেশি উৎকণ্ঠা, কেন না, উত্তরাধিকারী জামাই। অপুত্রক শ্বশুরের কন্যা বিবাহ করিয়া লোকটা খুব একটা দাঁও মারিল বলিয়া আশা করিয়াছিল ; কিন্তু ঐ রকম অস্থিচর্মসার শরীরের মধ্যে পরমায়ুর বহর দেখিয়া তাহার নিজের পরমায়ু নিত্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বছরকে বছর ঘুরিয়া যাইতেছে, অসুখে পড়িবার নামগন্ধ নাই ; যদি বা হইল একটু কিছু, একটা দিন উপবাস দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। ক্রমেই যেন ধৈর্য রাখা দায় হইয়া উঠিতেছিল। মুখ ফুটিয়া তো কিছু বলা যায় না, শুধু গুমরিয়া মরা।

এইবার যেন একটু কাবু করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জামাই চিকিৎসার পরামর্শের জন্য পাড়া তোলপাড করিরা বেড়াইতেছে। আহা, শ্বশুর মানুষ, যদি পরমায়ু থাকে তো আলাদা কথা, না হইলে ভগবান্ করুন যেন অল্প ভোগের উপর দিয়াই নিষ্কৃতি পান। গুরুজন···

শুধু মেয়ের মনটি বড ভাল। বুড়ো বাপ, চার চাবটে দিন কখনও তাঁহাকে কেহ বিছানায় পডিয়া থাকিতে দেখে নাই। পরিচর্যা করিতে করিতে কেবলই বাহিরে গিয়া চোখ মুছিতেছে।

মুরারি ডাক্তার আসিলেন। বেশ গোলগাল চেহারা, মুখে প্রসন্ন হাসি। কথাবার্তা চলাফেরার মধ্যে সকলের সঙ্গে একটি নিবিড আত্মীয়তার ভাব মাখানো এবং সেই জন্য গলার আওয়াজটা খুব মুক্ত। আর, সব অবস্থাতেই এক ভাব,—নিমন্ত্রণ-বাডিতেই হোক বা রোগীর ঘরেই হোক, রোগের প্রথম অবস্থাতেই হোক, শ্বাসের সময়েই হোক—গলার সেই এক রকম স্বর, সেই অকৃপণ হাস্য, সেই নির্বোধ মুখরতা···

সদানন্দ লোক, সব তাতেই পাওয়া যায়; তবে রোগের সময় লোকে একটু এডাইয়া চলে। মুরারি ডাক্তার একবার ঢুকিলে নাকি শ্রাদ্ধের লুচিটি পরিবেশন না করা পর্যন্ত ফেরেন না। গ্রামে 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকে' বলিয়া একটা চলতি কথাই দাঁডাইয়া গিয়াছে।

বাডি ঢুকিয়াই একগাল হাসিয়া বলিলেন, "এই যে বাবাজী, ভাল তো? পরেশদা কোন্ ঘরে? নিঝুম হয়ে পডে আছেন? তা আর এমন অন্যায় হয়েছে কি বাপু? তিন কুডি বয়েস হল, এখন কি আর লাফালাফি করে বেডাবেন?···দে বিন্দু, একটা আসন দে দিকিন, এইটুকু আসতেই ক্লান্ত হয়ে পডেছি, আমারও তো হল—আর কি, এই আশ্বিনটা পেরুলেই পঞ্চাশ বছর।"

বিন্দুবাসিনী রকে আসনটা পাতিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া বলিল, "আজ চার দিন থেকে শয্যেগত, ফিরে পাব তো বাবাকে মুরারি কাকা?"—জোরে অশ্রু নামিল।

মুরারি ডাক্তার বাডি কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "শুনছ পাগলীর কথা···ধর্ যদি নাই পাস। পারবি চিরকাল ধরে রাখতে? মুরারি কাকার হাতে তো পরমায়ু নেই, তবু না হয় জোড়াতাড়া দিয়ে দাঁড় করিয়া দিলাম, কিন্তু ক' দিন?"

তারিণী খুড়ো প্রবেশ করিলেন।

"এই যে খুড়োও এসেছ।...বিন্দু বলে—'ফিরে পাব তো বাবাকে?' তাই বলছিলাম—বলি, মুরারি কাকা ওষুধই দেবে, পরমায়ু তো দেবে না? ওঁর যদি তলবই এসে থাকে..." হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তারিণী খুড়ো বলিলেন, "পরমায়ু স্বয়ং ভগবানই দিতে অপারগ, তা তুমি-আমি কোন ছার। সেই ভাগবতে সেইখানটাই বলেছেন না ...নে বিন্দি, একটু তামাক সেজে আন্ দিকিন।...দেখলে নাকি দাদাকে?"

"না, হচ্ছে কি না, তাড়াতাড়ি কিসের? তামাকটা আসুক, একটু বেদম হয়ে পড়েছি। তোমার শরীরটা কেমন যাচ্ছে খুড়ো?...হ্যাঁ বাবাজী, তোমার সেই কাজটার কি হল, শুনলাম একটু আশা হয়েছে..."

"আর আশা, নবীনদা রোজই তাগাদা দিচ্ছে, চল একবার সায়েবের কাছে নিয়ে যাই, নতুন সীজন্টা শুরু হয়েছে; তা দেখুন না, ঠিক মোকা বুঝে শ্বশুর ঠাকুরের এই..."

"তা বটে। তা এ দিকটা চুকে গেলে, তুমি কর একবার দেখা, তোমাদের হলে আবার আমাদের ছেলেপুলেগুলোর একটা রাস্তা খুলবে।"

তামাক আসিল; আরও সব নানা রকম আলোচনা হইল। তারপর ধীরে সুস্থে মুরারি ডাক্তার গিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ পরেশ চক্রবর্তী ও-পাশ ফিরিয়া আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছেন। মুরারি ডাক্তার মুক্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, "দাদা!"

রোগী একটু চকিত হইয়া উঠিয়া পাশ ফিরিলেন এবং একটু বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বিছানার পাশে আঙুল কয়টা চাপিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "ব'সো।"

মুরারি ডাক্তার নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন, "বলি, মতলবখানা কি?"

বৃদ্ধ উত্তর স্বরূপ উপরে আঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন।

"আজ্ঞে না, সিটি এখন হচ্ছে না, মেয়ে জামাই বড্ড ছেলেমানুষ।...উনি ও দিকে টানছেন তো এদিকে মুরারি ডাক্তারও এসে ধরলে।...দাও দিকিন হাতটা।"

তারিণী খুড়ো আর বিন্দুর দিকে চাহিয়া নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। দরজার কাছে ছেলেমেয়ে কয়টি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিছু

একটা মজার কথা হইয়াছে ভাবিয়া তাহারাও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। বিন্দু তারিণী ঘোষালের হাতটা একটু স্পর্শ করিয়া বাহিরে ডাকিয়া চাপা গলায় বলিল, "কাকা, ও-রকম করে বলছেন…রোগীর মন…"

তারিণী খুড়ো একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোন কথা বিন্দুর! চিরটা কাল 'কাকা কাকা' বলে ঠাট্টা করে এসেছে, আজ আব বলবে না? কি রকম মিষ্টি শুনতে হল বল্ দিকিন?—বুড়ো বয়সের একটা সাধ; সেদো, কি বাইরের কোন ডাক্তার এসে বলতে পারত অমন প্রাণ খুলে?…আর একটা টিকে ভেঙে দে তো কলকেটাতে।…মুরারি এসে হাত ধরেছে, নিশ্চিন্তি, আর তোকে এ দিকে দেখতে হবে না—ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একটু নজর কর্ এবার।"

বিন্দু টিকা আনিয়া কলিকায় ভাঙিয়া দিতে দিতে বলিল, আশীর্বাদ কর ভালর দিকেই যেন নিশ্চিন্তি হতে পারি কাকা; সব কথাগুলোই কেমন যেন অমঙ্গল অমঙ্গল ঠেকছে কানে…"

মুরারি ডাক্তার হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন; বলিলেন, "কই?—ব্যাপার তো কিছুই দেখলাম না, বুকে একটু সর্দি বসেছে, তারই তাড়সে…"

বিন্দু ব্যস্ত ভাবে বলিল, "সেরে যাবেন তো কাকা?"

"সেরে যাবে না তো যাবে কোথায় বল্?—কি, হয়েছে কি দাদার? ভাবিস নি রে পাগলী—বুড়ো শীগগির নড়ছে না। এখন আরও দিন-কতক মেয়ে-জামাইয়ের সেবা খেয়ে তবে…"

"তাই আশীর্বাদ কর কাকা"—হাসিতে মেয়ের গালে চোখের অশ্রুবিন্দু কয়টি ঝরিয়া পড়িল। দুয়ারের কাছে জামাইয়ের মুখের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; না করিয়া ভালই করিল।

২

চিকিৎসার মত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মুরারি ডাক্তারের ঐ গুণ; সাবু তোয়ের করা থেকে দাগে দাগে ঔষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত সবই প্রায় নিজের হাতে। বিন্দু মৃদু আপত্তি করিল, কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তুই সেদিনকার মেয়ে, হাওয়ার কাপড় প'রে ঐ জামতলায় পুতুলখেলা করতিস, তুই রুগী-সেবার কি বুঝবি? শেষকালে মেরে ফেল্ বুড়োকে।"

অবশ্য এ কথার পর আর কোন মেয়েই অগ্রসর হইতে পারে না। সে

যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়া, রোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া, হাত পা টিপিয়া মুমূর্ষু পিতার সেবার সাধ মিটাইতে লাগিল।

সমস্ত দিন জোর চিকিৎসার পর সন্ধ্যার সময় রোগীর পরিবর্তন দেখা দিল ; অবশ্য খারাপের দিকে। একেবারে নিঝুম মারিয়া পড়িয়া না থাকিয়া রোগী মাঝে মাঝে চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কথার মধ্যে একটু একটু অসংলগ্নতা আসিতে লাগিল।

বিন্দুর কান্না দেখিয়া মুরারি ডাক্তার আদরের ধমকানি দিয়া বলিলেন, "অসুখ হয়েছে, একটু-আধটু বেফাঁস না বলে কি তোর বাপ এখন রুক্মিণীহরণের কথকতা করবে আশা করিস ? কচি খুকির বাড়া হলি যে তুই বিন্দি..."

বাহিরে আসিয়া জামাই, তারিণী খুড়ো প্রভৃতির সামনে নিজের বুকের উপর দুইটা মুঠা রাখিয়া হাসিয়া ঈষৎ চাপা গলায় বলিলেন, "দুটো বুকই সর্দিতে ঝাঁঝরে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে মুঠার মধ্য হইতে দুই বুড়া আঙুলকে মুক্ত করিয়া নাড়িয়া বলিলেন, "আশা বড একটা নেই, দেখে নিও আমার কথা।"

জামাই চিন্তিত ভাবে বলিল, "আজ রাত্তিরটা..."

মুরারি ডাক্তার হো হো করিয়া বলিলেন, "তুমিও যে বিন্দু হলে দেখছি বাবাজী,—রাত কাটবে না কি রকম ? পরেশদা'কে চেন না—এখন ক'রাত..." আবেগের মাথায় বিন্দুর কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সচেতন হইয়া সহজ গলায় বলিলেন, কোন ভাবনা নেই, আমি ওদের সেবাসমিতির দু'জন ছেলেকে বলে এসেছি..."

বিন্দু বাপের বিছানা হইতে উঠিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "না, আমি কখনই তাদের আসতে দেব না। ও অপয়ারা একবার ঢুকলে না নিয়ে বেরোয় না। এমনি সবাই সোনার ছেলে স্বীকার করি, কিন্তু সেবা করবার জন্যে রোগীর ঘরে ঢুকলে..."

জামাই বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "পালা করে জাগতে হবে।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, "আর পালা করতে হবে না, আমি একাই জাগব। না, কখনও আমি ঢুকতে দোব না ওদের..."

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "ওই করে তুইও শুদ্ধু পড়্, আমি দু'টো নিয়ে নাজেহাল হই। বাপের তাহলে খুব সেবা হবে।"

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ভাঙা গলায় বলিল, "আমি কিন্তু দু'জনের বেশি আসতে দোব না।"

অবশ্য দু'জনই আসিল না। বুড়ো পরেশ চক্রবর্তীর অসুখ, তায় আবার মুরারি ডাক্তার দেখিতেছে। একদিনেই নিউমোনিয়ায় দাঁড় করাইয়াছে, পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বারোয়ারীর চণ্ডীমণ্ডপে দলাদলির নেতারা অনেক ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছে, আজ রাত্রি হইতে পাড়ার শখের যাত্রাপার্টি কীর্তনের মহলা দিবে—শ্রাদ্ধ-বাসরের জন্য। বয়ঃস্থারা বলিতেছে, "আহা লোকটা ছিল ভাল গো, দোষে গুণে। মেয়ে কাজ কি রকম করে দেখা যাক্!"

ছেলেদের শখের সেবা-সমিতি। দু'জনকে বলা হইয়াছিল, ওপরপড়া হইয়া চারজন আসিল। নিজেরাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গাই দুইয়া খানিকটা দুধ যোগাড় করিয়া রাখিল। তাহার পর সমস্ত রাত তাসে, চায়ে, হল্লায় কাটাইয়া দিল। অবশ্য সেবা, ঔষধপত্র চালাইল বিন্দু আর মুরারি ডাক্তার মিলিয়া। বিন্দু একবার বলিলও।

মুরারি ডাক্তার একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, দুধের ছেলে, ওরা আবার সেবা করবে! একটা আমোদ; আমোদের বয়সই যে এটা!"

সকালে জামাই জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে আসিলে বলিলেন, "আমি বললাম না তোমায় কালকে? আজ সকালেই একটা টাল গেছে, অবিশ্যি বিন্দিকে বুঝতে দিই নি; কিন্তু আর বসে থাকা চলে না, হাতে যেটুকু আছে করে কর্মে দেখতে হবে তো? আমি আসছি···হ্যাঁ হ্যাঁ, চা হয়ে গেছে খাওয়া; হীরের টুকরো ছেলে সব,—কোন্ ভোরে গাই দুইয়ে চা করে, খাইয়ে তবে অন্য কথা।··· আমি এই এলাম বলে, ওষুধের সব বলে দিয়েছি বিন্দুকে। কিছু ভাবতে হবে না তোমার, তুমি বরং তারু কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ওদিককার যোগাড়যন্ত্র কর গে।"

দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই সেবা-সমিতির ছেলে চারিটি আসিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি-জগরণের ফলে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ, মাথার চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। একজন আগাইয়া বলিল, "আমাদের এখন আর কোন কাজ আছে মুরারি কাকা?"

মুরারি ডাক্তার ঘুরিয়া বলিলেন, "বিস্তর কাজ; কাজের তো এখন সবই পড়ে। তবু আবার নিজের শরীরও দেখতে হবে তো? তোরা এক কাজ কর্, দু'জন থাক্, দু'জন চট্ করে দুটো ডুব দিয়ে মুখে কিছু দিয়ে চলে আয়,— পালাপালি করে।"

জামাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাল সমস্ত রাত ছোঁড়াগুলো একটু

চোখ বোঁজে নি গা! ওদের এইসব সময়ে একটু কাছে কাছে থাকাই তো দরকার। হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে কোথা দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলে—একবার কি বুঝতে পেরেছিলে বাড়িতে রোগী রয়েছে একটা!"

কয়েক দিন হইতে ভবিষ্যতের গোলাপী স্বপ্নের মধ্যে দিব্যি নিদ্রাটি হইতেছে। জামাই বলিল, "রামঃ, আমার তো আপনাকে দেখে তখন মনে পড়ল শ্বশুরঠাকুর অসুখে পড়ে।"

ছেলে কয়টি প্রশংসায় একটু লজ্জিত হইল। একজন একটু বেশি অগ্রণী, বলিল, "না, কাজ থাকে তো সবাই থেকে যাই। নাওয়া খাওয়া—সে তো পরের কথা।"

একজন একটু রুগ্‌ণ গোছের; একটু যেন নিরাশার সহিত বলিল, "এখনই নেয়ে নেব?—তা হলে আজকে আর নাওয়ার দরকার হবে না মনে করছেন না কি?"

কথাটা কেহ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অগ্রণী ছেলেটি বলিল, "ও বলছে—ভগবান্ না করুন—পরেশ জ্যাঠা আমাদের আজই ছেড়ে যান তো আর একবার নাইতে হবে কিনা···গোবিন্দর আবার ম্যালেরিয়া দেখা দেয় কিনা মাঝে মাঝে।"

মুরারি ডাক্তার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, জামাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একবার দূরদৃষ্টিটা দেখ! আমেরিকায় জন্মালে এ সব ছেলে প্রেসিডেন্ট হত।···আজ সে ভয় নেই, তুই নেয়ে নিগে যা।···দেখছ, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি চলি। ঠিক, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম—আগে তোদের একজন সঙ্গে আয় দিকিনি আমার, একলা সামলাতে পারব না।···হ্যাঁ, আর এক কথা,—বাবাজী, তুমি আর বিন্দি নেয়ে টেয়ে তোয়ের হয়ে থেক।"

ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরিলেন; সেবা-সমিতির ছেলেটির হাতে মালসায়, কলসীতে পূজার নানারকম সরঞ্জাম। নিজের গায়ে একটা নামাবলী, একটা সাজিতে কিছু ফুল। সঙ্গে পুরোহিত অভয় ভটচাজ।

তারু খুড়ো আসিয়াছিলেন—পাড়ার আরও দু'একজন বৃদ্ধ, বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি। মুরারি ডাক্তার বাড়িতে ঢুকিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "এই যে খুড়োও এসেছ। অভয়পদকে ডেকে নিয়ে এলাম। স্বস্ত্যেনটা করিয়ে দিই। শেষকালে বুড়ো বলবে—মুরারিকে ডাকা হল অথচ স্বস্ত্যেনটা করিয়ে দিলে না; বুড়ো বয়সে শুধু কতকগুলো অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে দিলে।···কৈ গো বিন্দু···"

নটবর ঘোষাল বলিল, "কি রকম বুঝছ তাহলে?"

বিন্দু দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অলক্ষিতে মুরারি ডাক্তার নটবরের দিকে চাহিয়া একবার বুড়া আঙুলটা নাড়িলেন; তাহার পর বিন্দুকে শুনাইয়া একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন, "বুঝছি তো ভালই। ওষুধ চলুক না। তবে কি জান?—বলে, 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'—ওষুধেই যদি সব করত রে দাদা, তবে আর কুইন্ ভিক্টোরিয়া মরে যেত না।…নে বিন্দু, দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না মা, তাড়াতাড়ি যোগাড় করে দে দিকিন একটু, তুমিও লেগে যাও অভয়পদ—তোমার তো আবার মেল ডে আজ; আটটা বত্রিশের গাড়িটা ধরতে হবে।"

অভয়পদ ডেলি-প্যাসেঞ্জার-পুরোহিত, কলিকাতায় মার্চেন্ট আপিসে কাজ করে। সকাল থেকে সব কাজের মধ্যেই তাহার স্টেশনে গাড়ি আসিয়া পড়িবার চিত্রটি মনে সুস্পষ্ট থাকে বলিয়া, সর্বদাই খুব ত্রস্ত। বিন্দু ঠাঁই করিয়া দিলে সাধাহাতে চটপট পূজার সরঞ্জাম সব দোকান-সাজানো করিয়া সাজাইয়া লইয়া আচমন করিয়া বসিয়া গেল।

পরেশ চক্রবর্তী নিঝুম হইয়া পড়িয়া ছিলেন, মুরারি ডাক্তার গিয়া হাতটা তুলিয়া ধরিয়া একবার নাড়ীটা পরীক্ষা করিল, বুকটা দেখিল, তাহার পর ঔষধের শিশি তুলিয়া ধরিয়া একবার দাগ দেখিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। জামাই, তারু খুড়ো, আরও দু'একজন অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রকম হে?"

বিন্দু পূজার কাছে বসিয়া ছিল, প্রশ্নে সেও মুরারি ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। ডাক্তার বোধ হয় রসিকতা করিতে যাইতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আবার রকম কি? অভয়পদর হাতে গিয়েছে আর ভাবনার কি আছে? আমি এতটা সামলে নিয়ে এলাম, আর ও—কি যে বলে……একটু হাত চালিয়ে নাও হে অভয়। দাদার মাথায় ফুলটা ছুঁইয়ে দাও…"

বিন্দু ব্যাকুলভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "মুরারি কাকা?"

"এই দেখ্ বিন্দি, তুই ছেলেমানুষ হলি যে! পুজোর দিকে মন দে দিকিন। বলে—শান্তি স্বস্ত্যেন হ'ল আত্মার জন্যে আর তুই কি না…। আগে ফলটা দেখ্। দৈব বিশ্বাস করিস, না, করিস না? অভয়পদর শেষ হোক, দেখবি দাদা সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ করা, একা তোর বাবারই তো স্বস্ত্যেন করালুম না, সেই পাশ করেছি অবধি যারই নাড়ী ধরেছি…"

বোধ হয় হুঁশ হইল; থামিয়া গিয়া তারু খুড়োর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া দুটো টান দিয়া বলিলেন, "তোমার সেই সনাতন রক্ষিতের কথাটা মনে আছে

তো খুড়ো ?—সব ঠিকঠাক, নিয়ে যাবে গঙ্গার তীরে, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে ; তারেশ পুরুত স্বস্ত্যেন করে উঠল। 'যাক, অন্তত দেহটাও তো শুদ্ধ হবে' —বলে কপালে ফুলটা ছুঁইয়ে বললে, 'তোল, তাহলে'—সব এসে ধারাধরি করতেই রুগী একেবারে মারমুখো হয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল,—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমায় সব, পাঠশালার ছেলের মত চ্যাংদোলা করে, শুনি !' মহা রাগী লোক, ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত ! তিন দিন পড়ে ছিল ; ভিড় করে পাড়ার লোক তামাসা দেখতে এসে জুটেছিল—যে যেখানে পারলে সটকান দিলে। জয়হরি পায়ের দিকে ধরেছিল, লাফ দিয়ে পালাবে—দরজায় মাথা কেটে এক হুলুস্থুল কাণ্ড···বলে, স্বস্ত্যেনের গুণ নেই !···"

ঘরেব মধ্যে দুই তিন জন বর্ষীয়সী আর সেবাসমিতির ছেলে দুইটি বসিয়া ছিল। হঠাৎ একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "মুরারি কাকা, শীগগির আসুন একবার।"

"অভয়, তুমি উঠ না যেন, বিন্দুও বোস, ও কিছু নয়, আমরা দেখছি।"

সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল, বিন্দুও একটু দোমনা থাকিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মাঝে গিয়া উপস্থিত হইল।

রোগী উঠিয়া বসিয়াছে। বিকারের ঘোরে চক্ষু রক্তবর্ণ, সেবাসমিতির ছেলে দুইটির দিকে ঠায় চাহিয়া আছে। একটু পরে বার কতক কি বিড়বিড় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চায় ওরা ? কাকে চায় ?"

ছেলে দুইটি ঘর থেকে সনাতন রক্ষিতের গল্প শুনিয়া ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। একজন বলিল, "আজ্ঞে, আমরা কিছু চাই না তো ; শুধু প্রাণপণে, না খেয়ে-দেয়ে, রাত জেগে সেবা করতে···"

"আমি যাব না, যাব না আমি ; যাও তোমরা, তোমাদের হাতে কি ও ?"

ছেলে দুইটি ভয়ে মুরারি ডাক্তারের দিকে হাত একটু বাড়াইয়া বলিল, "কিছু তো নেই আমাদের হাতে।" একজন ব্যাকুল ভাবে বলিল, "ওঁর হাতের কাছ থেকে সাবুর জামবাটিটা সরিয়ে নিন না···"

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তোরা একটু বাইরে চলে যা দিকিন।···ঘোর এসেছে দাদার একটু···আর যত বলি তোরা বাবরি চুলগুলো ছেঁটে ফেল···"

রোগীর ঘোর কিন্তু কাটিল না। সে ক্রমে সব মাথাতেই বাবরি এবং সব হাতেই কি একটা দেখিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনের প্রলাপ বকিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। মুরারি ডাক্তার মাথা নাড়িয়া তারু খুড়োর দিকে

চাহিয়া বলিলেন, "এর পরের টালটা আর সামলাতে পারবে না, এই বলে দিলাম তোমায় খুড়ো, দেখে নিও···জামাই কোথায় গেল? এস হে ফর্দটা একবার করে নাও দিকিন, আর জয়নালকে বল, বাঁশটাশ কেটে নিয়ে আসুক···"

দাহকার্য সমাধা করিতে ভোর হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "এদের সব সঙ্গে করে নিয়ে যাও জামাই—নিম, লোহা আমি সব জোগাড় করে রেখে এসেছিলাম, সুদাম ময়রাকেও বলে দিয়েছি—মিষ্টি পৌছে দিয়েছে নিশ্চয়। আমি একটু বাগদীপাড়াটা ঘুরে আসি···"

জামাই বলিল, "কোন কেস টেস আছে না কি? তা একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসবেন—সমস্ত রাত জাগা, মেহনৎ···"

"এই দেখ, বুদ্ধি দেখ ব্যাটার আমার! বলে 'কেস'! আমার কি আর এ-কটা দিন 'কেস' দেখবার ফুরসুৎ আছে, না জল খাওয়া নিয়ে থাকলেই চলবে? কুলো এই কটা দিন হাতে। পরাণে বাগদীর ষাঁড়টা সম্বন্ধে পাকা করে আসি একেবারে, অবশ্য কথা হয়েই রয়েছে। যেদিন দাদাকে দেখতে যাই, সেই দিনই পরাণে বাড়ি বয়ে এসেছিল কি না; বলে—দাদাঠাকুর, শুনলাম আপনি গোসাঁই-পাড়ার পরেশ ঠাকুরকে হাতে করে নিয়েছেন, আমার ষাঁড়টারও গতি করে দিতে হবে এই মোহাড়ায়; জামাইঠাকুর বের্ষোৎসর্গ না করে থাকতে পারবেন না।···সস্তায় ছাড়বে, তবুও একবার পাকা করে আসি। বাগদীর মন তো।"

মুরারি ডাক্তাব যখন পরেশ চক্রবর্তীর বাড়ি ফিরিলেন, তখন প্রায় নয়টা হইয়া গিয়াছে। বিধিমত তেতো মিষ্টি খাইয়া ঘট ঘট করিয়া খানিকটা জল পান করিয়া বলিলেন, "পরাণের কাণ্ডটা দেখলে তারু খুড়ো! সেদিন ওপর-পড়া হয়ে বলতে এল তো? আর আজ স্বচ্ছন্দে বললে কি না, দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম বুঝি পরেশ ঠাকুর এ যাত্রা টিঁকে গেলেন। তাই ও-পাড়ার জনার্দন ঠাকুরের জন্যে কথা দিয়ে ফেলেছি!···পণ্ডিত পাড়ার জনাদন হালদার গো। সেদো ডাক্তার দেখছে···ওরা বোধ হয় হাতে দু-একটাকা বায়না গুঁজে দিয়েছে—জেতে বাগদী তো, উল্টে দিলে। তা আমিও বলে এলাম, কথা দিয়ে কথা রাখলি না পরাণে, দেখিস জনার্দন খুড়ো ডেংডেঙিয়ে সেরে উঠে তোকে কলা দেখাবে, এই প্রাতর্বাক্যে শাপ দিয়ে গেলাম···"

তারু খুড়ো বলিলেন, "ঘোর কলি হয়ে দাঁড়াল। চার পো। তাইতো ভাবছি—পরেশ দাদা দিব্যি গেল—পুণ্যিবান লোক···"

মুরারি ডাক্তার মুখ বাঁকাইয়া কুলকুল করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "আর দেরির কথা যে বললি—দেরিটা হয়েছে কোথায় শুনি? পরশু সকালে দাদাকে হাতে নিয়েছি, আজ সকালে…"

হঠাৎ চৈতন্য হওয়ায় থামিয়া গিয়া ক্রুদ্ধভাবে মুখটা গোঁজ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

তারু খুড়ো বলিলেন, "তা হলে উপায়?"

"উপায় মজাদীঘির হাট, চার কোশ পথ হেঁটে যেতে হবে এই বুধবার, উপায় তো নেই; পরেশদা ভাববে মুরারির হাতে গেলাম, বৃষোৎসর্গটাও একটু চেষ্টাচরিত্তির করে করিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু সময় কৈ? আমি তো সেই কথাই ভাবছি—সময় কৈ। মাঝখানে আবার একটা চতুর্থীর হাঙ্গামা আছে।… কৈ গো বিন্দু!…এই দেখ্, তুই কাঁদতে বসলি। সামনে দু-দুটো কাজ, আর এইটে তোর কাঁদবার সময় হল?…তারু খুড়ো!"

তারু খুড়ো একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সময় তো নয়; কিন্তু শোক, সে তো আর সময় অসময় মানবে না…স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে কি বলেছেন?…"

তামাক টানিতে লাগিলেন।

বিকাল বেলা মুরারি ডাক্তার, সুদাম ময়রা, গণেশ মুদী, অভয় ভটচাজ প্রভৃতি কয়েক জনকে লইয়া প্রবেশ করিলেন, উঠানে দাড়াইয়া ডাকিলেন, "কৈ, জামাই কোথায় গেলে? গিন্নীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটু কুমোরপাড়ায় চলে গিয়েছিলাম—জলটল একটু মুখে দিলে, বিন্দু?…দুটো বাতাসা খেয়ে একটু জল খেয়েছে?…আর ওর বেশি কি পারে বাবাজী? মেয়ের প্রাণ তো! তুমি খানিকটা কাগজ আর কালিকলম নিয়ে এস তো, ফর্দগুলো সেরে ফেলা যাক।"

ক্রমে ক্রমে তারু খুড়ো, নবীন ঘটক, ঘোষাল মশাই, হারু পণ্ডিত প্রভৃতি পাড়ার মাতব্বরেরা আসিয়া জুটিল। নানারকম মতামত, তর্ক, কেচ্ছাকাহিনীর মধ্য দিয়া অশেষ রকম আকার-পরিবর্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুর্থী আর শ্রাদ্ধের তালিকা দুইটা প্রস্তুত হইল। মুরারি ডাক্তার কাগজ-কলম ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "নাও, বাবাজী, এইবার একটু তামাকের যোগাড় কর দিকিন। একটা যেন বোঝা নেমে গেল।"

একটু খোসগল্প চলিল—পরেশ চক্রবর্তীর জীবন লইয়া খানিকটা আলোচনা—জামাইয়ের শ্বশুরের প্রতি অচলা ভক্তি (যা কখনই ছিল না). জনার্দন [illegible]

যরে সে যেন পুরেশ চক্রবর্তীর ওপর না টেক্কা দেয়, শত্রুপক্ষ যেন না বলিতে পারে—জামাইতে ছেলেতে ঢের তফাৎ—না, সে কেহই হইতে দিবে না,—গ্রামের বদনাম তো!

পিছনে যে যাহা বলুক, মুবারি ডাক্তাবেবও প্রশংসার বন্যা ছুটিল, "কে করে আজকালকাব দিনে শুনি? নিজের ভিজিট পকেটস্থ করেই নিশ্চিন্ত…"

মুরারি ডাক্তাব বলিল, "সমাজ আমাব,—স্বস্ত্যেন, শ্রাদ্ধ-শান্তি এ সব করবে কি সিভিল সার্জেন—জেলা থেকে এসে?"

হারাণ পণ্ডিত লোকটা একটু কটুভাষী, তবে মিষ্টি করিয়া বলে; হাসিয়া বলিল, "বাঁচালে তো আর শ্রাদ্ধ কবতে হয না ভাযা…"

দলের সমস্ত প্রশংসাব মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ছিলই, সুযোগ পাইযা সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তারু খুড়ো সামলাইয়া লইবার জন্য বলিলেন, "বাঃ, বলবে না? সুবাদে মুবারি ওব নাতি হয, ঠাট্টা কববে না?"

কিন্তু সামলাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, ওসব কথা মুবারি ডাক্তারের এক কান দিয়া ঢোকে অপর কান দিয়া বাহিব হইয়া যায়। তা ভিন্ন ওসব কথা ভাবিবার সময়ই বা কোথায?

চতুর্থীটা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইল। সবাই বাহবা দিল মুরাবি ডাক্তারের। জামাই কৃতজ্ঞতার সহিত হাত জোড করিয়া বলিল, "কাকা, আপনি না থাক্‌লে, কি যে হত! আমাব তো এই অবস্থা!"

মুরারি ডাক্তার বলিলেন,"দাদার কাজ দাদা নিজে করে নিচ্ছেন, আমার কি আর এদিকে মন আছে বাবাজী? বৃষটা না এনে ফেলতে পারলে· বেটা বাগদীর পো কি ভীষণ ফেরে ফেললে যে। হ্যাঁ বাবাজী, আমি সব জন-মজুব বলে দিয়ে এসেছি—কাল সকালেই এসে পডবে, দাঁড়িযে চারি দিকে পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়ে নেবে, আমিও এসে পৌছুব; তবে আমার আবাব একবার ন'গাঁয়ে চৌধুরীদের বাডি যেতে হবে—শামিয়ানা একটা চাই তো, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার, খেলা নয় তো, সময় বুঝে রোদ্দুরের তেজটা দেখছ তো। হ্যাঁ…রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ চাবটি দিন বাকি—বুধবার দিন মজাদীঘির হাট—চারটি কোশ পথ… বলছিলাম তুমি যদি ও ব্যাপারটা সেরে নিতে…"

জামাই মিনতির স্বরে বলিল, "আজ্ঞে আমার অবস্থা তো দেখছেনই—শেষে…"

"তা তো বুঝছি। যাব, আর করা যায় কি।…আজ আবার পেনো কুমোর

এসেছিল, তার মাগটা প'ড়ে কিনা। বললাম, 'তুই কি ঠাট্টা করছিস পেনো? খুব ফুরসুৎ দেখছিস আমার।'…যাব, আর ষাঁড় কেনা তোমার কর্ম নয় বাবাজী…"

ষাঁড়েরও খুব তারিফ হইল। মুরারি ডাক্তারের পছন্দ; কিছু নয় তো নিজের হাতেই দশ বারোটা ষাঁড় কিনিয়াছে। কিন্তু ষাঁড়ের প্রশংসা শুনিবার ফুরসুৎই বা কোথায় মুরারি ডাক্তারের? একটা দিন ছিল না, সব ওলট পালট। সে-সব সামলাইতেই একটা দিন গেল। শামিয়ানা আসে নাই, আবার যাইতে হইবে দেড় ক্রোশ পথ।

বলিলেন, "তাহলে তুমি নেমন্তন্নটা সেরে নাও জামাই বাবাজী, ত্বটো দিন লাগবে।"

জামাই বলিল, "আমার অবস্থা তো দেখছেনই কাকা, তার ওপর এই নিদারুণ শোকটা যাচ্ছে…ত্বটো পা হাঁটতে গেলে ভির্মি লাগবার মত হচ্ছে।"

"থাক্ তবে, একটা কাটিয়ে উঠতে উঠতে আর একটা না শুরু হয়। কোন রকমে সেরে নিতেই হবে…দেখ কাণ্ড, কেত্তনের কথাটা ভুলেই গেলাম। সিদ্ধু ঢপওয়ালীকেই কাল দিই বায়না পাঠিয়ে, হুগলীতে গিয়ে বাছাই করে আনবার তো আর সময় নেই। তবু আসরটা একেবারে খালি যাবে না…"

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য চলিয়াছে। এদিকে বৃষোৎসর্গ—ওদিকে কীর্তন—সভায় পণ্ডিতদের অনুস্বার বিসর্গের টংকার—বাড়ির উঠানে চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে—তাহার একপ্রান্তে ভিয়েনের আয়োজন। গ্রামের মাতব্বরেরা সেইখানে জটলা করিতেছে। চারিদিক তদারক করিয়া মুরারি ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। কাঁধে ফেলা গামছাটার কোণ দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সন্দেশের পাকটার দিকে নজর রেখে যেও সুদাম। দেখো যেন সমুদ্র পেরিয়ে এসে গোষ্পদে না ডুবতে হয়…"

সুদাম বাঁ হাতে হুঁকা টানিতে টানিতে ডান হাতে তাড়ু ধরিয়া ছানা মাড়িতেছিল, বলিল, "সুদাম ময়রা কি মরে গেছে বাবাঠাকুর?…হ্যাঁ, এ যা বলেছেন একটা কথার মত কথা, সমুদ্র পেরোনই বটে। আমি সেই কথাই তো তারু ঠাকুরকে বলছিলাম, বলি, হাতযশ বলি তো একে, যে দিকটা দেখ যেন গমগম করছে, আর এই বাড়িই তো আগেও ছিল…"

মুরারি ডাক্তার পাশ থেকে একটা কড়িবাঁধা হুঁকা তুলিয়া লইয়া ক্ষেত্র ঘোষের হুঁকা হইতে কলিকাটা বসাইয়া দিলেন। তার পর তারু খুড়োর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আত্মপ্রশংসার মত শোনায় তাই বলি নি, তবে সুদাম নেহাৎ নাকি

কথাটা তুললে।··দক্ষিণপাড়ার নিবারণ গো—মামা মারা যাওয়া অবধি সম্পত্তিটির লোভে আজ বোধ হয় ছ'-সাত বছর ধরে তিখির কাকের মত এসে বসে আছে ···বলে, 'মুরারি মামা, আজ মাসখানেক ধরে রাঙা মামী পড়ে, না এদিক না ওদিক, আর তো কষ্ট চোখে দেখতে পারি না। একটি বার দয়া করে চলুন'···ঝুলো-ঝুলি···বললাম, 'দাঁড়াও বাপু, একটি যা হাতে নিয়েছি সেইটেই সামলে নিতে দাও আগে···' এই যে বাবাজী, পরিবেশনের লোকের অভাব হচ্ছে? চল, চল, আসল কাজটা তো হল পরিবেশন···বলে মধুরেণ···"

দেওয়ালের আড়ালে গিয়া পড়ায় আর বাকিটা শোনা গেল না।

শারদীয়া

আশ্বিন মাস শুরু হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি আছে, তবে সেই যে আকাশ ঘিরিয়া পাথরের মত কালো মেঘ···চন্দ্র-সূর্যের দেখা নাই···আর ঝর ঝর অবিরাম ধারাপাত, সে ভাবটা আর নাই। এখন নানা রকমের সাদা কালো মেঘের স্তূপ লঘু হাওয়ায় ভর দিয়া আকাশে চঞ্চলভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এক এক পশলা বৃষ্টি, তাহার পিছনেই আবার মেঘের পাশ দিয়া নির্গত দীপ্ত সূর্যের কিরণপাত; বেশ বোঝা যায় খুব ঘটা করিয়া কোন একটা খুব বড় কাজ হইবে, তাই পৃথিবীকে জল-আছড়া দিয়া ধুইয়া মুছিয়া তৈয়ার করিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে। শারদীয়া পূজার আর দেরি নাই। প্রতিমা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছেলের দল মূর্তি ঘিরিয়া জটলা করে, কুমারকে রং রাংতা জোগাইয়া দেয়। মাঝে মাঝে গল্পও হয়, কুমার কাজে বিরতি দিয়া হুকা টানিতে থাকে, আকাশে বাঘ, সিংহ, ময়ূর প্রভৃতি নানা আকারের সঞ্চরমাণ মেঘে ছেলেদের সুপ্ত কল্পনাকে তোলে জাগাইয়া। বলে, "মনে হচ্ছে যেন সব চলল মাকে নিয়ে আসতে, না গা? ঐ দিকেই তো কৈলাসপুরী, না গা?"

কুমার বলে, "মনে হচ্ছে মানে? তোমরা কি ভেবেছ নাকি ওগুলো মেঘ? বেচারাদের দূর থেকে মেঘের মত দেখাচ্ছে বলে?···"

শরতের মেঘ গুম্ গুম্ করিয়া ডাকিয়া উঠে। কুমার বলে, "ঐ শোন,

তাহলে এটাকেও তোমরা মার সিংহির ডাক বলতে চাইবে না নিশ্চয় ? বলবে বাজ পড়ার শব্দ ?”

মাব সিংহেবই যে ডাক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। মা আসিবেন—আশায় কল্পনায় শিশু-চিত্ত বিকশিত হইয়া ওঠে।

শুধু কি শিশু-চিত্তই ? ফোটাব উৎসবে সমস্ত আকাশ-ধবাতল ওঠে মাতিয়া। কমল তুলিয়া ধরে শতদলেব অঞ্জলি, শিউলি বিছায় সোনাচাদিব আস্তরণ, স্থলপদ্ম আর বক্তকরবীর গাছে লাগে রাঙার সমারোহ। কাশের বনে ওদিকে কাহারা চামর গড়ায় মাতিয়া গেছে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে।

মা আসিবেন, আয়োজন প্রায় শেষ। পূর্ণতার প্রসন্ন-হাসি-মুখে ধরিত্রী প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ পঞ্চমী, কাল ষষ্ঠীর বোধন।

২

সনাতন রায় মোটর থেকে নামিয়া একটু ক্লান্তভাবে ভিতরের বারান্দায় গিয়া উঠিলেন। নিজেব হাতেই ফ্যানটা খুলিয়া দিযা একটা সোফায় গা ঢাকিয়া দিযা ডাকিলেন, “কৈ গো, আমার নতুন মা!”

ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেশ একটা বড় মোট পাঁজায় করিয়া আনিয়া সামনে বাখিয়া দিল। পূজার বাড়ি ; ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনে গম গম করিতেছে, দেখিতে দেখিতে মোটটার চারিদিকে সবাই ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সনাতন রায় বলিলেন, “না, এখন খোলা হবে না, তোমরা ঠাণ্ডা হয়ে চারিদিকে দাঁড়াও, আমার মা এসে খুলে যার যেটা ভাগ কবে দেবে।” একটি একটু বড়গোছের মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল,তার একটু পরেইএকটি ব্রীড়ানত বালিকাকে সঙ্গে করিয়া হাজির হইয়া বলিল, “নিয়ে এসেছি তোমার মাকে বাবা, উনিই এবার পূজোর চার্জে নাকি ?”

সনাতন রায় বলিলেন, “ওঁরই বাড়ির পূজো, উনি চার্জে থাকবেন না তো কে থাকবে ? আমাদের দু'জনের তো এবার ছুটি, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব।” মেয়েটি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল, বোধ হয় সে ভাবটি চাপা দেওয়ার জন্যই কোন রকমে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, “কেন ডেকেছেন আমায় বাবা ?” শ্বশুর বলিলেন, “ডেকেছি তোমায় কাজ তোমায় বুঝিয়ে দেবার জন্যে। নাও তো মা, পোঁটলাটা খুলে ফেল…

"আচ্ছা, এইবার এক কাজ কর। এর মধ্যে সবচেয়ে তোমার যেটি পছন্দ—কাপড় আর ব্লাউস্ পীস্—আগে আলাদা করে রাখ, তারপর···"

ছেলেমেয়েরা কাঁইমাঁই করিয়া উঠিল, সেই প্রগল্‌ভা মেয়েটি বলিল, "তাহলে তোমার নতুন মা ছেড়ে আমাদের পুরনো মার হাতেই দাও বাবা,—নিজের দিকে ঝোল টানবেন, তিনি নাকি আবার ভাগ করবেন!"

শ্বশুরের কথায় বধূ সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল, ননদের এই টিপ্পনিতে এবং সকলের হাসিতে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, তোরা বড্ড জ্বালাতন লাগালি।···আচ্ছা, আমিই ঠিক করে দিচ্ছি মা।"

ঝুঁকিয়া গোটা তিন চার কাগজের বাক্সর ঢাকনা খুলিয়া দেখিলেন। শেষেরটাতে খুব প্রচুর সাঁচ্চার কাজ করা একটা বেনারসী শাড়ি, আর ব্লাউস পীস্। সেইটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এটা তোমার পূজোর শাড়ি মা, এই প'রে পূজোটা সামলাবে।···আর আটপৌরেটা কোথায় গেল?"

আরও দুই তিনখানা বাক্স সরাইয়া একটা টানিয়া লইলেন, ডালা খুলিতে একটা চাঁপার রঙের দামী জর্জেট শাড়ি বাহির হইল। বলিলেন, "এটা কাল ষষ্ঠীর দিন প'রে ঠাকুর দেখতে যাবে, আর যখন পূজো ছাড়া অন্য কাজ সামলাবে—চারিদিক তো তোমাকেই সামলাতে হবে কিনা—তখন গিয়ে এইখানা প'রে থাকবে। পূজোর ক'টা দিন যদি সাদা কাপড় পরতে দেখি তো মায়ে-বেটায় একচোট ভয়ানক ঝগড়া হবে···"

মেয়েটি বলিল, "আহা-হা, আমরা যেন ঝগড়া করতে জানি না।···কই বের কর এবার আমাদের ষষ্ঠীর শাড়ি, সপ্তমীর শাড়ি, অষ্টমীর শাড়ি, নবমীর শাড়ি···"

অন্য একটি মেয়ে বলিল, "বিজয়ার শাড়ি।"

অপর একজন বলিল, "না বের কর তো নাতনী-ঠাকুরদায় ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে।" খুব একটা হাসির কলরব পড়িয়া গেল।

৩

মোটরে আসিতে আসিতে মেয়েটি বড় চোখে লাগিয়া গিয়াছিল। সনাতন রায় চর লাগাইয়া খোঁজ লইলেন। টের পাওয়া গেল খুব গরীব পিতামাতার মেয়ে। পিতা মাইনর স্কুলের পণ্ডিতি করেন, আর দু-পাঁচ ঘর যজমান আছে।

কোন রকমে চলিয়া যায়। মেয়ে শহরে মামার বাড়িতে আসিয়াছে, বাড়ি পাড়াগাঁয়ে, হুগলীতে নামিয়া বেশ খানিকটা ভিতরের দিকে যাইতে হয়, গ্রামটার নাম রায়বেড়ে।

বিবাহের কথা পাড়া হইল, কিন্তু মেয়ের বাপের খুব একটা কৃতকৃতার্থ ভাব দেখা গেল না। ঘটক ঠাকুর, সরকার মহাশয় যাহারা গিয়াছিল তাহাদের বলিলেন, "মেয়ে আমার রাজরাণী হবে, এর চেয়ে আনন্দ আর বাপমায়ের কি হতে পারে? তবে আমার অবস্থার দিক দিয়ে দেখতে গেলে একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাই…"

জমিদার বাড়ির সরকার, কথায় ধার থাকে, বলিলেন, "এটা যে অবস্থায় অবস্থায় বিয়ে হচ্ছে না সেটা তিনি খুবই জানেন ঠাকুরমশাই, মেয়ের সঙ্গে তাঁর আর কিছু ঘরে তোলবার অভিপ্রায় নেই।"

ঘটক এই ব্যাপারের ব্যাপারী, লোক চেনে; মেয়ের বাপের মুখে কি একটা লক্ষণ দেখিযা তাড়াতাড়ি বলিল, "মানে, রায় মশাইয়ের লক্ষ্মীর ঘর, সেখানে মা তো আর কিছুর অপ্রতুল রাখেন নি, তবে মা স্বয়ং আপনার বাড়িতে এসেছেন দেখে তাঁকে নিয়ে যেতে চান আর কি। সরকার মশাই সেই কথাই বলছিলেন। কি সরকার মশাই, এই তো?"

যাহাতে কথা না বাড়ে তাহার জন্য একটু চোখের ইশারা করিয়া দিলেন।

মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তাটাই জয়ী হইল, এরূপ অসম কুটুম্বিতায় আসল বেদানাটা যে কোথায় সেটা প্রকাশ করিয়া বলায় কোন লাভ নাই জানিয়া মেয়ের বাপ আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। বিবাহ হইয়া গেল।

কথাটা রায় মহাশয় বুঝিলেন। মনে মনে বোধ হয় একটু হাসিলেন। এক সময় বধূকে কাছে ডাকিয়া পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মা, তোমার বাবার ভয় হয়েছে আমি বুঝি তোমায় তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলাম।…চাল-কলা-খেকো ব্রাহ্মণ কিনা মার বাবা, তাই কলাভক্ত জীবটির মত বুদ্ধি।…বাপের কাছ থেকে কেউ মেয়ে কেড়ে নিতে পারে কখনও? তোমার যবে যখন খুশি বলবে মা, সঙ্গে সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা হবে।" বধূর আনমিত মুখটা নিজের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আর এই বুড়ো ছেলেটাকে ছেড়ে যতদিন ইচ্ছে থেক, পারবে তো অনেক দিন ছেড়ে থাকতে?"

বধূ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া মাথা নাড়িল, না, পারিবে না।

যে একটা সারা জমিদারী চালাইতেছে, একটি ছোট মেয়েকে বশে আনা

তাহার পক্ষে ছেলেখেলা। ফাল্গুনে বিবাহ হইল, বৈশাখের শেষাশেষি বধূ ঘর করিতে আসিল। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সাড়ে-চার মাসের মধ্যে জামাইষষ্ঠীর সময় দিন পাঁচেক গিয়াছিল, জামাই দু'দিন আর বধূ নিজে আরও তিন দিন ফালতু। আর যাবার নামও করে নাই, পাঠানোও হয় নাই।

না, নামও করে নাই যাওয়ার, আর শ্বশুর এতে আশ্চর্যও হন নাই, কেননা, দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্বে কে যে চিরকাল জয়ী তাহা তাঁহার বিলক্ষণ জানা আছে। বধূর মাথায় যে রায়বেড়ের চিন্তা প্রবেশ করিবে তাহার ফুরসৎ কোথায়? অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে একটা নূতন জগৎ দিন দিন চক্ষের সামনে দ্রুত প্রসারিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার উল্লাস, তাহার বিস্ময়ের সামনে রায়বেড়ে দিন দিনই যেন আরও মলিন হইয়া যাইতেছে। কাছাকাছি তিনটে শহরের বায়োস্কোপ, কি আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড সব! কখনও শখের থিয়েটার, কখনও সার্কাস। বায়োস্কোপের সমস্ত বড় বড় নামগুলা তাহার মুখস্থ হইয়া গেছে; এবার বাপেব বাড়ি গিয়া সবাইকে বলিল। তাহারা হাঁ করিয়া শুনিতেছে, শুধু সেই জানে বলিয়া এমন একটা আনন্দ হয়!···মোটরে করিয়া জজসাহেবের মেয়েরা বেড়াইতে আসে —শীলা, ওদের বউ। ওদের মোটরের শব্দ হইলেই ঠিক রং মিলাইয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া আসিতে হয়; এত বোঝে, বিশেষ করিয়া শীলা।···আবার ননদের সঙ্গে মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া আছে জজের বাড়ি, সরকাবী উকিলের বাড়ি, ডেপুটিদের বাড়ি, আরও কত সবার বাড়ি। সবারই বাড়িতে মোটর গাড়ি।··· কাহার কি গাড়ি সে জানে।···যেখানেই যায় প্রায় প্রথমেই তাহার রূপের প্রংশসা। এমন একটা সলজ্জ আনন্দ মেশানো!···বড়রা রায়গিন্নিকে বলে, "এখনও বড় ছেলেমানুষটি তাইতেই এত রূপ, একটু বড় হলে বৌ তোমার যা হবে!···" শীলা বলে, "বৌ, তোকে দেখে আমার কি মনে হয় জানিস?" অনেকবার শোনা কথা। বধূ বলে, "জানি, তোমার আর বলতে হবে না।" দু'জনের মধ্যে খুব চাপা হাসি চলে।

এসবের অতিরিক্ত আছে বাড়ির আদর। ননদ দুইটির আদর একটু মিঠে-কড়া গোছের, বেশ লাগে। শ্বশুর বধূ-অন্ত প্রাণ, নিজেকে একেবারে বধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা—"কৈ গো, নতুন মা আমার?" ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহস্থালির এদিককার প্রায় সব কাজই বধূর হাতে। সাজানো-গোছানো তো আছেই, দেওয়া-থোওয়া, আদর-অভ্যর্থনারও তাহার কাজ কম নয়. কিন্তু শ্বশুরের ডাক পড়িলেই সব ছাড়িয়া সদ্য সদ্য আসা চাই। নিজের অন্তরের

তাগিদও আছে, অভিমানেরও ভয় আছে। অসহায় শিশুর মত্তোই যে একেবারে চরমভাবে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহার অভিমান সত্যই প্রাণে বড় লাগে।

মাঝে শ্বশুর একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা তুলিয়াছিলেন নিজে থেকেই। তবে জমিদারী পদ্ধতিতে। কয়েকদিন আগে কি করিয়া খোঁজ পাইয়াছিলেন শীলার হাতেব একেবারে হালফ্যাশানের চুড়ি দেখিয়া বধূ প্রশংসা করিয়াছিল। সেই রকম চুড়ি যেদিন গড়া শেষ হইল, বধূকে ডাকিয়া পাশে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "ছেলের সাধ হয়েছে মা একটু…এইগুনো প'রে ফেল দিকিন। কলকাতায় গিয়েছিলাম—রায়েদের দোকানে চুড়িগুনো দেখে বড় চোখে লাগল। এসে গণেশ স্যাকরাকে ফরমাস দিয়ে দিয়েছিলাম, আজ দিলে।…তোমার ভাল লাগবে কিনা জানি না, কিন্তু তবুও পর, ছেলেরও তো একটা সাধ আছে…"

বধূ চুড়ি পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বুকের কাছে টানিযা লইয়া বলিলেন, "হল পছন্দ আমার মার ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, ভীমরতি! বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, বেহাই লিখেছেন, 'অনেকদিন আসে নি অনু, একবার যদি পাঠিয়ে দেন।'…কি লিখব ? অবশ্য বুড়ো ছেলেটা তোমার কি-করে থাকবে সেজন্যে তোমার ভাবতে হবে না।…তাহলে লিখে দিই যে…"

বধূর বুকটা একটু কি রকম করিয়া ওঠে, বাবা নিজে লিখিয়াছেন…বাবা, মা, খোকা, বাড়ি সব বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। নূতন চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তাহার পর বলে, "লিখে দিন এ-কটা দিন যাক, তারপর যাব বাবা…"

শ্বশুর হাসিয়া বলেন, "দেখ বোকা মেয়ের বুদ্ধি! আমি লিখলে বাবা কি ভাববেন ?"

বধূ বলে, "আমি দোব'খন লিখে বাবা।"

একটু কুণ্ঠিত হইয়াই বলে, তাহার পর একটা ছুতার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলে, "লিখে দোব, ঠাকুরঝিকে দেখতে আসবে, সেটা হয়ে যাক, তারপর। আঁ্যা বাবা ?"

ঐশ্বর্য আর জমিদারী-মগজের বিজয়ে সনাতন রায় হাসেন।

সত্যই বিজয়-পরাজয়ের কথা। মেয়ের হাতেই দুইখানি এই ধরনের পত্র পাইয়া বাবা আর পাঠানোর কথা লেখেন না। সে যে কী নিদারুণ, নবৈশ্বর্যশালিনী কন্যার কাছে সে সংবাদ কেহ পৌঁছাইয়া দেয় না। নিরীহ বালিকাও বোঝে না কিছু।

গরীবের মেয়ে রাজপ্রাসাদে গেলে তাহাকে যে তাহার পূর্ব-জীবন থেকে

একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তাহার মধ্যে সব সময়েই যে দারিদ্র্যের প্রতি একটা ঘৃণা-অবহেলার ভাব থাকে তাহা নয়। অনেক সময় থাকে একটা ঈর্ষার ভাব; যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায় তাহাকে একেবারে নিজের করিয়া, আলাদা করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা সহজ নয়, কেননা, দারিদ্র্যেরও একটা আবেদন আছে, নিজেব বুকের স্তন্য দিয়া যে-দারিদ্র্য এতদিন মানুষ করিল। সেই জন্য অর্থকে নিজের মায়া, নিজের মোহ পূর্ণতমভাবে নিয়োজিত করিতে হয়।

সনাতন রায় জানেন বিজয় তাহাব প্রায় করায়ত্ত, দারিদ্র্যকে মাত্র আর একটি আঘাত দিলেই হয় এবার।

সামনে পূজা, এব আড়ম্বরটা এবার দ্বিগুণ করিয়া দিলেন।

৪

প্রায় মাস খানেকেরও পূর্বে থেকে বাড়িটাতে সাড়া পড়িয়া গেল। এবারে একটা আরও সুযোগ যে, চারদিন পূজা। বৃহৎ অট্টালিকা মেরামৎ করিয়া চুন-রঙ ধরানোর কাজ আবম্ভ হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ আর বাড়ির মধ্যে যেটুকু খালি জায়গা ছিল সেখানে নূতন ভাঁড়ার তৈয়ার করিয়া মহাল থেকে দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। কলিকাতা থেকে থিয়েটার আসিয়া দুইদিন অভিনয দিবে, একদিন এখানকার শখের পার্টি, একদিন কলিকাতার বায়োস্কোপ। শহরের কাছাকাছি চারিটি পাড়া চারদিন খাওয়ানো হইবে।···দিন পনের পূর্বেই বাড়ি কুটুম্ব-সাক্ষাতে ভরিয়া গেল। নূতন বধুর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। হয় শাশুড়ি, নয় শ্বশুরের সঙ্গে, নয় একলাই তদারক করিয়া ফিরিতেছে। ক'টা দিনেই দায়িত্বের চাপে যেন কত বয়স বাড়িয়া গিয়াছে।···নূতন জীবনের মধ্যেও এ একটা নূতনতর ব্যাপার। রায়বেড়ের কথা মনে পড়ে কি? কর্ম-উন্মাদনার ক্ষণিক অবসাদের মধ্যে পড়ে বোধ হয় কখনও কখনও···বাবা আসিয়া অর্ধ-মলিন জামাটা আলনায় টাঙাইয়া রাখিলেন। বলিতেছেন, "অনু, পিঠের কাছটা অকটু সেলাই করে রাখিস তো।" মা রাঁধিতেছেন, অনু বসিয়া গল্প করিতেছে, খোকা আসিয়া বলিল, "বাগান থেকে দুটো বেগুন তুলে আনলাম মা, নতুন হয়েছে···দিদির জন্যে ভেজে দিও মা···তোর এখন কষ্ট হয় এখানে খেতে, না দিদি?" মা বলিলেন, "তাই কি হয় রে পাগল? বাপের বাড়ির ভাত শুধু নুন দিয়ে খেলেও

তার স্ব'দ আলাদা।...দেখিস না, কুবেরের ভাণ্ডার ছেড়ে মা-দুর্গাকে কেমন করে ছুটে আসতে হয় বছর বছর ?"

কেমন সব আবছায়া ছবির মত...বায়োস্কোপের এক একটা খণ্ড ছবি যেমন অর্ধেক ফুটিয়াই মিলাইয়া যায়। নূতন কর্মের মাঝে সব আবার মুছিয়া মিলাইয়া যায়।

শরতের রূপ, হালকা মেঘ থেকে এক পশলা বৃষ্টি মাটিতে পৌঁছিবার আগেই মেঘ যায় মিলাইয়া, দীপ্ত সূর্যের উল্লসিত আলোকে আকাশ যায় ভরিয়া।

শ্বশুর আসিয়া বলেন, "বেহাই লিখেছেন, অনেক দিন চিঠি পান নি তোমার..."

স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া বধূ বলে, "এই একটু ফুরসুৎ হলেই লিখে দোব বাবা, খবর দিয়ে দিন বাবাকে।"

ঈর্ষা নিজের বিজয়ে গোপনে হাস্য করে। দারিদ্রের শেষতম বন্ধনটি ছিন্ন হইতে চলিল।

ঈর্ষা যে নিজেই একটা পরাজয় এ-তত্ত্ব তাঁহাকে কে বুঝাইবে ?

ষষ্ঠীর দিনটা যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল নববধূ বুঝিতেই পারিল না। আনন্দের ক্লান্তি আর অবসাদের মধ্যে যখন শয্যাগ্রহণ করিল তখন অনেক রাত হইয়া গেছে। মনটা কেন, কি করিয়া যেন একটু বিষণ্ণ, কিন্তু সে বিষাদকে ভাল করিয়া বুঝিবার, অনুভব করিবার পূর্বেই, বোধ হয় সপ্তমীর পূজার উগ্রতর আনন্দের কল্পনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

আনন্দের ঔৎসুক্যে রাত্রে বোধ হয় ভাল করিয়া ঘুমও হয় নাই, খুব ভোরে উঠিয়া নববধূ আবার আয়োজনে মাতিয়া গেল। বোধনের বাজনায়, কর্মের ক্রমবর্ধমান কোলাহলে, ছেলেদের উৎসব-কাকলিতে তাহাকে যেন গোড়া থেকেই একটা অদ্ভুত উন্মাদনায় ঘিরিয়া ফেলিল। বোধ হয় শ্বশুরের অত্যধিক আদর আর নির্ভরতার জন্য তাহার মনে হইল সব ব্যাপারটা তাহাকে ঘিরিয়াই হইতেছে। চারিদিক থেকেই একটা আনন্দের ঢেউ একরকম দুর্বার উচ্ছ্বাসে তাহার মনের তটে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

শ্বশুর আসিয়া ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কৈগো মা, ঠাকুর যে ওদিকে এসে গেলেন, তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন...বরণ ক'রে নেবে চল..."

বধূ স্নান করিয়া নূতন বেনারসী শাড়িখানি পরিয়াছে, পিঠে কুঞ্চিত কেশ এলান, সিন্দুরবিন্দু দিবার জন্য আরশির সামনে দাঁড়াইয়া সোনার-চুড়ির ঝরের

কোন্ এক দেবকন্যাকে দেখিয়াই যেন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের ডাকে একটু ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ভ্রূমধ্যে সিন্দূরবিন্দু বসাইয়া কতকটা জড়িত পদে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূর অপূর্ব স্নিগ্ধ রূপে শ্বশুর মুহূর্তমাত্র নির্বাক হইয়া রহিলেন, তাহার পর তাহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়া বলিলেন, "দেখ তো! আমার এ মা গিয়ে বরণ করে না নিলে ও মা কি সিংহের পিঠ থেকে নামতে পারেন? চল এবার।"

শ্বশুরের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিতেই নববধূ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ রকম কিছু এর পূর্বে দেখে নাই···না এ রকম প্রতিমা, না এ রকম বেদীসজ্জা, না এ রকম আলোক, না এ রকম পূজাসম্ভার। এক কল্পনাতীত ব্যাপার।···এসব তাহার···তাহার সঙ্গে এসবের কোথায় একটা অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে···এ-ঐশ্বর্য, এ-পূজা···এমন কি, অন্য সব দেবতার চেয়ে শতগুণে ঐশ্বর্যময়ী এই দেবতাও তাহারই।···তাহার আসাতে সকলে যেমন ক্ষণিকের জন্য নির্বাক, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সেও সেই রকমই এই ঐশ্বর্য-সমারোহের সামনে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভিতর থেকে কি-যেন একটা ঠেলিয়া আসিতেছিল। আনন্দই, কিন্তু অশ্রুর সঙ্গেও সম্বন্ধ আছে।

শ্বশুর ঐশ্বর্যের বিজয়ে অন্তরে অন্তরে পুলকিত হইলেন; দূর পল্লীর কোনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া মনের কোথায় একটি হাসি ফুটিল বোধ হয়। মনে মনে বধূকে বলিলেন, "এ গণ্ডির বাইরে তুমি আর কি করে যাবে মা?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "নাও, এবার তোমার পূজোর যোগাড়ে নেমে পড মা। চন্দন ঘষবে? না, নৈবিদ্যি সাজাবে? তুমি বরং গিযে ঐ সোনার পরাৎটাতে নৈবিদ্যিই সাজাওগে।"

বধূ নৈবেদ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া একটু দাঁড়াইয়া পড়িল। আবার শ্বশুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া মুখটি তাহার বুকে গুঁজিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, ফুল আছে আর বাগানে? আমি আরও তুলে নিয়ে আসব।"

বধূ চলিয়া গেলে পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি চাও শিশুকে একদিনেই গিন্নী করে তুলতে সনাতন, তা কখনও হয়?"

সনাতন রায় বলিলেন, "মা আমার গিন্নিই হয়ে উঠেছেন, পুরুত মশাই। তবে আজকের কথা আলাদা, আজ জগতের সবচেয়ে পাকা গিন্নি মা-অন্নপূর্ণাই বা শিশু হয়ে বাপের বাড়ি ছুটে এসেছেন···"

কথাটা নিজের বুকে ধক্ করিয়া একটা আঘাত দিল; আর শেষ করিতে

পারিলেন না। অনেকে খোসামোদে, অনেকে সত্যই একটা উঁচু দরের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া সাধুবাদ দিল। একটু আলোচনা চলিল কথাটা লইয়া। সনাতন রায় কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে একটু এদিক ওদিক করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে ভিতর বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

৫

খিড়কির সঙ্গে বেশ উঁচু দেয়াল দিয়া ঘেরা একটা মাঝারি গোছের বাগান। মাঝখানে একটা ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণী, চারিদিকে ফলফুলের গাছ···এটি বাড়ির মেয়েদের জন্য। বধূর সঙ্গে কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে আর ছেলে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে ফুল তুলিবার জন্য আসিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দুই-একজন তাহার সঙ্গেই রহিল।

এদিকে কাজ-কর্মের ঝোঁকে প্রায় মাসখানেক বাগানে আসা হয় নাই। নিত্য পরিচয়ের মধ্যে এই ব্যবধানের জন্য গাছপালা, পুকুরের জল, এমন কি এখানের রোদটুকুকে পর্যন্ত যেন নূতন বলিয়া মনে হইল। প্রকৃতপক্ষে আসিয়াছেও নূতনত্ব কিছু কিছু। পুকুরের কুঞ্চিত, চিক্কণ বুকের উপর একদিকে কতকগুলা সাদা সাদা কহ্লার ফুটিয়াছে, মাঝখানে গোটাকতক পদ্ম, তাহাদের পাতার উপর হাওয়ার দোলে জলের গোটাকতক বড় বড় বিন্দু গড়াইয়া ফিরিতেছে, বায়বেড়ের চৌধুরীদের মজা পুকুরধার মনে করাইয়া দেয়। তফাৎ এই, সেটা একটা আদৎ পদ্মবন, এখানে গোটাকতক মাত্র ফুল—পুকুরকে সাজাইয়া রাখা। ···ননদ বলিল, "বাবা কলকাতার নার্সারি থেকে এনেছিলেন···এই সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে।" বধূ বলিল, "আমরা পুজোর সময় তুলতাম কোঁচড় ভরে। আমার ভাই খোকা খুব সাঁতার কাটতে জানে কিনা··"

ননদ আলাদা করিয়া নাম দিয়াছে, প্রশ্ন করিল, "আর বুনী বুঝি নিজে জানে না? লুকোন হচ্ছে!"

বধূ ঘাড় কাৎ করিয়া হাসিল, বলিল "জানতুম, এখন ভুলে গেছি।"

একটি ছেলে বাহাদুরি দেখাইয়া সামনে আসিয়া বলিল, "আমিও জানি সাঁতার, নিয়ে আসব তুলে?"

ননদ বলিল, "আন না, ইচ্ছে হয়েছে বৌদির।"

বধূ কি মনে ভাবিল। তাহার যেন মনে হইল চৌধুরীদের মজা পুকুরের

পদ্ম-তোলা আর এখানকার পদ্ম-তোলায় কোথায় একটা তফাৎ আছে। এ পুকুর তাহার নিজের, কিন্তু আজ কেন যেন বোধ হইতেছে চৌধুরীদের পুকুরের চেয়ে আরও দূর আরও অনাত্মীয়। সাজি দুলাইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "না, থাক্।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে কিছু দোপাটি তুলিল, কিছু রজনীগন্ধা।·· এ দুইটা ফুল তাদের বাড়িতে আছে। উঠানের দক্ষিণ কোণটাতে প্রত্যেক বৎসর কৃষ্ণকলি আর দোপাটি আপনি জন্মিযা গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হইয়া ফুটে। প্রত্যেক বৎসরই বাবা অনু আর খোকাকে দিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পূজাতে পাঠাইয়া দিতেন, বলিতেন, "আহা, দিয়ে আয, যত্ন নেই আত্তি নেই, ওবা মায়েব পুজোব জন্যে প্রতি বচ্ছর আপন মনেই ফোটে···।" আব বৎসরও ঠিক এই আজকেব দিনের এই সময়টা ফুল লইয়া গিয়াছিল·· যেন দেখা যায়···শীতলার মার উঠানেব উপর দিয়া যাইতেছে দু'জনে খুব জোরে···খোকা তাহাকে হাঁটায় হারাইযা দিবার জন্য একেবারে ঝুঁকিয়া গিযাছে সামনের দিকে···রেষারেষির ঝোঁকে দু'জনেই এক একবার হাসিযা উঠিতেছে···খোকার নূতন কাপড় কোমর বাঁধিয়া পরা···কোঁচড় ফুঁডিয়া কৃষ্ণকলি আর দোপাটির আভা বাহির হইয়া আসিতেছে। ···আজও খোকা সেইখান দিয়া যাইতেছে—যেন দেখা যায়। একটু যেন মনমরা···ভাবিতেছে, "আর বছবে দিদি পাশটিতে ছিল!···"

বাগানের শেষ দিকে একটা বাঁধানো চত্বর, তাহার চারিদিকে শিউলি গাছ। ননদ ডাকিল, "বৌদি, দেখসে, কি কাণ্ড! চাতালটা বোঝাই হয়ে বয়েছে ফুলে, এরা নিয়ে যায় নি নাকি কুডিয়ে?"

বধূ একটু মন্থর গতিতে গিয়া চাতালের উপর থেকে কিছু শিউলি সঞ্চয় করিল, তাহার পর সাজিটি পাশে রাখিয়া বসিয়া পড়িল। ননদ বলিল, "দুটো দোপাটি তুলেই শখ মিটে গেল। বুনী আর কেন বলেছে!"

শিউলি শেষ করিয়া উহারা ফুল সঞ্চয়ে বাগানে ছড়াইয়া পড়িল। বধূ বলিল, "আমি একটু বসি।"

কি হইয়াছে···আজ এই আলোর ছায়ায় ঝলমল দিনটাকে যেন বহু বৎসরের চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। এতক্ষণ হয় নাই, তিন মহল বাড়ির বাহিরে যে এমন একটা সখীর মত পরিচিত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে, এটা ধারণার মধ্যেই আসে নাই। এই চেনা দিনের নানা ব্যাপারের মধ্যে এখানকার পূজা, এখানকার জীবনের কোন অংশই নাই। চৌধুরীদের বাড়ির পূজার কাঁসর ঘণ্টা··· কোঁচড়ভরা কৃষ্ণকলি, দোপাটি···পূজামণ্ডপের সামনে ছেঁড়া চাঁদোয়ার তলায় যাত্রার

আসর সাজানোর আয়োজন…দেবদারুর কোঁচকানো পাতা…রঙীন কাগজের শিকলি, পতাকা…মা বাবার চণ্ডী পাঠের যোগাড় করিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "পেলে স্কুল থেকে কিছু আগাম? আজ বছরকার দিন ছেলে-মেয়েটাকে…চৌধুরীদের বাড়ির নেমন্তন্ন…সে তো পরশু…"

পূজার নহবৎ ভাসিয়া আসিতেছে…শ্বশুর কাশী থেকে আনাইয়াছেন। কত দূরের একটা অপরিচিত সংগীত কাদের বাড়ির…রূপকথায় শোনা কোন রাজপুরীর। পূজার বাজনা নয়, সাত মহলের মাঝে মণি-প্রবালের ঘরে বন্দিনী রাজকুমারীর কান্নার সুর…

বধূ একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সাঁচ্চার কাজ-করা শাড়ির অঞ্চলটা দিয়া চক্ষু মুছিল।

৬

সনাতন রায় নিজের ঘরে একটা হেলানো চেয়ারে শুইয়া ছিলেন। নিজের সেই দুইটা কথার আঘাত নিজেকেই বড় বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে…কি করিয়া সব যেন বিস্বাদ ঠেকিতেছে…কেন, কে জানে…

দুয়ার ঠেলিয়া পুরোহিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন, ভাবটা খুব উদ্বিগ্ন। বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে এসে বসে আছ? খুঁজছিলাম তোমায়!"

সনাতন কতকটা নির্বিকারভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পুরোহিত কতকটা শঙ্কিত উদ্বেগের সঙ্গে বলিলেন, "মা আসেন নি, সনাতন! কোথায় কি হয়েছে খোঁজ নাও। ও রকম করে চেয়ে রইলে যে? বিশ্বাস হচ্ছে না? যদু সার্বভৌমের সন্তান…সাত পুরুষ ধরে মায়ের পায়ে মন্ত্র প'ড়ে ফুল দিয়ে আসছি, মায়ের পায়ে পড়ছে, কি খড়মাটির প্রতিমার পায়ে পড়ছে বুঝতে পারি। মা আসেন নি। অবশ্য পুজোর লগ্ন হয়েছে…খড়মাটিকে সাক্ষী করে মন্ত্র আওড়াতে হবেই…রামগতিকে তন্ত্রধারী করে বসিয়ে এসেছি, কিন্তু বুঝছি সব শুষ্ক, নিরর্থক। সনাতন, শুয়ে থাকলে চলবে না; ওঠ। তুমি বিশ্বাস করবে না বলে সব কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না…কিন্তু সার্বভৌমের সন্তান পুজোর দিনে পুজো করাতে করাতে উঠে এসে মিছে কথা বলবে না; মায়ের পুজোর ফুলে আমি গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছি না…হতে পারে মনের ভ্রম…কিন্তু মা যে আসেনি নি, প্রতিমার যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি এটা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে…"

সনাতন রায় কতকটা নির্বিকার ভাবেই শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "অবিশ্বাস করব কি করে ? আমি নিজেই যে মায়ের বাপের বাড়ির পথ আটকে রেখেছি পুরুত মশাই। একটু দর্প হয়েছিল। মেয়েকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম তার বাপের কাছ থেকে, তার মায়ের কাছ থেকে।·· আমার নতুন মা কোথায় ? রতী এসে বললে বাগানে বসে আঁচলে চোখ মুছছেন।···ললিত নিজে গিয়ে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে আসুক। বুঝতে পারি নি পুরুত মশাই, কোন্ মেয়ের বুকের ব্যথা যে কোন্ মেয়ের বুকে বাজবে, অতটা আন্দাজ করতে পারি নি···অপরাধ হয়ে গেছে।"

শশুরে

১

হরিবিলাস সর্দার বিবাহসংক্রান্ত বিলটা কতদিন হইল পাস হইয়াছে বলুন তো ? ···আপনি যে আঙুল গুনিতে বসিয়া গেলেন ! না, অত মাস তারিখ ধরিয়া হিসাবে দরকার নাই। মোটামুটি ছয় সাত বছর হইল, না ?

তাহা হইলে আমার নায়িকা সোনিয়ার বয়স হইল আঠারর কিছু বেশি, আর নায়ক মিঠুয়ার বয়স সম্ভবত পনের, দু'এক মাস কমই হইবে, বেশি তো নয়ই।

সোনিয়ার বাপের বাড়ি বিহারের একটি শহরের উপান্তে, শহরের ক্ষীণ আলো আর পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আর কি। বাপ প্রথমটা সর্দা অ্যাক্টের গোলযোগটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, শহরে ও রকম কত ঢেউ উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। যখন ঢেউটা মিলাইয়া না গিয়া সত্যই দেশটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। ছেলের বাজার তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে, পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজিয়া-পাতিয়া প্রায় ক্রোশ ছয়েক দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে মিঠুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তাহার উচ্চতা সওয়া গজ আন্দাজ, সোনিয়ার চেয়ে ঠিক এক মুঠার উপর দুই আঙুল বড়। বিবাহ হইয়া গেল।

মধ্যের এই ছয় সাত বৎসরের ইতিহাস বাদই দেওয়া যাক। কোনও রোমান্সের খোরাক নাই, নায়ক-নায়িকার মধ্যে কুল্যে দেখা-সাক্ষাতের যোগাই

তো রোমান্স! আপনাদের অত সহজে থামানো যাইবে না, জানি। জিজ্ঞাসা করিবেন অন্তরালের, অদর্শনের রোমান্স!···মিঠুয়ার তরফে যে কিছুই নাই, এ কথা বেশ নিঃসংশয়ে বলা চলে। ছেলেটা হাঁদা গোছের, খানিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। নিয়মিতভাবে খাওয়া-দাওয়া, গরু-মহিষ চরানো আর ক্ষেতে ফসল তোলার বাহিরেও যে একটা দুনিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার অত খোঁজ-খবর নাই। তাহার 'মনোভাব' নামক জিনিসটাই গজায় নাই, সে ক্ষেত্রে সোনিয়া সম্বন্ধে তাহার মনোভাবটা কি সে কথাই ওঠে না। এক কথায় বলা চলে ছোঁড়াটা 'মাথায় বাড়িয়াছে', কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।

অবশ্য সোনিয়ার কথা একটু ভিন্ন। একে মেয়ে, তায় যত অল্পই হোক না, শহরের একটু গন্ধ আছে। তাহা ছাড়া বয়সেও তো সে মিঠুয়ার চেয়ে বড়। এর উপর যখন ধরা যায় তাহার স্বভাবটাও স্বামীর মত হাঁদাটে নয়, তখন তাহার মনের জটিলতা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। ঘরকন্নার কাজের অতিরিক্তও তাহার কাজ আছে। কাপড়টি ছোবানো, সাজিমাটি দিয়া ঘাটে বসিয়া চুলের গোছা ধোওয়া, শহরে মার সঙ্গে কিছু বেচাকেনা করিতে গেলে শহরের হাওয়া একটু লক্ষ্য করা, বাঙালীদের 'বেটি-বহু'রা কিভাবে কপালে টিপটি পরে, এদেশীরা হাতে কি ধরনের মেহদির নক্সা তোলে, মণিবন্ধে, বাজুতে, কণ্ঠের নীচে কি ধরনের উল্কি আজকাল চলতি—এই সব।

সুবিধা পাইলে—ধরুন, মা যখন কাহারও বাড়িতে ধানটা ঝাড়িয়া দিতেছে, কিংবা দালটা বাছিয়া দিতেছে—সে সম-বয়সীদের দলে ভিড়িয়াও যায়—অবশ্য তাহার অবস্থার মেয়ের পক্ষে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে ভিড়া সম্ভব। মোট কথা, মিঠুয়া বোধ হয় যে সময়টা মহিষের পিঠে শুইয়া মাঠের মাঝে অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, কিংবা ঘুড়ি-লাটায়ের ঝগড়ায় মার খাইয়া কান্নার চোটে পাড়া মাথায় করিতেছে, তাহার পত্নী সোনিয়া তখন সম-বয়সীদের কাছে এমন সব সংবাদ শুনিতেছে, যাহাতে তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

অবস্থা যখন এবম্প্রকার, মিঠুয়ার বাপ বুধন মড়র একদিন হঠাৎ আসিয়া বেহাইবাড়িতে উপস্থিত হইল। রৌদি মহতো নেশা-পানি আনিয়া বেহাইকে অভ্যর্থনা করিল। বুধনের মেজাজটা একটু যেন বেশি রকম রুক্ষ, বলিল, "এ তো ভাল কথা নয় সমধি (বেহাই), টাকা নেই টাকা নেই বলে মেয়ের দ্বিরাগমন করাচ্ছ না, ওদিকে আমার যে মুখ দেখানো ভার। বেটীর চালচলন শহুরে হয়ে উঠছে—সে-দেশ পর্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল, অথচ তোমার যেন হুঁশই নেই।

কবে তোমার 'টাকা হবে, মেয়েকে কায়দামাফিক বিদায় করবে, সে ভরসায় থাকলে তো চলবে না। আমি আজ এসেছিলাম শহরের দিকে, ফিরে গিয়ে জ্যোৎশ্বীজীর (জ্যোতিষীজীর) কাছ থেকে দিন দেখিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেয়ে পাঠাবাব যোগাড় কর।"

বেহাই বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিল। ক্ষেতে মকাইটা হইয়াছে ভাল এবার, ফসলটা উঠিলেই মেয়েকে বিদায় করিবে। হাত এখন নিতান্তই খালি, পাওনাদারকে কয়েক মাস সুদ পর্যন্ত দিতে পারে নাই, সেদিকে একটি পয়সাবও আশা নাই···"এখন পাঠালে কিছুই করতে পারব না, সব সাধ-আহ্লাদই বাকি থেকে যাবে···নাও সম্ধি, তুমি আজ যে মোটেই গেলাস তুলছ না···"

ছেলের বাপ রাজি হইল না,—ছেলের বাপই তো! অষ্টম বার গেলাসটা ভরিয়া বলিল—"মনে সুখই নেই তো গেলাস ভরা। তুমি মেয়েকে এক বস্ত্রে, খালি হাতে পাঠিয়ে দাও; আমার জোটে দেব পবতে, না জোটে ন্যাকড়া পরবে। আমি ইজ্জৎদার লোক, আমার ইজ্জৎ বজায় থাকলেই হল।···তবে আসল কথাটা বলতেই হল সম্ধি, আজ শহর থেকে আসার পথে কনিয়াকে (বধূকে) সখীদের সঙ্গে যে-রকম বেহায়াপনা করতে করতে আসতে দেখলাম, তাতে···।"

পেটে অনেকখানি গিয়াছে, রাগিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রৌদিও যোগদান করিল। খানিকটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিল—"কে কার বেটী, কে কার বাপ? সব রামজীর লীলা। তুমি নিয়ে যাও তোমার কনিয়াকে সম্ধি।"

বুধন গেলাসটা শেষ করিয়া শান্তভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল,—"না হয় থাক্ই তবে মকাই পাকা পর্যন্ত। তুমি ইজ্জৎদার লোক, তোমার কথাটা ঠেলব?—আমার মন যেন সায় দিচ্ছে না।"

রৌদি তখন পাঠাইবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে, প্রবল বেগে হাত নাড়িয়া বলিল,—"না, না; সব মায়ার বন্ধন সম্ধি, যত শীগগির কাটানো যায় ততই মঙ্গল; বলে—

কহত কবীর শুনো রঘুনাথা
মায়াধার নরক পথ যাতা

—মায়ার নদী নরকেই নিয়ে যায়। নদীতে গা ভাসাতে চাই না।"

বুধন দুই হাঁটুর উপর হাতের কনুই দুইটা ন্যস্ত করিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ সম্ধি—

আরে কৌন্ কিস্‌কা বেটা ভাইয়া, কৌন কিস্‌কা বাপ।
মায়াকা হও মুট্‌ঠি বান্‌হে, হাত পসারো—সাফ।

—কেই বা কার? মায়ার বশে হাত মুঠো করে ভাবছি—কি রত্নই না রয়েছে; খুলে দেখ—ফাঁকি!…কাটিয়াতে আর আছে নাকি? দেখ তো।…না থাকে দরকার নেই…এও একটা মায়াই বলতে হবে কিনা, যত এড়ানো যায় ততই ভাল।"

২

বৌদির বাড়িতে এই দার্শনিক বৈঠকের দুইদিন পরে মিঠুয়া বধূকে লইতে আসিল। মাথায় একটা গোলাপী চীনে সিল্কের টুপি; গায়ে সবুজ গেঞ্জির উপর একটা পাৎলা পিরান, কোমরে হলুদ-ছোবানো কাপড়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় জবজবে করিয়া মাখা সরিষার তেল টুপির নীচের অংশটা ভিজিইয়া কয়েকটি ধারায় কপাল, গাল, ঘাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে—চোখে কাজল।

পথে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়াছিল, শ্বশুরবাড়ির নিকট আসিয়া একটা কানে গুঁজিয়া দিয়া যথাসম্ভব শহুরে হইয়া লইল।

শ্বশুর-শাশুড়ি বাড়ি ছিল না। সোনিয়াকে তাহার দুই তিনজন সখী জোর করিয়া আনিয়া ঘরের ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে দাঁড় করাইল—অবশ্য খুব যে জোর করিতে হইল, এমন নয়। বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া, নাক সিঁটকাইয়া সোনিয়া চাপা গলায় বলিল, "ইস্! কি ভারী মদ্দ রে আমার!… আমি সোজা লোক? নিজে দেড় হাতের হলেও চার হাতের লাঠিই আমার।"

সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল।

একজন সখী বলিল, "তুই তো ঐ বিড়ির মতই ওকে তোর কানে গুঁজে রাখবি সোনিয়া।"

অপর একজন বলিল, "দেখিস, যেন বিড়ির মত ফুঁকে দিস নি তা বলে।"

আর একটা হাসির লহর উঠিল।

সব না বুঝিলেও, বেড়ার আড়ালে যে একটা কিছু হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া, মিঠুয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। নিজের পুরুষত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা গলা-খাঁখারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহাতে আরও একটা কি মন্তব্যের সঙ্গে বেড়ার ও-ধারে প্রবলতর হাসির বেগ ওঠায় অসহায় ভাবে হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

একটু বেড়ার ভিতর হইতে ধাক্কা খাইয়া একটি মেয়ে একেবারে সামনে

আসিয়া পড়িল। একটু থতমত খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রশ্ন করিল, "পহুনা (কুটুম), বেশ ভাল আছ তো ?"

মিঠুয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "হুঁ।"

"বলদ মহিষ সব কেমন আছে ?" নিজেও হাসিয়া উঠিল, পাশেও দুই তিনটি কণ্ঠে হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মিঠুয়া আরও ঘাড় গুঁজিয়া নিরুত্তর রহিল।

আর একটি মেয়ে দুইবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহিরে আসিল। অযথা এক ঝলক হাসিয়া আবার কৃত্রিম গম্ভীরতার সহিত বলিল, "আহা কচি ছেলে, দু'কোশ পথ হেঁটে এসে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গো! দুধ খেয়ে এসেছিলে পহুনা ?"

মিঠুয়া তেলে-ঘামে একেবারে জবরজঙ হইযা উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিযা আড়চোখে দেখিল আর একটি বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল, "মুখ তোল তো পহুনা, ক'টি দাত হয়েছে দেখি। আহা, সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘাড় তুলতে পারছে না।···আচ্ছা, ভাবনা নেই, যাবার সময় হেঁটে যেতে হবে না,—মিতিনকে (সইকে) বলব কোলে করে নিয়ে···"

এমন সময় অপর একদিকে রৌদির গলাব আওয়াজ শোনা গেল। সে বাড়ি ছিল না, এইমাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মেয়েরা যে যেখানে পারিল ছুট দিল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত রৌদির স্ত্রী এবং ভগ্নীও বাড়ি ফিরিল; পাড়ার বর্ষীয়সীদের ডাকিয়া রাত বারোটা পযন্ত গান হইল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছে জানিয়া মিঠুয়া মেয়েগুলার হাতে খোয়ানো আত্মমর্যাদা আবার অনেকটা ফিরিয়া পাইল এবং রাতে দৈনন্দিন নেশা করিয়া শ্বশুর যখন তাহার চিবুক ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া অন্তত আর একটা দিনও থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে পুনর্লব্ধ আত্মমর্যাদার বশে কোনক্রমেই রাজি হইল না।

পরের দিন বিকালে সাজগোজ করিয়া এবং শ্বশুরের দেওয়া একজোড়া রঙিন কাপড় আর উডানিটা কাঁধে ফেলিয়া একটা গোটা পুরুষের তেজে বউকে লইয়া বিদায় হইল।

সোনিয়া যাইবে না বলিয়া বাড়ির মধ্যে খুব একচোট কান্নাকাটি, ওজর-আপত্তি করিল, চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া আর একচোট ধ্বস্তাধ্বস্তি করিল, তাহার পর ঘোমটার মধ্যে একটানা কান্নার সুর তুলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মা, পিসি, পাড়ার বর্ষীয়সী আর সখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের প্রান্তে 'বড় হম্ দেওতা'র (ব্রহ্মদেব) আস্তানা পর্যন্ত সঙ্গে গেল, তাহার পরে একবার গলা-জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়া, সোনিয়াকে বিদায় দিয়া আস্তানার কদমতলাটিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

পথটা প্রায় পোয়াখানেক পর্যন্ত সোজা গিয়াছে। এটুকু সোনিয়া এমন ধীরে ধীরে চলিল যে, দুই তিনবার মিঠুয়াকে থামিয়া পড়িয়া তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। আপত্তির যে-রকম নমুনা দেখিয়াছে, দূরত্ব বাড়াইয়া শেষকালে পলাইয়া যাইতেও পারে—শহুরে মেয়েকে বিশ্বাস নাই। মোড়টা ঘুরিয়া খানিকটা পরে কিন্তু তাহার যেন বোধ হইল, বধূর পদক্ষেপ একটু একটু করিয়া দ্রুত হইয়া উঠিতেছে। নূতন বধূ হইতে একটা ভব্য দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকেও গতিবেগটা বাড়াইয়া দিতে হইল। দেখিল, তাহাতেও নিস্তার নাই। তখন নির্জন রাস্তায় তাহার গা'টা যেন ছমছম করিতে লাগিল।—মেয়েটা ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছে, মতলবখানা কি?

হঠাৎ সোনিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। মিঠুয়া অজ্ঞাতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বধূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মীয়া ভিন্ন এত বড় মেয়ের সহিত কখনও কথা কহে নাই, প্রবল অস্বস্তিতে পড়িয়া লাঠির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে ঘোমটার মধ্যে থেকেই ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রথম কথা ফুটিল, "ইস্, দৌড়নো হচ্ছে একেবারে!"

ইহা অতিমাত্রায় অপ্রত্যাশিত! মিঠুয়ার প্রথমটা কথাই যোগাইল না, একটু পরে জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "বাঃ, তুমিই তো জোরে চলতে আরম্ভ করলে, আমি সে রকম ভাবে চললে এগিয়েই যেতে!"

ঘোমটায় একটা ঝাঁকানি হইল, শব্দ বাহির হইল, "গমার কাঁহাকে!" অর্থাৎ, গেঁয়ো কোথাকার!

মিঠুয়ার যাহা কিছু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, বধূর এরূপ সম্ভাষণে একেবারেই বিলুপ্ত-প্রায় হইল। একটু পরে বলিল, "বেশ, চল আস্তে আস্তেই।"

খানিকটা গেল। একটু পরে হঠাৎ পিছন ফিরিতে দেখিল—বধূর মাথায় ঘোমটা নাই, কখন খুলিয়া ফেলিয়াছে; সে সশঙ্কভাবে মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইল। ভাবিতে লাগিল—এ তো ভীষণ ফ্যাসাদে পড়া গেল, মাঝ-রাস্তায় কি করিয়া এই অভাবনীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পিছনে তাহার জামার খুঁটে টান পড়িল। যদিও ফিরিয়া দেখিল, বধূর

হাত তাহাব অঞ্চলের ভিতরেই অচঞ্চল ভাবে আছে, তবুও তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ ঐ দুঃসাহসিকারই কাজ। প্রশ্ন কবিল, "কিছু বলছ ?"

বধূ ঘোমটামুক্ত মুখটা ব্যঙ্গের সহিত ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "কাকে ?"

"আমায় ?"

সোনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, "ওঃ, ওঁকে বলছে, মস্ত সমঝদার লোক কিনা! গেঁযো বুঝবে শুধু মোষ-বলদের কথা।"

এ রকম ভাবে ঘা দিলে মিঠুয়ার মত লোকেবও লাগে, রাগে মুখটা ভার করিয়া বলিল, "হ্যাঃ, বুঝি কিনা বলেই দেখ না।"

"ঢের বলেছি আব ঢের বুঝেছ , চল এখন, সামনে লোক আসছে।"

ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া আবাব চলিতে আরম্ভ কবিল। যখন আন্দাজ কবিল লোকটা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিযাছে, ঘোমটাটা খুলিয়া একেবারে পাশাপাশি আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। বোধ হয দুইজনে মতলব কবিয়া পথিকটিকে প্রবঞ্চনা করায় দু'জনেব মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা আবও নিবিড হইয়া গেল। অবশ্য সোনিয়াই অগ্রণী, বলিল, "গল্প কবতে করতে চল না , হাবা না বোবা ?"

"কি গল্প বলব ?—বাজবাণীর না হুডাবের (নেকড়েব) ?"

সোনিযা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "মন্‌সাব (মিনসের) কথা শোন না! আমি কি খুকি যে বাঘ-ভূতের গল্প শুনব ? তুমিই ববং দুধের ছেলে · কালকের কথা মনে আছে ?—আমাব মিতিন্‌দের হাতে নাকালটা ?"

মিঠুয়া চুপ কবিয়া রহিল। সখীদেবই একটা কথা সম্বন্ধে সংকেত করিয়া সোনিয়া বলিল,—"পা ব্যথা করছে না তো ?—যদি করে তো বল না হয়…

শেষ করিতে না পাবিয়া মুখে হাত দিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঠুয়া লাঠিটা বাগাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাদের সবগুলোকে আমি কাঁধে করে অমন পাঁচ ক্রোশ ঘুরে আসতে পারি—আমার নাম মিঠ্‌ঠু মড়র, হুঁ !"

"ওঃ, তাই তো গো! তা, তাদের বললে না কেন ? তাহলে হনুমানজি বলে তোমায় পুজো করত।"

হাসিতে হাসিতে বলিল, "তিনিও রাম-লক্ষ্মণ-সীতাজী—সবাইকে একসঙ্গে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেডাতেন।…নাও, খানিকটা এগিয়ে যাও, একটা গ্রাম এসে পড়ল।…এখন হাতে ধরে মড়রকে শেখাই দু'বছর।"

নিজেও ঘোমটাটা টানিয়া দিল এবং গতি মন্দ করিয়া স্বামীর আর নিজের মাঝে উপযুক্ত ব্যবধান করিয়া লইল। গ্রামটায় বসতি বিরল, তবে রাস্তায়

দু'ধারে দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া বাড়ি প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত গিয়াছে। ছেলে-মেয়েরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া, কোথাও বা রাস্তার মাঝে আসিয়া—"কনিয়া গে, দুগো ধনিয়া দে"—বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ছড়া কাটিতে লাগিল। একটু যাহারা বোঝে, বর-কনের বয়সের তারতম্য লইয়া অম্ল-মধুর মন্তব্য ছাড়িতে লাগিল।

৪

গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা গিয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুর পাড়ে। রাস্তার একটু পাশেই ঝাঁকড়া বকুল গাছের তলায় রানাভাঙা একটা পুরাতন ঘাট। লোকজন নাই কেহ। সোনিয়া বলিল, "তেষ্টা পেয়েছে, চল একটু বসি।"

মিঠ্ঠু বাহাদুরি দেখাইয়া বলিল, "ইঃ, দু'ক্রোশ তো পথ, তার মধ্যে আবার চারবার বস! আমার তেষ্টা পায় নি।"

সোনিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তবে তুমি যাও।"

"আর তুমি?"

"আমি জিরিয়ে টিরিয়ে বাড়ি ফিরে যাব।"

যা মেয়ে দেখা যাইতেছে, ও তা পরে। মিঠুয়া শুষ্ক মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সোনিয়া ঘাটের রানায় একটা জায়গায় গিয়া বসিলে সেও গিয়া পাশে বসিল। সোনিয়া গা-টা গুটাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ কাণ্ডটা? আর জায়গা নেই না কি যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে? আচ্ছা পাড়াগেঁয়ে ভূত তো!"

মিঠুয়া অতিমাত্র অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যে-রকম উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মনে করিয়াছিল খুব কাছে বসাটাই বরং অভিজ্ঞ নাগরিকের মত হইবে। বোকার মত একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আর বসবার মত পাকা জায়গা তো দেখছি না; তাহলে তো আমায় নীচে বসতে হয়।"

সোনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, "তাইতো গা—এত বড় অপমান! আমি…" হঠাৎ থামিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কত বয়স হল? এগার?"

মিঠুয়া যথাসম্ভব জোর দিয়া বলিল, "পন্দ্রহ্!"

সোনিয়া কথাটাতে মিঠুয়ার চেয়েও জোর দিয়া চোখ পাকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি পন্দ্রহ্ বছরের মদ্দ—অমুক মড়র—আমি বসব নীচে!…নীচে

বসবে না তো কোথায় বসবে?—আমার বয়স যে উনিশ!—বিশ্বাস হচ্ছে না"? —বলিয়া তাহার উনিশ বৎসরের সমস্ত শরীরখানি কপট দর্পে বিচলিত করিয়া, রানার নীচে পা দুইটি ঝুলাইয়া, বিপরীত দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া বসিল।

একটু পরে ফিরিয়া দেখিল, পনের বৎসরের জীবটি নিজের পরাজয় মানিয়া লইয়া, জড়সড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে, ঘাসের উপর বসিয়া আছে। একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, "ব'সে না থেকে, দু'টো ভালসারির (বকুলের) ফুল কুড়োও দিকিন। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি।"

"ফুল কি হবে?"

"বাড়ি গিয়ে তোমায় ভেজে খাওয়াব,—হাঁদারাম—"

মুখ ধুইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিয়া উঠিল। ছোবানো শাড়ির কোঁচা দিয়া মুখ মুছিয়া মিঠুয়ার দিকে মুখটা হঠাৎ বাড়াইয়া বলিল, "দেখ তো আমার কপালের টিক্‌লিটা (টিপ) ঠিক আছে কি না।"

"এক পাশে সরে গেছে।"

"কোন্ দিকটায়?"

"ডান দিকে।"

সোনিয়া মেহদি-রঙানো তিনটি আঙুলের ডগা টিপ ছাড়া কপালের আর সব জায়গায় বুলাইয়া বলিল, "কোথায়? বুঝতে পারছি না তো।"

"ডান দিকে ভুরুর ওপরে।"

সোনিয়া আবার সেইরূপ ভাবে হাত বুলাইয়া বলিল, "কোথায়? দুৎ, মিছে কথা, পড়ে গেছে নিশ্চয়।"

"না না, পড়ে নি।"

সোনিয়া ঝগড়া করার মত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়েছে, নিশ্চয় পড়েছে,—চাষা!"

মিঠুয়া আশ্চর্য হইয়া গেল;—ঐটুকু ছোট কপালটায় হাত বুলাইয়া টিপটা কোথায় ধরিতে পারিল না, এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া ইহাতে রাগ করিবার, ঝগড়া করিবারই বা কি আছে? একটু হতভম্ব হইয়া বলিল, "যদি রাগ না কর তো দেখিয়ে দিই।"

"*যদি খালি টিক্‌লিটা খুঁটে নিয়ে বসিয়ে দিতে পার তো কিছু বলব না, কিন্তু* খবরদার, যেন…ন্যাকাকে কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

ন্যাকার হাতটা কাঁপিতেই ছিল, তাহার উপর বাঙালী প্যাটার্নের ক্ষুদ্র টিপটা

বেশ একটু বাগড়াও দিল ; খুঁটিতে গিয়া কপাল হইতে না/ক পড়িল, সেখান হইতে দুইটি ঠোঁটের মাঝখানে।

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে, যতটা সম্ভব আলগাভাবে সেটাকে উদ্ধার করিয়া কপালে বসাইয়া দিল এবং একটা নিশ্চিন্তভাবে নিশ্বাস ফেলিল।

সোনিয়া দুইটি আঙুল দিয়া টিপটা একটু চাপিয়া দিয়া বলিল, "গেঁয়ো কোথাকার!"

মিঠুয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, "আবার ও কথা বলছ কেন? দিই নি ঠিক করে খুব সাবধানে?"

"নিশ্চয় বলব, আমার খুশি! নাও চল। আকাঠ গেঁয়ো!"

আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। সোনিয়া কি ভাবিতেছিল, একটু পরে বলিল, "তুমি গেঁয়ো বললে চট, কিন্তু কাউকে যদি বল যে আমার গায়ে হাত দিয়ে কপালের টিপ পরিয়ে দিয়েছ তো সে আরও গেঁয়ো বলবে। মনে থাকে যেন!"

মিঠুয়া মস্ত বড় বুদ্ধিমানের মত বলিল, "সে আমি বলতে যাব কেন? এতই বোকা নাকি?"

কথাবার্তা আরও অন্তরঙ্গতার সহিত হইতে লাগিল। পথের মাঝে লোক দেখিয়া যতবারই দুইজনে সরিয়া যাইতে লাগিল, লোক চলিয়া গেলে ততবারই আবার আরও কাছাকাছি হইয়া চলিতে লাগিল। সোনিয়া গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শ্বশুর-বাড়ির কথা, ননদ, দেওর, গরু, মহিষ ; নিজে শহরের কথাও বলিতে লাগিল। বাঙালী মেয়েদের কথা। কে এক বাঙালীর মেয়ে তাকে বড্ড ভালবাসিত, সোনিয়া তাহাদের বাড়ি ঘুঁটে যোগাইতে যাইত মাঝে মাঝে—তাহাকে আদর করিয়া বলিত, 'সোনাময়ী'—মানে, সোনার তৈয়ারী। সে নাকি সুন্দর বলিয়া তাহাকে এই আখ্যা দিয়াছিল···বাবাঃ, বাবাঃ, বাঙালীর মেয়েরা এত মিথ্যাও জানে! সোনিয়া নাকি আবার সুন্দর!

মিঠুয়ার সাহস বাড়িয়াছে, একটু বোধ হয় হয় জ্ঞানবুদ্ধিও হইযাছে পথ চলিতে চলিতে। বলিল, "মিছে কথা আর কি বলেছে! তুমি তো সুন্দরই।"

"নিজে যে সুন্দর সে ও রকম বলে—মানে, বাঙালীর বেটী নিজে সুন্দর বলেই আমার প্রশংসা করত।"

মিঠুয়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, এর মধ্যে তাহারও প্রশংসা প্রচ্ছন্ন আছে কি না।

যেন মনে হইল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একটু বলিয়াছে এবং যে ক্রমাগতই একনাগাড়ে 'গেঁয়ো, গেঁয়ো' করিয়া আসিয়াছে, তার মুখে ভালই লাগিল কথাটা।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, "বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ইঁদারাটার পাশ দিয়ে ঘুরলেই আমাদের বাড়ির রাস্তা কিনা। আচ্ছা, আসবার সময় তুমি অত কান্নাকাটি করছিলে কেন বল তো? এখন তো বেশ…"

সোনিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। খপ করিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া চাপা স্বরে উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, "সত্যি, এসে পড়েছি নাকি? আগে বলতে হয়,—এগিয়ে যাও, এক্ষুনি এগিয়ে যাও—"

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটার ভিতর হইতে কান্নার সুর উঠিল। মিঠুয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি! এই ত দিব্যি ছিলে, বললে, আমাদের বাড়ি খুব ভাল লাগবে, আরও বললে…"

স্বামীকে বেশ একটু ধাক্কা দিয়াই আগাইয়া সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "বাড়ি যে এসেছে। গেঁয়ো ভুচ্চড়কে নিয়ে কী ফ্যাসাদেই…"

অতঃপর নিজের গতি মন্দ করিয়া দিয়া বেশ উচ্চ সুরেই বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল।

আচারের অনাচার

১

বাড়িতে প্রত্যহ চুরি হইতেছে।

চুরির বিশেষত্ব আছে; সোনা নয়, চাঁদি নয়, কাপড় নয়, বাসনপত্র নয়; চুরি হইতেছে আচার আর তেঁতুল।

কিন্তু তাহাও তো চুরি। ধর, যদি ঝিয়ের কাজ হয় তো সেও কি কম ভাবনার কথা? আজ আচারে হাত পাকাইতেছে, কাল পোক্ত হইয়া পেনিটা, আংটিটা, কানের দুলটা সরাইবে, পরশু দেখিবে গলার হার অদৃশ্য হইয়াছে। গৃহস্থ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া বধূ।

কিন্তু সত্যই কি ঝিয়ের দোষ? সে বেচারির তো ভয়ে গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে, দেখিলে মনে হয় না মাসখানেকের মধ্যে সে কোন অন্ন জিনিস স্পর্শ

করিয়াছে। তবে, ননদ—সুধা?—মেয়েটার বয়স হইলেও, টক-ঝালের উপর একটু লোভপরায়ণ বটে; কিন্তু তাহার শপথ খাওয়ার বহর দেখিলে আর মনে হয় না, সে ভিতরে ভিতরে এই কাণ্ড করিতেছে।

দেওর করিবে না,—টক দেখিলেই তাহার গায়ে জ্বর আসে; চোখ বুজিয়া, নাক কুঁচকাইয়া দশ হাত দূরে পালায়। বৌ-দিদির ওটা একটা অস্ত্র। যখন দেওর ফাইফরমাইসে ডাকে অথচ সে নিজে এড়াইতে চাহে, বলে, "রোসো আসছি, হাতে তেঁতুল গোলা, ধুয়ে নি আগে হাতটা।"

দেওর উত্তর দেয়, "তুমি তেঁতুলপোকা হয়ে মর, আর আসতে হবে না।"

সে আচারের কাছে ঘেঁষিবে না।

স্বামী হাসিয়া বলে, "টক যদি চুরি যায় তো ধরে নিতে হবে এ মেয়েদের কাজ। নতুন মা হয়েছে এমন মেয়েছেলে যদি ঘরে থাকে তো চোর ধরবার জন্যে বেশি খোঁজাখুঁজির আর দরকার থাকে না…"

বধূ কৃত্রিম রাগের সহিত বলে, "থাম, নতুন বাপেরা বড় সাধু, একেবারে লোভ নেই!"

স্বামী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া বলে, "আছে; তবে টকে নয়, মিষ্টিতে। মিষ্টি যদি কিছু চুরি যায় তো আমার হাতে হাতকড়ি দিও।"

উভয়েই হাসে।

এসব কিন্তু ঠাট্টার কথা। এই হসিঠাট্টা থামিয়া গেলে চিন্তা আসে, রাগ হয়। সারা বৎসর ধরিয়া কোথায় দুটো আম রে, কোথায় কুল রে, কোথায় তেঁতুল রে—প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হইয়া সব যোগাড় করা; মসলা ভাজা; দুপুরে ঘুমের কথা ভুলিয়া মাখা-আচার পাহারা দিয়া রৌদ্রে শুকানো। এত কষ্ট করিয়া বাঁদর, হনুমান, কাঠবেড়ালির হাত থেকে উদ্ধার করিয়া জিনিস যদি ঘরে উঠিল তো অমনি অদৃশ্য হইতে লাগিল! শুধু মেহনতেরই কথা নয়। শেষপাতে একটু আচার না হইলে শ্বশুর-শাশুড়ির খাওয়া হয় না। চিরকালটা রাজপুতানায় কাটাইয়া ও-অভ্যাসটা জন্মের সাথী হইয়া গিয়াছে। বলেন, "বৌমা, তোমাদের দেশে সে জলও পাব না, সে হাওয়াও পাব না, সে তো আর তোমার হাতে নেই, কি করবে? আমাদের অদেষ্ট; তুমি বাছা আচারটুকু থেকে বঞ্চিত ক'রো না।"

তাই এত ঝক্কি লইয়া করা। কর্তা-গৃহিণী পশ্চিমা চাকর লট্টুকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছেন,—জনকপুর-পশুপতিনাথ সারিয়া কামাখ্যায় যাইবেন; সেখান হইতে জ্বালামুখী। ফিরিতে মাসখানেক লাগিবে। এই কয়দিন হইতে যে রেটে

চুরি হইতেছে তাহাতে তাঁহাবা ফিরিয়া যে আচারের মুখ দেখিতে পাইবেন এমন তো ভরসা হয় না। আর এটা না আমের সময়, না কুলের সময়, না তেঁতুলের সময়। আর সময হইলেও ও-জিনিস তো একদিনে হইবাব নয়।

মহা দুশ্চিন্তাব বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর এই এক তীর্থেব ঝোঁক হইযাছে ঠাকুব-ঠাকরুনেব! ওদের সংসাব কে সামলায় এদিকে তাহার ঠিক নাই। সব ছাড়িয়া যদি ছেলেটিব আর মেয়েটিব কথা ধবা যায় তো তাহাদেব সামলাইতেই ঠিক দুইটি লোকেব দবকাব। ছিলও সে ব্যবস্থা, নাতিটি বেশিব ভাগ থাকিত তাহাব ঠাকুবমাব কাছে, নাতনিটি দখল করিয়াছিল ঠাকুবদাদাকে—বধূ সাবা সংসাবটা একাই সামলাইত—একটু গায়ে লাগিত না। এখন পিসিমা আছে অবশ্য—কিন্তু তাহার ভাইপো-ভাইঝিদেব দেখা এখন নেহাৎ শখেব দেখা। নূতন বিবাহ—নিজেকে দেখিতেই তাহার বেশি সময় কাটে—তাহা ভিন্ন চিঠি লেখা আছে, সমবযসীদেব সঙ্গ আছে। ভাইপো-ভাইঝিদের নিতান্ত যে না দেখে এমন নয়, তবে কাজে সাহায্য হিসাবে নয়, শখ হইল—যেটাকে হাতেব কাছে পাইল লইয়া খানিকটা হুডাহুডি, ঘাঁটাঘাঁটি করিল, কিংবা নিজেব বাক্স থেকে ক্রীম, পাউডাব, রুজ বাহিব করিযা খুব একচোট সাজাইল, এই।

দেওরের ভালবাসা আবাব অন্য বকমেব—দাপাদাপি কবিয়া, চটকাইয়া কাঁদাইয়া সরিয়া পডিবে। তুমি সামলাইয়া মব।

ইহার উপব কুটুম্বিতা আছে। ননদাইয়েব কলেজ বন্ধ হইয়াছে, সে আজকাল শনিবার-শনিবাব আসিতেছে। এই একঘেয়েমির উপর দুইটা দিন কাটে ভাল; কিন্তু তবুও সামলানো সোজা নয় তো!

ওঁরা দু'জনে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া তীর্থ করুন।

হাঙ্গামের উপর হাঙ্গাম হইয়াছে দিদি-শাশুড়িকে লইয়া। শাশুড়ি যাওয়ার ঠিক দুইটি দিন বাদ দিযা সেই যে বিছানা লইয়াছেন, আজ পর্যন্ত উঠিতে পারিলেন না।

২

দিদি-শাশুডি অর্থাৎ শ্বশুরের শাশুড়ি; সরল কথায় শাশুডির মা। আইনত তিনিই এই বাড়ির মালিক। শ্বশুর যিনি তিনি আসলে ঘরজামাই। উঁহার

জীবনের অধিকাংশ ভাগই রাজপুতানায় কাটানোর সঙ্গে এই ব্যাপারটুকুর একটু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তাহার সহিত এই কাহিনীর কোন সম্বন্ধ না থাকায় সে-সব পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিবার দরকার নাই।

দিদি-শাশুড়ির মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁহার বয়স। সেটা যে ঠিক কত, গ্রামেব মধ্যে কাহাবও তাহা জানা নাই। ছেলে-বুড়ো সকলে তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছে, ছেলেরা বুড়ো হইয়াও একভাবে দেখিতেছে বলিলেও মারাত্মক রকম অত্যুক্তি হয না। তিনি নিজে কিছুই বলিতে পারেন না। কুড়ির হিসাবে চার কুড়ি বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া হিসাবেব হাঙ্গামা ছাড়িয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"হারানের মা যেবারে সাবিত্রীর বেরতো উজ্জাপন করলে সেইবারে চার কুড়ি পুরো হল। তোর দাদা-শ্বশুব বললে না ?—বলে—ঐ বেরতো পার্বণ করেই তো শেষ কর তোমরা আমাদের। নিজের চার কুড়ি হল, আমার হল চার কুড়ি দশ, এখনও যাবার নাম নেই…"

প্রমাণের মধ্যে এইটুকু ; কিন্তু হারানের বাপ-মা সাবিত্রী-সত্যবানের দীর্ঘায়ু উপভোগ করিয়া বহুপূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করায় হিসাব নিষ্পত্তির আর কোন সুযোগই নাই।

সে-যুগের লোক,—ওরা বাঁচিত বলিয়া হিসাব রাখিত না, আমরা মরি—এবং পদে পদেই মরি বলিয়া হিসাবের গাঁট গুনিয়া গুনিয়া চলি।

এই বুড়িকে ফেলিয়া যে উঁহারা তীর্থ করিতে গিয়াছেন তাহার একটু কারণ আছে। স্থবির হইলেও দিদি-শাশুড়ি বেশ ডাঁটো। ফলে ওঁর মৃত্যুর কথা এখনও কেহ ভাবিতে আরম্ভ করে নাই, অন্তত মাসখানেক কি মাস দুয়েকের মধ্যে যে ভালমন্দ কিছু একটা হইবে এমন আশঙ্কা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

বাহ্যত অবশ্য শরীরটি ধনুকাকৃতি হইয়া গিয়াছে এবং গলার স্বর হইয়া গিয়াছে টানা এবং তরঙ্গায়িত। কিন্তু এই স্বর এবং শরীর লইয়া এখনও সমস্ত বাড়িটিতে খুট খুট করিয়া বেড়ান। সংসার-অনভিজ্ঞতার জন্য কন্যাকে সাক্ষাৎভাবে এবং জামাতাকে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করেন, নাতি-নাতবৌয়ের সঙ্গে বিদ্রূপ করেন, নববিবাহিতা নাতনিকে নিজেদের জীবনের উদাহরণ দিয়া দাম্পত্যশাস্ত্রে তালিম দেন। শরীর ভেদ করিয়া বয়স যে মনের কোন্‌খানটা স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভালবাসার ক্ষমতাও বেশ অটুট আছে, এখন সবচেয়ে বেশি স্নেহ নাতির ছেলেটির উপর। বড়মা দাঁড়াইলে তাঁহার মাথা উপরদিক হইতে ঝুঁকিয়া

প্রপৌত্রের মাথার উপরটিতে আসিয়া পড়ে,—মনে হয় জীবনের দুই দিক মিলিয়া একটি পূর্ণ বৃত্ত সৃষ্টি হইল।

এই দিদি-শাশুড়ি এখন শয্যাধরা। হারাধন ডাক্তার বলিতেছে কোন উপসর্গ নাই তেমন, তবে বয়েস হইয়াছে, যে কোন মুহূর্তেই একটা উপসর্গ দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, তখন আর সামলানো যাইবে না। খুব সাবধান থাকাই ভাল, বিশেষ করিয়া খাওয়া সম্বন্ধে।

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে অবশ্য কোন ভয় নাই। শেষ বয়সে এটা ওটা সেটা খাইবার জন্য একটু লালসা হয় বটে, কিন্তু দিদি-শাশুড়ির ওসব বিষয়ে রসনা খুব সংযত। যাহা সামনে ধরিয়া দেওয়া হয় শান্তশিষ্ট ছোট মেয়েটির মত নির্বিচারে নিঃশেষ করিয়া একঘটি জল পান করিয়া উঠিয়া পড়েন। আহার সম্বন্ধে কখনও একটা সাধ আহ্লাদ কেহ দেখে নাই। যে-মন লইয়া নিমন্ত্রণে বসিয়াছেন, ঠিক সেই মন লইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন সাগু-বার্লির বাটি। চিরকালই এইভাবে কাটিল।

বরং নাতবৌয়ের সাধ হইয়াছে, "আজ তোমায় এটা করে দিই দিদিমা,··· মা, তুমি কখনও মুখ ফুটে বললে না তো এটা করে দে, কি সেটা করে দে; তোমাদেরও তো একটা সাধ আহ্লাদ আছে বাছা?"

বৃদ্ধা বলেন, "শোন কথা!—আমার সাধ আহ্লাদের কসুব কি বাছা? আমার কি একটা মুখ? এতগুলি মুখে আমি কত রকম কি খাচ্ছি—রোজই, নিতুই···আমার এই খাওয়াই বজায় রাখুন ঠাকুর···এই বুড়ো বয়েসে নিজের নোলা নিয়ে থাকব গা?—কি ঘেন্নার কথা!···"

সেই লোক বেশ একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। আহারে রুচি নাই। অমন মেজাজ, অত হাসিখুশি—সব গিয়াছে যেন। বেশ একটু খিট-খিটে হইয়া পড়িয়াছেন। বধূ যতটা পারে পরিচর্যা করে, কিন্তু একাদিক্রমে বরাবর তো বসিয়া থাকিতে পারে না। নাতনি বড় একটা ঘেঁসে না, কখনও আসিয়া একটু পা'দুটা টিপিয়া দিল, কি গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, তাহার পর একটা ছুতানাতা করিয়া সরিয়া পড়িল।—সে এখন একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপ কুড়াইয়া বেড়াইতে চায়, একটু সরস আলোচনা চায়। কি করিবে? ভালই বল, চাই মন্দই বল—বয়সের ধর্মই এই!

কাছে কাছে থাকে নাতির ছেলেটি। আর সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বুড়ির কোন গোল থাকে না। সে থাকিলেই ক্রমাগত গজ-গজ চলিতে থাকে— অনুযোগটা চলে মেয়ে-জামাই লইয়া—আজ এ যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইত তো কি এভাবে ফেলিয়া তীর্থ করিতে যাইতে পারিত? হাজার কর মেয়ে মেয়েই;

জামাই জামাই-ই—কথায় বলে—জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা…হ্যাঁ, নিজের পেটের মেয়েই পর হল, নাতি-নাৎবৌদের ভরসা!—স্বর্গে বাতি দেবে!…

বধূ বোঝে—ছেলে কাছে নাই, এত কথার মূলে ঐটুকু, কেন না ছেলে, জামাই, নাতি, নাতবৌ নাতনি সব ঐ নাতির ছেলেটিতে জমা হইয়াছে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলেটিকে বসাইয়া আসে। বলে, "আমি এই এলাম বলে দিদিমা—ঠাকুরপোর ভাতটা বেড়ে দিয়ে" কিংবা—"তোমার নাতির জামাটায় বোতাম ক'টা বসিয়ে এক্ষুনি এসে বসছি…"

হয়তো আসিতে পারে না। ঐ বোতাম সেলাই-ই একটিমাত্র কাজ হয় তবে তো? আবার কাজের চেয়ে অকাজের হিড়িক আরও বেশি। খুকির পা হওয়া পর্যন্ত মাকে হেঁসেল থেকে পূজোর ঘর পর্যন্ত সর্বত্রই সাহায্য করিতে সদা ব্যস্ত—কোথায় কোন্ ঘটনা ঘটাইয়া বসিয়া আছে কে জানে? নাতবৌ-এর অনুপস্থিতিতে কিন্তু ক্ষতি হয় না। খোকা আসিলেই সব ঠিক হইয়া যায়। কথার অফুরন্ত প্রবাহ আরম্ভ হইযা যায। সে-সব কথার অবশ্য মাথামুণ্ডু কিছুই থাকে না—এমন কোন কথাই থাকে না, সংসারের অভিধানে যাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহা না থাক, কিন্তু অনর্থ থেকে বাঁচায় এই সব কথা,—বধূ নিশ্চিন্ত থাকে।

সংসারে প্রয়োজনের মূল্য বেশি, না অপ্রয়োজনের?—মনে হয় দুই-ই তুল্য-মূল্য। প্রয়োজনের সংসার সে তো অপূর্ণ, তাহাকে পূর্ণতা দিয়াছে অপ্রয়োজনের বিলাস। জীবনকে ঘিরিয়া আছে শৈশব আর জরা—যেমন দিনকে ঘিরিয়া আছে উষা আর সন্ধ্যার স্বর্ণরাগ। দুই-ই অপ্রয়োজন কিন্তু এই দুই-ই দিয়াছে পূর্ণতা।

৩

হারাধন ডাক্তার আবার আসিয়াছিল, উপসর্গ এখনও কিছু পায় নাই; তবে অরুচির কথা শুনিয়া বলিল, ওটা ভাল লক্ষণ নয়। অনাহারে শক্তিহ্রাস হইতে হইতে শেষে রোগিণী বে-এক্তিয়ার হইয়া যাইবে। বলিয়াছে গুরুপাক না হয় এবং অধিক আহার না করিয়া ফেলেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মুখরোচক পথ্য তৈয়ার করিয়া দিতে। ডাক্তারেরা সব বয়সের রোগীকে এক নজরে দেখে না। সোজা না বলিলেও পাকে-প্রকারে বুঝাইয়া দিল—মুখরোচক করিতে গিয়া যদি একটু হয়ই গুরুপাক তো বিশেষ আপত্তি নাই তাহার। আর চাপ হওয়ার ভয়ে

নিক্তির ওজনে খাওয়ানোরও দরকার নাই। মোট কথা, পথ্য সম্বন্ধে আর কোন বাধাবিঘ্নই রহিল না। নাতবৌ ময়ান না দিয়া লঘুপাক করিয়া খানকতক লুচি প্রস্তুত করিল, অল্প ঘৃত দিয়া একটু হালুয়া তৈয়ার করিল। দিদিশাশুড়ির সামনে ধরিয়া বলিল, "নাও, ছুখানা মুখে দাও দিকিন দিদিমা। আজ আর সাবু আনি নি···নাও, ওঠ একটু।"

ঠিক দেড়খানি লুচি, আর আধ ছটাক হালুয়া কোনমতে গলধঃকরণ করিয়া বৃদ্ধা মুখ ঘুরাইয়া বসিলেন। নাতবৌ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"ওকি হল! এ রকম করে খেলে আর ক'দিন টেঁকবে —বিছানার সঙ্গে যে মিশে গেছ দিদিমা!"

বৃদ্ধা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "আর টেঁকা! একেবারে ভাল লাগছে না বৌ এসব।"

"কি ইচ্ছে করে খেতে তাই না হয় করে দিই দিদিমা, ডাক্তারে তো সবই খেতে বলেছে—বেশি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে?"

"না বাছা, মিষ্টির নামে গা ঘিন ঘিন করছে।"

"তেতো?—তেতোটা ভালও তোমার পক্ষে। বল তো উচ্ছে দিয়ে ভাল করে শুক্তো করে দিই না হয়?"

"মুখ যেন আপনিই তেতো হয়ে রয়েছে···"

"নোন্তা?—খানকতক শিঙাড়া দোব করে দিদিমা? দিই না!"

"রক্ষে কর বাছা—নুনের দিকে যেন চাইতে ইচ্ছে করছে না!"

"তবে কি করব? টক ঝাল তো দেবে না ডাক্তারে—আমি তিন রকমেই করে রাখব দিদিমা, যেটা ভাল লাগে মুখে দিতে হবে। না দিলে চলবে কেন গা? গায়ে একটু বল পাওয়া চাই তো। এই ওষুদ গেলার মতন করে একটু দুধ খাও, ওতে আর কি হবে বল?"

"ওতেই ঢের হবে। আমার মেয়ে-জামাই যেমন ছেড়েছে, যমেও তেমনি ছেড়েছে বৌ; তোদের ভয় নেই।···খোকাটা গেল কোথায়?—ডাক দিকিন। খুকুর হাতে দিয়েছিস একখানা লুচি?"

খোকাকে ডাকিতে হইল না। আহার্য সম্বন্ধে তাহার একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে, তিন ক্রোশের বাহির হইতেও টের পায়। আসিয়া উপস্থিত হইল মা বলিল, "জুটেছ গন্ধ পেয়ে? বসতে পার না বড়মার কাছে একটু? পিসিমা কোথায়—খুকুটাকে নিয়ে পাড়া-বেড়াতে গেছে বুঝি?—একটু আক্কেল থাকতে হয় তো মানুষের? যেমন পিসি তেমনি ভাইপো।"

দিদিশাশুড়ি একটু খিঁচাইয়া বলিল, "তুই আগে দে তো ওর হাতে দুখানা। এসে বেচারি যেন ভয়ে জবু-থবু হয়ে দাঁড়াল। পরের আক্কেল দেখতেই ব্যস্ত!"

খোকা আগাইয়া আসিতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে আসিল যেন; হাতটা তুলিতে গন্ধটা আরও তীব্র এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মা বিস্মিতভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিযা প্রশ্ন করিল, "আচারের গন্ধ যে তোব গাযে হাতে রে খোকা!"

খোকার বছর চারেক বয়স হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোটাকতক ব্যঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই; সেই জন্য তাহাকে বয়সের অপেক্ষাও শিশু এবং অত্যন্ত নিরীহ মনে হয়। ভীতভাবে চাহিয়া বলিল, "ডাঃ, আমিটো ঠাই নি।"

"না, ঠাও নি! তবে গন্ধ ভুর-ভুর কচ্ছে কিসের?—হাঁ কব তো দেখি।"

খোকা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বড়মার দিকে চাহিল। তিনি একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "একখানা লুচি হাতে দিবি কি না দিবি;—তা ডেকে ছেলেমানুষকে অত শাসন করবার কি দরকার র‍্যা? আ গেল যা—যা খেল্‌গে যা—আর হাঁ করে বেয়াকুব হতে হবে না।...আচার আচার একটা যেন রব উঠেছে—ঝি আচাব চুরি করছে, মেয়ে আচার চুরি করছে, ঐ দুধের ছেলে আচার চুরি করছে—কোন্ দিন বলবি আমিও মরবার সময় তোদের আচার চুরি করে যমের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করছি!"

বধূ বলিল, "তুমি রাগ করছ দিদিমা, কিন্তু সত্যিই ভ্যাক করে আচারের গন্ধ বেরল ও আসতেই, তাই বললাম। আচারগুলো খেটে খুটে করলাম অথচ যেন উবে যাচ্ছে। কে যেন সরাচ্ছে, কোনমতেই ধরতে পারছি না। কাঁচা-মিঠে আমের সেই মিষ্টি আচারের শিশিটাই পাওয়া যাচ্ছে না। ও-আম পাওয়াই যায় না, অনেক কষ্টে গুটি-কতক যোগাড় করেছিলাম।...ছেলেমানুষ দেখতেই দিদিমা, কোন গুণে ঘাট নেই। আমি নিশ্চিন্দি থাকি তোমার এখানে রয়েছে, আর..."

বুড়ি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া গেল। অর্ধ-শয়ান হইয়া উঠিয়া বলিল, "তোর যদি এই সন্দেহ হয়ে থাকে বৌ যে আমি তোর ছেলেকে চুরি-বিদ্যা শেখাচ্ছি তো নিয়ে যা এখান থেকে। দিস নি থাকতে আমার কাছে।...অপরাধের মধ্যে বলেছি ওই দুগ্ধপুষ্যি শিশু ও চুরির কি জানে? তা তুই কত কথাই না শোনালি আমায়। ছেলেটা যে আসে কাছে সেটা তোদের পছন্দ নয়। আমার কাছে এসে বিগড়োয়, নিয়ে যা সরিয়ে। আমি জানি শিশুর মন দেবতার মন, ওদের মনে পাপ ঢোকে নি; তোর যদি সন্দেহ মিছে কথা বলছি, তোর যদি বিশ্বাস ও করেছে চুরি, নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌গে, তবে আমার চোখের সামনে আর

শাসন করিস নি। যা নিয়ে যা, যা খোকা, আর আমার কাছে আসিস নি ; বলে নিজের মেয়েই যার ভুললে, তার আবার নাতি-নাতকুড়ের ভরসা!"

দিদিমাকে এতটা চটিতে কখনও দেখা যায় নাই। প্রবল উত্তেজনায় বালিসে বুক চাপিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। নাতবৌ কিন্তু বিস্মিত হইল না, আসিয়া পাশে বসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বলিল, "আমারই ভুল হয়েছে দিদিমা, তুমি চুপ কর, কাহিল হয়ে পড়বে। সত্যিই তো, কচি ছেলে ও চুরির কি জানে গা!"

চোর তাহা হইলে ধরা পড়িয়াছে। বড়মাকে ঠাকাক, কিন্তু মা ঠকিবার বান্দা নয়, এখন ভাল করিয়া সব কথা বাহির করা দরকার। এত আচার যায় কোথায়? সরায়ই বা কখন? বড়মার পাশের ঘরটিতে আচার থাকে একটি কুলুঙ্গিতে, তেপাই কি জলচৌকির সাহায্য না লইয়া খোকার কর্ম নয় আচারে হাত দেওয়া। বড়মার প্রায় চোখের সামনেই খোকা এতটা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে এর মধ্যে অন্য লোক আছে, আর খোকা আছে তাহার সহযোগিতায়। বড়মার তন্দ্রা নিদ্রা বা অন্যবিধ সুযোগে সে খবর পৌঁছায়, মূল তস্কর আসিয়া চুপিসাড়ে কার্য সিদ্ধ করিয়া সরিয়া পড়ে। এই মহামতিটি কে? এ-বাড়ির ঝি? ও-বাড়ির নন্দলাল? ছেলেটি আসিয়া খোকা আর খুকিকে লইয়া প্রায়ই ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাহা ভিন্ন আচার সম্বন্ধে একটু দুর্বলতাও আছে, বধূ যখন আচার তৈয়ার করিতে বসে, টের পাইলে খানিকটা আদায় করা চাই। ও-বাড়ির ঝি-মাগিটাও হইতে পারে; কিংবা এও হইতে পারে, দু-বাড়ির দুই ঝি আর নন্দলাল সবাই এর মধ্যে আছে, সুযোগ অন্বেষণের জন্য খোকাকে ঘাঁটিতে বসাইয়া রাখিয়াছে, মাঝে মাঝে ঘুসটা-আসটা দেয়। না, সন্ধান লইতে হয়, কিন্তু দিদিশাশুড়ির সমক্ষে সে হওয়া অসম্ভব,—মেজাজ অসম্ভব রকম খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই খোকাকে আহার করাইয়া দেওয়া হয়। নন্দ ওঘরে দিদিশাশুড়ির কাছে আছে। শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া বধূ খোকাকে খাওয়াইয়া দিতেছিল। সকলেই জানেন ব্যাপারটি বেশ আয়াসসাধ্য। মায়ের বাক্‌চাতুরীর যত শক্তি এ-অবস্থায় কাজে লাগাইতে হয়। মা অন্নের গ্রাস পাকাইয়া রাখিয়া বলিতেছিল, "নাও। আমি এই ভাগ করে দিচ্ছি—এই এটা

আম, এটা জাম, এটা সন্দেশ, এটা হল চন্দ্রপুলি, এটা…এটা…" ছেলে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "শাশুডির মাটা মা ?

ওটা ছেলের দৈনিক আহার্য, মারই সন্ধান দেওয়া, তবে আজ মনে পড়ে নাই, বলিল, "হ্যাঁ, শাশুডিব মাথা। খেয়ে নাও দিকিন শীগগির করে। তবে তো জোব হবে, তবে তো ঘোড়ায় চডে খুকুকে শ্বশুরবাডি পৌছে দেবে। খেয়ে নাও…কী লক্ষ্মীই হল খোকা আমাদের গা !…"

খোকা একটি গ্রাসের অর্ধেক শেষ করিয়া গভীরভাবে একটু টানা সুরে অত্মপ্রশংসা কবিল, "কেমন আটাব টুরি করে না !…"

মা হাতে একটা গ্রাস তুলিতেছিল, ছেলের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিযা উঠিল। কেমন যো বুঝিয়া নিজের দোষ স্খালন করিয়া লইতেছে ধূর্ত ! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—এই ছেলেরই মা তো ! গ্রাসটা বাখিযা দিয়া পিঠে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "হ্যাঁ, কেমন আচার চুরি করে না ! খোকা কি আমাদের চোর ? চুরি করে তো ঝি, নন্দ ; না খোকামণি? ঝিযেব নোলা খন্তি দিয়ে পুডিয়ে দোব'খন, ছ্যাঁক করে উঠবে, কি বল খোকা ? …নাও।"

খোকা গ্রাসটা মুখে লইয়া মাথা নাড়িয়া ছ্যাঁকা দেওয়ার দণ্ডটা অনুমোদন করিল।

মা বলিল, "খোকা আমার লক্ষ্মী, আর যত চোবেরা খোকাকে দুষ্টু করতে চাইছে, না খোকা ?"

খোকা বড ভাল ছেলে হইয়া পডিয়াছে , খুব জোরে মাথা নাড়িল, অর্থাৎ হ্যাঁ সে লক্ষ্মী এবং চারিদিক থেকে ক্রমাগত তাহাকে দুষ্টু করিবাব ষডযন্ত্রই চলিতেছে বটে।

কি যেন একটু ভাবিল এবং তাহার পর বড বড় চোখ দুইটা মায়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "বডমা টো টোর নয় মা !"

মা হাসিয়া বলিল, "না, বডমা চোর হতে যাবে কেন ? বডমা খুব লক্ষ্মী, আমার যাদুকে কত আদর করে।"

খোকা নিজের বেলার মত আবার সুর করিয়া বলিল, "কেমন আটার ঠায় না…"

মা একটা গ্রাসের দলা পাকাইতেছিল, থামিয়া গিয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিল। খানিকক্ষণ মনে মনে কি যেন মিলাইয়া মিলাইয়া

দেখিল, রহস্যটা কি পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে? আবার গ্রাসটা তুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "না, খোকা না দিলে বড়মা আচার তো খায় না। ভাগ্যিস খোকা এনে দেয়..."

খোকা একবার সংশয়িত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিল। তাহার পর একটু স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "না, এনে ডিনা টো।"

মায়ে বেটায় বুদ্ধির লড়াই চলিয়াছে।

মা মনে মনে হাসিল। বলিল, "আহা, দেবে না এনে খোকা? বড়মা কত বুড়ো হয়েছে, কত ভালবাসে..."

পুত্র এবার হারিল; তবে একেবারে নয়; বলিল, "হ্যাঁ ডোব।"

"নে, খা; কি করে দিবি খোকা? কুলুঙ্গিতে তো তোর হাত যায় না।"

খোকা একটু পৌরুষের স্বরে বলিল, "ঘোঁড়ায় টড়ে।"

মায়ের মনে পড়িল দিদিশাশুড়ির ঘরে একটি তেপাই আছে, সেটি খোকার কল্পলোকের অভিযানে পক্ষিরাজের কাজ করে। সব বোঝা গেল। দ্বিপ্রহরে যখন সে দিদিশাশুড়ির ভরসায় কাজকর্ম সারিয়া একটু বিশ্রাম লয়, ঠিক সেই সময় দিদিশাশুড়িরই প্ররোচনায় খোকা তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া আচার সংগ্রহ করে। সে আচার যে কি হয় তাহাতেও সন্দেহ রহিল না। যতদিন সামর্থ্য ছিল, নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, অসুখটা তাহারই পরিণাম। নিজে শয্যাধরা হইয়া প্রপৌত্রকে দলে টানিয়াছেন, তাই অসুখেরও বিরতি নাই।...নির্লোভ মানুষ, সত্যই সুসংযত, নির্লোভ, তাহারই মধ্যে এই একটি দুর্বলতা! এ কি বার্ধক্যের শেষ স্পৃহা? না, সারা জীবনের সুকঠোর নিস্পৃহতার অন্তরালে এ দুর্বলতাটুকু চিরকালই ছিল? না, জরায় যে আবার নূতন করিয়া শৈশবকে ফিরাইয়া আনে এ তাহারই নবপরিচয়?...বোধ হয় তাহাই—সেই জন্য আর সবাইকেই ছাড়িয়া দিদিশাশুড়ি খোকাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। কেননা জরার সাথী শৈশবই, জীবন যেখান হইতে যাত্রা করে আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া নিজের বৃত্ত পূর্ণ করে।

পরের দিন সতর্কভাবে দিদিমার বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গদির নীচ হইতে একটি বড় কৌটা আর একটি মাঝারি গোছের শিশি বাহির হইল; কৌটাটিতে দু'তিন রকমের আচার, শিশিটিতে সেই হারানো কাঁচা-মিঠা আমের মোরব্বা। বধূ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, এইভাবে বলিল, "দেখছ খোকার কাণ্ড দিদিমা! তোমার চোখে ধূলো দিয়ে...এই দেখ...তাই তো বলি!..."

বিশ্বাসে মন দিয়ে শুনবে, না কেবলই আমার প্লটের ফাঁকি ধরে ফেলবার চেষ্টা। যখন সত্যিই কোন গল্প হাঁকড়াই, তখন এটা সহ্য করা যায়; কিন্তু যখন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছি, তখনও যদি—"

তারাপদ বলিল, "এতে অভিমানের কিছু নেই, এ তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা লেখকেরা সামান্য অভিজ্ঞতাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সচেতন, অচেতন, অবচেতন নানা রকম জিনিসের দোহাই দিয়ে এমন একটা জিনিসে দাঁড় করাও যে, তোমরা যে কখনও সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে।"

সুধেন বলিল, "ও বেচারাদের মুশকিল আছে, সত্যের যথাযথ রূপ বজায় রাখলে ওদের পেট চলে না। তোমরা চাও রস, সত্য কথায় তা মোটেই নেই। যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জীবন আগাগোড়া দেখে গেলে মাত্র একটিবার রস বা রসিকতার সন্ধান মিলবে—যখন তিনি 'ইতি গজ' বলেছিলেন। অবশ্য কখনও রসের অপব্যয় করেন নি বলে রসিকতাটা একটু মারাত্মক রকম হয়ে জমে উঠেছিল।··· নাও শৈলেন, এই চমৎকার রাত্রের উপযোগী একটা গল্প ফাঁদ—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় ভালই, গাল-গল্প হক আরও ভাল, এই ভূতুড়ে রাত্রির রুদ্র রসে আমরা একটু ডুবে থাকতে চাই।"

সুধেন র‍্যাপারটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল।

শৈলেন বলিল, "নাঃ, মিথ্যেবাদী বলে ক্রমেই যে রকম বদনাম হয়ে যাচ্ছে, সত্যিকার অভিজ্ঞতাই একটা বলি।"

সুধেন বলিল, "আমার গা শিউরনো চাই কিন্তু। সেইজন্যে আমি গা আর মন দুটোকেই মুড়ি দিয়ে তোয়ের হয়ে বসেছি।"

শৈলেন বলিল, "যাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় করে সংজ্ঞালোপ করে দিয়েছিল, তাতে তোমার গায়ে একটু কাঁটাও জাগাতে পারবে না, এতবড় বীর তোমায় আমি মনে করি না।"

একটু চুপচাপ গেল; অলৌকিক গল্পের উপক্রমণিকা হইতেছে মৌনতা। গল্প বলিবার বা শুনিবার আগে লোকে যেন অনুভব করে, সে একটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করিতেছে, চকিত হইয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়ায়।

শৈলেন দূর ভবিষ্যতে কোথায় যেন একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

"ব্যাপারটা ঘটে ছোটনাগপুর সাইডে একটা জায়গায়—একটা ডাক-বাংলোয়। জায়গাটার নাম আর খুলে বললাম না। রাঁচি থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো রাস্তা অনেক দিকে চলে গেছে, তারই একটার একটা ডাক-বাংলোর কথা বলছি। আমার তখন তিন বছরের জন্যে বনবাস,—ফরেস্ট রেঞ্জারের চাকরি নিয়েছি, একটা জঙ্গলের চার্জ নিতে হবে।

"মোটর-বাসে চলেছি। শীতের সময়, বেলা প্রায় চারটের সময়ই দিন মলিন হয়ে এল। দূরে আকাশের কোলে এমুড়ো-ওমুড়ো একটা লম্বা পাহাড়ের রেখা আমাদের মোটর এগুবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, যেন বিরাটকায় কি-একটা এতক্ষণ শুয়ে ছিল, আমাদের এগুতে দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠছে। ঐ পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভয়, আগ্রহ, বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা কৌতুক বোধ করছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের নীচে পৌঁছে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। যখন প্রায় শিখরদেশে পৌঁছেছি, মোটর গেল বিগড়ে। সারতে দেরি হবে, রাত্রি হয়ে যাবে। সান্ধ্য পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্যে আমি মোটর থেকে নেমে খানিকটা তফাতে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। পেছনে রয়েছে একটা খাড়া শিখর, সামনে গভীর খাত,—খুব গাঢ় জঙ্গলে ঢাকা বলে আরও গভীর মনে হচ্ছে। প্রথমটা বেশ লাগছিল, কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া যত গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনটার ওপর জেঁকে বসতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ, রহস্যময়। অত বড় একটা বিরাট ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর অসহায় বলে মনে হতে লাগল। কি যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব,—যদি পাহাড়ের ওপর কোন সন্ধ্যা বা রাত্রি না কাটিয়ে থাক তো বুঝতে পারবে না। অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল যে, যে বিরাটকায় জীবটা খানিকটা আগে আমাদের দেখে জেগে উঠেছিল, তারই গর্ভে আস্তে আস্তে জীর্ণ হয়ে চলেছি। এই আতঙ্কের মধ্যে যখন মগ্ন হয়ে রয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে আগুনের ভাঁটার মত প্রকাণ্ড দুটো চোখ জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তলুব্ধ জন্তুর গর্জনের মত এমন একটা উৎকট আওয়াজ চারিদিক কাঁপিয়ে উঠল যে, আমার পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি সেই পাথরের ওপর থেকে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে—"

সুধেন একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিল, "ভাঁটার মত চোখ নিয়ে চিৎকার করে উঠল? তোমার কল্পনার অজগর বাস্তব হয়ে পড়ল নাকি?"

শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল, "তখুনি নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা আসলে এই যে,—মোটর তোয়ের হয়েছে, ইলেকট্রিক হর্ন দিয়ে হেড-লাইট জ্বেলেছে, সামনের একটা পাথরের গায়ে তার আলো ঠিকরে পড়েছে।

"হাসি পেল—ভয়ে এমন তন্ময় করে সব ভুলিয়ে দেয়!—এক্ষুনি যে কোন্ অতলে তলিয়ে যেতাম!

"মোটরে এসে উঠলাম। পাহাড়ে পথ দুই চক্ষু দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঘুরেফিরে মোটর নামতে লাগল।

"কেন জানি না, ঐ যে সন্ধ্যায় কেমন একটা অহেতুক ভয়েব ছাপ মনের ওপর পড়ল—কোনমতেই যেন তা কাটতে চায় না। আমায় যে আজকেব রাত্রিটা একলা একটা ডাক-বাংলোয় কাটাতে হবে—এই চিন্তাটা আমায় পীড়া দিতে লাগল। বরাবরই কেমন যেন অন্যমনস্ক আব মনমবা হয়ে বইলাম। বিপদের ওপর বিপদ, মোটর আব একবাব বাগড়া দিলে, আরও প্রায় কোযার্টাব তিনেক গেল। পাহাড় থেকে যখন নামলাম, তখন দিব্যি রাত হয়ে গেছে। যখন ডাক-বাংলোর সামনে পৌছলাম, কব্জি উল্টে হাত ঘড়িতে দেখি, সাড়ে-ন'টা। শীতের সাড়ে-ন'টাকে গভীব রাত্রিই বলতে হয়, সে নিশুতি আবেষ্টনীর মধ্যে প্রায় দুপুর বাতের সামিল।

"ড্রাইভার কয়েকবার ঘন ঘন হর্ন দিলে। কোন সাড়া নেই। ড্রাইভাব বললে, 'মোটর প্রায ঘণ্টা চারেক লেট হয়ে গেল, কীপার গ্রামে চলে গেছে নিশ্চয়, অবশ্য যাওয়া বেটার উচিত হয় নি। ওর ডিউটি হচ্ছে মোটর দেখে নিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া, কোন লোক না নামলে—'

"খাতির কবে আমার বাক্স, বিছানার গাঁটরি আর স্যুটকেসটা ডাক-বাংলোর বারান্দায় এসে রেখে দিলে। বললে, 'আপনার টর্চ রয়েছেই, একটু দূরেই গ্রাম, সেখানে গেলেই তারা কীপারকে ডেকে দেবে। কিন্তু বাবু...' কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

"প্রশ্ন করলাম, 'কি?'

"ঐই সময় মোটর থেকে তাগাদার হর্ন বেজে উঠল।

" 'না, কিছু নয়। মানে, এখানকার যে কীপার...'

"আবার তাগাদা হওয়ায় তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললে,—একলা মানুষ, তা ভয় পাবার কিছু নেই এমন।'...কিছু বলতেও পারলাম না; প্রায় ঘণ্টা তিন-চার লেট যাচ্ছে, তায় নিজে হতেই একটু খাতির করলে। আর বলবার ছিলই

বা কি ? মোটরটা চলে গেল। যতক্ষণ তার একটুও আওয়াজ শোনা গেল, কান পেতে রইলাম, একবার একটা শেষ হর্নের পর একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল,—যেমন দপ করে একবার জ্বলে উঠে প্রদীপ নেবে, আওয়াজটাও সেই রকম একটা আর্তনাদ করে যেন নিবে গেল। নির্জন বাড়িটার বারান্দায় আমি নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা চারিদিকে পরিষ্কার, বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। দৃষ্টির সীমার বাইরেই নিবিড় অন্ধকার, ডান দিকটায় অন্ধকার যেন আরও এক পোঁছ ঘন. যেটা পেরিয়ে এলাম, সেই পাহাড়টা আর কি।

"বেশ গুছিয়ে ভাবতে পারছি না। টর্চটা জেলে গ্রামের দিকেই যাব ? কিন্তু কোন্ দিকে গ্রাম ? যদি আন্দাজে ঠিক যাই তো হয়তো পাশেই পাব, যদি ভুল দিকে পা বাড়াই তো বোধ হয় এমন দু-চার মাইল গিয়েও মানুষের চিহ্ন পাব না, দেখে তো আসছি সমস্ত দিন, নিতান্ত বিরল-বসতি দেশ।

"রক্ষকটা সম্বন্ধে ড্রাইভার কি বলতে চাইছিল ?—থেমেই বা গেল কেন ?...

"কি করব না করব, কিছুই ঠিক করতে না পেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর কি মনে করে পা বাড়াব, পায়ের পেছন দিকটায় একটা লম্বা ভিজে টানে আচমকা শিউরে উঠলাম। ফিরে দেখি, একটা খুব বড কালো কুকুর। তাড়াতে গিয়ে আরও শিউরে উঠলাম হঠাৎ মানুষের আওয়াজ শুনে, কাছেই, বারান্দায় কোণের কাছটায়। কুকুরের খটকাটা সামলাতে না সামলাতেই হঠাৎ এটা কানে যাওয়ায় একটু অভিভূত হয়ে উঠেছি, এমন সময় কুকুরকে শাসাতে শাসাতেই একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, সামনে এসে সেলাম করে বললে, 'ও কিছু বলবে না হুজুর।...মোটর আজ আপনাদের খুব দেরি হয়ে গেল, কিছু দুর্ঘটনা হয়েছিল নাকি ?'

"লোকটার খুব বয়েস হয়েছে বলে মনে হল, আর আশ্চর্য রকম রোগা। এত রোগা যে, চলছে তা মাটিতে পায়ের আওয়াজটুকু হচ্ছে না যেন। গায়ে প্রায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া একটা সাদা কম্বল। আঙুলগুলো এত শীর্ণ আর অস্থিসার যে, মনে হচ্ছে, যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। মোটর ছাড়ার পর থেকে যে একটা কেমন ছমছমে ভাব মনে লেগে ছিল, মানুষ দেখে সেটা যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যাওয়া তো দূরের কথা, বরং বেশ একটু বেড়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না ; উত্তর দেওয়াই হল না বলা ঠিক। তাকে আড়চোখে একটু ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে বললাম, 'চাবি খোল।'

"এইযে, খুলি।' বলে আমার আর দোরের মাঝখানটায় আমার দিকে পেছন করে দাঁড়াল আর একটু ঝুঁকে যেন কোমরের চাবিটা তালায় লাগিয়ে দিয়ে তালাটা খুলে ফেললে। দরজা দুটো ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যান। আমি বাক্স-বিছানা নিয়ে আসছি ভেতরে।'

"তালা খুলল বটে, কিন্তু আমার যেন মনে হল, কোন শব্দ হল না। যা হোক, অতটা গ্রাহ্য না করে আমি বললাম, 'তবেই হয়েছে, তোমায় যেমন সবল দেখছি…'

"লোকটা হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

"আমায় কথাটা বলেই বারান্দায় মোটগুলোর দিকে চলে গিয়েছিল বলে ওর মুখটা দেখতে পেলাম না বটে, তবে হাসির আওয়াজটা কানে একটু নতুন ধরনের ঠেকল। যেন, মুক্ত মাঠের ওপর দিয়ে যে একটা কনকনে হাওয়া হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে, তারই একটা ঝলক ঘরের মধ্যে ঢুকে তরঙ্গিত হয়ে আবার কোন্ পথে বেরিয়ে গেল। হাসি, কিন্তু ঐ হাওয়ার মতই সুখহীন আর কনকনে, আমার হাড় পর্যন্ত যেন হিম হয়ে গেল।

"ভয়ের এত সামনাসামনি কখনও হই নি, কিন্তু নিরুপায় ; আর নিরুপায় বলে জবরদস্তি একটা ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করলাম—না, নিশ্চয় মানুষ! নিজের মনকে ধিক্কার দেওয়ারও চেষ্টা করলাম—দেখ তো, কথা কইলে একঝুড়ি, মোট আনতে গেল, মানুষ নয়?

"টর্চটা জ্বেলে ঘরে ঢুকে একবার দেখে নিলাম। বেশ বড় ঘরটা, টর্চ ফেলতে আলোটা সামনে একটা খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতর দিকে আর একটা দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল, অর্থাৎ এই ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর আছে, ছোটই বলে মনে হল। বাক্স-বিছানা আনার কোন শব্দ না পেয়ে ফিরে টর্চ ফেলে দেখতে যাব, দেখি সবগুলি ঠিক পেছনে জড়ো করা রয়েছে।…সুধেন, কি রকম লাগছে?"

ডাক শুনিয়া সুধেন একটু চমকিয়া উঠিল, একেবারে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল আর কি। সামলাইয়া লইয়া বলিল, "বেশ ; এত হাতের কাছে যে ভূতকে পাব, কল্পনাও করতে পারি নি। আর এত স্পষ্ট ভূত যে, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন সাহিত্যিক গল্পের অবতারণা কর নি…"

তারাপদ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "হদ্দ একটা গাঁজাখুরি আরম্ভ করেছ। তা সে বরং ভাল। তুমি দুঃখ করছিলে বটে, কিন্তু তোমাদের

সাহিত্যিক গল্পে সর্বদাই একটা যেন ধুকপুকুনি লেগে থাকে। হয়তো যা ভাবছি তা নয়, হয়তো যা হবে মনে করছি ঠিক তার উল্টোটি হয়ে বসবে, হয়তো ঠিক করে রেখেছি এইবার বিয়ে হবে, দু'জনের একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।...নাও, বেশ বিষ্টিটা জমে এসেছে। সেই অত্যন্ত রোগা বুড়োটি নিঃশব্দে অবলীলাক্রমে সেই অত্যন্ত ভারী মোটঘাটগুলো এনে তোমার পেছনে জড়ো করলে। তারপর?"

শৈলেন বলিল, "জিনিসটা বোধ হয় গাঁজাখুরির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, যা প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম আর নিজেব কানে শুনেছিলাম, মাত্র তাই তোমাদের কাছে বলে যাচ্ছি। একটা কথা আমি গোড়াতেই বলে রেখেছি, লুকোই নি, অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যে থেকেই কেমন একটা থমথমে ভাব আমার মনে আধিপত্য বিস্তাব করেছিল—পাহাড়ের ওপরের সেই গম্ভীর স্তম্ভিত ভাব, তারপর সেই জনহীন বাংলোতে সেইভাবে একলা পরিত্যক্ত হওয়া, সেই কালো কুকুরটার নিঃশব্দে এসে পা চেটে দেওয়া, তার পরে আচমকা সেই শীর্ণ লোকটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে আবির্ভাব—সব মিলিয়ে ধারারাহিকভাবে আমার আতঙ্কটা পুষ্ট করে যাচ্ছিল। ওরই মধ্যে আবার লোকটাকে পেয়ে এক-আধ বার একটু সাহসের মত হয়েছিল বোধ হয়, কিন্তু সে ভাবটা স্থায়ী হতে পেল না। হয়তো জিনিসগুলো আনতে, রাখতে শব্দ হয়েছিল। প্রেত ইথারজাতীয় বটে; কিন্তু সে যা স্পর্শ করবে তাও যে লঘু হয়ে যাবে, এমন কথা আমি কোথাও পাই নি। কিন্তু অন্যমনস্ক থাকার দরুনই হোক বা যে জন্যেই হোক, ঘুরে জিনিসগুলোর ওপর নজর পড়তেই মনে হল, কই, শব্দ শুনলাম না তো!

"একটা কথা বলি নি, লোকটা—আমি 'লোকটা' বলেই চালাই—কোনও আলো সঙ্গে আনে নি।

"তিন চারটে জিনিস এল—দিব্যি ওজনদুরস্ত, অথচ একটু শব্দ কানে এল না, আর এসে পড়লও যেন ফিরে না দেখতেই,...একটা বিশ্রী খটকা লাগল। কি বলতে চেয়েছিল লোকটার সম্বন্ধে?—এই নয়তো যে, সে নিজে দূরে থাকার দরুন সব সময় আসতে পারে না, আর...

সেই ফাঁকতালে চিন্তার মাঝখানেই সমস্ত শরীরটা আমার শিউরে উঠল। আবার তখনই সে ভাবটা কেটে গেল, কেন না কড়া টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখছি একটা মানুষ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে; এই শুনলাম কথা কইলে,—স্বরটা হয়তো একটু চাপা, কিন্তু নাকী নয়; এ অবস্থায় সন্দেহও আবার বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনটাকে আবার ধাতস্থ করে নিলাম। বললাম, 'বিছানাটা পেতে

ফেল দিকিন।... আচ্ছা, আগে আলোটা জেলে ফেল। কোথায় আলোটা? টর্চ আর কতক্ষণ জেলে রাখব? জেলে রাখা মানেই তো পয়সা পোড়ানো।' আলাপটা সহজ করে ফেলবার জন্যে এইটুকু রসিকতাও করেছিলাম। লোকটা সেই রকম হি-হি করে হেসে উঠল, বললে, 'না, টর্চ আর আপনাকে বেশিক্ষণ জেলে রাখতে হবে না বাবু—হি-হি-হি-হি...'

"প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা মজা হল, টর্চের চাবিটা টিপে ধরে টর্চটা জেলে রেখেছিলাম, আঙুলটা একটু আলগা হয়ে গিয়ে টর্চটা নিবে গেল। আলগাভাবে ধরে রাখলে স্প্রিং-ওলা টর্চগুলো হয়ই এ রকম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর জলল না, ফিউজ হয়ে গেল।

"বললাম, 'টর্চটা যে খারাপ হয়ে গেলে!'

"অত কড়া একটা আলো নেবায় আরও অন্ধকার হয়ে গেছে, কাউকে দেখতেও পেলাম না, কোন উত্তরও পেলাম না।

"টর্চটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে যাওয়াটা খেয়ালের মধ্যে আনি নি, ও রকম কয়েকবার হয়েছে; কিন্তু উত্তর না পেয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত দুয়েকের মধ্যে এই লোকটা ছিল, অথচ উত্তর নেই কেন? একবার মনে হল হাতটা চালিয়ে দেখি—ঠেকে কিনা কারুর গায়ে; কিন্তু কেন বলতে পারি না, সাহস হল না ও পরীক্ষা করতে। নিজের গলার আওয়াজে নিজের ভয়টা ভাঙবার জন্যে একটু জোর আওয়াজে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায় গেলে?'

"উত্তর নেই। শুধু হাওয়ার শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

"বুঝতে পারছি, শরীরটা ঝিমঝিম করে আসছে। মরীয়া হয়ে আরও জোরে বললাম, 'গেলে কোথায়? তোমায় যে আলো আনতে বললাম! শুনছ, গেলে...'

"হঠাৎ থেমে যেতে হল, আমার নিজের কথার প্রতিধ্বনিতে ঘরটা এমন বোঝাই হয়ে গেল যে, মনে হল, অন্ধকার ঘরটায় কাদের মেলা বসে গেছে। আমার ভয়ে-অতি-সজাগ কানে শোনাল যেন ঘরের চারিদিকে শতকণ্ঠে কারা আমারই কথার ব্যঙ্গপ্রতিধ্বনি করে বলছে, 'গেলে কোথায়?...তোমায় যে আলো আনতে বললাম!...শুনছ?'

"অনুভব করছি, মাথার চুলগুলো যেন কদমফুলের মত খাড়া হয়ে উঠেছে। কি যে করব, বুঝতে না পেরে অসাড় হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর পাশে নজর পড়তে মনে পড়ল, দরজাটা খোলা আছে। একটা চিৎকার করে ছুটে বেরুতে যাব, দেখি সামনের দেয়ালে একটি অস্পষ্ট আলো পড়ল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

লণ্ঠন হাতে পাশের ঘর থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। পাশে জমাট-বাঁধা এক খাবলা অন্ধকারের মত সেই কুকুরটা। ময়লা চিমনি, তেলটা খারাপ নিশ্চয়, খানিকটা ধোঁয়ার নীচে একটা মিটমিটে শিখা জ্বলেছে। গাছের শেকড় যেমন মাটি আঁকড়ে থাকে, সেই রকম ভাবে লিকলিকে কালো কালো আঙুল দিয়ে লোকটা লণ্ঠনের হাতলটা লেপটে ধরেছে। অস্পষ্ট আলো তার কোটরগত চোখে, উঁচু চোয়ালের হাড়ের ওপর পড়ে উৎকট দেখাচ্ছে।...কিন্তু তা দেখাক, রোগা মানুষ, উপায় কি। যা হোক, ভূত তো নয়, ভূতে তো আর আলো জ্বেলে আনবে না। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'তাই বলি, তুমি বুঝি আলো জ্বালাতে গিয়েছিলে?'

" 'হ্যাঁ, আলোটা জ্বেলে নিয়ে এলাম। এবার আপনার বিছানাটা করে দিই। খাবেন কি?'

"বললাম, 'সেজন্যে ভাবনা নেই। টিফিন কেরিয়ারে আমার খাবার আছে, তুমি শুধু বিছানাটা করে দাও।'

" 'কই, আপনার টিফিন-কেরিয়ার তো দেখলাম না!'

" 'সে কি!'—বলে ফিরে মোটগুলো দেখতেই চক্ষুস্থির। টিফিন-কেরিয়ারটা সত্যিই নেই! বিমূঢ়ভাবে একটু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। সরালে নাকি খাবারসুদ্ধ কেরিয়ারটা?

"বললাম, 'বারান্দা থেকে আন নি বোধ হয়। দাড়াও তো দেখি।'

"আলোটা নিয়ে বারান্দায় এলাম, সেখানেও নেই কেরিয়ারটা। লোকটা মোটগুলো ভিতরে নিয়ে আসবার সময় লুকিয়ে ফেলে নি তো? কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব। আমি যতদূর বুঝলাম, ও বাইরে থেকে যেটুকু সময়ের মধ্যে জিনিস তিনটে এনেছে, তাতে একটা জিনিসই আনা চলে না, এর মধ্যে আর লুকোবার সময় পাবে কোথা থেকে? তবুও কেমন একটা জিদ ধরে গেল, সেই কালি-পড়া আলো নিয়ে সমস্ত বারান্দাটা এমুড়ো-ওমুড়ো একবার দেখে নিলাম। না পাওয়াতে আরও রোখ চেপে গেল—নিশ্চয় কোথাও রেখেছে। বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পেছনে গেলাম। একহারা বাংলো, মাঝখানে একটা বড ঘর, দু'দিকে দুটো ছোট ছোট ঘর; সামনের দিকে বারান্দা আছে, পেছন দিকে তাও নেই। বাড়িটার পরেই পরিষ্কার জমি। কোথায় লুকোবে? অথচ টিফিন-কেরিয়ার আমি এনেছি। বাসে একবার পড়ে গিয়ে বাটিগুলো আলগা হয়ে গিয়েছিল, গুছিয়ে ভাল করে বসিয়ে দিলাম। তবে? চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দূরে নজর পড়ায় মনে হল, খানিকটা দূরে—কম্পাউণ্ডের শেষে একটা ঘরের মত

আছে। চোর যেন ধরে ফেলেছি এই রকম উৎসাহ নিয়ে এগুলাম। একটা ছোট্ট ঘরই, শেকল দেওয়া। খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি, একটা কেরোসিন তেলের আধভরা টিন, গোটা দুই আলো, গোটা দুই বালতি; টিফিন-কেরিয়ার নেই। রাগ, কি জিদ, কি নিরাশা, কি ঘরে ফিরে আবার সেই লোকটাকে দেখতে পাওয়ার ভয়—ঠিক বলতে পারি না, তবে এটা বেশ মনে আছে যে, নিশিতে পাওয়ার মত আমি ক্রমাগতই সেই মিটমিটে লণ্ঠনটা হাতে করে বাড়িটার চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলেছি দু'বার, চারবার, পাঁচবার, তারপর আর হিসেব নেই; ঘুরেই চলেছি, মনে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন—আমার খাবার কোথায় গেল? কেরিয়ারের মধ্যে করে আনা আমার খাবার? কোথায় গেল আমার খাবার? ভেতরে ভেতরে কার সঙ্গে যেন একটা তুমুল তর্ক বেধে গেছে—বাঃ, গেলেই হল খাবার?—অত কষ্ট করে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম!

"মাটির দিকে চেয়ে খুব একমনে খুঁজছিলাম। হঠাৎ একবার চোখ তুলতে প্রায় এক রকম আঁতকে উঠলাম, পাহাড়টা যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। প্রথম তাড়সটা কেটে গেলে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি,—পাহাড়ের ঠিক মাথায় সবে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তারই আলোয় পাহাড়ের ওপরের রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠায় মনে হচ্ছে, পাহাড়টা যেন খুব কাছে। কিন্তু অন্যমনস্ক হওয়ায় একটা ফল হল নিজে যে কোথায় রয়েছি জ্ঞান হল! দেখি আলোটাতে আর কিছু নেই, গাঢ় কালির মধ্য দিয়ে একটা ক্ষীণ রাঙা টকটকে শিখা কোন রকমে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ গাটা শিউরে উঠল, হাতে হাত দিয়ে দেখি একেবারে হিম হয়ে গেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ঘড়িটাতে দেখি প্রায় একটা, অন্তত ঘণ্টা তিনেক ঘুরেছি এই ছটাকখানেক বাড়িটার চারিদিকে।—ঘুরে ঘুরে আবার খুঁজেছি!"

শৈলেন একটু চুপ করিয়া সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়া ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

তারাপদ বলিল, "বৃষ্টি দেখছি আজ আর থামবে না।"

সুধেন কহিল, "তোমায় বাহাদুরি দোব, জ্ঞানটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লে না! প্রায় সেই রকমই হয়, লোকে ভয়ের মধ্যে অনেক সময় ঠিক থাকে, কিন্তু ভয়ের ঝোঁকটা কেটে গেলে যখন দেখে কি অবস্থার মধ্যে ছিল, তখন অনেক সময় আর টাল রাখতে পারে না। অনেক সময় মারা পর্যন্ত যায়।"

শৈলেন ধীরে ধীরে যেন আবিষ্টভাবে বলিল, "অজ্ঞান তখনও হই নি, তবে কেন যে হই নি, আমার এখনও আশ্চর্য বোধ হয়। ফিরে এসে দেখি, লোক

বারান্দায় একটা যেন কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হল রাগ, বললাম, 'আমি ঘণ্টা তিনেক—' কি ভেবে কথাটা আর শেষ করলাম না, লোকটা দু'হাতে চোখ রগড়ে' ঘড়ঘড়ে অথচ চাপা স্বরে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবু, ঘুমকাতুরে মানুষ···পেলেন না ?'

"বললাম, 'না।'

"বাসে এনেছিলেন ঠিক মনে আছে ?"

"আমার রাগটা আরও বেড়ে গেল ; হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিতে যাব, তখুনি সম্বিৎ হল—যদি হাত ধরতে গিয়ে শূন্যে মুঠো বাঁধি। কিংবা যদি দেখি, শুধু একটা মড়ার হাড় মুঠিয়ে ধরেছি ! এখন তবুও তো মাঝখানে একটা সন্দেহের ব্যবধান আছে, তখন ? নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'নিশ্চয় এনেছিলাম।'

"বললে, 'আচ্ছা, আপনি ভেতরে যান, নিশ্চয় খুব শীত করছে আপনার।'

"আমার ভুল বোধ হয়, কিন্তু মনে হল যেন ঘরে ঢুকে কপাট দুটো ভেজিয়ে সেই অন্ধকারে আলোর শিষটা উসকে দিয়েছি, এইটুকুর মধ্যেই লোকটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। টিফিন-কেরিয়ারটি সামনে রেখে দিয়ে বললে, 'এই নিন, হি-হি-হি-হি···'

"সেদিন আমি মনের একটা অদ্ভুত অনুভূতির পরিচয় পাই, ভয়ের চরম অবস্থায় আর ভয় থাকে না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, এটা বড ভীষণ অবস্থা, এর একচুল পরেই উন্মাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ; এটা ঠিক বর্ডারল্যাণ্ড। আর সন্দেহ নেই ; বেশ বুঝতে পারছি, হাতখানেক দূরেই প্রেতাত্মা ; তারই সঙ্গে কথা কইছি, বেশ স্পষ্ট দৃঢস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় পেলে ?'

হি-হি-হি করে হাসির সঙ্গে উত্তর হল, 'আপনি যেখানে রেখেছিলেন।'

"প্রতি মুহূর্তেই উৎকট ভয়ের একটা ঢেউ যেন সমস্ত শরীর তোলপাড় করে ভেঙে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই মরীয়া হয়ে রুক্ষ হয়ে উঠছি ; কেমন যেন একটা নেশা চেপে গেছে—যা স্পষ্ট নগ্ন সত্য, তার সম্মুখীন হতে হবে। একটু রূঢ় স্বরেই বললাম, 'রেখেছিলাম মোটর বাসে, সেটা এখন কিছু নয় তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে। সেখান থেকে আনতে হলে···'

"শেষ করতে পারলাম না ; নিজের কথাতেই যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে শরীরটা ভেতর থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে!! পঁচিশ-ত্রিশ মাইল !!!···

"এর পর এইটুকু মনে পড়ে যে, হি-হি-হি-হি করে একটা হাসি ক্ষীণ হতে

হতে একেবারে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল। আর অল্প একটু মনে পড়ে, বরফের মত একটা ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শের অনুভূতি।"

শৈলেন চুপ করিল, মনে হইল, কাহিনীটা বলিতে সে যেন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে তাহার সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিল। এবার বেশ ঘরোয়া কথাবার্তার মত বলিতে লাগিল, "মাঝে অল্প জ্ঞান হয়েছিল কি না মনে নেই; তবে একটু ভাল করে যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়েছে, দেখি আমার চারিদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, আমি একটা বড় ঘরে একটা খাটের ওপর শুয়ে আছি। একজন লোক মাথায়, একজন পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

"পায়ের কাছের লোকটির ওপর চোখ পড়তেই চোখ আর ফেরাতে পারি না। লোকটি হি-হি-হি করে হেসে বললে, 'কিছু ভয় নেই বাবু, রাতে অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? আমি না ধরে ফেললে তো পড়েই যেতেন মুখ থুবড়ে।'

"ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর হুঁশ হল,—সত্যিই তো, না হয় বেয়াড়া রকম রোগাই, কিন্তু এ-মানুষকে অত ভয় পাবার—"

তারাপদ ও সুধেন বিস্ময় আর নিরাশায় এক রকম চিৎকার করিয়াই উঠিল, "মানুষ!"

শৈলেনও ঈজি-চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "তবে তোমরা কি ভেবেছ? রোগা আর খাপছাড়া মানুষ মানুষই নয়?"

দু'জনেই কতকটা অপ্রস্তুতভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শৈলেনের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধেন বলিল, "আবার ঠকালে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর রং ফলিয়ে গল্প!"

শৈলেন বলিল, "তোমরা যে রস চেয়েছিলে সেটা পেয়েছ তো? ডাক-বাংলোর কীপারেই যদি তা পরিবেষণ করতে সক্ষম তো আপত্তি কিসের?"

তারাপদ বলিল, "বেশ, গল্পই যদি, সমালোচনার ধাক্কা সামলাও—মানুষ পঁচিশ মাইল দূরে বাসের ভেতর থেকে টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে এল কি করে? আর-সবই নয় বাদ দিলাম—তোমার মনটা সেদিন ভয়ে খুব high strung ছিল, সবই তার বিকার।"

শৈলেন ক্রমেই বেশি আশ্চর্য হইয়া বলিল, "আনে নি তো অত দূর থেকে!"

"তবে?"

শৈলেন উত্তর করিল, "সে কথা তো ও লোকটা নিজেই বলে দিলে—আমি যেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।"

"কোথায় রেখেছিলে?"

"মোটর থেকে নামিয়ে রাস্তায়।"

তারাপদ, সুধেন শৈলেনের মুখ থেকে দৃষ্টি নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। শৈলেনেব মত অবস্থায় না পডিয়াও যে তাহাব মত ধাঁধায় পডিয়া গিয়াছিল, তাহাব জন্য বোধ হয় লজ্জিত হইল একটু।

জামাইষষ্ঠী

হঠাৎ বিজলীবাতি নিভিয়া গিযা গাডিটা অন্ধকার হইয়া গেল।

এ-লাইনে এ রকম হইযাই থাকে। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া, বইখানি খুলিয়া নিশ্চিন্তমনে পডিতে বসিলে—দপ করিয়া আলোটা নিভিয়া গেল। 'দুত্তোর' বলিয়া হাত-পা ছডাইয়া শুইয়া পডিলে, তেমনি হঠাৎ আলোটা জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের উপর ঠিকরাইয়া পডিতে লাগিল! এ একরকম ফ্যাসাদ আর কি! রেল-বিভাগেব অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি; বেহারী হইলে হাতটা চিতাইয়া নির্লিপ্তভাবে বলে, "জানে হনুমানজি," বাঙালী হইলে উন্টাইয়া প্রশ্ন করে, "এ লাইনের কোন্ জিনিসটা ঠিক চালে চলতে দেখেছেন মশায়?"

কোনটাই ঠিক ভাবে চলিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।

প্যাসেঞ্জাররা নির্বিকার, নির্বিকল্প। থার্ডক্লাসে বসিলে প্রায় শোনা যায়, কঙ্কর সাজিতে সাজিতে কিংবা খৈনিতে তালি দিতে দিতে এখানকার অননুকরণীয় গ্রাম্য হিন্দিতে কেহ বলিতেছে, "আসমানকে বিজলি বাত্ত?"··· ইত্যাদি, অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ—ও তো এমনি দপ করিয়া নিভিবেই, দপ করিয়া জ্বলিবেই,—এ আর কি নতুনটা দেখিলে সবাই!

তডিৎ-বিজ্ঞানের এমন বিশদ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতার দল তুষ্ট হইয়া বলে, "ওয়াজিব—ওয়াজিব" অর্থাৎ—হ্যাঁ, ঠিকই তো···।

দুই বন্ধুতে অনেক দিন পরে দেখা। নৃপেন বলিতেছিল, "সো গ্ল্যাড্! তারপর, খবর কি? শুনেছিলাম কার মুখে যেন যে, এই কলেজেই ভর্তি হয়েছিস। কাছেই থাকি, কিন্তু একবার এসে যে···"

এই সময় আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। ওদিকে গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা

পড়িল ; লাঠি পাগড়ি সমেত এক দল এদেশী লোক সাঙ্গোপাঙ্গদের হাঁক দিতে দিতে, এবং তারই মধ্যে দু'একজন তারস্বরে মকাইয়ের বাজারদর আলোচনা করিতে করিতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই—"ই ভেওড়া বা হো !" বলিয়া জটলা বাঁধিয়া নামিয়া গেল। থানায় আটকানো বন্যার জলের মত মাত্র দুটি লোক অবশিষ্ট রহিয়া গেল।

নৃপেন বলিল, "বিলকুল রেহাই দিলে না,—গেল দু'টোকে ছেড়ে।"

ইণ্টার ক্লাসের গাড়িটা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মে আলো নাই, তায় আকাশে মেঘ, তবু আন্দাজে একটু লক্ষ্য করিয়া দেবেশ বলিল, "না, এরা ভদ্রলোক বলে বোধ হচ্ছে, ভেড়ার দল সবই নেমে গেছে।"

কামরায় তিনটি বেঞ্চ। একটিতে গদি নাই, একটিতে একখানি বিশাল বপু কপট নিদ্রায় সতর্কভাবে নাক ডাকাইতেছে। আগন্তুক দু'টি অন্ধকারে একটু এদিক-ওদিক করিয়া দেবেশের বেঞ্চির এক কোণেই বসিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, "সে যাই হোক, যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি, ছাড়ছি নে। আমার বাড়ি তিনটি স্টেশন পরেই, নেমে অন্তত একটা দিন কাটিয়ে যেতেই হবে। ভাল কথা,—যাওয়াটা হচ্ছে কোথায় তাও তো জিগ্যেস করি নি। পেটে এত কথা হুড়োহুড়ি করছে যে, কোন্‌টে রেখে কোন্‌টে জিগ্যেস্ করব..."

দেবেশ বলিল, "ভাই, যেখানে যাচ্ছি তা যদি তোমায় জানাই তো ভয় হয় নেমন্তন্ন কেটে উল্টে সঙ্গ না নিয়ে বস।"

"কি রকম, কি রকম ?"

"যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি, পুশারোড স্টেশনে ; তোমার আগেই নেমে যাব। আশা আছে নিজে অনভিজ্ঞ হলেও..."

"শ্বশুরবাড়ি!"—বলিয়া নৃপেন বিস্ময়ে একরকম চীৎকার করিয়াই উঠিল। "বিয়ে করলে কবে ? কৈ, ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি !"

"ঠাকুরমার অসুখের কল্যাণে ব্যাপারটা একেবারে হঠাৎ হয়ে গেল। তবু অপরাধ স্বীকার করছি ; দণ্ডাদেশ কর।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিল। পাশে দুইটি ভদ্রলোক আছেন বটে, তবে তাঁহারা নিশ্চয় বেহারী, তাহার উপর অন্ধকারে তাঁহাদের মুখ দেখা না যাওয়ায় চক্ষুলজ্জার বালাই নাই। বিশ্রম্ভালাপ খুব জমিয়া উঠিল। বাধামুক্ত গলা গাড়ির আওয়াজের দুই পর্দা উপর দিয়া চলিল—শ্বশুরবাড়ির কথায় হৃদয়ের দুয়ার একেবারে হাট আছড় করিয়া দেয় কিনা !

নৃপেন হাসিয়া বলিল, "কি সাজা দোব? তোমার কাছে এখন রাজার রাজ্যও তো অকিঞ্চিৎকর।" একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ, দিচ্ছি দণ্ড,—এক একটি মুহূর্ত এখন তোমার কাছে অমূল্য, তাই থেকেই তোমায় মোটারকম কিছু বঞ্চিত করলাম,—অর্থাৎ আমার ওখানেই তোমার আপাতত যেতে হচ্ছে"—বলিয়া আরও জোরে হাসিয়া উঠিল।

দেবেশ জানালার পাতলা আলোর সামনে হাতজোড় করিয়া বলিল, "এই তো হল দণ্ড? এখন আমার স্বপক্ষে একটু আপীল করতে চাই, ভরসা আছে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় নিজে মর্মজ্ঞ না হলেও যুক্তির সারবত্তা দেখে তাঁর কঠিন মন টলবে। তাহলে ধর্মাবতার, প্রণিধান করতে আজ্ঞা হোক।—এই সামান্য দোষে এক মুহূর্তের জন্যও শ্বশুরবাড়ি থেকে বঞ্চিত করা লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে পড়ে, কেননা, ধরার তাপদগ্ধ মানবের একমাত্র চরম সান্ত্বনা এই শ্বশুরবাড়ি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন—ভ্রমর জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত। সব গোবিন্দলালের আপন আপন ভ্রমর সম্বন্ধে এ কথাটা সমানভাবে খাটলেও, তাঁদের নিজের নিজের পিতৃগৃহে সব ভ্রমরই আর অনেকানেকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত খেলো, কেননা তাঁদের চেয়েও এমন সব মধুরতর মধুরতম জীব সেখানে বিহার করেন, যাঁদের মহিমা বর্ণনায় ভাষাও মৌন হয়ে পড়ে। সেখানে থাকেন শালী—তিনি ধরায় স্বর্গ, স্বর্গে অপ্সরা, অপ্সরায় উর্বশী; সেখানে থাকেন শালাজ—তিনি আবার শালীর চেয়েও শক্তিশালী। ধরার আদেখলে জীব আমরা, হদ্দ স্বর্গ আর উর্বশী পর্যন্ত কায়ক্লেশে ধারণা করিতে পারি, সুতরাং এঁদের বর্ণনার চেষ্টা করে কল্পনাশক্তিকে আর অপদস্থ করব না।

"শ্বশুরবাড়ির মর্ম যে শুধু আমরাই বুঝেছি তা নয়; দেবতারাও বাদ যান না। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের জাল দিয়ে ক্ষীর করলে তিনটি বড় বড়তে এসে ঠেকেন…ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা আগে কি রকম ছিলেন বলা যায় না, তবে বার্ধক্যে এসে পিতামহ হওয়া পর্যন্ত চরাচরে শ্বশুরবাড়ি সৃষ্টি করা নিয়ে মেতে আছেন। বাকি রইলেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর; এঁদের শ্বশুরবাড়ি-প্রীতি ব্যাখ্যান করে কবি কি মন্তব্য দিচ্ছেন, ধর্মাবতারের শুনতে আজ্ঞা হোক—

হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে পয়োনিধৌ।
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্॥

"হর, অর্থাৎ মহেশ্বরের শ্বশুরবাড়ি হল হিমালয়ে, তিনি সারা জীবনটা সেই-খানেই কাটিয়ে দিলেন। হরির, কিনা বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়ি হল পয়োনিধি অর্থাৎ

সমুদ্র, কেননা বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মীর উদ্ভব সেইখানেই, তাই তিনি সেইখানেই শয়ন করে কাটালেন। এই সব দেখে-শুনে কবি বলছেন, এই অসার সংসার 'শ্বশুর-মন্দিরম্'ই হচ্ছে সার বস্তু। সুতরাং ধর্মাবতার যদি অধমকে এ-হেন শ্বশুর-মন্দির থেকে বঞ্চিত করেন তো…"

পাশের ভদ্রলোকটি বেশ একটু জোরে গলা-খাঁখারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দেবেশ নৃপেনের গাটা টিপিয়া গলা নামাইয়া বলিল, "বোধ হয় বাংলা বোঝে রে!"

কথাগুলো নৃপেনের লাগিতেছিল ভাল এবং ক্রমে খোদ বন্ধুপত্নীর সরসতর প্রসঙ্গে আনিয়া ফেলিবাব বাগ খুঁজিতেছিল। আস্তে বলিল, "বোঝে তো মাথা কেটে নেবে, হ্যাঃ!" তাহার পব জোরেই বলিল, "এ যুক্তির ওপর তোমায় মার্জনা করা যায় না; বৈষ্ণবিক ভাষায় বলতে গেলে—এহ বাহ্য, আরও কিছু থাকে তো বল।"

পাশের সহযাত্রীটির গলার আওয়াজে যে একটু কুণ্ঠা আসিয়া পড়িতেছিল তাহা আর জমিতে পারিল না। তা ভিন্ন, শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছার চেয়ে বক্তার বলিবার ইচ্ছা কম বলবতী ছিল না। দেবেশ বলিয়া চলিল, "একে তো এ-হেন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, তাতে আবার যাত্রার উপলক্ষটা গুরুতর,…কাল জামাইষষ্ঠী। এই দিনটার দিকে সাধারণ জামাতা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমিও সারাটি বছর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি, যদি বঞ্চিত হই তো আয়ুক্ষয় হবে, আবার একটা বছর বেঁচে থাকবার উৎসাহ হারাব। তিন শ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে ভগবান প্রজাপতি এই দিনটি লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে আমাদের জন্য আলাদা করে দিয়েছেন। এ দেশটা নীরস! এই গাড়ি যদি বাংলাদেশের গাড়ি হত তো আদমসুমারি করলে দেখা যেত, এর শতকরা নব্বই জন জামাই। হরেক রকমের জামাই—সিদে জামাই, কুঁজো জামাই, ঢেঙা জামাই, বেঁটে জামাই, মাকুন্দো আর গুঁপো জামাই, আনকোরা, দোজবরে জামাই—মোটকথা যতরকমের জামাই আজ পর্যন্ত বেরিয়েছে। বাকি দশজন হচ্ছেন শ্বশুর কিংবা সম্বন্ধী জাতীয়—শহর থেকে জামাইষষ্ঠীর বাজার করে ফিরছেন। আহা, চিন্তায়ও সুখ,—বাড়িতে কিংবা হস্টেলে যাকে দিনান্তেও কেউ একবার ফিরেও দে[illegible] না, আছি কি গেছি—সেই নগণ্য জাবার জন্যে শাশুড়ি এতক্ষণ বোধ হয় [illegible]লেহ্যপেয় তোয়ের করতে ঘর্মাক্ত; শালীমহল সুমিষ্ট প্রবঞ্চনার নতুন নতুন [illegible]য় আবিষ্কারে ব্যস্ত। ছোট শহর; সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায় না. শ্বশুরম[illegible] আজ সারাটা দিন বোধ হয় রোদবৃষ্টি মাথায় করে

আমারই রসনাতৃপ্তির জন্যে সারা মজঃফরপুর ঘেঁটে বেড়িয়েছেন—কে জানে বোধ হয় এই গাড়িতেই কোথাও বসে হৃষ্টচিত্তে ভাবছেন—যাক, দিব্যি আমগুলো পাওয়া গেছে, দেবেশ আমার ল্যাংড়া যেমন ভালবাসে !...সে-বেচারির এইতেই ফুর্তি ; দেবেশ ভালবাসে, এইতেই তিনি কৃতার্থ—হাত্তোর বোকারাম রে !

"এইজন্যেই তো গিন্নিকে শাসিয়ে রেখেছি—দেখ, যদি মেয়ে হয় তো তোমায় ডাইভোর্স করব কিন্তু। আমি করব উপার্জন, তার ওপর আবার বাজার করতে পায়ে ঘাঁটি পড়াব, আর সে ব্যাটা জামাই—নবাব খাঞ্জা খাঁ আমার, দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে..."

শেষ হইবার পূর্বেই দু'জনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং পাশের লোক দুটিও অর্ধস্ফুট হাসিতে কাঁপিতে লাগিল। মুখ দেখা না গেলেও দেবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপলোক বাঙলা সমঝ্‌তেহেঁ মালুম পড়তা ; ঠিক হ্যায় কি নেহি কহিয়ে না—হাম মরে কামা করকে, আওর—মেরা দামাদ..."

নৃপেন হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আর যদি জামাই হয়ই তোমার দুর্ভাগ্যবশত ?"

দেবেশ বলিল "তাহলে আমার চেয়ে তাঁরই দুর্ভাগ্য বেশি। বাবাজী যেমন পাঞ্জাবী দুলিয়ে, কোঁচা লুটুতে লুটুতে জামাইমার্কা মৃদু হাস্য করতে করতে লটবর চালে গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রণাম করবেন, অমনি গলাটি টিপে ধরে রাস্তার দিকে মুখটি ফিরিয়ে দিয়ে বলব—যাও, সিদে উল্টোমুখো ; মেয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে, আবার এখানে কি মনে করে সোনার চাঁদ...?"

হাসি চলিতে লাগিল। পাশে দুইটি অপরিচিত লোক—এই চিন্তায় যা বা একটু সংকোচ ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে একেবারেই কাটিয়া গেল। ক্রমশ এ-দুজনের চক্ষে তাহারা রসিক ও সমঝদার হিসাবে যেন দলভুক্তই হইয়া পড়িল। অন্ধকারে বয়সও ভাল বোঝা যায় না, এবং সেইজন্যই সমবয়সী বা কাছাকাছি ঐরকম বলিয়া ধরিয়া লইতেও আটকাইল না। দেবেশ মাঝে মাঝে তাহাদের সাক্ষী মানিতে লাগিল, "ঠিক হ্যায় কি নেহি সাহেব,—কহিয়ে..."

অন্ধকার ভেদ করিয়া এবং নিবিড়তর অন্ধকার গর্ভে পুঞ্জীভূত করিয়া গাড়ি ঠায় চলিয়াছে। এই রহস্যময় আবেষ্টনীতে নব্য জামাতার কৌতুকময় শ্বশুরালয়-রহস্য বেশ একটি অদ্ভুত রসে আর্দ্র করিয়া তুলিল।

নৃপেন বলিল, "আপীলের যুক্তি খুব সারবান বটে ! এইরকম একজন ভাবী শ্বশুরকে তার নিজের শ্বশুর-মন্দিরে যেতে দেওয়া তবেই চলে, যদি তার নিজের

শ্বশুর সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য লগুডহস্তে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি হন। তা তোমার শ্বশুরের মতামত যখন এখানে পাচ্ছি না…"

কণ্ঠস্বরে ভয়ের অভিনয় করিয়া দেবেশ তাড়াতাড়ি বলিল, "না, ধর্মাবতার, মাফ করা হোক, ওটা সাক্ষীর **temporary insanity,** সাময়িক মস্তিষ্ক-বিকার—আপনার মূল দণ্ডের আদেশ শুনে অবধি তার মাথার ঠিক নেই কিনা…আর একটা কথা তোমায় আগে বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই,—প্রফেসার গুপ্টার কল্যাণে তোমার দণ্ড আমি আগে থাকতেই ভোগ করে বসে আছি, আর বল কেন ; না হলে বেলা দেড়টার গাড়িতে কোথায় আলোয় আলোয় আলো করে যাব, না, অন্ধকার রাত্রে এই যমালয়যাত্রার দুর্ভোগ! লোকটা দিলে না ছুটি কোন মতে হে!"

নৃপেন একটু বিরক্তভাবে বলিল, "ওটার কথা আর ব'লো না, একটা বেরসিক ভূত…শ্বশুরবাড়ির নামে অত খেপ্ চুরিয়াস্ কেন রে বাপু! নিজে বিয়ে করলি নি করলি নি, কপালে নেই ; তা ব'লে…"

বাধা দিয়া দেবেশ বলিল, "বিয়ে করলে না! তুমি তাহলে লেটেস্ট দাম্পত্য-বুলেটিন অবগত নও দেখছি ;—আরে গুপ্টা সাহেব যে মুড়িয়েছেন মাথা শেষ পর্যন্ত, তুমি আছ কোথায়! আর দুর্ভাগ্যক্রমে পুশাই হয়েছে তার প্রয়াগ-ক্ষেত্র, তাই তো নেহাৎ শিষ্য-সমভিব্যাহারে যেতে হবে বলে…"

"থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসার গুপ্টা—হুর্‌রে!" অন্ধকারেই হস্তটা তুলিয়া নৃপেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

ও বেঞ্চের স্থূলকায় লোকটি সশব্দ কপট-নিদ্রার মধ্য দিয়া কখন অনাড়ম্বর অকপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল ; হুড়মুড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে জিত্তে-ও?" সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা বুঝিতে পারিয়া আবার শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দেবেশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় মাড়োয়ারী, আজ কলেজ-টাউন ক্লাব ম্যাচে কিছু টাকা ধরে থাকবে…নাও, আর থ্রি চিয়ার্সে কাজ নেই, বেজায় চটেছি লোকটার ওপর। ওর সাবজেক্টে পার্সেণ্টেজটা কম আছে, ভাবলাম, কাজ কি—হাজরিটা একটু দিয়েই সোজা ওই দিক দিয়েই চলে যাব।…কমন রুমে গিয়ে ব্রজেশের কাছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদরটা রেখে তার কোটটা খুলে গায়ে দিলাম ; প্রফেসার্স রুম থেকে গুপ্টা সাহেব বেরুচ্ছে—যথাসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে মাথা নীচু করে বললাম, স্যার, বাবা খবর পাঠিয়েছেন—পিসিমা খুব অসুস্থ—যদি

এটেণ্ডেন্স নিয়ে ছুটি দেন তো দেড়টার গাড়িতে···অবস্থা নাকি বড়ই সঙ্কটাপন্ন —ডিলিরিয়ামে খালি আমার নাম করে···”

“টপ করে কি বললে জানো ?—বললে, ‘তাই তাড়াতাড়ি এসেস্লে বোঝাই হয়ে চলেছ বুঝি ছুটে ?’

“কমন রুমে পাঞ্জাবীটা খোলবার সময় বুক পকেট থেকে রুমালটা পড়ে গেল, তুলে কোটের পকেটে তাড়াতাড়ি গুঁজে নি—অত কি মনে থাকে ?···সব তো বুঝিস বাপু—কে সঙ্কটাপন্ন—কার ডিলিরিযাম বকবার অবস্থা—তায় নতুন বিয়ে কবেছিস, ভাল করেই বুঝিস, দিলেই পারতিস একটু ছুটি, কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ?···সেখানে সে বেচারি হা-পিত্যেশ করে বসে আছে···”

নৃপেন দুঃখের ভান করিয়া বন্ধুর মুখের দিকে হাতটা বাড়াইয়া বলিল “আর ব'লো না, আমি হঠাৎ কবি-বাল্মীকি হযে বুঝি শাপ দিয়ে বসি—মা গুপ্টা প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ···ওঃ, লোকটা কি নৃশংস হে ! তোমায় এই রকম উৎকট আঘাত দিয়ে কোন্ মুখে আবার নিজে শ্বশুববাড়ি যাবে ?”

দেড়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এই যে বিরহ, তাহার আলোচনায় দেবেশেব মনটা তাহাব অজ্ঞাতসারেই একটু ভারী হইয়া পড়িল, ওদিককার বিবহবিধুর মুখখানি বোধ হয় বড় স্পষ্ট হইযা উঠিল ; বলিল, “চুলোয় যাক, তুমিও যেমন ।···পকেটে দেশলাই রাখ ? একটু ধোঁযা খেতে হবে, দেশলাইটা আনা হয় নি ।”

নৃপেন বলিল, “না, আমার ও হাঙ্গামা নেই, তুমিই বা ধরলে কবে থেকে ? —আগে তো খেতে না ।”

সিগরেটের বাক্সটা বাহির করিতে করিতে দেবেশ পাশের লোক দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, “আপলোগ দিয়াশলাই রাখতে হ্যাঁয় ?”

একজন খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাসিল মাত্র, অপর লোকটি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ওদিককার গদিবিহীন বেঞ্চের উপর গিয়া বাহিরের দিকে মুখটা বাড়াইয়া বসিয়া রহিল ।

তাহার গতিবিধিটা এতই আকস্মিক এবং অসঙ্গত যে দুই বন্ধুতেই যথাসম্ভব চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল । দেবেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল, “একেবারে স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ ! তা যাক, বাঁচা গেছে ।” একটু চাপা গলায় বলিল “এখন ইনি গেলে আরও একটু প্রাণ খুলে কথা কই ।···হ্যাঁ, সিগরেট ধরবার কথা জিগ্যেস করছিলে ? ভাই, শ্বশুর-মশাই দেখে-শুনে, অনেক খোঁজখাঁজ নিয়ে দিব্যি

একটি অতীব শান্তশিষ্ট সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন,...পানটি পর্যন্ত খায় না, মাটি থেকে চোখ তুলে কথাটি কয় না, নিরীহ, গোবেচারি, এক কথায় বলতে গেলে ভাজা মাছটি-উল্টে খেতে জানে না। তাঁর মেয়ে কিন্তু এ হেন জামাতা রত্নটিকে একেবারে বিগড়ে দিলে—চারিদিক দিয়ে—মস্তকটি চর্বণ করে দিলে আর কি, অবশ্য ক্রমশ...

"একদিন, কি যে বলে বেশ, একটা ইয়ের জন্যে খোশামোদ করছি—গিন্নী হঠাৎ বেঁকে বসলেন—'অত লক্ষ্মী, ভালমানুষ, তোমার আবার এসব শখ কেন? এদিকে তো চুলটি পর্যন্ত আঁচড়াতে জান না, পানটি খেতে জান না।'

"সদ্য সদ্য প্রাণের দায়ে শ্রীহস্তের একটি পান খেয়ে সে-ঝোঁকটা সামলানো গেল।—অধোগতির প্রথম ধাপ।

"পরের বারে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে, সেলুনে ঢুকে দিব্যি দশ আনা ছ' আনা করে চুল ছাঁটিয়ে নিলাম। মাথায় প্রথম টেড়ি উঠল।

"দেবী প্রথম দিকটা বেশ প্রসন্নই রইলেন। উৎসাহ পেয়ে যখন আবদার খুব বাড়িয়ে দিয়েছি, হঠাৎ পরিবর্তন!

"অপরাধ?"

" 'ছোট পিসেমশাই যখন আসেন, সিগরেটের গন্ধে বেশ মনে হয়—হ্যাঁ, বাড়িতে জামাই এসেছে বটে। আমার সে সাধ মেটবার নয়, আমিও কারুর এ-সব বিদঘুটে সাধ মেটাতে চাই না...'

"কি করব বল?—ধরলাম।—পিস্‌শ্বশুরের টিন থেকে চুরি-করা চারটে গোল্ডফ্লেক আমার ব্রতভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করছিল, শ্বশুরের কন্যা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।...তার পরে গোঁফ জোড়াটির উপর শুভদৃষ্টি পড়ল। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি নৃপেন, আমার অমন যত্ন করে পোষা নিরীহ গোঁফ জোড়াটির ল্যাজ কেটে তাকে এ রকম উগ্র আর তেজী করে তোলবার আমার কখনই ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু কি রকম বেকায়দায় আমায় ফেলে যে...তা যদি শোন..."

"নিশ্চয় শুনব" বলিয়া নৃপেন বন্ধুর দিকে আর একটু ঘেঁষিয়া বসিল; তাহার পর যেন বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এইভাবে বলিল, "কিন্তু তুমি যে ভয় পাইয়ে দিলে হে—ওঁদের মন পাওয়া তো নেহাৎ চাড্ডিখানি কথা নয় দেখছি। বছর ঘুরতে না ঘুরতে শ্রীপাদপদ্মে ভাল ছেলে বলে যে এতদিনকার সুনাম তা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে, ঘাড়ের চুল, গোঁফের মূল বলিদান দিতে হয়েছে—অথচ এখনও আইবুড়োর গন্ধ ভাল করে যায় নি।...আচ্ছা, প্রফেসর গুপ্টা তাহলে কি দিয়ে দেবী-মর্যাদা রক্ষা

করলেন? সে-বেচারির তো গোঁফ-সম্পদও ছিল না, আর সিগরেট তো তাঁর একটা অঙ্গবিশেষই ছিল বললেই চলে…?"

দেবেশ বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি গুপ্টা সাহেবকে দেখ নি এদিকে?—তাঁকে বাবরী রাখতে হয়েছে, চাপদাড়ি আর গোঁফ কালচার করতে হয়েছে—যেন মাঝবয়সের রবিবাবুটি; সিগরেটের পাটই উঠিয়ে দিতে হয়েছে, তার জায়গা নিয়েছে শুদ্ধ, সনাতন পান আর দোক্তা—ভিন্নরুচির্হি স্ত্রীলোকঃ…এখন যদি সামনে গুপ্টা সাহেবকে দেখ তো আর চিনতে পারবে না—সে স্মার্টনেস্ কোথায় গেছে—এখন দেখবে দিব্যি নাদুসনুদুস গেরস্ত—"

"বটে!"

"তবে আর বলছি কি?—তুমি এস না একবার কলেজে, একবার নব কলেবরটি দেখে যাও,—চলে এস একবার…"

অতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না।—

এই সময় গাড়িটি পুশা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিয়া গতিবেগ কমাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে, কি নিগূঢ় কারণে তা হনুমানজিই জানেন,বিজলী বাতি দুটি সমস্ত কামরাটি অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল—সুপ্তোত্থিতের মত যেন একেবারে তাজা হইয়া!

দুই বন্ধুতেই দেখিল—পাশেই, দাড়িগোঁফে আবৃত মুখ, বাবরীর মাঝখানে সিঁথে কাটা, নাদুসনুদুস গেরস্ত গোছের একটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া আছে; মুখের পান চিবানো হঠাৎ বন্ধ করায় গালদুটি ঈষৎ ফোলা, গায়ে শ্বশুরবাড়ির উপযুক্তই বেশভূষা…

চিনিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

পানটা চিবাইতে আরম্ভ করিয়া জড়িত রসনায় কহিলেন, "এই যে দেবেশ দেখছি…ইয়ে, তোমার পিসিমা…মানে, এই গাড়িতেই যাচ্ছ বুঝি?…"

উত্তর দরকার হয় না,—এই গাড়িতেই তো যাইতেছেই, একসঙ্গে আসিতে হইল এতটা; তবুও সম্মোহিতের মত দেবেশ মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসিমার ভারী…ইয়ে, পিসিমার বড্ড…আপনি বুঝি—এই গাড়িতেই?…"

ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াইল।

গদিহীন বেঞ্চ হইতে অপর ভদ্রলোকটি ততক্ষণ উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া দরজামুখো

হইয়াছেন।...সামনে কুলির মাথায় একটা বড চ্যাঙারি, ওপরে বাছা বাছা কটা ল্যাংড়া আম দেখা যায়। দেবেশ ঘুরিতেই চোখোচোখি হইয়া গেল।...

"এই যে বাবাজি...এই গাডিতেই বুঝি আসা হল ?...আমি ভাবছিলাম বুঝি ...থাক থাক, দীর্ঘজীবী হও...প্রণাম হয়েছে—ওঠ—"

ভক্তিমান জামাইয়ের তখন মাটি ছাড়িয়া ওঠা যে কি ঘোর সমস্যা শ্বশুর বোধ হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারিলেন।

চল্লিশ বৎসরের দুই প্রান্তে

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বেই এই বাডির কর্তা ছিলেন বাচস্পতি মহাশয়,—গঙ্গাধর বাচস্পতি। অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, এদিকে স্মৃতি আব ন্যায়েও অসাধারণ অধিকার। সভাপণ্ডিতির জন্য একদিকে বর্ধমান অপরদিকে কৃষ্ণনগর থেকে টানাটানির আর অন্ত ছিল না। যান নাই। বলিতেন, "বোনের দাসী করে রাখবার জন্যে কি মা-সরস্বতীকে তপস্যা করে ঘরে আনলাম ?"

একটি চতুষ্পাঠী ছিল—নবদ্বীপ, মিথিলা এমন কি বারাণসী থেকেও ছাত্রসমাগম ছিল তাতে।

লোকে বলে, "দাম্ভিক ছিলেন। কত কি করে যেতে পারতেন, কিন্তু নিজের কোট ছেড়ে এক পা নডলেন না কখনও..."

ছিলেন নিশ্চয় অটল, দাম্ভিক।...সমুদ্র তো আর নিম্নগা নদীর প্রকৃতি অবলম্বন করিতে পারে না।

যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের এখনও বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসা উঠিলে মনে পড়ে একটি দীপ্ত, সৌম্য পুরুষ-সিংহকে,—উন্নত ললাট, দীর্ঘ নাসা, প্রশস্ত বক্ষে সংযত জ্যোতিশ্ছটার মত শুভ্র যজ্ঞোপবীত, প্রোজ্জ্বল অগ্নি-শিখার মত রক্তাভ, সুগৌর ঋজু, দীর্ঘ কলেবর। তখন ফুট-ইঞ্চি দিয়া দৈর্ঘ্য মাপিবার রেওয়াজ হয় নাই। দেশে সংস্কৃত-চর্চা ছিল,—"রঘুবংশে"র দিলীপের তুলনা দিয়া লোকে বলিত—'শালপ্রাংশু'।

তিনি ছিলেন এক নাম, এক রূপ আর এক প্রতিজ্ঞায় চিরপ্রতিষ্ঠিত।

কিঞ্চিদূর্ধ্ব চল্লিশ বৎসর পরে, এখন এ বাড়ির কর্তা রমণীমোহন—বাবু রমণী-

মোহন ভট্টাচার্য, বাচস্পতি মহাশয়ের পৌত্র। চার ফুট নয় ইঞ্চির মানুষটি, গড়ন পাতলা-পাতলা শৌখীনগোছের। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর। 'রমণীমোহন' এই ফিনফিনে নামের জন্যও, এবং অনেকটা স্বল্প, সুকুমার দেহের জন্যও, স্কুলে তাহার নাম হইয়াছিল 'লেডি'। অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে সেটা এখনও জারি আছে।

ঠাকুরদাদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার লোক ছিলেন, রমণীমোহনের চরিত্রে তাহার অঙ্কুর ছেলেবেলা হইতেই দেখা গেল,—যেটা ভাল লাগিবে না সেটাতে কোনমতেই লাগিয়া থাকিবে না। কিছু সংস্কৃত পড়িল, ভাল লাগিল না, ছাড়িয়া দিল। গ্রামের স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িল, তাহার পর আর ভাল লাগিল না। কলিকাতায় গিয়া মেসে থাকিয়া ম্যাট্রিক দিল, আই-এস্‌সি-টাও পাস করিল; কিন্তু আর ওসব ভাল লাগিল না। বন্ধুবান্ধবেরা বিস্তর বোঝাইল, অভিভাবকেরা বোঝাইল, চোখ রাঙাইল; মেয়েরাও কাঁদিয়া চোখ রাঙা করিল; কিন্তু রমণীমোহন অটল, ছেলেবেলায় যা মাত্র জিদ ছিল তা এখন স্ট্রং প্রিনসিপলে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শুধু একটি কথা যেন নখে-দন্তে আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল, "আর ভাল লাগছে না।" কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিল।

মাঝের কয়েক বৎসরের ইতিহাস আরও দ্রুত ভাল লাগা না-লাগার কাহিনী। তাহার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরিয়া চরকা-তক্‌লি কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া চৌমাথায় দাঁড়াইয়া গান্ধীর চৌদ্দপুরুষান্ত করা—সবই আছে। এমন কি, প্রায় সব ছাড়িয়া যে ছাগলীটির দুধের উপরই দিনকতক জীবনতরী বাহিয়া রাখিয়াছিল, গান্ধীর উপর আক্রোশে সেটির বাচ্চার উপর দিয়াই এক সময় উগ্ররকম আমিষভোজী হইয়া উঠিল। কিন্তু উদরের ভাল লাগা না-লাগা বলিয়াও একটা ব্যাপার আছে; ছাগলীর-দুধ-খাওয়া দুর্বল নাড়ীতে তাহার ছানাদের হাড়-মাংস-চর্বি বরদাস্ত হইল না। খুব এক চোট পেটের ব্যারামে ভুগিয়া পছন্দসই নূতন পথ খুঁজিবে এমন সময় তাহার পিতার মৃত্যু ঘটিল।

দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মিলাইয়া জমিজমা নিতান্ত নিন্দার যোগ্য নয়; কিন্তু রমণীমোহনের জীবনের চরকার যুগ অনেক দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন প্রিনসিপ্‌ল বদলাইয়াছে, শুধু মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা ভাল লাগিল না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল,—একটা বাড়ির কর্তা, অথচ চাকরি করে না, এটা যেন কি রকম একটা খাপছাড়া ব্যাপার হইয়া পড়ে—কেমন যেন নেড়া-নেড়া ভাব একটা—ঠিক কারণ দেওয়া যায় না, ঠিক বর্ণনা করাও যায় না…

তবে শরীরের উপরে মাথাটিতে চুল না থাকার সঙ্গে বাড়ির কর্তার চাকরি না-থাকার নিশ্চয়ই কোন দিক দিয়া যেন একটা সাদৃশ্য আছে।

হাওয়ায পবিবর্তন ঘটে ; তাই এই বাড়ির এক কর্তা এক সময় রাজসভায় হাজবি দেওয়ায় অসম্মান জ্ঞান কবিত, আর অন্য সমযে অন্য এক কর্তা প্রবল উৎসাহে সবুট চবণ-সকাশে ভিক্ষাপত্র নিবেদন করিতেছে—আই হ্যাভ দি অনার টু বি ইত্যাদি, অর্থাৎ হে দাতা, তোমার নিতান্ত অনুগত দাসের বৃত্তিই আমাব পরম সম্মান।

চাকরি হইয়াছে। বমণীমোহন এখন ডেলি প্যাসেঞ্জাব। আশ্চর্যেব বিষয, ভাল না-লাগার অমন যে একটা উগ্র বৃত্তি ছিল রমণীব মনে এতদিন, সেটা প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর তাহার সমস্ত জীবনের উপব দিযা বিজয-অভিযান করিয়া এইবার যেন শান্ত, সংযত হইয়া আসিয়াছে। এতদিন পরে এই একটা অবস্থা আসিয়াছে যাহা বেশ দিব্য ভাল লাগিতেছে।—এইটা দাসত্বের অবস্থা।

বাচস্পতি মহাশয় এক নামেই দেশবিশ্রুত ছিলেন, পৌত্র এবই মধ্যে তিনটি নামে খ্যাত হইযা পডিয়াছে—রমণীমোহন, লেডি আর ছোটবাবু। শেষের নামটা এখনও আপিসেই আবদ্ধ আছে, পুষ্ট হইযা একদিন 'বডবাবু'তে দাঁডাইবে, ক্রমে গ্রামে আসিয়াও চাবাইয়া পডিবে। —রমণীমোহনের ·এখন সবচেয়ে উচ্চ আশা এই।…এ ভিন্ন লোক্যাল ট্রেনেব দৈনিক রাজনীতি-বৈঠকে স্বরের উচ্চতা এবং আলোচনার উগ্রতার জন্য রমণীমোহনের বিশেষ নাম আছে, তবে সেটা গাড়িতেই নিবদ্ধ—সঙ্গে করিয়া নামিতে হয় না।

শুধু বহু নামই নয়, কর্মের দিক দিয়াও বাচস্পতি-পৌত্রের পিতামহ হইতে বিশিষ্টতা আছে। তাহার মূলেও প্রিনসিপ্‌ল, থিয়োরি প্রভৃতি কতকগুলি জটিল ব্যাপার আছে যাহা এ-যুগের মানুষের জীবন আরও সমস্যাঘন করিয়া তুলিয়াছে এবং যাহা দ্বারা সে নিজেকে ভালমত ঠাহর করিযা উঠিতে পারিতেছে না, নিজের একটি নিজস্ব রূপ দাঁড করাইতে পারিতেছে না।—অত্যুগ্র নাগরিক জীবন আছে আবার ব্যাক-টু-ভিলেজ অর্থাৎ গ্রামের সঙ্গে নাডীর যোগের কথাও আছে ; দেবদেবী আছেন, কুলধর্ম আছে, আবার এদিকে উদার বিশ্বমানবতাও আছে, সাহেব না হইলেও এক পা চলা দায়, আবার এদিকে স্বরাজ আছে, বিপ্লবের জয়গানও চাই—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সবেরই মর্যাদা রক্ষা করিতে হয় একটু-আধটু করিয়া। সারা যুগটাতেই থিয়োরি আর প্রিনসিপ্‌লের জট পাকাইয়া গিয়াছে। গঙ্গাধর বাচস্পতির যুগটা ছিল 'না' অথবা 'হ্যাঁ'-এর

আপোষের সব কিছুর সঙ্গে মানাইয়া বেশ মানানসই হইয়া চলিবার যুগ। যুগের দুইটার মধ্যে আপোষের অবসর ছিল না—রমণীমোহনের যুগটা 'না' এবং 'হ্যাঁ'-এর এই মূল তত্ত্বটাই তাহার জীবনের প্রতি দিনটিতে মূর্ত হইয়া উঠে।… যে কোন একটা দিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যাক।—

রমণীমোহন ভোরে উঠিল,—অবশ্য সে-যুগের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নয়, কেননা এ-যুগের হাইজীন্ অর্থাৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব বলিতেছে তাহাতে এক্সপোজারের ভয় আছে। …প্রাতঃকৃত্য সারিয়া একটা খাটো ময়লা কাপড়ের উপর গামছাটা জড়াইয়া হাতে একটা দা লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে চলিয়া গেল। এ-ব্যাপারটা ব্যাক্-টু-ভিলেজ, গ্রামের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে মিতালি। আজ কিন্তু বেশি সময় দিতে পারিবে না রমণী; ষষ্ঠীপূজা আছে; আটটি যজমানের বাড়ি হাজিরা দিতে হইবে। হাতে একটি রিস্ট-ওয়াচ বাঁধা, ঘুরিয়া ফিরিয়া এ-গাছটার মাথায় কোপ, ও-লতাটার গোড়ায় কোপ বসাইয়া ঠিক পনের-মিনিট-ব্যাপী যেন একটি ল্যাবরেটরি-গ্রাম্য-জীবন অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা বিড়ি ধরাইল, সেটা ভস্মীভূত করিয়া তেল মাখিয়া তালপুকুরে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

স্নানের পরের রমণীমোহন একেবারে অন্য লোক। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় সাবান দিয়া কাচা ঝকঝকে পৈতা, গায়ে নামাবলী, কপালে, কর্ণমূলে চন্দনের রেখা, টেড়ির ও-প্রান্তে টিকিটি বড় বড় হালফ্যাশানী চুলের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র করা, একটি বিল্বপত্র বাঁধা; ডান হাতের অনামিকাতে একটি কুশাঙ্গুরীয় পরানো। রমণীমোহন বাড়িতে রান্নার তাগাদা দিয়া ষষ্ঠীপূজা অভিযানে হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। মনটা আরও আগাইয়া গিয়া স্টেশনে ন'টা ছত্রিশের গাড়ির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আটটা বাড়িতে পূজা সারিতে আটটা পঁয়তাল্লিশ হইয়া গেল। অবশ্য পূজা যা হইল তাহাতে যজমানদের রাতারাতি বংশলোপ হইবার কথা, নেহাৎ বাঙালী পরিবার বলিয়াই রমণীর পূজার উজান ঠেলিয়াও বৎসর বৎসর বংশবৃদ্ধিই হইতেছে।

হাতে ঠিক একান্নটি মিনিট। ইহার মধ্যে কাপড়-চোপড় বদলানো, খাওয়া, একটু বিশ্রাম, গাড়ি ধরা। তবে বেশ কেমন করিয়া যন্ত্রের মত হইয়াও তো যাইতেছে মন্দ নয় এই বছর দুই ধরিয়া। ভাত বাড়িবার তাগাদা দিতে দিতে

বাড়ি ঢুকিয়া রমণী প্রথমেই মণিবন্ধে ঘড়িটা বাঁধিয়া লইল। কাঁটার দিকে চাহিয়া কপাল কুঁচকাইয়া বলিল, "বাবাঃ—আজ আবার পূজোতে পাঁচ মিনিট দেরি করিয়ে দিলে—ঐ নটবর-কাকার বাড়িতে—নিশ্চয় গিন্নী নেই, ও-সব হাল-ফ্যাশানের বউদের কি পূজোর যোগাড় করা পোষায়···কই গো, দিলে ভাত? ···নাঃ···"

আহারটি হাইজীন-সঙ্গত—দ্রব্য হিসাবেও, রন্ধনের প্রক্রিয়া হিসাবেও, আবার আহারের পদ্ধতির দিক দিয়াও। দ্রব্যের দিক দিয়া বলা যায়—রমণী ঠাকুরদাদার যুগকেও অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে—অল্পস্বল্প নয়—প্রায় হাজার-আড়াইয়েক বছর, যখন তেল-মসলা এমন কি বোধ হয় কুলো-বঁটিরও ব্যবহার ভাল করিয়া জানা ছিল না। কুটনা কোটায় কিংবা রন্ধন-প্রক্রিযায় কোন জিনিসেরই ভাইটামিনের উপর হাত পড়িয়াছে কি না ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া, হাত উল্টাইয়া ঘড়িটা কনসল্ট করিয়া রমণী খুব সংযত ভাবে আসন গ্রহণ করিল। তাহার পর বাঁ হাতের কনুইটা খুব অনুভব করিয়া করিয়া বাঁ দিকের পাঁজরার নীচে খানিকটা প্রবেশ করাইযা ঝুঁকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল (—আপনারা জানেন না তাই হাসিতেছেন)—ইহাতে লিভার হইতে হজমের রস অবাধে নিষ্ক্রমণ হয়, হজমের সহাযতা করে। আহার্যগুলা দাঁতে পিষিয়া পিষিয়া স্যালিভার সঙ্গে একেবারে মিশাইযা আহাব সমাপন করিতে করিতে ঠিক পঁচিশটি মিনিট লাগে। এতে দাঁতও অবিকৃত থাকে, পরিপাকও নির্দোষ রকম হয়। দাঁত এবং পরিপাক শক্তি দুইটাই খুব খারাপ বলিয়া রমণী ইহার এক মিনিট এদিক-ওদিক হইতে দেয় না।

"লেডির হল?"—জয়হরি ডাকিয়া গেল, ন'টা বাইশ লোক্যাল ট্রেনের জয়-হরি। রমণী তখন সংযতভাবে শ্বাস উর্দ্ধে টানিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, উত্তর দিল না। বাটিটা রাখিয়া তাহাতে খানিকটা জল ঢালিযা সেটুকুও দুধের প্রথাতেই চুমুক দিয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিল, মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া নাকী সুরে বলিল, "আচ্ছা কেন খাবার সময় ডিস্টার্ব করা বল তো?—ঐটুকু ডেকে আপ্যায়িত না করলেই হত না?—হল তো একটা বিস্রি খাবার সময়?—এখন সামলাই সমস্ত দিন ধরে—"

ঢেকুর তুলিতে তুলিতে এবং পেটে টোকা মারিতে মারিতে উঠিয়া পড়িল!

মা বসিয়া ছিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "কি ঢেকুরের ঘটা বাবা বুড়োর মত। শ্বশুরঠাকুরের অত বয়সেও কেউ এ-সব উপদ্রব দেখে নি।"

রমণী আবার নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আরে রোজ দেখছ এই রকম একটা না একটা বিঘ্ন হচ্ছে! ঠিক খাবারটির সময়—নয় জয়হরে, নয় পেনো, নয় যতে…যত ওদের বারণ করি…হঠাৎ ঢুকে দিলে হজমের নাড়ীতে শক লাগবে, তা শুনবে কেউ?"

আসন ছাড়িয়া আবার মূর্তি বদলাইয়া গেল। পূজাতে পাঁচ মিনিট সময় গিয়াছে—জয়হরেও মিনিট-খানেকের ধাক্কা দিয়া গেল। ঠিক সাত মিনিট আর সময় আছে, বাহির হইতেই হইবে। বিদ্যুৎ-চালিতের মত আঁচাইয়া, জুতা-জামা পরিয়া লইল, আজ আবার একটি ফালতু হাঙ্গামা আছে—পুজোর হ্যাঙ্গামে টিকিটি পৃথক করা আছে—আঁচাইয়া বড় চুলের সঙ্গে সেটাকে আবার একাকার করিয়া দিতে হইবে, কপালের কানের ফোঁটা-চন্দন মুছিয়া ফেলিতে হইবে—সাহেব চটা বেজায় এসবে।

দেবতার পরে সাহেবের মন রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি এই সব ত্রুটি সারিয়া রমণী শুইবার ঘরে গিয়া একটু হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা ডেক-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল। স্ত্রী মনোরমা পানের ডিবা এবং একটা বিস্কুটের বাক্স হাতে করিয়া প্রবেশ করিল।

ডেক-চেয়ারের আরামটি বাঁধা পাঁচ মিনিটের, এই সময় স্ত্রীর সহিতও রুটিন-বাঁধা একটু একথা-সেকথা, একটু ফষ্টিনষ্টি হয়।…ডাক্তারী বিজ্ঞান বলিতেছে—আহারের পরেই শরীর এলাইয়া একটু রিল্যাকসেশ্যন, আর হালকাগোছের একটু কথাবার্তা হজম এবং পরমায়ুর পক্ষে খুব উপকারী। তাহার মানে, এই পাঁচ মিনিট মনোরমা একটা জারক ঔষধের শিশি। একটু কথা কওয়া, একটু হাসি, একটু ঠাট্টা-প্রশংসা—সে-সব সেবনের পূর্বে শিশিটাকে একটু নাড়িয়া লওয়া…ডাক্তারী বিজ্ঞানেরই একটা নির্দেশ—শেক দি ফায়েল বিফোর ইউজ…

"আজ ছোটবাবুর বড্ড দেরি হয়ে গেল, হাঁ করুন, পানটা আমিই না-হয় মুখে দিয়ে দিই, সময়ের সুসার হবে এখন।"

হাসিয়া মনোরমা ডিবা হইতে দুইটা পান বাহির করিয়া স্বামীর মুখে পুরিয়া দিতে যাইতেছিল, রমণী হাত উল্টাইয়া একবার চকিতে ঘড়িটা দেখিয়া লইল, "ওঃ বড্ড দেরি হয়ে গেল, আজ আর তিন মিনিটের বেশি রেস্ট-এর জন্যে দেওয়া যাবে না"—বলিয়া প্রায় লাফাইয়াই স্ত্রীর হাত হইতে পান দুইটি লইয়া তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দিল; মুখটা যে সে বেচারির কেমন-ধারা হইয়া গেল সেটা লক্ষ্য করিবারও ফুরসৎ নাই। ডিবাটা পকেটে পুরিল, বিস্কুটের টিফিন-

বাক্সটা বাঁ হাতে লইল, তাহার পর পটের কালীর দিকে যুক্তকরে দাঁড়াইয়াই হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, "খুব মনে পড়ে গেল প্রণাম করতে গিয়ে,—আজ আমার আসতে দেরি হবে, লাস্ট ট্রেনে আসব।"

আবার ঘুরিয়া যুক্তকর তুলিতে যাইবে, মনোরমা প্রশ্ন করিল, "কেন?"

আধ-ফেরা হইয়া রমণী বিরক্তভাবে বলিল, "সব কথায় টোকা কেন যাত্রার সময়?...আজ গোলদীঘিতে মহাবোধি হলে বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ পণ্ডিত ফাদার লা মোসা—'সত্যধর্ম ও ধর্মে অসত্য'—নিয়ে এক বক্তৃতা দেবেন...পারলে বুঝতে কথাটা?...কেমন একটা ওবোস, টুকতেই হবে, হাজার তাড়াতাড়ি থাকুক লোকের!"

পুরা প্রণাম আর করা হইল না; তাড়াতাড়ি আর একবার পটের দিকে চাহিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া হন হন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই পটের দিকেই চাহিয়া চাহিয়া মনোরমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তবে ব্যাপারটা কিছু নূতন নয়, মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাজে বাহির হইয়া গেল।

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই বাড়ির, সম্ভবত এই ঘরেরই একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলে চলে।

সময়টাও এই, অর্থাৎ দিবার প্রথম প্রহর মাত্র শেষ হইয়াছে, সূর্য দেখিয়া অনুমান হয়; তখন সূর্যের সঙ্গে সব দিক দিয়াই যোগটা নিবিড়তম ছিল।

গঙ্গাধর বাচস্পতি প্রাতঃকালীন পূজা-আদি সমাপন করিয়া এই ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সদ্য-সঞ্চিত পুণ্যে সমস্ত শরীর ভাস্বর, যেন সূর্যদেহচ্যুত একটি জ্যোতিঃশিখা। গৃহিণী একটি বঁটিতে উরু চাপিয়া একটি বড় থালায় নানাবিধ ফল কাটিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া, কাপড়ের চওড়া টকটকে লাল পাড় কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "হল পূজো?...দেখো..."

শেষের এই কথাটুকু একটা সতর্কতার বাণী। বাচস্পতি মহাশয়ের মাথাটা চৌকাটের উপর যায়, তাই সাবধান করিয়া দেওয়া।

মাথাটা নীচু করিয়া প্রবেশ করিতে করিতে বাচস্পতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ও বলতে হবে না, স্বয়ং তুমি যখন ভেতরে রয়েছ, মাথা আপনিই নুয়ে আসবে।"

গালে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠায় গৃহিণীর নথটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল,

বলিলেন, "আর রঙ্গ করতে হবে না, ব'সো এসে। বড্ড বেলা হচ্ছে আজকাল পূজোতে।"

"আর এদিক থেকে সময় ওদিকে যতটা যায় ততই ভাল; এদিককার বেলাও তো পড়ে আসছে?"

আসন পাতা ছিল, বাচস্পতি মহাশয় গিয়া তাহার উপর বসিলেন। গৃহিণী মিছরির পানা আর ফল, ভিজানো মুগের ডাল ও ছানার থালাটা সামনে আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "তা পড়ে আসছে বই কি।"

একটু লজ্জিত অথচ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। যাহাদের দিনমান কাটিয়াছে ভাল, বেলা যখন পড়ন্ত সে-সময় ব্যর্থতার অনুতাপে যাহাদের অতীতের দিকে চাহিতে হয় না, এ তাহাদের মুখের হাসি।

"মুগের ডাল আজ বেশি ভিজিয়েছ।"

"বৌমা ভিজিয়েছিলেন।...তা হোক, খেয়ে নাও, আবার সেই দুপুর গড়িয়ে গেলে ভাতে বসবে তো।"

বধূমাতা একটি কালো পাথরের রেকাবি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। শাশুড়ি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "দেখেছ মরণ! আর মনেও থাকে না কিছু।...রেখে দাও ওঁর সামনে মা।...বউমার নিজের হাতের গড়া সন্দেশ, এবার বাপের বাড়ি থেকে শিখে এসেছেন। কেমন হল দেখ।...আজকালকার মেয়েরা যে শিখছে এই সব নানান রকম।" •

অবগুণ্ঠনবতী পুত্রবধূ রেকাবি শ্বশুরের সামনে রাখিয়া একটু কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। অভিমতের অপেক্ষা করিতেছে।

শ্বশুর ফলমূল থেকে হাত সরাইয়া ধীর আগ্রহে একটা সন্দেশ তুলিয়া মুখে দিলেন, বিচক্ষণতার সহিত আহার করিয়া বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার। তুমি বলে না দিলে মনে করতাম আমাদের তারু ময়রার মেয়ে গড়েছে বুঝি।...অতি মধুর!"

দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। বধূর শরীরটিও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে দুলিয়া উঠিল। গৃহিণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "উনি অত মেহনৎ করে গড়ে খাওয়ালেন, পুরস্কার হল, বেহানের গালাগাল খাওয়া—এমনই যুগই পড়েছে বটে!"

আর একটা তুলিয়া লইয়া বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, "না, সত্যিই বড় উপাদেয় হয়েছে মা। রোজ আমার বরাদ্দ রইল, তবে এতগুলো করে নয়—ছেলে তো তোমার বুড়ো হতে চলল কি না...,"

আহারান্তে ধীরে-সুস্থে চতুষ্পাঠীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রচুর স্বাস্থ্যে, প্রচুর অবসরে, প্রচুর মুক্তিতে, সমস্ত সম্বন্ধ পূর্ণভাবে উপভোগ করা, সমস্ত রস নিংড়াইয়া পান করা, ওদিকে এক আত্মসমাহিত জীবন ;—জীর্ণ, অকালবৃদ্ধ, অনবসর, শৃঙ্খলিত, স্বজন-বিচ্ছিন্ন, চিরবুভুক্ষু, এদিকে এক শতবিক্ষিপ্ত জীবন।

মাঝে মাত্র চল্লিশটি বৎসরের ব্যবধান।

শব্দরূপ

"লতা—লতে—লতাঃ, লতা—লতে—লতাঃ…"

রাস্তার ওধারে ঐ ওদের বাড়ির ছেলেটি জোরগলায় শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছে। সেকেণ্ড কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে এইরকম শুনিয়াছি।

রাত এগারোটা; আহারাদি সারিয়া পান চিবানোর সঙ্গে ধূমসেবন চলিতেছে, পাশে শুভ্র পরিচ্ছন্ন বিছানাটি, ইচ্ছা হইলেই গিয়া শুইব, সে ইচ্ছার মধ্যে বাহিরের অন্য কাহারও অধিকার উপদ্রব নাই, সেটা মাত্র আমার স্বরাট্ মনের খেয়ালখুশি।

…এ-ই তো জীবন!—মুক্ত, আত্মসম্পূর্ণ…

ছেলেটির উপর মনটা করুণায় ভরিযা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের চিত্র সব যেন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।—

সকালবেলায় ওঠা।…অবশ্য এখনও উঠি, কিন্তু তাহা চাই বলিয়াই উঠি, সকালটা মিষ্ট লাগে বলিয়াই উঠি।

তখন মিষ্ট লাগিত বিছানা আর তাহার বিচ্ছেদটি সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সমস্ত সময়টিকে তিক্ত করিয়া রাখিত। কিন্তু সে কথা কে বোঝে? জীবনের ও-অংশটার বর্তমান নাই, শুধু ভবিষ্যৎ আছে; আর সেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য মায়ের চোখ পর্যন্ত সতর্ক, নিষ্করুণ; অন্যে পরে কা কথা?

মায়ের প্রথম সম্ভাষণ, "না, এ ছেলের যদি কিছু হয়! মাস্টার এসে গেল, এখনও তোর ঘুমের ঘোর কাটল না?—চোখ কচলাচ্ছিস? নাঃ—"

নেপথ্যে কাকার তাগাদা, "উঠল, বৌদি, তোমার আদুরে গোপাল? খুব আস্কারা দাও, ভবিষ্যৎটি চিবিয়ে খাও ছেলের—"

একটু পরে দাদা তাগাদায় আসিয়া উঠানে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

কোন রকমে বাক্‌স্ফূর্তি হইলে আঙুল গুনিয়া বলিলেন, "প্রথম নম্বর তো শয্যাত্যাগই বাবুর একটা পর্ব, তোড়জোড় করে মুখ ধোওয়ার ঘটা—যতটা সময় যায় , তারপর হ্যানো, ত্যানো, সাত সতেরো…"

গণনাটা অনির্দিষ্ট 'হ্যানো ত্যানো'র জোরে আটের কোঠা পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, "এখন আবার ঐ এক কাঁড়ি কোলের কাছে নিয়ে বসেছ তো ? খাও, কিন্তু ও ঘুঘনি খাওয়া হচ্ছে না শৈলেন নিজের ভবিষ্যৎ খাওয়া হচ্ছে, শর্মা এই বলে রাখলে।"

ঘুঘনি গলা দিয়া আর গেল না, তাড়াতাড়ি হাতমুখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া গিয়াছি। জীবন মাস্টারমহাশয় এই দিকেই চাহিয়া আছেন, দেখিয়াই একপ্রকার ভেংচানো আপ্যায়নের সঙ্গে হাত দুইটা একটু বাড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আ-সুন, আসুন, আজ্ঞাজ্ঞে হোক ! দেড়টি ঘণ্টা বসে আছি বাপু,…পড়াশোনা তোমার কর্ম নয়, কেন এলে ? যাও, মা, ভাই, কাকা, জ্যেঠার আদর খাওগে।—কালকের অঙ্কটা হয়েছিল ?"

সৌভাগ্যক্রমে কঠিন অধ্যবসায়ের জোরে অঙ্কটা হইয়াছিল। জীবন মাস্টার মহাশয়কে খুশি করিতে পারিব বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, করে তবে ছেড়েছিলাম মাস্টারমশাই, রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত—"

"রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ! অসাধ্যসাধন করেছ যে ! নেপোলিয়ান না হয়ে ছাড়ছ না দেখছি !" (অতঃপর বিকৃত মুখে)—"বলি, সারা বছরটা সাতটা না হতেই বিছানায় ঢুকে একটা দিন যদি একটু রাত করেই শুয়ে থাক তো বড় গলা করে আবার সেটা জানাচ্ছ কি ! লজ্জা করে না ?"

অধ্যবসায়েরও পুরস্কার এই, একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল—জীবন মাস্টারের পড়ানোর এই নমুনা,—তামাক খাইতেন, সে যুগের ঢাউস 'বসুমতী' পড়িতেন, বাকি সময়টা ভালমন্দ নির্বিশেষে বাক্যযন্ত্রণা দিতেন। শ্লেষবাক্যে অমন সাধা রসনা এ পর্যন্ত আর কাহারও দেখি নাই।

বাড়ির গণ্ডি পার হইলে স্কুলে ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি তাহা এই যে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত অকুণ্ঠভাবে ঠেঙাইতেন। প্রোপ্রাইটার, হেডমাস্টার উভয়েই তাঁহার ছাত্র, এই পদ্ধতিতে গড়া ; তাঁহারা মৃদু আপত্তি করিলে বলিতেন, "কেন, এরাই বা কি দোষ করেছে ?"

না, জীবনটা যে নিতান্ত এইরকম একঘেয়েই ছিল—এটা বলাও ভুল হইবে।—বৈষ্ণবাটি স্কুলের টীম ম্যাচ খেলিতে আসিল। ভলান্টিয়ারের ব্যাজ বুকে লটকাইয়া

সে কী স্ফূর্তি সমস্তটা দিন! স্টেশন থেকে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা; আতিথ্যের তদারক, ঘোরাফেরা, মোড়লি করা; বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, স্কুলের সম্পর্কও একেবারে অন্যবিধ। হেডমাস্টার বলিতেছেন, "দেখো শৈলেন, সারাটা স্কুলের মানমর্যাদা আজ তোমাদের ওপর নির্ভব করবে—সেবায়, সম্বর্ধনায়, ডিসিপ্লিন রক্ষায কোন রকম যেন অপযশ না হয়, দেখো!"

হউক একদিনের জন্য, কিন্তু সেই একদিন ধরিয়াই জীবনের কি প্রসাব! কি বেপরোয়া ভাব!—সেই দিনই সিগাবেটে হাতেখড়ি।

পরের দিন ফার্স্ট পিরিয়ডেই সেকেণ্ড মাস্টাব ক্লাসে ঢুকিয়া বোর্ডে দাগড়া দাগড়া অক্ষরে লিখিলেন, "রাইট অ্যান এসে অন ফুটবল ম্যাচ। দশখানি পাতা ভরে লিখবে সব, কাল নিশ্চয় মন দিয়ে খুঁটিনাটি লক্ষ্য কবেছ সবাই—টীমের গাড়ি থেকে নামা থেকে শেষ পর্যন্ত।—শুনছ তো শৈলেন? হুঁ, তুমি আবাব বেশি মুড়লি করছিলে দেখলাম, একটি পাতা কম হলে মুড়লি ঘুচুব তোমাব।"

যাঁহারা শখ করিয়া মধুর ব্যল্যে, মধুর কৈশোরে ফিরিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের মানা করি না, তবে আমি তাঁহাদের দলে নই।

শব্দরূপের গগনভেদী শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, "তৃতীয়া—লতয়া, লতাভ্যাম্, লতাভিঃ।"

আমাকে মুখস্থ করিতে হইতেছে না, তবু, কি জানি কেন, শুধু শোনার জন্যই যেন পরিশ্রান্ত হইয়া আসিতেছি। কানে য-ফলা আর বিসর্গ যেন হাতুড়ি পিটিতেছে। যে মুখস্থ করিতেছে সে বেশ উৎসাহের সহিতই মুখস্থ করিতেছে—কাল পণ্ডিতমহাশয়ের প্রসন্ন মুখ দেখিবে নিশ্চয় এই উচ্চাশায়। আমার কিন্তু এদিকে অমন মধুর অম্বুরির ধোঁয়া তিক্ত হইয়া আসিতেছে, সামনের জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশের নীলাভা মলিন হইয়া আসিতেছে। কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যাইতেছে সেই ছেলেবেলার এক দিনের কথা—রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অঙ্ক কষার ইতিহাস—তার পরিণাম—তার পুরস্কার।

অথচ বুঝি, এটা আমার উচিত নয়, এমন কি অধর্ম, কেননা আমি একজন প্রফেসর। পাড়ার ঘরে ঘরেই যদি কিশোর-কণ্ঠে শব্দ-সাধনার রোল উঠে তো আমার প্রফেসরী-কর্ণে সেই সঙ্গীত ঝঙ্কার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু—

আমার ছোট ভগ্নী আসিয়া উপস্থিত হইল। না, এগারোটা উহার শয্যা আশ্রয়ের সময় নয়। অনেক কাজ ওর; সবচেয়ে বড় কাজ বাড়ির গেজেটগিরি।

ভোর ছয়টা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত তাহার গতিবিধির গণ্ডির মধ্যে যাহা ঘটে অক্লান্ত উৎসাহে সে-সমস্তর সংবাদ চারিদিকে চারাইয়া দেওয়া সুধী-র নিত্যকর্ম। আমি উহাকে নিরুৎসাহ করি না, কেননা কোন ঘটনা কিংবা কোন আলোচনা ও এমন নিখুঁৎভাবে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতেছে যে সঙ্কল্প করিয়া আছি উহাকে একটি সাহিত্যিক করিয়া গড়িয়া তুলিব। শুধু অনুরূপ বর্ণনা বা আবৃত্তিই নয়, ওর স্বকীয় মন্তব্য বলিয়াও একটা জিনিস আছে, আর সেটা যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনই নির্ভীক।

বসিয়া আমার আরাম-কেদারার হাতলে চিবুক রাখিয়া সুধী বলিল, "মেজদা, তোমার লজ্জায় আর মুখ দেখানো উচিত নয়।"

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন রে?"

সুধী বিরক্তির ভান করিয়া বলিল, "কেন রে, কি? পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে বিয়ে করলে না, কিন্তু কী জজ-ম্যাজিস্টেরটাই বা হলে? হলে তো শেষ পর্যন্ত সেই মাস্টার—গোবর্ধন মাস্টার যা তুমিও তাই, তুমি না হয় টাই এঁটে টুপি প'রে গরু তাড়াতে যাও।"

বুঝিলাম সুধী-র নিজের কথা নয়, আবৃত্তি; নীচে মা প্রভৃতির মধ্যে আমার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, সুধী সেইটেই রাতদুপুরে আমার শ্রুতিগোচর করিতে আসিয়াছে। বলিলাম, "বিয়ে করলে যে একটুও হত না, হদ্দ তোর না হয় আর একটা বৌদি—"

সুধী মাথা ঝাঁকাইয়া রাগতভাবে বলিল, "না, হত না! কারুর হয় না! বিয়ে করে সব্বাই বইখাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে পৈতে পুড়িয়ে ভগবানচন্দ্র হয়ে বসে থাকে। তুমি এই রাতদুপুরে আর বকিও না মেজদা। তোমার বরং ওদের বাড়ির ঐ ছেলেটির দেখে শেখা উচিত,—ওর চন্নামৃত খাওয়া উচিত।"

অবশ্য 'চন্নামৃত' কথাটার অর্থ সুধী জানে না বলিয়াই বলিল, তবে কথাটা কাহারও মুখে উঠিয়াছে নিশ্চয়। যাহার চরণোদকের এতটা প্রভাব সেই দেব-বালকটি কে জানিবার জন্য সুধীকে প্রশ্ন করিলাম, "কোন্ ছেলের কথা বলছিস তুই?"

"কেন, ঐ যে পড়ছে, শুনতে পাচ্ছ না? মাসখানেক আগে পর্যন্ত ও-ছেলে যা ছিল, বাবা, বাবাঃ, ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে কেবল এপাড়া, ওপাড়া, সেপাড়া করে ডানপিটেগিরি করে বেড়াত—বই-সেলেটের সঙ্গে দেখা নেই। বাপমায়ে স্কুলে টাকা গুনে যাচ্ছে, ছেলে সেই একভাব—সেই যে

সেকেনকেলাসে এসে আটকেছেন, আর নডনচডন নেই—তা বয়েস মানবে কেন গা? দিন দিন মাথায় লম্বা হচ্ছেন আর কাটগোঁয়ারের মত চেহারা হচ্ছে। একবার তো পালিয়ে গিয়ে পশুপতিনাথই হয়ে এল···আবার এদিকে ভক্তিটুকুন আছে কিনা! এমন সময় একদিন গিন্নীর বোন এলেন।”

জিজ্ঞাসা করিলাম, “ছেলেটির মাসী?”

“ছেলের মাসী। অবাক হয়ে বললেন, ‘দেখছিস কি সরী, শীগগির ছেলের বিয়ে দে, ছেলে যে দামডা মেরে যাচ্ছে, এর পরে আর কি সামলাবে? দে দিকিন বিয়ে, যদি ছেলের মতিগতি না ফেরে তো আমার নাম লক্ষ্মী বামনী নয়।’ গিন্নী বললেন, ‘দাও একটু কিছু করে দিদি, আমি তো পাডার নালিশে নালিশে উদ্ব্যস্ত হয়ে গেছি। বললেই বলে, ‘আমি রোঘো ডাকাত হব; বডদের লুটব, ছোটদের পুষব!’ গিন্নীর বোন উঠে পডে লাগলেন. বিয়ে হয়ে গেল। দেশেই বৌভাত সেরে আজ এসেছে সব। আর সে ছেলেই নেই।···কর বিয়ে মেজদা, এখনও কাল বয়ে যায় নি।”

ওদিকে ঐ কঠোর সাধনা চলিয়াছে, “ষষ্ঠীতে—লতায়াঃ-লতয়োঃ-লতানাম্, ষষ্ঠীতে লতায়াঃ—”

একেবারে অভাবনীয় পরিবর্তন! এত পরিশ্রম দেখিয়া গায়ে কাঁটা আসিলেও বিবাহের উপর একটা শ্রদ্ধা আসে বইকি।

সুধী বলিয়া চলিয়াছে, “আমরা আজ গিয়েছিলাম কিনা, এই তো আসছি সেখান থেকে।···কি ফুটফুটে বৌটি, মেজদা! বেশ ডাগোর-ডোগোর, আর কথাবার্তায় কি সেয়ানা! আমার সঙ্গে তো খুব ভাব হয়ে গেল।···আহা, যদি ঐ রকম একটি—”

আমি ধমক দিতে চুপ করিয়া গেল। তখনই আবার পূর্ব উৎসাহে আরম্ভ করিয়া দিল, “খু—ব ভাব হয়ে গেল আমার সঙ্গে। নামটিও বড্ড চমৎকার—”

একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা যেন ভাবিতেছিলাম, বোধ হয় দেশের ভাবী রঘু ডাকাতের কথা,—তারা সব এই রকম বিবাহ করিয়া ভাল ছেলে হইয়া যদি এই ভাবে ব্যাকরণ সাধনায় মাতিয়া উঠে তো—

সুধী-র কথায় অলস প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি নামটি?”

“বনলতা।”

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া কথাটা আবছাগোছের কানে গেল। সতর্ক হইয়া চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, “কি নাম বললি?”

"বনলতা গো।...ছেলেটা যাই হোক বড় ম্যাদামারা কিন্তু বাপু; সেই থেকে এক কথা নিয়ে বকেই চলেছে।...তা হবেই বা না কেন বল? এদিকে তো পড়াশোনার পাটই তুলে দিয়েছিল কিনা! গিন্নী বলেন, 'কি ঝোঁকই পড়ার হয়েছে, দিদি!—বৌমা যাবেন, তখন গিয়ে বাধ্য হয়ে বই বন্ধ করবে; বৌমার আবার কড়া আলো চোখে সয় না কিনা।"

এই কঠোর সাধনার গোড়ার রহস্য জানিতে পারিয়া আমার এতক্ষণের দুঃখ-দুশ্চিন্তা আলোড়ন করিয়া বোধ হয় একটা সকৌতুক হাসি ঠেলিয়া উঠিয়া থাকিবে। সেটা বিবাহের গুণগানের এবং সদ্‌দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ সুফল জানিয়া সুধী আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল, "বলব তাহলে মাকে মেজদা, যে তুমি রাজি হয়েছ?

আমি আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৌটির এত দেরি হচ্ছে কেন বল্ তো আগে?"

সুধী বলিল, "আমরা যখন এলাম তখন তো মোটে খেতে বসল সব! সবে এসেছে আজ...সবই অগোছ ছিল কিনা!—বলব গিয়ে মাকে?—হ্যাঁ মেজদা?"

ওদিকে তখন ক্লান্ত স্বরের মূর্ছিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, "সম্বোধনে—হে লতে, সম্বোধনে—হে লতে—হে লতে—হে লতে—"

খোকা

১

খোকাকে আপনাদের মনে থাকিতে পারে, কিছু পূর্বে তাহাকে গৃহদেবতা গোপালের জন্য সঞ্চিত ক্ষীর চুরি করিতে দেখা গিয়াছিল। ছেলেটি এখন আরও একটু বড় হইয়াছে। এখন তাহার মায়ের কোলে তাহার সেই সময়কার বয়সের একটি বোন।

খোকার ধারণা অবশ্য—একটু নয়, সে খুব বড় হইয়াছে—এত বড় যে কত বড় সে নিজেই ঠিক মত ধারণা করিতে পারে না। আন্দাজটা পাকা করিবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। এ-বিষয়ে তাহার সহায়িকা খুকি। অমন লক্ষ্মী সহায়িকা থাকিলে পরীক্ষার সুবিধাও অনেক। খোকা যখন পাশের বাড়ির গৃহশিক্ষক নিবারণ পণ্ডিত হইয়া বসে, খুকি পাশের বাড়ির মন্টুর চেয়েও বেশি

দুলিয়া পড়া করিতে থাকে। দোলন একটু কমিলে নিবারণ পণ্ডিতের মতই খোকা গম্ভীর ভাবে বলে, "খুকু, তোমার বাবাকেও পড়িয়েছি, তোমাকেও পড়াচ্ছি—আমার কাছে ফাঁকি চলবে না! পড়!·· তুমি এইবার এই রকম করে বল—'বাবাকেও পড়িয়েছেন মাস্টার-মশাই ?·· ওরে ব্বাবা'।"

খুকু অতটা পারে না, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করে, বলে, "পলেছিলে মছাই ? ওলে ব্বাবা!"

খোকা চোখ পাকাইয়া হাত দোলাইয়া বলে "হুঁ! এই হাতে কত কানমলা খেয়েছে, জিগ্যেস ক'রো না তোমার বাবাকে!·· এইবার তুমি আবার এই রকম করে চেয়ে বল—'ওরে ব্বাবা'···"

বড়য় রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীত খোকা এক এক সময় নিজেই বড় হইয়া গিয়া বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়—বাবার জুতা পরিয়া, কি কাকার মোটা ডাক্তারী বই লইয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে, তাহার পর হঠাৎ খেয়াল বদলাইয়া আসল বয়সের খেলার ঝোঁকে বই, জুতা কোথায় থাকে পড়িয়া—যথাস্থানে যথা-সময়ে সেগুলার খোঁজ পড়ে—খোকার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে কাকার কিল, বাবার চাপড়, মায়ের গঞ্জনা।

পূজার সময় খোকাকে এখন আর ক্ষীর চুরি করিতে দেখা যায় না। নৈবেদ্য উৎসর্গের সময়টিতে খুকিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কাছটিতে বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বড়র উপযোগী সব উপদেশ দিতে থাকে, "খুকু, তুমি ওটা খাবে মনে করছ নাকি ? করতে নেই। নোলায় খবরদার জল আসতে নেই খুকুমণি —ঠাকুর তাহলে···"

নিজের নোলা জলে অচল হইয়া পড়ায় বোধ হয় থামিয়া যাইতে হয়।

খুকির লোভটা অন্যত্র, রসনা আশ্রয় করিয়া ততটা নয়। রংচঙে কাপড়-চোপড়-জড়ানো মূর্তিটির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে, "ঠাকুল নোব।"

এবার খোকা একেবারে অকৃত্রিম ভাবে বড় হইয়া পড়ে। খুকির মুখটা খপ করিয়া চাপিয়া ধরে এবং যাহাতে এত বড় অনুচ্চারণীয় কথাটা ঠাকুরমা বা ঠাকুরের কানে না যায় সেই জন্য খুকির একেবারে মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া খুব চাপা গলায় বলে, "বলতে নেই খুকু, চুপ কর।"

এমন ভীষণ অন্যায়টা খুকি যাহাতে আবার না করিয়া বসে সেইজন্য তাহার মুখটা চাপিয়া বসিয়া থাকে এবং ঠাকুরমার পূজা সাঙ্গ হইতেই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া ওঠে, "খুকুর কথা শোন ঠাকুরমা, বলছিল ঠাকুর নেবে!

ঠাকুরকে পুতুল ভেবেছে! এবার ঠাকুর ওকে কি করবেন?"

ঠাকুরমা চারিটি মুঠা ক্ষীরে কলায় ভরিয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলেন, "কিছু কবলেন না এবারটি, আমি বলে দেব'খন।"

খোকা করুণাময় মুখ-চোখ কুঞ্চিত করিযা ঠাকুরমাব পানে চাহিয়া বলে, "হ্যাঁ ঠাকুরমা, বলে দাও, কচি মেযে বলে ফেলেছে একটা কথা—ওর তো জ্ঞান হয নি এখনও তত।…

ঠাকুরমাব সঙ্গে কথাবার্তায ঠাকুর যদি তাহার কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন সেইজন্য খোকা আগে থাকিতেই সাবধান হইয়া প্রশ্ন করে, "আমি কখনও বলেছি ঠাকুমা?"

২

না, খোকা বলিবে কি করিয়া? তাহাব পক্ষে তো বলা সম্ভবই নয়। সে যদি খুকুব মত না জানিত তবে তো বলিত? সে যে জানে ওটা পুতুল নয়, গোপাল। অবশ্য গোপালকে ঠাকুর ভাবিতে ওর এক এক সময় কি রকম মনে হয়—মনকে ভয দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া মনে করাইতে হয়; কিন্তু ওটা যে রথযাত্রার পাঁচুর মার দোকানের পুতুল নয়, এটা খোকা ঠিক জানে। এটা যে গোপাল তাহার একটা মস্ত বড প্রমাণ এই যে, দিনমানে এটা পুতুল হইয়া থাকে। এই যে লুকোচুরি এইটিই গোপালেব পরিচয়—গোপালের স্বরূপ। এ-পরিচয় খোকার জানা আছে…অবশ্য কথাটা খোকা আর গোপালেব মধ্যে একটা গোপন রহস্য। …ঠাকুরমা রাত্রে বৃন্দাবনের গল্প করিতে করিতে যখন ঘুমাইয়া পড়েন তখন হইতে আরম্ভ হয় গোপালের লুকোচুরির এই খেলা। আরম্ভটা খোকা ঠিক ধরিতে পারে না। খুব চেষ্টা করে, তবে এখন পর্যন্ত পারে নাই ধরিতে!

গল্প বলিতে বলিতে ঠাকুরমা ঘুমাইয়া পড়িলে গোপাল আসিয়া তাহার খুব নরম হতে খোকার চক্ষু দুইটি টিপিয়া ধরে—নিশ্চয় এই গোপালই, কিন্তু কেমন করিয়া ওর পাথরের হাত অমন ঘুমের মত নরম হইয়া যায় খোকা ঠিক বুঝিতে পারে না। গোপাল যখন ছাড়িয়া দেয় চোখ, তখন খোকা দেখে সে একেবারে তাহাদের খেলার জায়গায়—বিছানায় তাহার ঠাকুরমার পাশে আর শুইয়া নাই। সেখানে তালপুকুরের মত কালোজলে-ভরা যমুনার ধারে কদমগাছের আড়ালে আড়ালে তাহাদের লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে। তাহাদের বাড়ির মুংলীর মত অনেক গরু, বুধীর মত অনেক বাছুর—তাহাদের হাম্বারবের সঙ্গে—গোপ্যালের

বাঁশির শব্দ আর খেলায় ভরা যমুনার তীরে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। ঠাকুরমা যে গল্প বলিতে বলিতে ঘুমাইয়া পড়েন সব সেই রকম—সুদাম আছে, শ্রীদাম আছে, বলাই আছে, সুবল আছে—আরও কত সব আছে। গোপাল সকালে ঠাকুরমার কাছে পূজায়-পাওয়া ক্ষীর সর বিলি করে—যতই বিলি করে, ফুরায় না। কি করিয়া যে ফুরায় না খোকা এক এক দিন জিজ্ঞাসা করে।

ঘরের মধ্যে পূজার সময় গোপালের দিকে চাহিতে ভয় করে বটে, কেন না, গোপাল একদৃষ্টে ঠাকুরমার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে ; কিন্তু যমুনার তীরে খেলার সময় গোপালকে তো মোটেই ভয় করে না—তাহা হইলে তো ওদের নন্তকেও ভয় করিত। না, পূজার গোপাল যখন খেলার গোপাল হইয়া যায় তখন করে না ভয়, তাই খোকা করে জিজ্ঞাসা এক এক দিন, বলে, "তুমি এত ক্ষীর সর পাও কোথায় ? ঠাকুরমা তো তোমায় একটুখানি কবে দেন।"

গোপাল বলে, "পৃথিবীতে যত মা আর ঠাকুমা যত ক্ষীর সব লুকিয়ে রাখে আমি সব খুঁজে নিয়ে আসতে পারি !" যত ছেলেরা খেলে সবাই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে। খোকা চোখ বড বড করিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু কথাটা খোকার একটুও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, কেন না, ঠাকুরমাও তো খোকাকে এই কথা বলিযাছে কয়েক বার। খোকা জিজ্ঞাসা করে, "তারা কেউ কিছু বলে না তোমায় ?" ঘরের ঠাকুরের হাতে যেখানটায় বালা পরানো আছে, যমুনাতীরের গোপাল সেইখানটা খোকার সামনে বাডাইয়া ধরিয়া বলে, "এই দেখ না দাগ, মা বেঁধেছিল"···খোকা দেখে একটুও মিছে কথা নয়, কডাবাঁধা রাঙা দাগে হাতটা ফুলিয়া গিয়াছে।···আবার লুকোচুরি খেলা চলিতে থাকে—অবাধ খেলা—কাহারওই বাবা, কি কাকা কাছে নাই যে ধমক দিবে, এমন কি মা ঠাকুরমাও নাই যে মুখের ঘাম মুছিয়া, কি গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া খেলার মধ্যে বিরতি আনিবে।

রোজ, প্রত্যহ গোপাল আসিয়া যখন থেকে চোখ টিপিয়া ছাডিয়া দেয়, এই খেলা আরম্ভ হয়—শেষ হয় যমুনাতীরের সন্ধ্যাবেলার সূর্য ভোরবেলায় যখন খোকাদের ঘরের সামনে নন্তদের অশত্থগাছের পাতায় পাতায় রঙের ছিটে ছডাইতে থাকে।

খুকি ভাবে ঠাকুর পুতুল। কচি মেয়ে—ভাবুক ; কিন্তু খোকা জানে ঠাকুর কে ; খোকা জানে ঠাকুরের হাতের বালার নীচে তাঁর মায়ের বাঁধনের রাঙা দাগ লুকানো আছে। ঠাকুরমাও বলে—আছে। খোকা যেমন ঠাকুরমার কাছে

শুনিয়াছে, ঠিক তেমনই করিয়া গোপাল বলে, "এ দাগ আমার সোনার বালার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। এই দাগের লোভেই তো মাযের ভাঁড থেকে ননী চুরি করি আমি।"—খোকা ঠিক বোঝে না কথাটা—বাঁধনের দাগ কেন লাগিবে ভাল?

গোপাল পাথরের গোপাল হইয়া লুকায়, যখন যমুনাতীরের গোপাল হইয়া যায়, মাযের বাঁধনের রাঙা দাগ মেলিযা ধরে।

এক এক দিন পূজার সময় প্রসাদের জন্য বসিযা বসিয়া খোকা এই লুকোচুরির ঠাকুরের চেখের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার যেন এক একবার মনে হয় কালো পাথরের ওপর টানা সাদা চোখে কি-একটা হয়—মনে হয় একটা দুষ্টু হাসি চোখের কোণে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া পডিয়া গোপালের সমস্ত মুখটাতে ছডাইয়া পডে। প্রায় কথাই কওয়ার মত কি এক ধবনের হাসি, কত দিনের চেনা—যমুনাতীরের কত কি সব যেন চারিধারে ওঠে জাগিয়া।

আবার সব মিলাইয়া যায়;—হাসি, বাঁশি, সুদামভাই, ফোটাফুলে-ভরা কদমগাছ, পেখমধরা ময়ূর—সব। খোকা ঠাকুরেব চোখের দিকে চাহিয়া খোঁজে, যত খোঁজে ততই আরও পায না; ভাবে ঠাকুবমার গোপালেব হাসিটি পর্যন্ত কি লুকোচুরিই না জানে!—ভয়ানক আশ্চয বোধ হয় খোকার।

৩

আজ কযেক দিন হইতে সমস্ত বাডিটি বড বিষণ্ণ হইয়া আছে। ঠিক এ-ধরনের অভিজ্ঞতা খোকার জীবনে এ পযন্ত হয় নাই। বাবা ডাকিয়া আদর করিতেছে না, খোকাকে তো নয়ই, এমন কি খুকিকে পর্যন্ত নয়। কাকা বই হারাইলে আগে মারিত তাহার পর আদর করিত; বেশি মারিলে খেলনা পর্যন্ত কিনিয়া দিত এমন আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটিয়াছে কযেকবার। আজ দুই দিন হইতে বই কোথায় আছে তাহার খোঁজই করে না। খোকার মনটা এক একবার যেন কান্নায় ভরিয়া ওঠে, শুধু কি লইয়া কাঁদিবে বুঝিতে পারে না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে। আজ সকালে বাবা কোথায় গেল? আগে যখন কোথাও যাইত, খোকাকে খুকিকে চুমা খাইয়া যাইত; আজ ঠাকুরমাকে আর কাকাকে কি বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। খোকার ঠোঁট ফুলিয়া যাইতেছিল বলিয়া কপাটের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বাবা তো ডাকিলও না একবার।

ওদিকে মায়ের অসুখ। কাকা বলে খুব শীঘ্র ভাল হইয়া খোকাকে আর খুকুকে আদর করিবে বলিয়া খুব ঘুমায়। কাকা ঘুম ভাঙাইতে বারণ করিয়াছে খোকাকে। খোকা কখনও তো মাকে জ্বালাতন করে না খুকির মত। বড়রা কখনও মাকে জ্বালাতন করে? কিন্তু মাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনটা যে ছটফট করিতেছে।

খোকা দিনগুলাকে আবার সেই পুরানো খাতে চালাইবার জন্য নিজেই একবার ওপরপড়া হইয়া চেষ্টা করিল। কাকার সবচেয়ে মোটা ডাক্তারী বইটা কাঁধের ওপর সাপটাইয়া লইয়া কাকার ঘরের দরজার পাশে গিয়া দু-একবার উঁকি মারিল, তাহার পর প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া চৌকাঠ ডিঙাইয়া বলিল, "কাকা, কি দুষ্টু খুকু!—তোমার বইটা লুকিয়ে রেখেছিল, ভাগ্যি আমি…"

কাকা ফিরিয়া চাহিতে খোকা দেখিল, কাকার চোখ জলে ভরা! কাকাকে তো কেহ মারে নাই—তবে?…খোকার মনটা কি রকম হইয়া উঠিল। কাকা যদি বলিত, "খোকা, তোমারই কাণ্ড বই লুকুনো"—তাহার পর যদি চিরাচরিত পদ্ধতিমত একটা চাপড় বসাইয়া দিত, খোকা রাজি ছিল—তাহার পর আদর না করিলেও তাহার দুঃখ ছিল না। চোখে জল দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। এ দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই,—বড়রা কাঁদিবে কেন? কে তাহাদের মারে?

বইটা আস্তে আস্তে কোন রকমে এক জায়গায় রাখিয়া দিয়া খোকা চোরের মত গা লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার মনটাতে কি রকম একটা হইতেছে—কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব—খোকা চাহে না কেহ তাহাকে এ-অবস্থায় দেখিয়া ফেলে—কাকা, ঠাকুরমা, কেহই নয়, এমন কি খুকি পর্যন্ত নয়।…তাহার পর আবার কি হইল খোকা বুঝিতে পারিল না—তবে এই না-মার খাওয়া, না-বকুনি খাওয়ার অপমানে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাকা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে কোলে জড়াইয়া মুখ নীচু করিয়া প্রশ্ন করিল, "খোকা, তুই কাঁদছিস? কেন রে? মার জন্যে মন কেমন করছে? মাকে তো গোপাল ভাল করে দেবেন, কান্না কিসের? চল্ দিকিন, সারদার দোকান থেকে তোকে নতুন একটা খেলনা কিনে দিই…"

মায়ের নামে খোকার মনে সেই কেমন-কেমন ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। আবার অন্য দিক দিয়া যেন একটা কূল পাইল—কিছু বুঝিতে

পারিতেছে না, অথচ যে একটা কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহার জায়গায় মাকে লইয়া দুঃখ, অভিমান—খোকা যেন একটা আশ্রয় পাইল। মা'র সে তত ভক্ত নয়, ঠাকুরমা আর কাকা লইয়াই তাহার জীবন, তবু খোকা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "মার কাছে যাব আমি…"

ভাল করিয়া প্রকাশ্যে কাঁদিয়া বাঁচিল যেন।

কাকা বলিল, "নিশ্চয় যাবি, বাঃ, যাবি নি!…তোর মা এখন ঘুমুচ্ছে খোকা, যেই উঠবে তোকে নিয়ে যাব! ততক্ষণ খেলনা নিয়ে আসি গে চল্।…খুকুর জন্যে কি খেলনা নিবি খোকা?…খুকুকে যে বড্ড ভালবাসে খোকা আমাদের; দাদা হয়, বাসবে না? বা রে!"

খোকার আব কান্না নাই, তবে চোখে জল আছে এবং কান্নার বিরামে এক-একবার ফুঁপাইয়া উঠিতেছে। বলিল, "খুকু ভারি দুষ্টু—মা'র মুনা খাব বলে।"

"হ্যাঁ, খুকু ভা—রি দুষ্টু, মাকে ঘুমোতে দেবে না, খালি বলবে মুনা খাব। কৈ খোকা তো বলে না…খোকাকে খুব বড খেলনা দিতে হবে। চল, কিনে নিযে আসি…"

নামিয়া উঠান দিয়া যাইবে, ওদিককার ঘর থেকে ঠাকুরমা বাহির হইয়া আসিলেন, ডাকিলেন, "বডখোকা, কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে? এদিকে আয়।"

খোকা হওয়ার পর খোকার কাকা বডখোকা হইয়াছে, কতকটা শঙ্কিত ভাবে মার পানে চাহিয়া খোকাকে লইয়া অগ্রসর হইল। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল "কেমন আছে বৌদি? আবার বাড়ল নাকি?"

মা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "বুঝছি না। খোকাকে দেখতে চাইছে, আয় নিয়ে একবার বাছা, কোন দোষ হবে না।"

ছেলে একটু ভাবিল। ডাক্তার বলিয়া গেছেন, ছেলেমেয়েকে দূরে দূরে রাখিতে একটু—কাছে থাকিলে ভাবাবেগে মুমূর্ষু রোগিণীর আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনা আছে!…অথচ যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন অভাবের বেদনাও তো কম আশঙ্কার বিষয় নয়।

সে মাত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বৌদির সঙ্কটের কথা শুনিয়া আজ তিন দিন আসিয়াছে। গ্রামের একমাত্র ডাক্তার করুণাবাবু মহকুমায় গিয়া কি করিয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, কাল রাত্রে আসিবার কথা ছিল, আজ এখন পর্যন্ত আসেন নাই, এদিকে রোগিণীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তার আসে না দেখিয়া দাদা

নিজে আজ সকালে মহকুমায় গিয়াছে, করুণাবাবু না আসিতে পারেন, অন্য ডাক্তার লইয়া আসিবে। বড়খোকা অকুল পাথারে পড়িয়াছে।

একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, একটু দাঁড়াও মা, বুকটা একবার দেখে নিই।"

ঘর হইতে স্টেথস্কোপটা আনিয়া রোগিণীর ঘরে প্রবেশ করিল। একটু পরে বাহির হইয়া আসিল—মুখটা খুব বিষণ্ণ।

মা চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না।

বড়খোকা খোকার হাতটা ধরিয়া বলিল, "চল্ খোকা, মা'র তোর ঘুম ভেঙেছে!"

খোকা আজ দু'দিন পরে মা'র কাছে আসিল। ঘরের বাতাসটায় কি একটা আছে, খোকার বড় ভয় করিতেছে। মাকে এ রকম কখনও দেখে নাই, এত রোগা···পরশুও তো মা'র অসুখ ছিল, দাওয়ার রোদে বসিয়া তাহাকে গল্প বলিয়াছে, খুকুর পুতুলকে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। মাকে দেখিয়া ভয় করে আজ!

মা ইশারা করিয়া খোকাকে ডাকিল। খোকা পা উঠাইতে পারিল না, ঠাকুরমার কাপড়টা খামচাইয়া ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুরমা এক হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "চল দাদু, মা ডাকছে।"

কতকটা জোর করিয়াই খোকাকে তুলিয়া খাটের ওপর মা'র কাছে বসাইয়া দিল। খোকার এমন বিচিত্র অনুভূতি জীবনে কখনও হয় নাই; ভয়ে, লজ্জায়, আরও সব কিসে-কিসে সে জড়সড়, মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল।···মা আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে, চোখ দিয়া আস্তে আস্তে জল গড়াইয়া পড়িতেছে···অনেকক্ষণ পরে—প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, এই রকম আওয়াজে বলিল, "কেঁদ না যেন, সোনা আমার।"

ঠাকুরমা খোকাকে বুকে চাপিয়া নামাইয়া লইয়া বাহিরে আসিল। কাকা ঘরেই রহিয়া গেল।

খোকা মুখ তুলিতে সাহস করিতেছে না; বাহিরে আসিতে আসিতে ঠাকুরমারও কান্না নামিল নাকি?

৪

একটা অব্যক্ত ভয় যেন খোকার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। খোকা অসুখ কাহাকে বলে জানে। অসুখে লেপ মুড়ি দিয়া কাঁপে লোকে, সাবু খায়, কাজ না করিয়া দাওয়ার রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর গোপাল ভাল করিয়া দেন—দু'দিন পরে রুটি খায়, তাহার পর ভাত। খোকার কাছে অসুখের এই স্বরূপ বিশেষ অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ এটা কি ? গোপাল এখনও ভাল করিয়া দেন নি কেন ?···এর পরের অবস্থাটা খোকার অভিজ্ঞতার একেবারেই বাহিরে—চিন্তার মধ্যেই আসিল না···তবে অন্য নানান রকম প্রশ্ন—বিশেষ করিয়া গোপালের এই নিশ্চিন্ততা তাহার সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া তাহার মনটা ভার করিয়া রাখিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা ;—মা'র কত কষ্ট হইতেছে ! না, মা ভাল হইয়া যাক্,—এ-মাকে দেখিলে ভয় হয়—মিছামিছি কান্না আসে, বড় কষ্ট হয়···

মাকে দেখার পর হইতে সমস্ত বিকেলটা খোকা খুব শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হইয়া রহিল, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সে বায়না ধরিল।

বায়নার কোন হিসাব নাই। আরম্ভ করিল মা'র কাছে যাইবে বলিয়া, সন্ধ্যার সময় রোগিণী আরও নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে, কাকা বলিল, একটু থাম্ খোকা, আবার তোকে যাব নিয়ে···খোকা গিয়ে মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে, তাইতেই তো ওর মা ভাল হয়ে যাবে।···খোকা, তুমি বড় হয়েছ, দাদার চেয়েও বড় খোকা, খোকাই তো বাড়ির কর্তা এখন। কই, খোকা, তোর মাকে ডাক্তার হয়ে দেখছি—টাকা দে···!"

রহস্যটা করিয়া কাকা হাসিয়া উঠিল, খোকা কিন্তু যোগ দিল না। তিনটা আঙুল মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, "মা'র কাছে যাব।"

কাকা অশেষ প্রকারে খোকাকে বড়, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, লক্ষ্মী প্রতিপন্ন করিল, কত রকমের প্রলোভন দিল ; সব কথার শেষেই খোকার ওই একটি কথা, "মা'র কাছে যাব।"

আবদার যখন কান্নায় দাঁড়াইল খোকাকে বাহিরে লইয়া যাইতে হইল, এবং সেখানেও যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, কাকাকে হার মানিয়া রাজি হইতে হইল। খোকা বলিল, "না, যাব না, আগে কেন নিয়ে যাও নি ?"···কত সাধ্যসাধনা, ওদিকে মাও একবার দেখিতে চাহিয়াছে—কোনমতেই যাইবে না খোকা—

তাহাকে আগে কেন লইয়া যাওয়া হয় নাই ?···মা ছাড়িয়া জিদটা দাঁড়াইল খাওয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই না-খাওয়া লইয়া—আরও যত রকমের সব আদাড়ে জিদ। কোল মানে না, শাসন মানে না—কাকা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল···।

রোগিণীর কাছ থেকে উঠিবার জো নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমাকে উঠিয়া আসিতেই হইল। বলিলেন, "তুই বোস গিয়ে বড়খোকা বৌমার কাছে, আমি আসি একটু সাম্‌লে ওকে।···যতীন এ-গাড়িতেও এল না···আজকের রাতটা···"

নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া আঁচলে চক্ষু দুইটা মুছিয়া বলিলেন, "শ্রীহরি শ্রীহরি···এস তো দাদু, আজ অত আবদার করতে আছে? মাকে তাহলে গোপাল ভাল করে দেবেন কি করে ?"

ঠাকুরমার কাছে আসিয়া খোকা অল্পক্ষণেই শান্ত হইয়া গেল। বধূ অসুখে পড়া পর্যন্ত নবীনের মা রান্না করিয়া দিতেছে। ভাত লইয়া কত গল্পের সহযোগে নাতিকে খাওয়াইয়া ঠাকুরমা বিছানায় উঠিলেন। নবীনের মার মেয়ে খুকিকে ঘুম পাড়াইয়া শোওয়াইয়া গিয়াছে ; এক দিকে নাতনী আর এক দিকে নাতিকে লইয়া ঠাকুরমা শুইলেন। তাহার পর গল্প আরম্ভ হইল।

"গোপালকে ক্ষীর নাড়ু দিও না ঠাকুমা, আগে মাকে ভাল করে দিন···কি করছেন গোপাল, ঠাকুমা ? তুমি বলেছিলে গোপালকে ঠাকুমা ?"

"বলেছিলাম বই কি দাদু, আজ থেকে বলছি ? কতবার বলেছি—তোমাদের ভালয় ভালয় রেখে যেন যেতে পারি ; কতবার বলেছি—ঠাকুর, আমার তো হল ঢের, এবার ডেকে নাও আমায়। তা কাকে ডাকতে কার ডাক পড়ল···"

কান্নাটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

খোকা ঠিক বুঝিতেছে না—প্রশ্ন করল, "কেন ডাকবেন ঠাকুমা ?—খেলবার জন্যে ?

ঠাকুমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "ঘুমো দাদু একটু তাড়াতাড়ি আজ ; মনটা তোর মা'র কাছে পড়ে রয়েছে।"

খোকা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল একটু, কিন্তু গোপালের আচরণ লইয়া মনে অজস্র প্রশ্ন যাওয়া আসা করিতেছে, ঘুম আসিবার পথই বন্ধ। একটু পরে ধীরে ধীরে ডাকিল, "ঠাকুমা !"

ঠাকুরমা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, বলিলেন, "ঘুমোস নি এখনও ? এই দেখ !"

খোকা তাহার দুর্ভাবনার একটা যেন সমাধান পাইয়াছে, অনেক ভাবিয়া বলিল, "তোমার কথা গোপাল বোধ হয় শুনতে পান নি।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "হবে।" তাহার পর উদ্গত অশ্রুর সঙ্গে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তিনি সব শোনেন, শুধু আমার কথাই শুনতে পান না কেন দাদু—কি দোষ করেছি আমি?"

এ তো আরও গুরুতর সমস্যা। খোকা ভাবিল, তাহার পব বলিল, বোধ হয় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন ঠাকুমা।"

ঠাকুবমা বলিলেন, "ঠিক ধবেছিস দাদু তুই, ওঁব বাঁশিই হয়েছে কাল, ঘরে ঘবে আগুন লেগে যাচ্ছে, এত লোকেব হাহাকার কান্না ওর কানে যায় না। চাষেব মাঠ ফেটে চৌচির হযে যাচ্ছে, গেরস্তর গোলায় ধান নেই, অত সাধের ধেনু তাঁর—তাবাও এক মুঠো খড পায় না। এদিকে কেউ নাডিছেঁড়া ধন শ্মশানে দিযে আসছে—আমিই এই ঘরের লক্ষ্মী সোনার প্রতিমে বিদায় দিতে বসেছি—এত দুঃখু, এত হাহাকার তাঁব কানে যায় না! বাঁশি নিয়েই তিনি বিভোর। থাকুন, কিন্তু আমায় আর এত দগ্ধাচ্ছেন কেন দাদু?"

কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইযা উঠিল।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় ঠাকুরমা প্রশ্ন করিলেন, "ঘুমোলি দাদু?"

খোকা হাতে ভর দিযা একটু উঠিযা বসিল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ঠাকুমা, বাঁশি ভেঙে দেবে,—কুটিলা যেমন দিয়েছিল?"

এত দুঃখেও ঠাকুরমার মুখে হাসি আসিয়া পডিল, না ঘুমাইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নাতি একটা মতলব ঠাহর করিযাছে বটে। বলিলেন, "তাই হবে'খন; তুই এখন ঘুমো দাদু একটু। পিদ্দিমটাও নিবে আসছে।"

চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া ঘুম পাডাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খোকার কিন্তু আজ অনেক সমস্যা—গোপালের এই এত ব্যাপারের মধ্যে বাঁশি বাজানোর ব্যাপারটা তাহার অধিকতর দুর্বোধ্য এবং ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ খেলার সময় খুব রাগিয়া গোপালকে বলিবে সে।

অনেকক্ষণ কাটিল—অন্য বারের চেয়েও কিছু বেশিক্ষণ—তাহার পর খোকা আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকুমা!"

"কি রে ডাকাত? দেখ তো কাণ্ড!"

"আমি ঘুমুচ্ছি কি না জিগ্যেস করলে না?"

"তুই তো জেগে রয়েছিস দেখছি।"

"এইবার ঘুমুব। সত্যি, তুমি চোখে হাত দিয়ে দেখো..."

ঠাকুরমা খানিকক্ষণ পরে ডাকিয়া সাড়া পাইলেন না। কিন্তু কি ভাবিয়া একবার চোখে হাত দিয়া বুঝিলেন, খুব জোরে চোখ বুজিয়া থাকিবার জন্য খোকাব নাক মুখ সব কুঁচকাইয়া রহিয়াছে এবং চোখের পাতা একটু একটু কাঁপিতেছে। হার মানিযা বলিলেন, "এই তোমার ঘুম? তবে থাক শুয়ে তুমি—নবীনের মাকে ডেকে দিই। আর তোমার সঙ্গে গল্প করলে আমার চলবে না।"

৫

সমস্ত রাত বধূকে লইয়া মাতাপুত্রে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। পুত্র প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভ্রাতৃজায়াকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের অসম্পূর্ণ ডাক্তারী বিদ্যায যতটা কুলায় চেষ্টা করিয়াছে—মা করিয়াছেন অতন্দ্রিত প্রার্থনা গোপালেব কাছে —"হে ঠাকুর, বাঁশি ছাড, ফিবিয়ে দাও আমার সোনার কমল—ছাড বাঁশি একদিনের তরেও, নইলে শিশুর মুখেও তো দুর্নাম রয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে..."

রোগিণীর অবস্থা ঠিক বোঝা যাইতেছে না। ভোরের একটু আগে একবার খোকা আর খুকিকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তুলিয়া দু'জনকেই দেখানো হইল। তাহার পর হইতে আরও নিঝুম হইযা রহিয়াছে।

... ...

ভোর হইয়া গেছে। বডখোকা নিজের ঘর হইতে একটু যেন ব্যস্ত হইয়া আসিল। রোগিণীর বিছানার এদিক ওদিক, বালিশের নীচে কি একটা খুঁজিতে লাগিল উদ্বিগ্ন ভাবে। মা প্রশ্ন করিতে বলিল, "স্টেথস্কোপটা পাচ্ছি না,—একটু আগে বৌদির বুকটা দেখে নিয়ে গেলাম ওঘরে—"

মা প্রশ্ন করিলেন, "নেই?"

"না—একবার বুকটা দেখতে হবে যে! বেশ মনে পডছে নিয়ে গিয়ে বাইরে চেয়ারের হাতলটায় রেখে মুখটুকু ধোয়া সেরে নিতে গেলাম। আধ ঘণ্টাও হয় নি, ফিরে এসে দেখি!..."

পাডায় হনুমানের উপদ্রব, কি যে হইয়াছে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। মায়ের হাতটা বধুর মাথার উপর জপে নিরত ছিল, উগ্র নিরাশায় টানিয়া লইয়া বলিলেন, "সব নাও ঠাকুর, চিকিচ্ছের সান্ত্বনাটুকুও আর রেখ না—"

চোখে অঞ্চল দিয়া বধুর শিয়র হইতে নামিয়া কতকটা জোরেই কাঁদিয়া

উঠিয়াছেন, এমন সময় বাহিরে কড়া-নাড়ার শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বড় ছেলের গলার আওয়াজ, "মা,—বড়খোকা!"

বড়খোকা তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। দাদা আর করুণা ডাক্তার! দাদা শুধু প্রশ্ন করিল, "আছে?"

করুণা ডাক্তার গিয়া রোগিণীর পাশে বসিল। শান্ত প্রকৃতির লোক, ধীরে ধীরে হাতটা তুলিয়া লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ীটা পরীক্ষা করিল, তাহার পর "হুঁ—" করিয়া ধীরে ধীরে একটা শব্দের সঙ্গে বড়খোকার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দিয়েছিলে?"

"খুব খারাপ অবস্থা দেখে একটু মকরধ্বজ..."

ডাক্তার রোগীর দিকে চাহিয়া ভেতর পকেটে হাত দিয়া একটু থমকিয়া গেল, বলিল, "হুঁ, ঠিক ফেলে এসেছি, যতীন যা তাড়া দিলে; দেখি তোমার স্টেথস্কোপটা।"

বড়খোকার মুখটা একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "সেটা পাচ্ছি না, বাইরে রেখেছিলাম, বোধ হয় হনুমানে..."

মা একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও করুণা, তুমি ওকে রাখতে পারবে না বাবা, গোপালই আজ বিমুখ আমার ওপর—সব পথ বন্ধ করে..."

ডাক্তার বৃদ্ধার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "চুপ কর খুড়ী।...বড়খোকা, তুমি একবার ছোট আমার ওখানে সাইকেলটা নিয়ে। আর যতীন, তুমি দেখ ভাল করে খুঁজে—হনুমানেরা এখন ঘুমুচ্ছে, স্টেথস্কোপের লোভে কেউ ঘুম ছেড়ে উঠবে না।"

হারাইলে লোকের প্রকৃতিই হইতেছে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খোঁজা। সম্ভবপর জায়গায় গেল না পাওয়া, তখন অসম্ভব জায়গায় খোঁজ পড়িল এবং গেল পাওয়া।

পূজার ঘরটা একটু ওদিকে একটেরেয়। দেখা গেল—ঘরের দুয়ারটা খোলা এবং চৌকাঠের সামনে একটা কাঠের চেয়ারের উপর একটা বেতের মোড়া বসানো। স্বভাবতই একটু কৌতূহল হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়া যতীন যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—

ঠাকুরের হাতে রূপার ডাণ্টির ছোট বাঁশিটা নাই, নীচে দুই খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে!

শুধু তাহাই নয়, বাঁশির জায়গায় দুই হাতের আঙুল দিয়া গলানো একটা স্টেথস্কোপ।...ঠাকুরেব সাদা সাদা চোখের নির্বিকার দৃষ্টি শূন্যে চাহিয়া আছে।

হাত পা ধুইয়া রাত্রের কাপড় ছাড়িয়া স্টেথস্কোপটি গোপালের হাত হইতে সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। ততক্ষণে বড়খোকাও ওদিক হইতে ডাক্তারের নিজের স্টেথস্কোপ লইয়া সাইকেল হইতে নামিল।

... ...

ডাক্তার সব শুনিল। নিজের ভাল স্টেথস্কোপটাই হাতে কবিযাছিল, একবার কি ভাবিল!...সমস্ত গ্রামটাই বৈষ্ণবপ্রধান।...ধীরে ধীরে ফিবাইয়া দিয়া যতীনকে বলিল, "দাও তোমারটাই দেখি।"

ভাল করিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া একটা শান্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, "মকরধ্বজটা কাজ কবেছে। হার্টের একশনটাও ভাল।—কই, গোপালের শাসকটি কোথায় লুকুলেন?"

দেশের মেয়ে

১

মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "দু'বছর ধরে ছেলে চাকরি করছে—যেমন তেমন চাকরি নয়, দারোগা-গিরি—লোকে জজিয়তি ছেড়ে যা কামনা করে,—পাড়াগাঁয়ে থাকা, তাও আবার এ-দেশের পাড়াগাঁ;—ছেলের তোমার কিন্তু শরীর ফিরছে কই বৌদি?

কথাটা সত্য নয়; বসন্তের শরীর বেশ ফিরিয়াছে; স্বাস্থ্যহীনদের শরীর ফিরাইবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট দারোগাগিরির প্রবর্তন করিয়াছে এমন নয়,—হাডভাঙা খাটুনি আছে, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, সুনিদ্রার ব্যাঘাত—তবুও বিহারের পাড়াগাঁয়ের দুধ ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবারের জোরে এবং অগাধ একাধিপত্যের আনন্দে বসন্তের শরীর বেশ ভাল ভাবেই স্থূলত্ব লাভ করিয়াছে—বাঙালীর শরীরের যা চরম উৎকর্ষ। মিত্র-গৃহিণীরও যে সম্প্রতি দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়াছে এমন নয়। প্রকৃত কথাটা এই যে, তিনি আজ বসন্তের সেজ ভাইয়ের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহের কথাটা পাড়িতে আসিয়াছেন। মনে মনে একটা

যুৎসই গৌরচন্দ্রিকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীরটা লইয়া বসন্ত বাহির হইতে আসিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিল।

বসন্তেব মা বিমর্ষভাবে বলিলেন, "সে কথা কে বলবে বল ঠাকুরঝি ? বললেই একবাশ জামা বের করে বলবে, 'এইটে ছোট হয়ে গেছে, এইটে সেলাই খুলে পড়ছে, সাত সেব ওজন বেড়েছে।'…দাঁড়িপাল্লা ধবে মানুষ ওজন করা! আমি হাব মেনে বলা ছেড়ে দিয়েছি বাপু…কই গো বৌমা, তোমার পিসশাশুড়িকে পান জর্দা দিয়ে যাও।"

"আসছে, ব্যস্ত কিসের ?…হ্যাঁ, আজকাল ঐ এক ওজন ওজন বাই হয়েছে। সেদিন নন্তে এসে বললে, 'মা, কাকার তিনটাকার মাংস বেড়েছে'…'সে কি বে ?' 'হ্যাঁ গো, ছ-আষ্টে আটচল্লিশ, তিন ষোলং আটচল্লিশ'…বুঝতে কি পারি ? শেষে টের গেলাম হাঁসপাতালের কলে তৌল করে দেখা গেছে খুড়োর নাকি আট সের ওজন বেড়েছে ; গুণধর ভাইপো ছ'আনা করে তার হিসেব করে লাভ দেখাচ্ছেন—বাজারে পাঁঠার যা দর আর কি !…"

একটা হাসির রোল উঠিল। সেটা থামিলে দম লইয়া মিত্র-গৃহিণী বলিলেন, "জ্বালার কথা আর ব'লো না। বসুর আমাদের কিন্তু তদারকের দরকার হয়ে পড়েছে বৌদি। বেটাছেলে যদি নিজের শরীরের হেফাজৎ করতে পারত তো আর ভাবনা ছিল না। বৌমাকে সঙ্গে দিচ্ছ না কেন ?"

"এই প্রথম ঘর করতে আসা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, একটা সংসার ঘাড়ে করতে কি পারবে এর মধ্যে ?"

"ওমা, পারবে না,…আর সংসার করা তো তোমার আশীর্বাদে ঝি-চাকর-ঠাকুরদের ওপর নজর রাখা ; কিসের অভাব গা বসন্তর আমার ? আর অন্য দিকেও তো দেখতে হবে বাপু। বৌদি আমার সেই নিজের প্রথম ঘর করতে আসার কথা ধরে বসে আছেন—এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এলেন, নাকে নোলকটি দুলদুল করছে—লক্ষ্মী-প্রতিমের মতন ; এখনও চোখের ওপর যেন ছবিটি লেগে রয়েছে আমার…"

বসন্তের মা একটু লজ্জিতভাবে মিত্র-গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর উনি তখন পাকা গিন্নী!…একাল সেকালের তফাত বুঝি ঠাকুরঝি, মনে করেছিলাম মাস দু'তিনের জন্যে না হয় নিয়ে যাক সঙ্গে করে ; আবার ভাবছি…"

বধূ পান-জর্দা আনিয়া মিত্র-গৃহিণীর হাতে দিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। চিবুক-স্পর্শে চুম্বন করিয়া পাশে বসাইয়া মিত্র-গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন,

"হ্যাগো, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে—থাকতে কষ্ট হবে নাকি নবাবের ঝির ? আমি তো বাছা তখন থেকে তোমার শাশুড়ির কাছে তোমার বাপের যশ গাইছি—ও সোজা লাঙলঠেলা চাষার মেয়ে নয়, খুব পারবে—না গো বৌদি, কোন ভয় নেই, ছেলেমানুষ হলে কি হয়, কাজকর্মে বুদ্ধিতে মা আমার ঠিক আমার পুঁটুর মতন চৌখস মেয়ে, ভাবও তেমনি দুটিতে, যেন ঠিক মায়ের পেটের বোন। সেদিন পুঁটু এসেছিল, ঠায় চেয়ে দেখছিলাম কিনা—দুটিতে এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছিল, এমন মানাচ্ছিল।...এ তো তোমার এখানকাব জদা নয় বৌদি !"

জর্দাটা এখানকারই, মিত্র-গৃহিণীর রসনায় যে অপরিচিত এমন নয়। বসন্তের মা বলিলেন, "লক্ষ্ণৌয়ের, তোমার পিসশাশুড়িকে একটু এনে দাও না বৌমা।"

"তা দাও, একটু মুখ বদলানো হবে মাঝে মাঝে...তুমি ঐ কব বৌদি, না বাপু, ছেলেটার দিকে যেন চাইতে পারা যায় না, আর সত্যিই তো গা..."

"বলব ওঁকে আজ, সত্যি কদিন থেকে দোমনা হয়ে রয়েছি ছেলেটার শরীব দেখে..."

"শোন কথা বৌদির! উনি দাদার রায় নেবেন! কার রায়ে এত বড সংসারটা চলছে সেকথা যেন আমার কাছেও লুকনো আছে!"

বধূর পিঠে একটা সস্নেহ স্পর্শ দিয়া বলিলেন, "এই সোনার প্রতিমেই কে পছন্দ করে ঘরে এনেছিল গা ?"

২

এই অধ্যায়টি বসন্তের সহধর্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর একটু পরিচয় দিয়া আরম্ভ করা ভাল। সে নূতন ঘর করিতে আসিয়াছে এবং জন্মতারিখের হিসাবে বোধ হয় অপ্রাপ্তবয়স্কাও বলা চলে, তাই বলিয়া তাহাকে কাঁচা মেয়ে মনে করিলে বেজায় ভুল করা হইবে। তাহার বিবাহ হইয়াছে পশ্চিমের এক দারোগার সহিত,—তাহার মা, খুড়ী, পিসি এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন এবং সাধ্যমত তাহাতে এইরূপ রুক্ষ দেশ এবং উগ্র স্বামীর জন্য,—তালিম দিয়া পাঠাইয়াছেন। মেয়েটি বাহ্যত বেশ ধীর, নম্র এবং হাস্যময়ী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় গম্ভীর, সন্দিগ্ধ, সতর্ক, এবং এ গাম্ভীর্য, সন্দিগ্ধতা ও সতর্কতা বিশেষ করিয়া দুইটি বিষয়ে পরিস্ফুট,—প্রথমত এদেশের লোকের সম্বন্ধে, স্ত্রী পুরুষ

নির্বিচারে ; দ্বিতীয়ত স্বামীর সম্বন্ধে। অনেক মাস্টার আছে যাহারা টেবিলে বেঞ্চে, এমন কি দু'একটা নিরীহ পৃষ্ঠেও বেত আছড়াইয়া তবে সেদিনের কার্য আরম্ভ করে ; তাহাতে নাকি ফল ভাল হয়। বসন্তের নবীন দাম্পত্য-জীবনের সব খুঁটিনাটির হিসাব রাখা সহজ নয় ; মোটামুটি এই কথা বলা চলে, হিরণ স্বামী সম্বন্ধে মূলত মাস্টারের নীতি অবলম্বন করিয়াই সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বসন্ত-দারোগার অমন কুলোপানা চক্র এবং ফোঁসফোঁসানি এক জায়গায় আসিয়া যে কিরূপ নিষ্ক্রিয়, তাহা পরে দেখা যাইবে। আগে বসন্ত ছিল অখণ্ড, —দারোগাবাবু বলিলেই তাহার পরিচয় পূর্ণ হইয়া যাইত ; এখন তাহার দুইটা সত্তা আছে,—দারোগা-বসন্ত এবং স্বামী-বসন্ত।

দারোগা এবং স্বামী এই পদবী দুইটি বাঙালীর অভিধানে তুল্যার্থক হইলেও এ ক্ষেত্রে কোন মিল নাই—দারোগা বসন্ত যে পরিমাণে উগ্র, স্বামী বসন্তটি ঠিক সেই পরিমাণে নিরীহ হইয়া আসিতেছে। কথাটা যে নিতান্ত মনগড়া নয় পরবর্তী কাহিনীতেই তাহার পরিচর পাওয়া যাইবে।

মিত্র-গৃহিণীর পরামর্শে বসন্ত হিরণ্ময়ীর অভিভাবকত্বে যখন কর্মস্থলে আসিয়া হাজির হইল, তখন সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। স্টেশন হইতে ষোল মাইল পথ, সওয়ারি—বলদের পাল্কি-গাড়ি, স্থানীয় ভাষায় শাম্পেনি বলে।

বসন্ত যতক্ষণ একবার থানাটা তদারক করিয়া আসিতে গেল ততক্ষণ হিরণ একবার সমস্ত বাড়িটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দক্ষিণ ও পশ্চিমে দু'সারি ঘর, মাঝখানে পাঁচিল দিয়া ঘেরা উঠান। উঠানের এক কোণে একটি পাতকুয়া, পাশেই একটা জেয়ল গাছে আড়াআড়িভাবে একটি ধনুকাকার বাঁশ বাঁধা, তার এক দিকে ছিপের আগায় বঁড়শির মত একটা বড় অর্ধডিম্বাকার বালতি ঝুলিতেছে, অন্য দিকে ভারসাম্যের জন্য একটা ঢেঁকির আধখানা বাঁধা। সব মিলিয়া যেন একটা চড়কগাছের মত দেখিতে হইয়াছে।

নিশ্চয় বেশ ভাল করিয়া বাঁধাছাঁদা আছে, তবুও কেমন মনে হয় বাঁশ বালতি ঢেঁকি তিনটিই যেন ঘাড়ে পড়িবার চক্রান্ত করিয়া মাথার উপর আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে। এ-জাতীয় জিনিস হিরণ এর পূর্বে দেখে নাই—বাংলা দেশে তো নয়ই, শ্বশুরবাড়ি আসিয়াও নয়। মনে মনে মা-কালীকে স্মরণ করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। মনটা একটু খিঁচড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের দিকে গেল। রসুইয়া-ঠাকুর মনিব আসিতেই একবার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিজের এলাকার মধ্যে আসিয়া চা আর হালুয়ার

বন্দোবস্ত করিতেছিল। নবাগতা কর্ত্রীকে তাহার ঘরের দুয়ারে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিল এবং তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

লোকটা দুর্বল প্রকৃতির, বোধ হয় দারোগার আওতায় এই রকম হইয়া পড়িয়াছে। এই দৌর্বল্যের জন্যেই প্রতি কথাই একটু হাসিয়া বলিতে অভ্যস্ত—খোশামুদি-গোছের একটু মলিন হাসি। হিরণকে ঠায় গম্ভীর-ভাবে দাঁড়াইয়া ঘরটা পর্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বেজায় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; তাহার স্বভাবসিদ্ধ হাসি টানিয়া বলিল, "চা আর জল-খৈ রান্না করছি।"

কালো লিকলিকে-গোছের চেহারা। পরনে মাসখানেকের ধূলোময়লার উপর হলুদ-লঙ্কার ছোপধরা একটা কাপড। কাঁধে তদনুরূপ একখানি গামছা। শুচিতার পাওনা মিটাইবার মত করিয়া পায়ের পাতা দুইটি ধোওয়া, তাহার পর হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় সাদা হইয়া গিয়াছে।

প্রণাম করিতে হিরণ নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, সেটা কুশলসূচক হইবে না বুঝিতে পারিয়া লোকটা পূর্বাহ্লেই নিজের পরিচয়ে যতটা সম্ভব গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিল, "দো বরস্ রংপুরে থাকছিলাম, শুকতুনি রাঁধতে জানি।"

নাসিকা আরও কুঞ্চিত করিয়া হিরণ বলিল, "তবে আর কি, মাথা কিনেছিস। এত নোংরা, তোর হাতে বাবু খায়?"

লোকটা একটু অপ্রতিভ হইয়া একবার নিজের চেহারার পানে চাহিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "বরাহ্মন্ আছি; দোষ লাগে না।"

হিরণ অল্প কথার লোক, কিছু বলিল না। তাহার নাসিকাটা কুঞ্চিত থাকায় বোঝা গেল সে এতটা নোংরামিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে পারে এ-পরিমাণ ব্রহ্মতেজের কথাটা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঝি আসিয়া খবর দিল গা ধুইবার জল তৈয়ার।

হিরণ ঘুরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তুই দিয়েছিস নাকি জল তুলে?"

প্রশ্নের দোষ দেওয়া যায় না। কালো কুচকুচে রং, আঁটোসাটো, জাঁদরেল গোছের চেহারা; পরনে চৌদ্দ হাতের একটা পালের মত মোটা কাপড। সামনেই একটা সুপুষ্ট কোঁচা, ময়লা যেন তাহার পরতে পরতে অন্ধকারের মত জমাট হইয়া আছে। কাপড়ের যে-টুকু মাথায় সে-টুকু তেলে-ময়লায় তারপলিন কাপড়ের মত হইয়া গিয়াছে।

ঝিয়েরা কখনও দুর্বল প্রকৃতির হয় না, দারোগার ঝিয়েরা তো নয়ই। প্রশ্নটা

বুঝিতে না পারায়—মুখে কাপড় দিয়া অনেকটা বেয়াদবির সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ভুলহীন্ বাঙলা বলাইছতিন্!"—অর্থাৎ কনেবৌ বাঙলায় কথা বলছেন আমার সঙ্গে।

ঠাকুর বুঝিয়াছিল প্রশ্নটা, তাহার রংপুর প্রবাসের কল্যাণে; বলিল, "চাকর পানি ভরিয়ে দিয়েছে; তাকে বোলাইয়ে দিই?"

যেমন নমুনা দেখা যাইতেছে, চাকরের চেহারা দেখিলেই যে স্নানের প্রবৃত্তি বাড়িবে এমন ভরসা হয় না, অথচ স্নান না করিলেও নয়।…"না থাক্; কোথায় জল দেখিয়ে দে, চল্"—বলিয়া হিরণ কাপড়-গামছা বাহির করিতে গেল।

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বসন্ত চা-হালুয়া লইয়া বসিয়া গিয়াছে। বধূকে প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখলে সব?"

বধূ মুখটা অতিমাত্র গম্ভীর করিয়া উত্তর করিল, "চমৎকার! সাধে কি শরীর ও-রকম হয়ে গেছে! খেতে প্রবৃত্তি হয় তোমার ঐ ভূতের হাতে? যেমন ঝি, তেমনি ঠাকুর! থাক কি করে?"

"বেশ কাজ করে সব কিন্তু, নিজেব সাজগোজের দিকে লক্ষ্য নেই, অসুখ-বিসুখ নেই, কামাই নেই, আমার বেশ একটানা চলে যায়। আর বামুনটা নোংরা আর দেখতে কাঁকলাসের মতন হলেও বাঁধে ভাল, এ তল্লাটে বাংলা-রান্না-জানা লোক আর নেইও। তাই নিয়েই আমার দরকার; ওর রান্নাই খাব, ওকে তো আর খাব না।"

শেষের এই রসিকতাটুকুর উদ্দেশ্য হিরণের এই গাম্ভীর্যে একটু আঘাত দেওয়া। অকৃতকার্য হইয়া বসন্ত আর কথা না বাড়াইয়া জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল। শেষ হইলে বলিল, "তোমাকেও এনে দিক?"

ঘিয়ে জব্‌জবে সোনার রঙের মত হালুয়া, প্রচুর দুধ দেওয়া ঈষৎ গৈরিক রঙের ঢলঢলে চা, দীর্ঘ আট ক্রোশের যাত্রায় পরিশ্রান্ত মনকে টানে; কিন্তু তাহাদের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়া হিরণ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "মা গো! —অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে! আগে ওর একটা ব্যবস্থা করি,—তারপর ওর হাতে খাব—যদি প্রবৃত্তি থাকে। ওকে ডেকে বলে দাও আজ ও যাক, কাল যেন নেয়ে-ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে তবে বাড়িতে ঢোকে।…রাত্তিরটা আমি চালিয়ে নেব'খন। ঝিটাকে ডেকে দাও, একটা ফরসা কাপড় দিই।"

বসন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, "তুমি চালিয়ে নেবে মানে? এই আট ক্রোশ পথ শাম্পেনিতে এসে রান্না করবে নাকি? শরীর তো?—না, কি?"

হিরণ স্বামীর চোখের উপর স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, “আমি নিজের শরীর দেখবার জন্যে এখানে আসি নি। আমার শরীরের ওপর যদি মশাইয়ের এত দরদ থাকতো তো ঐ ভূতপ্রেতদের হাতে যা-তা খেয়ে নিজের দেহ কালি করতেন না।...আট ক্রোশ ঐ বিদ্‌ঘুটে গাড়িতে গতর চুর করে সত্যি কারোর মেজাজ ভাল থাকে না; সেটি মনে রেখে যা ভাল বুঝছি করতে দাও।...এই দাই!...চাকরটার নাম কি?”

বেশ বোঝা গেল হিরণ আসিযা গৃহস্থালিব রাশ কডা হাতে বাগাইয়া ধরিয়াছে। স্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী প্রভৃতি এই শকট-সংলগ্ন কোন অশ্বই খাতির পাইবে না তাহার কাছে। বসন্ত খানিকটা এদিক ওদিক করিল, তাহার পর বধূর উপরকার রাগটা চাকর-দাসীদের উপর ঝাড়িয়া অফিসে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পডিল এবং সেখানেও কণ্ঠস্বরকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া একটা তুমুল রকমের হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। হিবণ বুঝুক সে নেহাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়, একটা গোটা থানার পুলিস কতোয়াল তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

তারপর প্রায় রাত্রি বারোটাব সময়—হিরণের হাতের আলুনি তরকারি, পোড়া লুচি এবং ধরা দুধ অজস্র প্রশংসার সহিত আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

৩

পরের দিন সকালেই বসন্তকে একটা তদারকে বাহিরে যাইতে হইল। হিরণ বাড়ি-ঘর-দুয়ার তিনটা লোকের সাহায্যে ধুইয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া লইল। চাকরটা স্নান করিয়া বাবুর একটা ধোপদুরস্ত কাপড পরিল এবং ভৃত্যোচিত নোংরা কাজ যতটা সম্ভব এডাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঝি মাইজীর ফুলকাটা চওড়াপেড়ে শাড়ি পাইয়াছে, নিজেকে এবম্বিধ দুর্লভ সম্পদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য প্রায় পো-খানেক মাইল দূরে নদীতে গিয়া চুলে ক্ষার আর এটেল মাটি ঘষিতে লাগিল। কাজের অসুবিধা হওয়ায় অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া থানার লোকে তাহাকে ধরিয়া আনিল।

ঠাকুরটা সত্যই রাঁধে ভাল, কিন্তু একজোড়া নূতন কাপড় এবং একটা নূতন গামছা পাইয়া কোন কারণে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া, সব রান্না এমন কি তাহার সবচেয়ে বড় শিল্প শুকতুনি পর্যন্ত বরবাদ করিয়া রন্ধনপর্ব শেষ করিল। এদিককার দেখাশোনা সারিয়া হিরণ যখন স্নান করিতে যাইবে, দেখিল সাবানের বাক্সয় সাবান

নাই। আজ সকালেই নূতন সাবান বাহির করিয়া দিয়াছে, বসন্ত মাত্র একবার ব্যবহার করিয়া বাহিরে গিয়াছে। ঝিয়ের কাছে পাওয়া গেল না, চাকরের কাছেও নয়। তখন ঠাকুরের খোঁজ পড়িল। থানার হাতায় তাহাকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে লোক ছুটিল সেখানেও নাই। রিপোর্ট পাওয়া গেল, তাহাকে নদীর ঘাটে দু'একজন দেখিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, জলের ধারে কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া, পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ সাবানের গাঢ় ফেনায় আবৃত করিয়া ঠাকুর অসীম পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে গাত্রচর্ম সংস্করণে ব্যস্ত, পাশে বালির উপর হলদে রঙে ছোবানো দুইখানা নূতন কাপড় শুকাইতেছে।

বসন্ত কোন অনিবার্য কারণে দিনমানে আর আসিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া বধূর নিকট গৃহস্থালির সুবন্দোবস্তের কথা শুনিয়া এবং কিছু প্রমাণও চাক্ষুষ করিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, "সর্বনাশ করেছ যে! সে ব্যাটাকে নতুন কাপড় দিতে গেলে কেন?"

হিরণ কতকটা অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন বল তো?"

বসন্ত উত্তর না দিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কাপড় দুটো ছুবিয়েছিল কিনা বলতে পার?"

হিরণ বিস্মিতভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, হলদে রঙে।"

বসন্ত হতাশভাবে এলাইয়া পড়িয়া বলিল, "ব্যস্, তাহলে যা ভয় করেছি তাই হয়ে বসে আছে নিশ্চয়। নতুন কাপড় পেলেই সে তাড়াতাড়ি ছুবিয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি পালায়। কত কাণ্ড করে তাকে আটকে রাখি, দোকানে পর্যন্ত তাকে কাপড় বেচা মানা। এখন করা যায় কি? তাও কি সেখানে লোক পাঠিয়েই তাকে পাওয়া যাবে? দুটো জেলার মধ্যে শ্বশুরবাড়ির সংক্রান্ত যে যেখানে আছে লুকিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়াবে,—দু'মাসের ধাক্কা। ওর চেয়ে দাগী চোরকে টেনে বার করা ঢের সহজ। আমি তিনবার ঘা খেয়ে খেয়ে ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে কোন রকমে এই বছরখানেক আটকে রেখেছিলাম। আর—তুমি?"

হিরণ প্রথমটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী তাহার ত্রুটিটুকু লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া এবং একবার আস্কারা পাইলে আরও বাড়াবাড়ি করিবে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর গেলে কি জলে পড়বে? আমি না হয় নেহাৎ অকর্মণ্য;—তোমার রান্নাঘর মাড়াবার যুগ্যিও নই; কিন্তু একমুঠো চালও ফুটিয়ে দিতে পরেব না? তাতে দুটো

আলুভাতে ফেলে দিতে পারব না? আমি পাড়াগেঁয়ে জংলী; ভাল তরকারিটা-আসটা না হয় নাই রাঁধতে পারলাম, কিন্তু…”

কথাবার্তা উল্টা দিকে যায় দেখিয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি বলিল, “বাঃ তাই কি বললাম?—ভাল রাঁধতে পার না? কাল রাত্রে ডালনা যা রেঁধেছিলে! একটু নুন কম হওয়া সত্ত্বেও সে কী সুন্দর হয়েছিল! যদি নুনটা ঠিক একটু মাপসই হত তো না-জানি…”

হিরণকে একভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া থামিয়া গেল।

হিরণ শান্তকণ্ঠে বলিল, “নুন কম হয়েছিল, কই কাল তো বল নি। ঐটেরই তো বেশি প্রশংসা করলে।”

বসন্ত আমতা আমতা করিয়া বলিল, “প্রশংসা না করে উপায় ছিল? জিনিস যা দাঁড়িয়েছিল, অতিবড় শত্রুও প্রশংসা না করে…আর নুন কম মানে—নেহাৎ যেন একটু—মনের সন্দেহও হতে পারে…”

হিরণ সেইরূপেই শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, “কি অপরাধটা করেছি যে শুধু সন্দেহের ওপর রান্নার এই অপবাদটা দেওয়া হল?”

বসন্ত আরও ঘাবড়াইয়া গেল। কি বলিলে সামলানো যায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, “এই দেখ! অপবাদ দোব কেন? আর অপরাধের কথা যে বলছ, অপরাধ তো আমারই, আমি যে একটু বেশি নুন খাই—একটা রোগ আমার…”

“বলেছ আমায় সে-কথা এর আগে? নুন একটু বেশি দেওয়া খুব শক্ত—না, জিনিসটা বড় মাগ্যি?”

বসন্ত অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া যেন হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বলিল, “মনে হল একবার বলি, কিন্তু আবার ভাবলাম রোগটা যদি এইভাবে একটু একটু করে সেরে আসে তো…”

হিরণ একটু নাক মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “থামো বাপু, একে আমার মাথার ঠিক নেই!”

ঠাকুর সত্য সত্যই নূতন কাপড়ের জয়পতাকা উড়াইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে। হিরণ নূতন পাচক আনিতে দিল না। রান্নাঘরের অসপত্ন চার্জ গ্রহণ করিয়া স্বামীর দেহচর্যায় পূর্ণ উৎসাহে লাগিয়া গেল।

বিশেষজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন গবর্ণমেন্ট নুন জিনিসটাকে এখনও

প্রয়োজনমত মহার্ঘ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন বিশেষ আইন করিয়া যদি একেবারেই জিনিসটাকে দেশছাডা করিয়া লওয়া হয়—অন্তত কিছুদিনের জন্য, তো বসন্ত খুব কৃতজ্ঞ হয়। একবার মুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করিয়া সে আর কথাটা ফিরাইতে পারিল না এবং উত্তরোত্তর অধিক পারিমাণে মুন খাইয়া বধূর রান্নার অপ্রশংসা করিয়া নিমকহারামিও করিতে পারিল না। যাহোক পাড়াগাঁয়ের প্রচুর টাটকা মাছ আর খাঁটি ঘি দুধের জোরে দারোগাগিরির হাড ভাঙা খাটুনি ও হিরণের প্রাণান্তকর পরিচর্যার মধ্যেও শরীরটা কোন রকমে খাডা করিযা রাখিল। কিন্তু রহস্যপ্রিয় বিধাতার বোধ হয় সেইটুকুও সহ্য হইল না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিরণের মনটা সাধারণভাবে এ দেশের লোকের উপর সন্দিগ্ধ—তাহার বাপের বাডির লোকের তরফ হইতে ট্রেনিং-ই ঐ ধরনের। বসন্তের শরীর যে ভাঙিয়াছে এটা অবশ্য হিন্দু স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইল না। তখন সে একটু চিন্তিত হইল। রান্নার তো কোন রকমই ত্রুটি নাই, স্বামী রোজ উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিতেছে, অথচ এ-রকমটি হইতেছে কেন? হিরণ একদিন সমস্ত-রাত গভীরভাবে ব্যাপারটা অনুধাবন করিল, তাহার পর তাহার মনে হইল যেন রহস্যটা ধরা পডিয়াছে।

পরের দিন মাছওয়ালী মাছ দিতে আসিতে হিরণ নিজেই গিয়া সামনে দাঁডাইল। মাছের কান্‌কো আঁশ সব উল্টাইয়া দেখিযা পরম বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া বলিল, "হুঁ, বুঝেছি, তুই হারামজাদি রোজ পচা মাছ দিয়ে যাস, তাই বাবু মুখে দিতে পারেন না, রোস।"

মেছুনী যেন আকাশ হইতে পডিল, তাহার ভোরের ধরা মাছ, তাডাতাডি দারোগাবাবুর বাডি যোগান দিতে আসিয়াছে। দুই হাত তুলিয়া, বুক চাপডাইয়া, আঁখকে কিরা, গঙ্গাজীকে শপথ খাইয়া সহস্রভাবে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। শেষে মাছের কান্‌কোর মধ্যে হাতটা চালাইয়া দিয়া খানিকটা টাটকা রক্ত বাহির করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া বলিল, "এই দেখুন মাইজী, একেবারে টাটকা খুন, পচার কথা ছেড়ে দিন, একটু বাসি হলেও কি এ জিনিস পাওয়া যেত?"

হিরণ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, তাহার পর তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল, "দেখ্, আমি খাস বাংলাদেশের মেয়ে, তোদের কারচুপিতে তোদের দারোগাবাবু ভুললেও আমি ভোলবার পাত্রী নই, তোদের জাতকে আমাদের দেশে ঢের দেখেছি, কি করে গেরস্তর চোখে তোরা ধুলো দিস তা যদি

আমার জানা না থাকত তো আর এখানে আসতাম না। বলি, ওটা তোর মাছের রক্ত, না?—এইটে আমায় বিশ্বাস করতে হবে?”

মেছুনী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া হিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটু সংবিৎ হইলে বলিল, “মাছের রক্ত নয় তো কি মাইজী?”

“মাছের রক্ত?—বাসি পচা মাছ সব ফেলে দিয়ে, টাটকা মাছ বেচবি সেই রকম বোকা জাত কিনা তোরা। এখানকার বাজারে লাল খুনখারাবি রং আসে না? কিছু জানি না আমি, না?”

মাগীটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হিরণ বলিল, “তুই বল্ দিকিন আমার পা ছুঁয়ে, রং গুলে, আর হড়হড়ে করবার জন্যে একরত্তি ফেনের সঙ্গে মিশিয়ে কান্‌কোর মধ্যে দিয়ে বাসি মাছ নিয়ে আসিস নি? বল্, যে মাছটা সন্ধ্যে পর্যন্ত বিকোয় না, সেটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাস,—সেই লোকসানটা গা পেতে নিস? বল্ না? আ মর্! মাছ না হলে দারোগাবাবুর চলে না, বেশি নুন-ঝাল দিয়ে রেঁধে দিচ্ছি আজ, কিন্তু ফের যদি কখনও কান্‌কোর মধ্যে রং ঢেলে আমায় ভোলাতে আসিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।”

মেছুনী আবার হাজার রকম ভাবে শপথ করিল, কিন্তু কেহ যদি লক্ষ্য করিবার থাকিত তো স্পষ্টই বুঝিতে পারিত—মাছ দিয়া যাইবার সময় সে একটু চিন্তিত ভাবে যাইতেছে, মাথার মধ্যে একটা নূতন ধারণা খেলিতেছে যেন।

দু’চারদিন ভাল অর্থাৎ পূর্বের মতই মাছ পৌঁছিল, তাহার পর বসন্ত একদিন খাইবার সময় হাতটা একটু গুটাইয়া লইয়া বলিল, হ্যাঁগা, মাছটা একটু দোরসা বলে বোধ হচ্ছে যেন।”

হিরণ পাখা করিতেছিল, হাতটা থামাইয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া গম্ভীর-ভাবে বলিল, “ঠিক এই কথাই এবার শুনব তা জানতাম। যদ্দিন পচা দোরসা মাছ মাগী দিয়ে গেছে তদ্দিন তো মুখে একটি কথা ছিল না, আমি যেই তার বজ্জাতি হাতে নাতে ধরে টাটকা মাছের বন্দোবস্ত করলাম, অমনি তুমি দোরসা মাছের গন্ধ পেলে। দেখ, আমারও নাক আছে চোক আছে, নিজে কিনে, নিজের সামনে কুটিয়ে, নিজের হাতে রেঁধেছি, দোরসা হলে ধরা পড়তই, পাতেও দিতাম না; শত্রু নয় তো। আর যদি এতই অপদার্থ মনে কর, এতই অবিশ্বাস, আনিয়ে নাও না বাপু তোমার ঠাকুরকে। মাকে লিখে দিই, নিয়ে যাক আমায়। কেন মিছামিছি একটা অপযশ…”

বসন্ত তাড়াতাড়ি সস্নেহে মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল, "না, আমার যেন একটু সন্দেহ হচ্ছিল—সামান্য একটু, তা সন্দেহের উপর তো একটা অপবাদ দেওয়া যায় না! আর ঠাকুর?—তোমার হাতের রান্নার পর আর সে ব্যাটার সে পোড়া-ধরা রান্না কি খাওয়া যাবে? তাকে তো সরিয়েই দেব ভাবছি এবার…"

রান্না কোনদিন আলুনি হয় না, মাছও শোধরাইয়াছে, স্বামীর শরীরের কিন্তু উন্নতি দেখা যায় না, বরং উত্তরোত্তর যেন খারাপই হইতেছে। দুশ্চিন্তায় আবার হিরণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দোষটা যে কাঁচা আহার্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেননা এদিকে তো পান হইতে চুনটি খসিতে দেয় না সে।

গয়লানী আসিয়াছে, উঠানে বসিয়া ঝিয়ের সামনে দুধ মাপিয়া দিতেছে। কেঁড়ে হইতে গাইয়ের দুধের ইষৎ হরিদ্রাভ টাটকা ধারা পিতলের মেছলিতে জমা হইতেছে।

হিরণের চোখটা একবার কুঞ্চিত লইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া গিয়া বলিল, "দাঁড়া, ঠিক গাইয়ের দুধ দিচ্ছিস তো?"

গয়লানী কেঁড়েটা মাটিতে রাখিয়া বিনীতভাবে বলিল, "দারোগাবাবু গাই-দুধের কম রেটে দুধ নিচ্ছেন আর আমি মহিষের দুধ দিয়ে অধর্ম করব মাইজী? বেটাপুৎ স্বামী নিয়ে ঘর করছি…"

হিরণ বিরক্তভাবে মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "নে বাপু, আমায় আর তোদের জাতের ধর্ম দেখাস নি,—কথায় বলে গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে। ফেল্ তো মাটিতে দু'ফোঁটা দুধ, দেখি।"

দু'টা আঙুল দুধে ডুবাইয়া গয়লানী মাটির একটু উপরে ধরিল। গাঢ় স্নিগ্ধ গুটিকতক দুধের ফোঁটা উঠানের শানের উপর টলটল করিতে লাগিল।

হিরণ একটু ঝুঁকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কখনও গরুর দুধ নয় তোর, তা ভিন্ন খাঁটিও নয়, টাটকাও নয়। এতদিনে ঠিক ধরেছি, চিরকাল গাই-দুধ খাওয়া অভ্যেস, তার জায়গায় মোষের মাঠা-তোলা তে-বাষ্টে দুধ খেয়েই দিন দিন দারোগাবাবুর শরীরপাত হয়ে যাচ্ছে।"

একে দুধটা খাঁটি বলিয়া অপবাদটা যথার্থই গায়ে লাগে, তাহার উপর দারোগাবাবুর ভয়। গয়লানী বুক চাপড়াইয়া, কপাল পিটিয়া স্বামী পুত্র, গঙ্গা-মাই, সলেশবাবা, শীৎলামাই-এর শপথ খাইয়া নানাভাবে নির্দোষিতা প্রমাণ

করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু সব বৃথা। হিরণ এই সমস্তর মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিল, "দেখ, আমি দেশের মেয়ে ; বাড়ির পাশে গয়লাপাড়া, আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই। না হয় যা বলছি মিলিয়ে দেখ্।"

হিরণ অভিজ্ঞতার গর্বের সহিত হাতের তর্জনীটা তুলিয়া বলিল, "সেরে এক পো জল, গেরস্তর বাবারও সাধ্যি নেই—এক ল্যাক্‌টোমিটার ছাড়া…"

গয়লানী শিহরিয়া উঠিয়া চোখ দুইটা হাতে চাপিয়া শপথ করিল, "হে মাইজী, আঁখ গল্ যায়।"

"রাত্তিরে জ্বাল দিয়ে সরটা তুলে নিস। মোষের দুধ গরুর দুধের মত পাৎলা হল, তারপর একটু কাঁচা মাখন আবাব মিশিয়ে আর একবার জ্বাল দিয়ে…"

"হে মাইজী, এ সব কিছু জানিও না সাত জন্মে। দোহাই ধর্মের, গরুর বাঁটের টাটকা-দোহা দুধ—রং দেখুন—মোষের দুধ তো সাদা হবে ?"

হিরণ অনেকটা ভেংচাইয়া বলিল, "সাদা হবে ! এতই বোকা দারোগাবাবুর বউ, না ? তোদের দেশে হলুদ নেই তো ! হলুদ বেটে, পুরু কাপড়ে তার রস নিংড়ে তোমরা দাও না তো দুধে ? মাইজী তো কিছু জানে না ! চালাকি করতে আর জায়গা পাও নি ! গাইয়েব দুধের ডবল দাম, উনি সেই দুধে ঘি না করে বাবুকে নিত্যি যোগান দিচ্ছেন ! বড় সোহাগ কিনা…। বাবুকে এতদিন যা ঠকিয়েছিস ঠকিয়েছিস, মনে রাখিস এবার শক্ত লোকের পাল্লা…"

আর দুই তিন দিন দুধটা ভালই অর্থাৎ পূর্ববৎই আসিল। খুব সম্ভব গয়লাবাড়িতে হিরণের ফরমুলা লইয়া গবেষণা চলিল এ-ক'টা দিন। তাহার পর একদিন দুধের বাটিতে একটু চুমুক দিয়াই ধীরে ধীরে বাটিটা নামাইযা বসন্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ গা, যেন হলুদ গন্ধ বেরুচ্ছে দুধটাতে।"

হিরণ ইহার জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল, কিছু না বলিয়া পাখা নামাইয়া ডাকিল, "দাই।"

ঝি আসিলে বলিল, "তোদের দারোগাবাবু দুধে হলুদের গন্ধ পাচ্ছেন।"

ঝি স্বভাবতই একটু সাহসিকা, তাহার উপর ক্রমাগতই পরিষ্কার থাকিবার নানা রকম দ্রব্যসম্ভার পাইয়া একেবারেই কর্ত্রীর অন্তরঙ্গ এবং তাহার ফলে আরও বেশিরকম সাহসিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টপ করিয়া দুয়ারের আড়াল হইয়া হাসিতে লুটপুট হইয়া বলিল, "গ্রে মাই ! আইকাল আর কাঁহা হরদি কোঁটেইছেই ?" (মা !—আজকাল আর হলুদ কৈ মশায় ?)

"নে থাম্, তোকে আর হাসতে হবে না হারামজাদী, আমার এদিকে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে রোজ রোজ কচি ছেলের মত বায়নাক্কা দেখে দেখে"—ঝিয়ের ঔদ্ধত্যের জন্য এইটুকু মৌখিক ধমক দিয়া হিরণ স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দেখ, দাইও বলছে আজকাল আর হলুদ মেশায় না, তার মানে আগে মেশাত। ছোটলোক হলেও, মেয়েমানুষ হলেও ওর তোমার চেয়ে বুদ্ধি আছে। যদ্দিন ছিল দুধে হলুদের গন্ধ, তদ্দিন পেলে না ; যেই একটু বুদ্ধি করে ধরে সেটা বন্ধ করলাম, বলছ···না হয় দেব'খন মাগীকে আব একবার চুমড়ে, কিন্তু তোমার সেই চিরকেলে হাড়-জ্বালানো সন্দেহ নয় তো ?"

নিজের মুখেই এতবার মনের সন্দেহের দোহাই দিয়াছে যে সেটাকে আর অস্বীকার করা যায না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসন্ত ধীরে ধীরে দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিল। তাহার পর আটকানো নিঃশ্বাসটা খুব জোরে নামিয়া প'ড়ায়, ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়ে একটা তৃপ্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, "নাঃ, তোমার কথাই ঠিক, মনের সন্দেহই ছিল দেখছি,—ঠাউরে ঠাউরে খেয়ে দেখলাম কিনা। যাক্, মিটে গেল।"

মাছ গেল, দুধ গেল, দু'দিন পরে ঘি-ও নষ্ট হইল। ঘিয়ের গয়লানী মাইজীর গালমন্দর ভিতর দিয়া টের পাইল শহরে ভেজিটেবল ঘি বলিয়া ঘিয়ের এক সজাতি দেখা দিয়াছে, ভেজাল দিলে দুনো লাভ বাঁধা। তাহার 'পুরুষ'কে দিয়া দশ ক্রোশ দূর হইতে এক টিন সংগ্রহ করিল এবং অল্পে অল্পে যোগান দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মস্তিষ্ককে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

ওদিকে মেছুনীর কাঁসার চুড়ির মাঝে এক এক জোড়া করিয়া রুপার চুড়ি উঠিয়াছে, দুধের গয়লানীর গা হইতে কাঁসার বালা একেবারেই নির্বাসিত হইয়াছে ; এখন বেসাতি করিবার সময় তাহারা বাংলাদেশের মেছুনী গয়লানীর মতই হাতমুখ খেলাইয়া, গয়না চমকাইয়া বেসাতি করে। সমস্ত গ্রামটা ভেজালে ভরিয়া গিয়াছে, আশপাশের গ্রামেও সুরু হইয়াছে। বসন্ত গৃহে নিরীহ হইলেও বাহিরে উগ্র, এদিকে উগ্রতাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে বরং। জরিমানা করিল, বেটা-ছেলেদের ডাকিয়া মারধোর করিল, শেষে ঘর জ্বালাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। কিছু ফল হইল না। হিরণের শিষ্যরা মাইজীর কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।

হিরণ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "হ্যাগা, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি ?

যদ্দিন ঠকিয়ে এসেছে তদ্দিন তো মুখ বুজে সয়ে গেলে। এখন নিরীহ বেচারীদের উস্তম ফুস্তম করছ কেন বল দিকিন? একে তো যত আঁকুপাঁকু বাড়ছে ততই শরীর কালি হয়ে যাচ্চে ওদিকে, তার ওপর নির্দোষীদের শাপমন্যি খেয়ে একটা কাণ্ড ঘটুক; কথায় কথায় হাত উঁচু করে—দক্ষিণ-মুখো হয়ে যেমন সব গঙ্গার দিব্যি, সন্দেশ ঠাকুরের দিব্যি খায়—আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। রোজ পুরুৎ জ্যোৎখীজীর হাত দিয়ে পাঁচসিকে করে পুজো পাঠিয়ে কোন রকমে কাটিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে আছে অদৃষ্টে···" হাতে করিয়া আঁচল ধরিয়া তুলিল।

বসন্ত বুদ্ধি করিয়া কিছুদিন ছুটির দরখাস্ত দিয়া দিয়াছিল; দুই মাস পরে বাড়ি আসিয়াছে।

মিত্র-গৃহিণী ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের কথাবার্তা অনেকটা আগাইয়া আনিয়াছেন; এখন হিরণের সাহায্যটাও কাজে লাগাইতে হইবে, কেননা, পয়মন্ত বলিয়া সে শ্বশুর-শাশুড়ির বড় প্রিয়পাত্রী।

সবাই বসিয়া ছিলেন, এমন সময় বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া সদরের দিকে চলিয়া গেল। মিত্র-গৃহিণী হিরণের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন "তা বলতে নেই,—এ ক'টা দিনেই বসন্তর আমাদের শরীরটা যেন একটু···তা হবে না গা? বৌদিদির নিজের পছন্দ করা মেয়ে···"

বসন্তর মা বসন্ত মোটা হইয়াছে এটা ধরিয়া লইয়াছেন। মায়ের নজর নাকি বড় খারাপ, সেইজন্য অকল্যাণের ভয়ে এখনও পুত্রকে ভাল করিয়া দেখেন নাই। মিত্র-গৃহিণীর উভয়স্পর্শী প্রশংসায় সম্প্রীতির সহিত বলিলেন, "তা সেয়ানা আছে বাপু তোমাদের বৌ, বলছিল কিনা—বলে—মা, কী ভেজালের দেশ! মাছ, দুধ, ঘি, তেল—সব-তাতেই কী ভেজালের ছিষ্টি!—শোধরাতে কি কম কাণ্ডটা করতে হয়েছে!···না, বলতে নেই, সেয়ানা আছে···কৈ গো, কাশী থেকে যে জর্দাটা এসেছে, তোমার পিসশাশুড়িকে একটু দাও না বৌমা—"

বুড়াশিব ডে

১

রাস্তাটা দত্তদের পুকুরের ধারে ধারে খানিকটা দক্ষিণে গিয়া পূর্বে ঘুরিয়াছে এবং সেখান হইতে সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছে। এই মোড়ের মাথায় বুড়োশিবের মন্দির। বলা হয় মন্দির বটে, কিন্তু আশ্রয়টি সে-জাতীয় কিছুই নয়। ঠিক রাস্তার পাশেই প্রায় বুক উঁচু, ফালির মত একটু রক, তাহার পরই ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ ঘব। ছাতের সামনের অর্ধেকটা কবে পড়িয়া গিয়াছে, পিছনের অর্ধেকটা একটা বৃদ্ধ বট নিজের শিবা-উপশিরার জটিল গ্রন্থি দিয়া কোন রকমে ধরিয়া আছে। মা-গঙ্গা যখন আকাশ বাহিয়া চলেন, তাঁহার কায়েমী আশ্রয় শিবের-মাথায় নামিয়া আসিতে কোন বাধাই থাকে না।

মূর্তিটা কালো পাথরের, কিন্তু এত জায়গায় ভাঙা ঘষা যে, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কোন্ দেবতার মূর্তি বলা কঠিন। দেবীর পাশেই একটি শ্বেতপাথরের বৃষ বসানো থাকায় বিগ্রহটিকে শিবমূর্তি জ্ঞানেই পূজা করা হয়। ডেঁপো ছেলেরা বলে ওটা বাবার সার্টিফিকেট।

ঠিক পূজা হয় বলিলেও ভুল হয়। যাহারা এই পথ দিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যায়, ফিরিবার সময় এক ঘটি জল ঢালিয়া একটা প্রণাম করিয়া যায়। পূর্বে দু'একখানা করিয়া বাতাসা পড়িত, সম্প্রতি পাশের বাড়ির ছেলেটা বড় হইয়া বেজায় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাতাসা পড়িতেই সে আসিয়া অভিভাবকহীন ঠাকুরের উপর অনাচার লাগায় বলিয়া ঠাকুরের সেটুকু সুখও গিয়াছে—ভূতনাথের উপর ভূতের উপদ্রব আর কি!

এই ঠাকুর। লোকে যে পূজা করে তাহার মধ্যে ভক্তির দয়ার ভাগই থাকে বেশি,—"আহা, কেউ তোমার দেখবার নেই বাবা; একরত্তি যে মিষ্টি দেবে লোকে, সেও ভোগে লাগবে না দস্যি ছেলেদের জ্বালায়···"

এ-হেন ঠাকুরের কাছে কোন প্রার্থনা করা সহজে কল্পনায় আসে না।

তবু একজন করে, নিত্য, আর নিরুপায়ের পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। সে দুর্গাচরণের বৃদ্ধা মাতা।

দুর্গাচরণের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, এখনও ছেলেপিলে হয় নাই। স্ত্রীর বয়স চব্বিশের উপর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, প্রথম পক্ষেরটি বাঁচিয়া থাকিলে প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশের কাছাকাছি হইত।···মোট কথা সন্তানাদির আর আশা নাই।

মা জাহ্নবী দেবী অনেক চেষ্টা করিলেন।—জলপড়া, কবচ, মাদুলি, সাধু

সন্ন্যাসী, পীর, ফকির—কিছুই বাকি রহিল না। বধূটিকে লইয়া অনেক তীর্থ-পর্যটনও করিলেন। শেষে শরীর যখন জবাব দিল, সমস্ত চেষ্টা তাঁহার বুড়াশিবের মাথায় এক ঘটি করিয়া জল ঢালায় আসিয়া দাড়াইল। বলিলেন, "বাবা, তোমায় ছেড়ে রাজ্যি ঘুরে বেড়ালাম, সেই অপরাধেই কি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করলে না? সাজা তো হল, এখন দেখ একটু মুখ তুলে, বউয়ের কোলে দাও একটি গুঁড়োগাড়া যা হয়…"

সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতি হোমরা-চোমরাদের বধিরত্ব হেতু কখনও কখনও যেমন চাকরির জন্য খোশামোদ করিয়া লোকে নগণ্য ছোটবাবুকেই আকাশে তোলে, এও সেই রকম হইল।

অভ্যাসের জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক, ক্রমেই এই মূর্তিটির উপর মনের যত ভক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর গুটিকতক বাতাসা। পাছে অনাচার হয়, সেই ভয়ে বৃদ্ধা পাড়ার আতঙ্ক সেই ছেলেটিকে পূর্বাহ্ণেই ডাকিয়া লইতেন এবং উৎসর্গীকৃত বাতাসাগুলি কুড়াইয়া লইয়া সতর্কভাবে তাহার হাতে তুলিয়া দিতেন। ক্রমে ছেলেটিকে আর ডাকিতে হইত না এবং এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তাহার উপর হইতে আতঙ্কের ভাবটি কাটিয়া গিয়া তাহাকে পূজার যেন একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অর্থাৎ সে পূজার দেবতার গোষ্ঠীভূত হইয়া উঠিল এবং তাহার জায়গাটা হইল শিবঠাকুর এবং বৃষের মাঝামাঝি; নন্দী-ভৃঙ্গীর সামিল বলিলে ভুল হয় না।

ক্রমশ, সন্তানপ্রার্থিনীর পরের সন্তানের উপর যে একটা সহজ টান বা স্নেহ থাকে, সেটুকুও আসিয়া ছেলেটিকে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিল।

কিছুদিন এইভাবে গেল।

তাহার পর বৃদ্ধা একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিন দিন ঠাকুরের ফুলজল-বাতাসা বন্ধ রহিল। বধূটি স্নান করিয়া ফিরিবার সময় রকে টুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে। ঠাকুরের কাছে গিয়া অত করিয়া পূজা দিতে লজ্জা করে; কেমন যেন হয়, ঠাকুর মনের আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্টভাবে দেখিয়া ফেলিবেন। আর সবার কাছে লুকানো যায়, তাঁহার কাছে তো লুকাইবার যো নাই।

চতুর্থ দিনে বৃদ্ধা ভোরের পূর্বেই ঘুম হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। বধূকে ডাকিয়া পাশে বসাইয়া তাহার পিঠে হাতটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বধূ প্রশ্ন করিল, "কেমন আছ মা, ডাকছিলে কেন?"

"বলছি…বৌমা, ঠাকুরকে এ-দু'দিন বাতাসা দেওয়া হয় নি, না?"

বধূ মাথাটি নীচু করিয়া রহিল।

"পাগলী মেয়ে···বলতে কি সরছে মা যে, বলব?—কি সব গোলমেলে ব্যাপার—যেন কতদূর থেকে ঘুরে ফিরে এসেছি, বুড়োবাবার মন্দিরের সামনে এসে পা এত ভেরে গেল যে, আর চলতে পারি না। বকটিতে উঠে বসব এমন সময়···বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে বৌমা···বসব, এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখি ঠাকুর নেই। মনটা আতালি পাতালি করে উঠল—ওমা, একি কাণ্ড! এমন সময় হঠাৎ দেখি সেই দুরন্ত ছেলেটি যেন লাফাতে লাফাতে উঠে এল। জিগ্যেস করলাম, "হ্যাঁরে খোকা, ঠাকুর কোথায় গেলেন বলতে পারিস দাদা?" ছেলেটা বললে, তা বুঝি জান না? তিন দিন বাতাসা না পেয়ে তিনি যে তোমাদের বাড়িই গেছেন, তিন দিন ঠায় উপোস করিয়ে রেখেছিলে যে তুমি'···'আমাদের বাড়ি? আর আমি পোড়াকপালী রাজ্যি ঘুরে মরছি!'—বলে তাড়াতাড়ি উঠব এমন সময় দেখি···"

বৃদ্ধার গলাটা কাঁপিয়া উঠিল, বলিলেন, "আমার কি সে রকম অদেষ্ট হবে বৌমা? কেন যে মিছে আশা দিচ্ছেন···"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "দেখি তুমি হন হন করে মন্দিরের পানে চলে আসছ, কোলে—সে যে কী অপূর্ব মূর্তি ছেলের, কি বলব বৌমা, চোখে যেন এখন পর্যন্ত লেগে রয়েছে!···দেখেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—'তোর বাতাসা খেতে এলাম, মন্দিরে পড়ে থাকলে তুই ভুলে যাস কিনা'···ছ্যাঁৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল।"

শাশুড়ি-বৌয়ে দুজনেই অভিভূত ভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বৃদ্ধা সজল চক্ষু দুইটি বধূর মুখের উপর রাখিয়া ব্যাকুল প্রশ্নে বলিলেন, "কাঙালের সঙ্গে সত্যিই কি ঠাকুর ঠাট্টা করলেন বৌমা?"

২

যদি মানা যায় যে, এই স্বপ্ন-ব্যাপারে বুড়াশিবের কিছু হাত ছিল তো তাঁহার যে ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, জাহ্নবী দেবী এটা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। বৎসর না ঘুরিতেই বধূর শূন্য কোল পূর্ণ করিয়া একটি পুত্রসন্তান হইল। বুড়াশিব নিজেই আসিয়াছেন বলিয়া নাম হইল গৌরীনাথ।

পূর্ববর্ণিত সমস্ত ঘটনাই প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার ব্যাপার। এর মধ্যে

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। জাহ্নবী দেবী নাই। গৌরীনাথের মা সাবিত্রী দেবী, এখন প্রায় পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ়া, অনেকটা শাশুড়ির জায়গা লইয়া বুড়াশিবের মাথায় জল, বিল্বপত্র, বাতাসা চড়াইতেছেন; ব্যবধান এইটুকু যে, জাহ্নবী দেবীর ছিল নাতির আকাঙ্ক্ষা, সাবিত্রীদেবীর আরও প্রাথমিক ব্যাপার, অর্থাৎ পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, অবশ্য এই ব্যাকুলতার অন্তরালে যে একটি কাল্পনিক শিশু ঘুরিয়া বেড়ায় না, সে-ই বা কে বলিবে?

গৌরীনাথ ইতিহাসে এম-এ পাশ করিল, এখন গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগে একটি ভাল চাকরি করিতেছে এবং উগ্ররকম রিসার্চে ডুবিয়া আছে। রিসার্চের সুবিধার জন্যই বালিগঞ্জে একঠি ছোট্ট বাড়ি লইয়া একলাই থাকে, সাবিত্রী দেবী বলিয়াছেন, তিনি শেষ বয়সে গঙ্গা আর বুড়োশিব ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারিবেন না।

গৌরীনাথ ক্বচিৎ-কখনও আসে দেশে, না হইলে চাকরির অতিরিক্ত সময়টা মিউজিয়াম, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি কিংবা সাহিত্য পরিষদে কাটাইয়া দেয়।

দেশে, পাড়ার বর্ষীয়সীরা বলে, "ইটপাথর নিয়েই কি কাটাবে ছেলে, গৌরীর মা?—বিয়ে-থা দাও!"

বিয়ের কথায় দুঃখ হয়, তবুও সাবিত্রী দেবী বুড়াশিবের রকে মাথা নোয়াইয়া বলেন, "অপরাধ নিও না বাবা, ইটপাথরের মর্যাদা আমি তো বুঝি, যাতে তোমার তৃপ্তি তুমি তাই নিয়ে থাক। সন্তান হয়ে এসেছ, কি যে ভয়ে ভয়ে থাকি তা তুমিই জান।"

বাবা প্রস্তররূপে বৃদ্ধার আকুতি শুনিয়া কি ভাবিতেন বলা যায় না, তবে সন্তানরূপে এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন, যাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই দুর্জ্ঞেয়।

গৌরীনাথের এবারে প্লান ছিল শিবরাত্রি উপলক্ষে নেপালে গিয়া পশুপতিনাথ এবং আশেপাশে আর যা মূর্তি-বিগ্রহ আছে, সে সব সম্বন্ধে গবেষণা করিবে; কিন্তু মা চিঠির উপর চিঠি দিয়া, লোক পাঠাইয়া, শপথ দিয়া এমনি করিয়া তুলিলেন যে, সে আর হইয়া উঠিল না। বাড়ি আসিলে সাবিত্রী দেবী বলিলেন, "বাবা, সেবারে ও-রকম অসুখে পড়লি, বুড়াশিবের কাছে মানত করলাম, তোকে দিয়ে শিবরাত্রির দিন হাজার বিল্বপত্র চড়াব; আজ সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে শিবতলায় যাবি একবার।...না রে না, তোকে উপোস করতে হবে না, ভয় নেই, তুই উপোসে কত বাহাদুর সে ঠাকুর নিজেই বোঝেন।"

মনে মনে বলিলেন, "তুমি উপোস করে থকলে কি ঠাকুরের পেটে জলবিন্দুও পড়বে? কত ছলনাই যে জান!"

সন্ধ্যার পর মার নির্বন্ধাতিশয্যে গৌরীনাথ গিয়া বুড়াশিবের মাথায় বিল্বপত্রগুলি ঢালিয়া দিল। ভক্তির বালাই নাই, মূর্তির গঠন দেখিয়া তাহার মধ্যকার প্রত্ন-তাত্ত্বিকটি হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোয় এবং ফুল-বিল্বপত্রের অন্তরালে যতটা সম্ভব মূর্তিটা পরীক্ষা করিল; এতদিন, নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই এই শিলা-পিণ্ডটির এবং জীর্ণ প্রাচীর কয়টির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। মা যতক্ষণ পূজা করিলেন, আশেপাশে, কোণে-কানে ঘুরিয়া মন্দিরের কঙ্কালটুকু, কয়েকটা শিলালিপি, দেয়ালে গাঁথা দুইটি ক্ষুদ্র মূর্তি—সব পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সাবিত্রী দেবী উঠিয়া বলিলেন, "ওরে গৌরী, অন্ধকারে কোণেকানে অমন করে ঘুরিস নি বাবা, আজ শিবরাত্রি। তোর কি কিছুতেই ভয় নেই, হ্যাঁরে?" বলার ভঙ্গীতে যথেষ্ট উদ্বেগ তো ছিলই, কোথায় যেন একটু গর্ব, একটু নিশ্চিন্ততাও লাগিয়া ছিল।—একি সাধারণ ছেলে যে ভয় থাকিবে এর?

গৌরীনাথ একটু যেন চিন্তিতভাবে বাড়ি আসিল। আহার করিবার সময় সাবিত্রী দেবীকে বলিল, "মা, শিবঠাকুর বলে তো দিব্যি জল ঢেলে আসছ; ঠাকুরমাও বোধ হয় ঐ করে ফাঁকি দিয়ে শিবলোকে গেলেন চলে! কিন্তু, ঠাকুর তো তোমার শিব নয়—শিবের ধার দিয়েও যান না; ও যে ডাহা বুদ্ধদেব দেখছি!"

সাবিত্রী দেবী একবারে শিহরিয়া উঠিলেন। মালাজপ বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "চুপ কর্ গৌরী, তোদের মুখে কি কিছুই আটকায় না; 'শিব শিব!'—আজ কত যুগ থেকে বাবা পূজো নিয়ে আসছেন, সাতটা গাঁয়ের জাগ্রত ঠাকুর, আর তুমি কিনা···দেখ দিকিন, কী অমঙ্গুলে কথা এই শিবরাত্রির দিন···না বাপু।···"

গৌরীনাথ হাসিয়া বলিল, "এ যে তোমার অন্যায় কথা মা; অনেক দিন থেকে লোকে ভুল করে পূজো দিয়ে আসছে বলে বুদ্ধদেব শিব হয়ে যাবেন? এ ভেদ্ধি আর যে বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু ইতিহাস বিশ্বাস করবে কেন মা?"

বৃদ্ধা অস্থির হইয়া বলিলেন, "তুই চুপ কর্ গৌরী। কে তোর ইতিহাস জানি না; কিন্তু ধর্মের সে কি বোঝে রে? আরে গেল! বাবা কত বাঁজাকে ছেলে দিলেন, স্বপ্নে কত রোগীর গায়ে পদ্মহস্ত বুলিয়ে নীরোগ করে দিলেন, তোদের ইতিহাস-মিন্‌সে তার খোঁজ রাখে? এই তো সেদিনের কথা, সীতেনাথের মা

বুড়ি মানত করে রেখেছিল—অক্ষয় তৃতীয়ায় বাবা তারকেশ্বরের দোরে নাতির চুল দেবে, ঐ একটি গুঁড়ো তো ? দেবে কি, নিজে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ল। দিন যত এগিয়ে আসে, মাগী মাথামুড় খুঁড়ে মরে ; কপাল গেল ফুলে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু হল রক্তজবা ! শেষে দিলেন না বাবা স্বপ্ন ? বুড়ি বলে, সে কি মূর্তি ! শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'হবে না ? এত ভেদবুদ্ধি ! তবে তোদের বটতলায় তোদের জন্যে ভাঙা মন্দির আগলে কেন রয়েছি ? তারকেশ্বরে আমি আর-এক শিব, না ?'…বুড়ি বলে—'অপরাধ হয়েছে বাবা, জ্ঞানহীনা, অবলা নারী'…তার পরদিন মরতে মরতে গিয়ে বাবার পূজো দিয়ে এল, আর এমনই বাবার মহিমে, কোথায় গেল অমন বাত, কোথায় কি !…দেখা হল, বললাম, 'বলি অ সীতেনাথের মা, এই শুনলাম তোর অমন বাত, তারেকেশ্বরে যেতে পারবি না'…তখন সব খুলে বললে, 'এই এই ব্যাপার মা, বাবার লীলে কে বুঝবে বল !'…না বাবা, ব্যাগ্যতা করছি, তুই ওসব খেরেস্তানির মধ্যে থাকিস নি। আর তিনিই যদি না হবেন তো অমন ধবধবে শ্বেতপাথরের ষাঁড় কেন সামনে বসে থাকবে বল্ দিকিন ? আর এও বলি—কেষ্ট কি বলরাম এঁদের কারুর নাম করতিস তো মানতামও—হয়তো হয়েছে ভুল ; কিন্তু বুদ্ধদেব তো মানুষই ছিলেন, তিনি কি করে দেবতা হবেন বল্ তো ? না, ছিঃ, মতিগতি বদলা !…হ্যাঁরে গৌরী, সবাই থাকতে অবিশ্বাস হল কিনা তোরই ?"

কথাটা বোধ হয় বাহির হইয়াই পড়িত—বিশেষ করিয়া তাহার অবিশ্বাস কেন হওয়া চলে না বা উচিত নয়। কিন্তু, বৃদ্ধা আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন—শাশুড়ির বিশেষ করিয়া মানা আছে। দেবতা যখন দয়া করিয়া আসেন, জন্মকথা শুনিয়া ফেলিলে তাঁহাদের আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসে, তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন।

ব্রতের দিনটা গৌরীনাথ আর মার মনে ব্যথা দিল না, তাহা ভিন্ন এখনও ভাল করিয়া দেখাও হয় নাই !

সাবিত্রী দেবী আরও খানিকটা বকিয়া গেলেন, "আর কাকেই বা দুষব ? হাওয়াইযেন বদলে গেছে, সেদিন চৌধুরীদের বাড়ি সরস্বতী পূজোর দিন অমনি—পূজো যা হল তা তো মা-ই জানেন—যেন শুধু একটা ঠাট বজায় রাখা। সন্ধ্যের সময় এক নেকচার ! কি ? না, এ সরস্বতী ঠাকুর একেলে ঠাকুর, বেদে পাওয়া যায় না, রামায়ণে পাওয়া যায় না—আরে গেল যা ! এঁকে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া বলব না ? মা যদি না-ই ছিলেন তো তোর বেদ রাময়ণ এল কোথা থেকে ভেবে দেখ্ দিকিন ! না ভক্তি থাকে, মা তো যেচে পূজো নিতে আসেন না ;

বাড়িতে ডেকে এনে তাঁকে এমন করে অপমান করা কেন ? আবার লোক জড করে !...না, তুই বাবা ও-সবের মধ্যে থাকিস নি..."

মনুষ্যমূর্তি ঠাকুরের এই বিপরীত কাণ্ড দেখিয়া সমস্ত রাত মনে মনে পাষাণমূর্তির কাছে আবেদন জানাইলেন, "বাবা, এত আত্মবিস্মৃত হলে মার প্রাণ কি করে বাঁচে বল দিকিন ? আমার যে তোমায় ও ভিন্ন ভাববার যো নেই! যে-কটা দিন আছি, তুমি ওইরূপেই থাক—আমি যেন ওই বিশ্বাস নিয়েই মরতে পারি..."

৩

সকাল বেলায় সুবিধা হইল না , শিবরাত্রির প্রভাত, পূজার্চনা একটু বেশি বকম ছিল, তত্ত্বজিজ্ঞাসা মূর্তির কাছে ঘেঁসিবার অবসর পাইল না। বৈকালে গৌরীনাথ নোট-বুক আর পেন্সিল হাতে করিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক মন্দিরে কাটাইল।

বাড়িতে আসিয়া গৌরীনাথ মাকে বলিল, "না মা, তোমার শিব টেঁকলেন না, বুদ্ধদেবের দিকে প্রমাণ এত বেশি যে..."

সাবিত্রী দেবী কতকটা বিস্মিতভাবে এবং কতকটা হতাশার সহিত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, "তুই বুঝি আবার সেখানে গিয়েছিলি ?"

"শোন কথা মার ! আমার বলে সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। পুরাতত্ত্ব জিনিসটা যে কি তা তো বোঝ না। এ-তো আস্ত একটা মূর্তি, একটা খোলামকুঁচি নিয়ে এক এক সময় রাতদিন যে কোথা দিয়ে যায়..."

সাবিত্রী দেবী কতকটা আশান্বিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কি রকম খোলামকুঁচি চাস গৌরী ?"

গৌরীনাথ মার সারল্যে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল "হাসালে দেখছি মা, ছেলেবেলায় খোলামকুঁচি ঘসে ঘসে আমরা পয়সা করতাম, এখন দেখছি তুমি সেই পয়সার ঘুষ দিয়ে আমায় ভুলিয়ে দিতে চাও !"

সাবিত্রী দেবীও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "না গো, তুমি এখন মস্ত হয়েছ, মার সাধ্যি কি তোমায় ভোলায়।...তা তুই বল্‌গে যা বাপু বুদ্ধদেব, যখন যুক্তি শুনবি নি তো কি আর করব ? আমার ঠাকুর আমার কাছে শিবই আছেন। এখন যদি বলিস্ তুই আমার ছেলে নয়, অমনি তাই কি হয়ে যাবে ? তিনি যখন সর্বঘটেই আছেন তখন তোর বুদ্ধমূর্তিতে থাকতেই যত বাধা ! যাঃ, বকাস নি আমায় !"

বেপরোয়া ভাবটা দেখাইলেন বটে, তবু যেন কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল মনটাতে—ঠাকুর দেবতা লইয়া একটা হৈ হৈ রটানো…

মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল, একটু খোসামোদের স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁরে গৌরী, এমনও তো হতে পারে বাবা, যে বুদ্ধদেব শিবত্ব পেয়েছেন? তাই মেনে নিয়ে চুপ করে থাক্ বাপু, না হয় তোরই কোট বজায় রইল!"

গৌরীনাথের কি আর সে উপায় ছিল যে, চুপ করিয়া থাকিবে? কলিকাতায় গিয়া সে বড বড কয়েকখানা কাগজে সাঁতরায় অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তিপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়া বড বড লেখা বাহির করিযা ফেলিল। মাঝে আসিযা একদিন খানকতক ফটো লইযা গিয়াছিল, ব্লকে সেগুলাও বাহির হইল। বটবৃক্ষটাব স্থাপত্য, বয়স, মন্দিরটার শিলালিপির মধ্যে মুছিয়া যাওয়া কয়েকটা অক্ষবের আভাস প্রভৃতি হইতে একরাশি শকাব্দ, বিক্রমসংবৎ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি বাহির করিয়া গণিতের একটা দুষ্প্রবেশ্য ব্যাপার দাঁড করাইল। এই সবের সহিত ব্লকগুলির দুর্বোধ্যতা মিলিয়া প্রবন্ধগুলো এমন এক একটা গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, অল্পদিনেব মধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে রীতিমত একটা সাডা পডিয়া গেল। মূর্তিটিতে একে এমনি কিছুই ছিল না, তাহাতে ছাপার আকারে আবার একেবারে লেপাপোঁছা কালীমূর্তি হইয়া বাহির হইল। তাহার সহিত বুদ্ধদেবের যদি কোন সাদৃশ্য ছিল তো তাঁহার নির্বাণ অবস্থার, তাঁহার কোন পার্থিব মূর্তির সহিত লেশমাত্র সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু বুদ্ধেতর কোন মূর্তির সহিতও সাদৃশ্য না থাকায় বিরুদ্ধ প্রমাণ বলিয়া ধরিবার উপায় ছিল না। কয়েকজন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক অবশ্য বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, কেহ কেহ জোর গলায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেনও, কিন্তু তাঁহারা কাগজে এ রকম চোখরাঙানি খাইলেন যে, বেশি উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইলেন না। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিল—ইহারা নিজেরাই পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া পডিয়াছেন—জীর্ণ রেলিক্—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় আর যোগ দিতে আসা কেন? কেহ বলিল—ইহারাই স্বরাজের পরিপন্থী—ইতিহাসের মুখে থাবা দিয়া দেশে আত্মচেতনা জাগিতে দিতেছেন না। ইহাতে সবাই যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল এমন নয়, দু'একজন প্রতিবাদের স্বরটা ধরিয়া রহিল; তবে গৌরীনাথের নূতন থিয়োরী—তৃতীয়-চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বাঙলার মূর্তি-শিল্পের উৎকর্ষ লইয়া বেশির ভাগই এমন মাতিয়া গেল যে, প্রতিবাদের আওয়াজ কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সাঁতরা জায়গাটি ছোট, নিরিবিলি, কলিকাতা হইতে কিছু দূরেও; কিন্তু

কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার লোকেও খবর পাইল যে, তাহাদের বুড়াশিব লইয়া বহির্জগতে কি একটা জটলা চলিতেছে। ক্রমে খবরটা স্পষ্ট হইয়া আসিল যে মূর্তিটি শিবের কি বুদ্ধদেবের এই লইয়া দেশে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সাবিত্রী দেবীর পুত্র গৌরীনাথ এর মূলে। রাস্তার মোড়ে, অশ্বত্থতলায় চণ্ডীমণ্ডপে এই লইয়া একটু আলোচনা হইতে হইতে ক্রমে দারুণ মতভেদের সংঘর্ষে জায়গাটা খুব তাতিয়া উঠিল। একদল,—বেশির ভাগ বৃদ্ধ এবং কিছু কিছু নিতান্ত সেকেলে গোছের প্রৌঢ় বা যুবা, বলিতে লাগিল—মূর্তি আবহমান কাল থেকে যা আজও তা-ই। বাকি সবাই, বিশেষ করিয়া যুবারা গৌরীনাথের কথাই সমর্থন করিল। অল্পে অল্পে রীতিমত দলাদলি পড়িয়া গিয়া শ্রাদ্ধ ও বিবাহের আসর পর্যন্ত আক্রমণ করিল। যাহারা বুড়া শিবের পক্ষে রহিল—যুবারা তাহাদের নাম দিল 'বাবার পার্টি'; বুদ্ধ লইয়া ধর্ম হইতে স্খলিত বলিয়া ধ্বনিসাদৃশ্যে যুবাদের নিজেদের নাম পড়িল—বুদ্ধিভ্রষ্ট। আক্রোশের ভক্তিতে মাঝে পড়িয়া শিলামূর্তিটির উপর ফুল-বিল্বপত্রের গাদা জমিয়া উঠিতে লাগিল। ওদিকে যুবারা 'অমিতাভ ড্রামাটিক্ ক্লাব' নাম দিয়া একটি সমিতি গড়িয়া বুদ্ধদেব-সংক্রান্ত একটি নাটকের জোর মহড়া দিতে লাগিল; শীঘ্র পারফর্মেন্স দিবে এবং তাহাতে গ্রামের মুখোজ্জ্বলকারী গৌরীনাথকে অভিনন্দিত করিবে।

ইহার মধ্যে গৌরীনাথ একদিন গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাকে বলিল, "সাহেব ছিলেন না, বিলেতে গিয়েছিলেন; সেদিন এসে সব দেখে শুনে বললেন 'গৌরী, এই মূর্তিটিরই অভাবে আমি আমার বইখানা শেষ করতে পারছি না। তোমার গ্রামে এল কোথা থেকে?' সব শুনে বললেন···হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি মা, সাহেব বলছেন মূর্তিটা মহাদেবেরই; বৌদ্ধ আর শৈব যুগের সন্ধিকালে বাংলায় এ ধরনের মূর্তিশিল্প···থাক্, সে-সব কথা তো তুমি বুঝবে না।"

সাবিত্রী দেবীর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন, "আহা, দীর্ঘজীবী হোক তোর সাহেব, বাবা, আর বলতে যে হবেই গৌরী, তুই জিগ্যেস করে দেখিস, নিশ্চয় বাবা নিজে স্বপ্ন দিয়েছেন।"

"কিন্তু হ্যাঁ, উনি আবার বলছেন আজকাল এ-মহাদেবের পুজো কোথাও প্রচলন নেই। সে যা-ই হোক মা, তোমার বুড়াশিব সত্যই জাগ্রত,—তোমার ছেলেকে এই বছরেই বোধ হয় রায়সাহেব খেতাবটা পাইয়ে দিলেন···"

বৃদ্ধা মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, "কত ছলনাই যে জান!" বাহিরে আর কিছু প্রকাশ না করিয়া পুত্রকে বলিলেন, "রায়সাহেব!—তোর আবার

রায়সাহেবিতে কি দরকার গৌরী ?”

বলা বাহুল্য, রায়সাহেবির উপর যতটা ব্যক্তিগত ঝোঁক, তাহার চেয়ে গৌরীনাথের বেশি এই আশা ছিল যে, মা ইহাতে লুব্ধ হইবেন,—মূর্তিটা স্থানান্তরিত করা সহজ হইবে ; কিন্তু এমন একটা জবর সংবাদে খুশি হওয়া দূরের কথা, মা এমন বিসদৃশভাবে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন যে, গৌরীনাথ প্রথমটা যেন চকিত হইয়া গেল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, “ ‘তোর আবার’—মানে ? তোমার ছেলে কি নির্বিকার পরমব্রহ্ম ভেবেছ ?—কোন সাধ-আহ্লাদ নেই ? কত লোকে আজীবন চেষ্টা করে পারছে না, আমি যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই তো জোর বরাৎ বলতে হবে। সাহেব বললেন, ‘গৌরী, এ রকম মূর্তি সমস্ত বাংলায় দু’তিনটির বেশি নেই, কোথায় যে আছে ছড়ানো এগুলি ধরতে পারছিলাম না। তুমি যদি মূর্তিটি এনে হাজির করতে পার, এই বার্থ ডে-লিস্টে’… বার্থ ডে-লিস্ট্ জান তো মা ?—রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে খেতাবের যে ফর্দ বের হয়…‘রায় বাহাদুর’টা আর দেবে না, ‘রায় সাহেব’টা স্বচ্ছন্দে হয়ে যায়।”

সাবিত্রী দেবী কতকটা অন্যমনস্ক কতকটা বিহ্বল ভাবে ছেলের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মুখ দিয়া যেন রা সরিতেছে না।

গৌরীনাথ বলিয়া চলিল, “তুমি যে ঘাবড়ে গেলে মা ! তোমার মূর্তি নিয়ে দরকার তো ?—আমি জয়পুরের মূর্তি এনে দেব ; শিব কি বুদ্ধ, কি গণেশ, কি নাড়ুগোপাল কোন সন্দেহ থাকবে না। আমি ভাবছি এখন নিয়ে যাই কি করে। তোমার ‘বাবা’কে যদি “প্রিজার্ভেশন অব এন্‌সিয়েন্ট মনুমেণ্ট এ্যাক্টে” ফেলি তো আস্তানা ছেড়ে সুড় সুড় করে যেতে হয়, কিন্তু তাতে অনেক সময় হৈ-চৈ হয়,—লোকের মন থেকে কুসংস্কার এখনও সম্পূর্ণ যায় নি তো !—সাহেব তা চান না, দূর হলেও জায়গাটা কলকাতার কাছাকাছির মধ্যে ধরতে হবে কিনা…”

একটু চিন্তিত থাকিয়া বলিল, “রোসো, দেখা যাক, বেশ একটা মতলব এসেছে মাথায়,—যদি লেগে যায়,…ওদের যদি দলে টানতে পারি তো কার্যসিদ্ধি অবধারিত জেন মা। সাহেবের কাছেও খাতিরটা বেড়ে যায় কত ; গবর্ণমেণ্টেরও নেকনজরে থাকা যায়। তা ভিন্ন সি-আই-ই নাইট্‌হুড সবই তো ঐ পথে,… দাঁড়াও…”

সাবিত্রী দেবী যেন একটা ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিয়া কতকটা ব্যাকুলভাবে এবং অনেকটা নিরাশভাবেই বলিলেন, “না গৌরী, একেবারে দেশ ছাড়া করবি বাপ, যখন বুঝলিই স্বয়ং তিনি—দু’টো বিল্বিপত্র পেলে সন্তুষ্ট থাকেন—কি হবে

ওঁর গবর্ন্মেণ্টের কাছে কদরে আর খেতাবে বাবা ?"

গৌরীনাথ হাসিয়া বলিল, "খেতাব ওঁর নয় মা, আমার।"

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "মা বলে যার কাছে এসেছ তাকেও ভোলাবে ?" বাহিরে বলিলেন, "ওঁরই হোক আর তোরই হোক্—ছাড তুই খেয়াল গৌরী—বড সব্বনেশে নেশা ও এক। ওরই পেছনে চৌধুরীদের অতবড জমিদারিটা ধাবে ধারে বিকিযে গেল, একবার ঝোঁক ধরলে টাকাকডি, ঠাকুর দেবতা কিছুই জ্ঞান থাকে না।"

৪

অমিতাভ ড্রামাটিক ক্লাবে ড্রেস্-রিহার্সাল চলিতেছিল। ছডি ঘুরাইতে ঘুবাইতে গৌরীনাথ গিয়া উপস্থিত হইল।

সে গ্রামের লোক হইলেও বহুদিন হইতে—অর্থাৎ, সেই কলেজ যুগ হইতেই কলিকাতাবাসী, কালেভদ্রে প্রবাসীর মত আসে মাত্র, তাও বেশি মেলামেশার অভ্যাস নাই। কাজেই নিতান্ত যাহাকে 'গেঁয়োযোগী' বলে, সেরূপ হইয়া যায় নাই। অপরিচয়ের বা অল্প-পরিচয়ের ব্যবধানের জন্য নবীনদের মধ্যে বেশ একটা খাতির আছে, সম্প্রতি মূর্তি ব্যাপারে সেটা বাডিয়াও গিয়াছে বরং। সে আসিতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পডিল।

ক্লাবের সেক্রেটারি অনাদি একটি নডবডে চেয়ারকে রথের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সারথির পার্ট করিতেছিল, পরম আগ্রহে চেয়ারটা ছাডিয়া উঠিয়া দাঁডাইযা বলিল, "বসুন।"

গৌরীনাথ পলকে চেয়ারটির বিপজ্জনকতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! সে কি হয় ? আপনি বসে রয়েছেন চেয়ারটায়। আমি এই চৌকিতে বসছি। চলুক আপনাদের। ডিসটার্ব করলাম নাকি ?"

যে বুদ্ধদেবের পার্ট করিতেছিল, সে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "না, ডিস্টার্ব কি বলছেন, বরং মাঝে মাঝে দয়া করে এসে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন। চেষ্টা করছি আমরা, তবে ঠিক ক্যালকাটা স্টাইলের বুদ্ধদেব কি ফোটাতে পারব ?"

সারথি অনাদি বলিল, "শোনাও না গৌরীদাকে পার্টটা একবার।"

গৌরীনাথ সুবিধাটা হাতছাডা করিল না। খানিকক্ষণ উৎকট চীৎকার, হাত পা আছড়ানি ঔষধ-গেলা গোছের করিয়া সহ্য করিল। অঙ্কটা শেষ হইলে, অনুতাপের সুরে বলিল, "আমি ভাবছি গ্রামটা অভাগা।"

"কেন ?—ও কথা বলছেন কেন ?" কয়েকজন উৎসুক প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

"এই এমন শক্তি—এইখানেই নষ্ট হবে তো ? বাইরে গেলে অনুকূল অবস্থায় পড়লে গ্রামের মুখোজ্জ্বল হত।"

বুদ্ধদেব লজ্জিতভাবে চৌকিটা খুঁটিতে খুঁটিতে সস্মিত বদনে কহিল, "গ্রামের মুখোজ্জ্বল তো আপনিই করেছেন।"

অন্য একটি ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আপনার রিসার্চ না হলে আজ সাঁতরাকে চিনত কে ?"

অনাদি বলিল, "আর আজ না চেনে কে ?"

গৌরীনাথ বলিল, "ও কি জানেন ? রিসার্চের মালমসলা যখন মজুদ তখন একদিন না একদিন ধরা পড়তই, তবে আমারই নজরে পড়ে গেল, এই যা। তা-ও কি আমিই যতটা করতে পারতাম পারছি করতে ?"

বুদ্ধদেব অগ্রসর হইয়া চেয়ারটার পিছে ঝুকিয়া দাঁড়াইল ; বলিল "সে কি কথা ! সামান্য একটা ভাঙা মূর্তি নিয়ে, দেশময় যে সাড়া পড়িয়ে দিয়েছেন…!"

চেয়ারটা ক্যাঁচ কবিয়া নড়িয়া উঠিতে অনাদি বলিল, "তুমি একটু সরে দাঁড়াও ভাই , এ-রথ রথী-সারথি উভয়ের ভার একসঙ্গে সইবে না।"

গৌরীনাথ বলিল, "এই মূর্তিটার কথাই ধরা যাক, ওর দ্বারা দেশেব যে একটা স্থায়ী গৌরব হত তা কি হতে পারবে ? কাগজের হৈ চৈ দুদিন পরে কাগজেই চাপা পড়ে যাবে ; এদিকে গঙ্গার বেনোজলের ঘষ্টানি খেয়ে খেয়ে দিনকতক পরে মূর্তির গায়ে যা একটু আধটু ইতিহাসের আঁচড় আছে এখনও, তাও যাবে মিটে। কে আর এসব কথা ভাবতে যাচ্ছে বলুন !"

না ভাবিবার দোষ হইতে বাঁচিবার জন্য সকলেই মুখে দারুণ ভাবনার রেখা ফুটাইয়া তুলিল। যে শুদ্ধোদন সাজিবে, পুত্রবিরহের গভীর হতাশার ভাবটা অভিনয় করিয়া সে বলিল, "এর কি কোনও উপায় নেই ?"

গৌরীনাথ বলিল, "উপায় আছে এখনও এবং আছে আপনাদের হাতেই, অর্থাৎ গ্রামের তরুণদের হাতেই। আপনারা যদি সাহায্য করেন তো আমি মূর্তিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে মূর্তিটিও রক্ষা পায় সাঁতরারও নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে। কিন্তু, তাতে মূর্তিটা ঠাঁইনাড়া করতে হয় ! আপনাদের মধ্যে যাঁরা মিউজিয়ামের মূর্তি-বিভাগ দেখেছেন, তাঁরা আমার কথাটা বুঝতে পারবেন। সেই সব মূর্তি আমাদের দেশে হাটে-বাটে, ভাঙা দেউলে পড়ে ছিল ; কোন-কোনটা বোধ হয় পূজোও পাচ্ছিল, যেমন এ মূর্তি পাচ্ছে ;

কিন্তু বলুন তো আজ ইতিহাস তার বিজ্ঞানসম্মত মন্দিরে বসিয়ে তাদের যে গভীর শ্রদ্ধাযত্নের সঙ্গে পুজো করছে, সে পুজো কি অন্যত্র সম্ভব ছিল? দেখুন আমাদের শাস্ত্রের মধ্যেও ভাঙা দেবতার পুজো বারণ, কেননা সে দেবতা প্রাণহীন। কিন্তু, দেবতা যে পরিমাণে ধর্মচক্ষে প্রাণহীন, ঠিক সেই পরিমাণে ইতিহাসের চক্ষে প্রাণবন্ত, কেননা ছোট থেকে বড পর্যন্ত তার প্রত্যেক অঙ্গহানি এক একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য। দেবতা যখন ধর্মের রাজ্যে মরেন, তখন ইতিহাসের রাজ্যে তাঁর হয় রেসারেকৃশ্যন অর্থাৎ পুনর্জন্ম। তখন তাঁকে ঘরে বেঁধে রেখে মাথায় জল ঢাললে কোনই ফল হয় না, শুধু ইতিহাসের সাক্ষী ভাঙানোর দোষ হয়। আপনারা বোধ হয় বলবেন ইতিহাসের কি দরকার? এই ভাঙা নুডি যদি লোকের মনের ধর্মভাবটা জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয় তো ওকে রেহাই দাও না। এই বিজ্ঞানের যুগে আপনারা, দেশের তরুণরা, যদি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা না বোঝেন আর তার আসনে অন্ধ সংস্কারকে বসান তো আমার কিছুই বলবার থাকে না…"

একটা মিশ্র আওয়াজ উঠিল, "না, না, বলুন…ইতিহাস চাই বৈকি… ইতিহাসের অভাবে…" যাহারা কম তরুণ তাহাদেরই আওয়াজটা বেশি স্পষ্ট।

গৌরীনাথ বলিয়া চলিল, "তাহলে বোধ হয় কিছু অপ্রিয় হলেও একটা কথা আমি বলব। কেননা আমি তো গ্রামের বৃদ্ধদের মধ্যে কথা কইছি না, কইছি সেই তরুণদের মধ্যে যারা দেশের ভবিষ্যৎ। ইতিহাস আর ধর্ম—কোন্‌টা স্থায়ী? কালের কষ্টিপাথরে কোন্‌টার দাগ অমিট থাকে?—কত ধর্ম এল কত গেল—কোথায় এখন ফ্যারাওদের ধর্ম;—আইসিস্ রা, থিয়া?—হল গ্রীসের অভ্যুদয়, এল জুপিটার, এপোলো, ভিনাস্, মিনার্ভা—কোথায় তারা এখন? বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে, তারা ছিল। কালের দরবারে তাদের এইটুকুই সার্থকতা যে মানবমনের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত করবে তারা। তার মানে তাদের সবচেয়ে বড গুণ এই যে তারা ইতিহাস-সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। এই ইতিহাস হচ্ছে কালের সহযাত্রী—যা কিছু হচ্ছে সব এরই মধ্যে। বর্তমান যুগে যে-জাতের এই ইতিহাস নেই, সে-জাত সভ্যজগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, দাঁড়াবার অধিকারও নেই। মানুষের কথা ছেড়ে দিন, একটা কুকুরেরও ইতিহাস না থাকলে, অর্থাৎ সে পেডিগ্রীড্ না হলে আজ তার সভ্য জগতে ঠাঁই নেই। এ অবস্থায় আপনারা কি সর্বতোভাবে ইতিহাস গড়ে তোলাটাকে দেশের সবচেয়ে বড় কাজ মনে করেন না? আর ইতিহাসের মালমসলাকে কুসংস্কারের কাছে বলি দেওয়াটাকে একটা গর্হিত, আত্মঘাতী কাজ বলে মনে করেন না?…

"আমি বলছি—আপনারা আমায় এ-মূর্তিটি দিন। এর গুরুত্ব আপনাদের কাছে সবিস্তারে বলবার সময় নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, এর পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ আর শৈব পর পর দুটি ধর্মেরই প্রভাব রয়েছে বলে বড় বড় সাহেবরা সন্দেহ করছেন। তাঁরা বলছেন, এতে বাংলার ধর্মের আর মূর্তিশিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস ঠাসা রয়েছে। এহেন এক সম্পদ যা গ্রামের বহু ভাগ্যবলে পাওয়া গেছে সেটা কি আপনারা ভাঙা মন্দিরে চাপা পড়ে নষ্ট হতে দেবেন, —না… "

একটা কলরবের মত উঠিল, "না না, আপনি নিয়ে যান। আমাদের কিছু আপত্তি নেই…"

"আপানাদের আপত্তি যে থাকবে না তা আমি আশাই করেছিলাম। থাকবে কয়েকজন বড়দের আপত্তি, তাঁরা বলবেন—দেবতাজ্ঞানে যখন মূর্তিটিকে পূজো করছে এখনও…"

একজন বলিল, "তাঁদের কথা শুনবে কে ?"

অনাদি বলিল, "আর যারা ঠাকুর বলে মনে করে—'বাবার দলে'র লোকেরা গুনতিতে কমও,—হোপলেস্ মাইনরিটি, ঠেকাতে পারবে না। আমাদের ক্লাবে তো বলতে গেলে সবাই 'বুদ্ধ পার্টি'র।"

এক কোণে একটি ছোকরা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল এতক্ষণ, দাঁড়াইয়া উঠিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, আমি বিশ্বাস করি মূর্তিটা মহাদেবের, থিয়েটারে জয়েন করছি সে আলাদা কথা, আর্ট হিসেবে…"

সে একটা প্রবল আপত্তি করিবে ভাবিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরটাতে অভিনয়ের হাওয়া ছিলই ; যেন একটা উগ্ররকম আত্মোৎসর্গ করিতেছে, মুখে এবং গলার স্বরে এই ভাব ফুটাইয়া ছোকরা বলিল, কিন্তু দেশের কাছে—দেশের ইতিহাসের কাছে আমি দেবতাকেও মানতে চাই না। আমার শুধু একটা অনুরোধ—সাঁতরার দেবতা আজ যাচ্ছেন ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে ; তাঁকে সেই ভাবেই বিদায় করা হোক। আমার প্রস্তাব—পাঁজি দেখে একটি শুভদিন দেখা হোক—সেটির নাম দেওয়া হোক 'বুড়াশিব ডে' (Bura Shib Day), আর উপযুক্ত বাজনাবাদ্যি কাঁসর-ঘণ্টার সঙ্গে বাবাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হোক।"

… … …

গ্রামে বিশেষ কিছু সাড়াশব্দ, ওজর আপত্তি উঠিল না। মৃতজাতির দেবতা

—তাদের ধর্মবিশ্বাস একটা প্রাণহীন আচার মাত্র। ফুলে পাতায় সাজানো গাড়িতে চড়িয়া—বুড়াশিব চলিয়াছেন যাদুঘরে ইতিহাসের কাছে তাঁহার জবানবন্দি দিতে। বিলাতী ব্যাণ্ড, কাঁসরঘণ্টা, আতসবাজি···গ্রামের একটা উৎসব···বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা ভুলিয়া অনেকেই আসিল দেখিতে—একটা অভিনব তামাসা—এই প্রথম আর এই শেষ।

সারা গ্রামখানার মধ্যে শুধু একজনের বিস্ময়বিমূঢ় মনে একটা গভীর দাগ বসিয়া রহিল, কেননা সেই একজনের কাছে দেবতা ছিলেন দেবতা—শিলা মাত্র নয়,—যে দেবতাকে সে একদিকে দিয়াছে বক্ষের স্তন্য আর অপর দিকে দিয়াছে গভীর ভক্তি।—

উৎসবমত্ত জনতা থেকে দূরে জীর্ণ বটের একটা ঝুরির কাছে দাঁড়াইয়া সাবিত্রীদেবী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বড় গভীর দুঃখেই তাঁহার বহুদিনের আশঙ্কাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন, "করেছিলাম চেষ্টা; কিন্তু তোমাকেও যেদিন কলিকালে ধরলে বাবা—যেদিন বুঝলাম পোড়া রায়সাহেবির মোহ তোমায়ও পেয়ে বসে তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়েছে, সেদিন থেকেই আমি সব আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়েছি।"

টেলিগ্রামের দৌত্য

সংসার-কলেজ

সর্বাণীকুমার একদমে ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ, বি-কম, এম-এ, বি-এল এবং পি-এইচ-ডি পাস দিয়া যখন পাণ্ডিত্যের একটি জটিল প্রহেলিকা হইয়া বাহির হইয়া আসিল, সংসারের তরফ হইতে প্রথম তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন একটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার পিতা। এটিকে শেষ অভিনন্দনও বলা চলে, কারণ ইহার পরে সংসার উদাসীন হইয়াই রহিল এবং বিশেষ করিয়া চাকরির বাজারে সর্বাণী হাজার হাজার রকমে নিজের পরিচয় দিয়াও সে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারিল না। তখন শ্বশুর বলিলেন, "এ কাজের কথা নয় বাবাজি, তোমার ও প্রেস্টিজ···প্রেস্টিজে পেট ভরবে না, ঢুকে পড় আমার আপিসে, কপাল ঠুকে।"

আজ এক বৎসর সর্বাণী এই মার্চেণ্ট আপিসে কাজ করিতেছে। উন্নতিও

করিতেছে—একে বডবাবুর জামাই, তায় পেটে বিদ্যাও আছে—তবে শ্বশুরের বড কড়া নজর, বলেন, "না, কাজ শেখবার বয়েস এটা, ফুর্তির ঢের সময় আছে।" কাজে ঢুকিবার পর মাত্র একবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিয়াছিল; শ্বশুর বলেন, "এখন ঐতেই সন্তুষ্ট থাক। আর শ্বশুরবাড়ির খোদ-শ্বশুরটিকে তো অষ্টপ্রহর দেখতেই পাচ্ছ, যাহোক একটা সান্ত্বনা তো?"

জীবনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ রসিকতা—এসবের ধার দিয়া বড একটা যান নাই; কোথায় অসঙ্গতি হয়, ভুলভ্রান্তি হয—বিশেষ খোঁজ রাখেন না, স্থূল বপুখানি পরতে পরতে আন্দোলিত করিয়া হাসিযা উঠেন।

মাস ছয়েক হইল একটি কন্যা হইযাছে—অনেক দিন হইতে একবার যাওয়ার জন্য সর্বাণী উসখুস করিতেছে। আপিসেব প্রবীণদের তাগাদায় বডবাবু রাজি হইয়াছেন—চার দিনের মেযাদে। সাহেব কি একটা ব্যারাম সাবিবাব জন্য বিলাতের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস বাথ (Bath) নামক শহরে গিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে। সে আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই সর্বাণীর হাজির হওয়া চাই।

সর্বাণীর গাড়ি দুটো-ছাপ্পান্নয়। ঠিক হইয়াছে আডাইটে পর্যন্ত আপিসে থাকিবে, তাহার পর ট্যাক্সিতে ছুট দিযা শিযালদহে গাড়ি ধরিবে। সর্বাণী এ-বহি সে-বহি উল্টাইয়া খানিকটা কাটাইল, একটা মোটা লেজারে ক্রমাগতই ভুল লিখিয়া খানিকটা কাটছাঁট করিল এবং ক্রমাগত বাম হাতের রিস্টওয়াচটির দিকে এবং ডানদিকে দেওয়াল-ঘডিটার দিকে চাহিয়া সময়ের স্টীট রোলারের মত গতিটার জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দেওয়াল-ঘডিটায় ক্যালকাটা-টাইম—এদিকে রিস্টওয়াচে রেলওয়ে টাইম আজ মিলাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে যেন দুইটাই ষডযন্ত্র করিয়া আজ হাত পা মুড়িয়া বসিয়াছে।

টেবিলের দুই পাশের দুইটি ড্রয়ার টানিয়া দিযা আড়াল করিয়া, পকেট হইতে একটি সুগন্ধ-লিপি সন্তর্পণে বাহির করিয়া কোলে মেলিয়া ধরিল এবং ঘাড সোজা করিয়া চোখ নীচু করিয়া পডিতে লাগিয়া গেল। আপিসের ঠাকুর্দা অভয় চৌধুরী তাহার পেছনেই পিছন ফিরিয়া বসেন, না ঘুরিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "মুখস্থ হল ভায়া?"

সর্বাণী হাসিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, মুখ তুলিতেই বডবাবুর পেয়াদা একটি সেলাম ঠুকিয়া একটি স্লিপ দিল। লেখা আছে—"Dr Sarbani Bose, Ph D. to see me at once" (ডক্টর সর্বাণী বোস, পি-এইচ. ডি. এখনই এসে দেখা করুন)—বডবাবু জামাইয়ের শ্রেষ্ঠ খেতাবটি নামের দুই দিকে জুড়িয়া দিতে কখনও ভোলেন না।

সর্বাণী শ্বশুরের কামরার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি একখানা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে বলিয়া কলম ঘষিতে লাগিলেন। বেয়ারা বাহিরে গিয়া পর্দাটা টানিয়া দিল।

বড়বাবুর লিখিতে খানিকটা সময় গেল; শেষ হইলে বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া মলাটের উপর কর্মসমাপ্তিসূচক একটা কিল বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "ব্যস!" এ তাঁহার একটা চিরকেলে বদ অভ্যাস, সাহেবও শোধরাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছেন। বলিলেন, "আগে কাজ, তারপর সংসারের কথা, এটুকু মনে রেখ বাবাজি।...হ্যাঁ, তাহলে আজ নেহাৎ সিঁদুরালিতে যাবেই?"

সিঁদুরালি শ্বশুরবাড়ি। যুবক লজ্জিতভাবে মাথাটা একটু নীচু করিয়া লইল। বড়বাবু কহিতে লাগিলেন, "তা যাও, আর যাবে বৈকি, সে কি কথা! তুমিও অনেকদিন যাও নি, আর তাঁরাও অনেকদিন তোমায় দেখেন নি। তোমার শাশুড়ির খুবই ইচ্ছে। আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ইয়াব্বড়া এক চিঠি লিখেছেন —সে যদি দেখ! আর, আমারই কি অনিচ্ছে? তবে কি জান বাবাজি?— চাকরি আগে, ফুর্তি পরে। এই তোমাদের উঠতি বয়েস, এখন সব ভুলে উন্নতির দিকে নজর রাখবে—বকোধ্যানম্ হয়ে চিন্তা করবে কিসে দু-পয়সা আসে। এইটিই মূল রে বাবা। আর মানুষ কটা বচ্ছরই বা রোজগার করতে পারে? পঞ্চাশ পঞ্চান্ন—ধর ষাট? তারপর কর না কত ফুর্তি করবে।...বেয়ারা! ...ডাকলে আবার সাহেব বেটা রাগ করে। তা কি করব? ও ছেলেদের খেলনার মত কলিং বেল আমার হাতে টেকে না। চারটে তো বেকল হয়ে পড়ে আছে। অত যদি অফিস্যাল কায়দা চাই তো দে না একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টা কিনে—এন্তার পা দিয়ে খটাং খটাং করতে থাকব'খন।

সর্বাণী হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু পকেট হইতে দস্তার মোটা চেন-আঁটা একটা প্রকাণ্ড পকেটঘড়ি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, বলিলেন, "দুটো পনের হয়েছে, ঠিক আড়াইটের সময় যে ট্যাক্সিটা দেখবি, ডাকবি। আমি ও হল্টেজ ফল্টেজ দিতে রাজি নই, বুঝলি? না দেবায়, না ধর্মায়।...ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে থাকগে।...কি বুঝলি? হয়েছে, হয়েছে, আর মেলা বক্তিমে দিতে হবে না,—তুমি খুব বুদ্ধিমান, এখন যাও, দয়া করে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াও গে।...বাবাজি বোধহয় ভাবছ শ্বশুরব্যাটা আচ্ছা কৃপণ তো..."

সর্বাণী অপ্রতিভ ভাবে অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "না…"

বড়বাবু সেটুকুর দিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "…ছু-এক মিনিট হণ্টেজ নিয়ে মারামারি করে। তা করি ; কেন যে করি, পয়সাটা যে কি জিনিস ক্রমে টের পাবে। এইতো কুল্যে একটি মেয়ে হয়েছে ; বছর বছর একটি করে আমদানি হয়ে সংসারটি জাঁকালো হয়ে ঘাড়ে চেপে বসুক, তখন বুঝবে—হ্যাঁ বুড়ো ব্যাটা একদিন বলেছিল বটে।"

রসিকতা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সর্বাণী লজ্জায় মাথা নত করিল। ।

"হ্যাঁ, তোমায় যার জন্যে ডাকা। কথাটা বলতে কেমন শোনায় বটে, কিন্তু তা ভাবলে সংসার চলে না। কথাটা এই যে—দিলাম বটে পাঁচদিনের ছুটি—তোমারও দেখছি মেয়েটির দিকে মন পড়ে রয়েছে, গিন্নীরও আগ্রহাতিশয্য, কিন্তু পার তো এ থেকেও একদিন বাঁচিয়ে নিয়ে এস। সাহেব এই সময়—সেরে-সুরে ভাল মন নিয়ে আসবে, একটা মস্তবড় সুযোগ। কি জান বাবাজী ? শ্বশুর-বাড়িটা একটা বদ জায়গা, সব মেয়েদের কাণ্ড কিনা ? ঠিক যে-সময়টি পয়সা কামাবার বয়েস, সেই সময়টি ও উপসর্গটিও জোটে এসে। এই করেই বাঙালী জাতটা তো গেল। সায়েবদের মধ্যে ও বালাই-ই নেই—তোমাদের ওপর শাসনও করছে দিব্যি। পি-এইচ.ডি.পাশ করে তো ডাক্তার হয়েছ—ওদের বই-টইয়ের মধ্যে 'শ্বশুরবাড়ি' বলে কোন কথা পেয়েছ ?—আমরা টেনে father-in-law's house করেছি, আমাদের কাজ চালাবার জন্যে। এইগুলি লক্ষ্য করবার বিষয়।"

লজ্জায় সর্বাণীর আর ঘাড় তুলিবার অবস্থা ছিল না।

"রাগ ক'রো না বাবাজি, শ্বশুর তোমার একটু স্পষ্টবক্তা লোক। পাশ করেছ অনেক—লেকচারও শুনেছ অনেক। কিন্তু সংসার-কলেজের প্রিন্সিপ্যালের লেকচার একটু শুনতে হবে বই কি।…আরে চার দিনে না আসতে পার পাঁচটা দিনই পুষিয়ে নেবে, কিন্তু তার বেশি নয়।…হ্যাঁ, এইগুলো ধর—নাও, হাত তোল। এই কুড়ি টাকা—সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়া, ওদিকে যদি গাড়িটাড়ি নাই এসে পৌছুল কি কিছু হল—একটা তখন ভাড়া করতে হবে তো ?…এই দশ টাকা ধর। এই ট্যাক্সি আট টাকা…হ্যাঁ, হ্যাঁ, অতই লাগবে,—শ্বশুরের কাছ থেকে টানতে হয় রে বাবা, নাও, হাত গুটিও না। আমরাও তো এক সময় জামাই ছিলাম—শ্বশুর ব্যাটাকে কামধেনু বলেই ধরতাম…হাঃ—হা—হা…। রাস্তায় চা জলখাবার আছে—এই পাঁচটা টাকা ধর।…সিগারেট খাওয়াটা ছেড়েছ তো ?

হ্যাঁ, ওটা প্রথমত বড অপকারী, আর দ্বিতীয়ত—সেরেফ বাজে খরচ—না দেবায়, না ধর্মায়।···প্রথম মেয়ের মুখ দেখবার জন্যে ধরবে সব, একটু নেবে ঘোষ এগু সন্দের ওখান থেকে, একটা কিছু যাহোক সোনাদানা নিয়ে যেও। এই নাও পঞ্চাশটি টাকা—দেখছ, ব্যাটা নবাবপুত্তুর আবার হাত গুটোয়! এদিকে বেয়ারা ব্যাটাও হ্যাঁ করে রয়েছে—কোথায় যাচ্ছ খোঁজ নিতে কি বাকি রেখেছে মনে কর ?···এই ধর একটা টাকা। সেখানে মেয়েবা খাওয়ার জন্যে ধরবে—কেন বোকার মত নিজের গাঁট থেকে পয়সা খরচ করবে ? রাখ এই কুড়িটা টাকা।—আমাদের ঠাকুদ্দার সেই 'জুতাকা বদৌলত' খাওযাবার গল্পটা জান তো ?—এক মৌলবী ছিল—বে করলে, ছেলে হল—বন্ধুরা বললে, খাওয়াও ; কিন্তু সে-বেচারা পেরে ওঠে না। শেষকালে তাগাদার চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিলে একদিন সবাইকে ঢালোয়া নেমন্তন্ন করে। সবাই জুতো ছেড়ে ঘরে গিয়ে বসে হাসিতামাসা, গল্প-গুজব করতে লাগল। যখন আর কেউ বাকি নেই, মৌলবীসায়েব সবার বাছাবাছা জুতোগুলো বাজারে নিয়ে গিয়ে···"

হাসির মধ্যেই বেয়ারা আসিয়া বলিল, "ট্যাক্সি হাজির।"

বডবাবু বলিলেন, "তাহলে ওঠ বাবাজি, আর দেরি করা নয়। থাক্ থাক্, আর প্রণাম করতে হবে না। আমার মাথায় যত চুল আছে তত বছর পরমায়ু হোক—তোমার গিয়ে—টাক পডবার আগে যত চুল ছিল।—হাঃ—হা—হা—এস বাবা, স্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম করে দিও।"

কলেজের দৃশ্যান্তর

সিঁদুরালি গ্রামটা কলিকাতা হইতে একশত ক্রোশের মাথায়, রেল স্টেশন হইতে ছয় ক্রোশ, পোস্ট অফিস হইতে চার ক্রোশ। রেল নৌকা আর গরুর গাড়ি যোগে পৌছিতে হয়, গোটা চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়া যায়। সেবারে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাণী নাক-কান মলিয়াছিল—আর ও-মুখো নয়।···

ভোরে রেলগাডি হইতে নামিয়া শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ মত একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিল। স্টেশনে লোক. গাড়ি মজুত ছিল—সে কথাও জানাইয়া দিল। তাহার পর দীর্ঘ সাত ঘণ্টা রাস্তার ঝাঁকানি, দোলানি, ধূলা, তৃষ্ণা, রোদ—সমস্ত অত্যাচার একখানি মিলনোৎসুক মুখের চিন্তায় সহ্য করিয়া যখন গন্তব্যস্থানে পৌছিল—তখন বেলা একটা হইয়া গিয়াছে।

গল্পগুজবের মধ্যে স্নানাহার সারিতে প্রায় তিনটা হইয়া গেল। তাহার পব পান চিবাইতে চিবাইতে বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করিল ; বড় শালাজ গল্প করিতে করিতে দুয়ার পর্যন্ত আসিল এবং একটি মিষ্ট হাস্যের সহিত সর্বাণীকে সব ছাড়িয়া আগে একটি যুৎসই নিদ্রা দিবার পরামর্শ দিয়া বিদায় লইল।

ওদিকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সেটা যাহাতে সম্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিল। জুতাজামা ছাড়িয়া পালঙ্ক আশ্রয় করিতে না করিতেই মাখনের মত কোমল, ঢলঢলে একটি কচি মেয়েকে কোলে লইয়া তাহার স্ত্রী সুহাস ব্রীড়াজড়িতপদে ঘরে প্রবেশ করিল।

দু'জনেই পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুহাস হাসি-হাসি মুখখানা লজ্জায় বাঁকাইয়া নীচু করিল। অনেকদিন পরে দেখা, তাহার উপব কোলের এই নূতন সম্পদটি,—তাহার বড়ই জড়িমা বোধ হইতেছিল। দৃশ্যটা সর্বাণী খানিকটা উপভোগ করিল, তাহার পর বধূকে কাছে টানিয়া লইয়া, বাঁ হাতটা তাহার কাঁধের উপব বাখিল, দক্ষিণ হস্তে কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাব নধর ঠোঁটে—পিতৃত্বের একটি স্নেহনিদর্শন দিল, তাহার পব বলিল, "বড় চমৎকাব হয়েছে, না ?"

সম্মুখ হইতে স্বামীর পাশে আসিয়া সুহাসের লজ্জাটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল ; খুকির মুখের পানে চাহিয়াই বলিল, "তোমার মত মুখ হয়েছে, চমৎকার তো হবেই ! সবাই বলছে বাপ-মুখো মেয়ে, খুব ভাগ্যবতী হবে। ঠিক তোমার মত আদল হয়েছে।"

সর্বাণী হাসিয়া বলিল, "যদি তোমার কথাই মানতে হয় তো অন্তত বেচাবাব একটা দুর্ভাগ্য এই যে, মার অমন মুখ না পেয়ে বাপের এই কাঠখোট্টার মত মুখ পেয়েছে।" তাহার পর আর একটু ঝুঁকিয়া বলিল—"সত্যি বলছি চোখ দু'টি অবিকল তোমার মত।"

শিশুটি এই সুযোগে বাপের পকেটস্থ মনিব্যাগটি অল্পায়ত্ত আঙুলের দ্বাবা যতটা সম্ভব বাগাইয়া ধরিয়াছিল, একটা টান দিয়া সেটাকে মুখে পুরিবার চেষ্টা করিল। সুহাস হাসিয়া বলিল, "বাপের উপর ডাকাতি হচ্ছে ?"—বলিয়া কন্যাকে স্বামীর বক্ষে তুলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, বমালসুদ্ধ ডাকাত ধরে দিলাম—বকশিস ?"

সর্বাণী কন্যাকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিল। বধূকেও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভেজানো দরজার বাহির হইতে কাংস্য-নিন্দিত স্বর উঠিল, "তা বলি

জামাইবাবু, এখন মা-ষষ্ঠীর কিরপেয় সুভালাভালি একটি ভেঙে দুটি হল, আমাদের বকশিস…"

"ঝি !"—বলিয়া সুহাস মুখে আঁচল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"তোর যে আর তর সয়না ঝি—কদ্দিন পরে দুটিতে…"

কণ্ঠস্বরটি শ্যালিকা সুভাষের ; তাহারও যে বিশেষ তর সহিতেছিল এরূপ মনে হয় না, কারণ সে দুয়ার পর্যন্তও খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিল এবং বলিল, "আমাদের সবার বকশিস বাকি—মেয়ের বাপ হাওয়া চাড্ডিখানি কথা নাকি ?…"

ঝি-ও হাসিতে হাসিতে তাহার অনুসরণ করিল। ঝি আসিতে সুহাস ঘোমটাটা কপালের নীচে নামাইয়া দিল। সর্বাণীর ঠোঁটে একটি বেশ সরস বিদ্রূপ আসিয়াছিল, সেটি প্রয়োগ করিবার পূর্বেই খুকি ঝিকে দেখিয়া মায়ের কোল হইতে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ডুডু !"

ঝি বলিল, "না রে ক্ষেপী, জুজু নয়, বাবা—এইতো কোলে উঠেছিলি ; বাবা চুমো খায়, গয়না দেয়…ওমা সত্যিই তো ! কই পেরথোম মেয়ে, মুখদেখানো সোনা দানা কই ? আর তোমরাও তো আচ্ছা মা-মাসি বাপু, তেহন্‌থে নিজের কথাই পাঁচকাহন করছ, মেয়েটা কথা কইতে জানে নি বলে আর সে নিজের নেয্য পাওনা পাবে নি গা ?…"

সুভাষও যোগ দিল, "তাই তো ! আমি ভেবেছি দিদি প্রথমে এসেছে, নিশ্চয় আদায় করে রেখেছে !…তুই যে ভাই মেয়ের কথাও ভুলে বসে থাকবি এ কেমন করে জানব ?"

সুহাসের দেওয়ার মত কোন জবাবদিহি ছিল না। আসল কথাই হইতেছে —শেখানো থাকিলেও সে অনেকদিন পরে স্বামীকে দেখিয়া আদায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সর্বাণীর ইঙ্গিতমত পকেট হইতে চামড়া দিয়া মোড়া একটা কৌটা আনিয়া তাহার হাতে দিল। সর্বাণী বোতাম টিপিয়া খুলিয়া একটু লজ্জিতভাবে সুভাষের হাতে দিল। মাঝখানে একটি পাথরবসানো লকেটযুক্ত একগাছি সোনার হার।

সুভাষ উৎফুল্লভাবে খুকির গলায় পরাইয়া একটু দূরে সরিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল, "কি চমৎকার মানিয়েছে দেখ দিদি !…বোসজামশাই, তোমার পছন্দ আছে, আমি পরোয়ানা দিলাম।"

ঝি-ও আহ্লাদের চোটে বুকে চাপিয়া একমুখ হাসিয়া হারটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সর্বাণী আর সুহাস, দুজনেই লজ্জায় ঘাডটা নীচু করিয়া আডচোখে সন্তানের বর্ধিত শ্রী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুভাষ খুকিকে কোলে লইযা সংবাদটি বাডিতে রাষ্ট্র করিতে ছুটিল। ঝি-ও অনুসরণ করিল।

খানিকক্ষণ ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শেষে সুহাসই কথা কহিল,—অনুযোগের স্বরে ঘাড বাঁকাইয়া বলিল, "দেখ তো, মিছে আমায় অপ্রস্তুত করালে।"

সর্বাণী তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "সরে এস,—কেন বল তো?"

"এনেছিলে তো আগে হারটা বের করে দিলেই হত। ঠাট্টার চোটে কি আর কেউ টেঁকতে দেবে?"

সর্বাণী বলিল, "সাজা কি তোমার একটু হওয়া উচিত নয়?"

সুহাস বিস্মিতভাবে চাহিতে বলিল, "যেমন ভাবে আমায সব কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলে। আমিই কি কম লজ্জায় পডলাম?"

সুহাস রাগিয়া বলিল, "ইয়ার্কি নয়, মিথ্যে কথা বলে এখন তোমায় সামলে নিতে হবে।"

"মিথ্যে কথাটা বুঝি ইয়ার্কির বাইরে হল?…তা কি বলতে হুকুম হয়?"

"বলবে আমি তোমায় বলতে ভুলিনি। তুমি নিজেই—নিজেই…"

"শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম? বেশ তাই বলব।"

"আঃ, তা কেন? বলবে, বলবে—আঃ বল-না, কি বললে ভাল হবে—আমার মাথায় আসছে না…"

সর্বাণী বিপর্যস্ত মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইল, মুখ নত করিয়া বলিল, "আমায় বললে, তার উত্তর দোব; তোমায় জিগ্যেস করলে ব'লো…"

সুহাস উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিল, "হ্যাঁ?…"

"ব'লো এর পরেরটির বেলায় আর ভুল হবে না—" বলিয়া আদরে মুখটি চাপিয়া ধরিল।

এমন সময় ভেজানো দরজায় আঘাত করিয়া তাহার বোন প্রশ্ন করিল, "আসতে পারি?"

দুতের যাত্রা

দু'টা দিন এই রকমে হাসি-তামাসা, মিলন-সোহাগের মধ্যে লঘুভাবে কাটিয়া গেল। সকলে ধরিয়া বসিয়াছে—খাওয়াইতে হইবে। তাহারই আয়োজন

চলিয়াছে। কর্মকর্তা সুভাষ, তাহারই হাতে টাকা। সর্বাণী প্রীতিভোজে প্রথমে একটু আপত্তি জানায় ; পরে, টাকা দেওয়ার সময় যাহাতে অনুষ্ঠান-আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয় সেজন্য শ্যালিকাকে মিনতি জানাইয়া বলে, "মান অর্থ সব তোমাবই হাতে সমর্পণ করলাম, সুভাষ, দেখো!"

এদিকে আপিসে শ্বশুর মহাশয় বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আজকালকার ছেলে নিজের স্বার্থ বোঝে না, কেবল ফুর্তির দিকেই নজব। তাহাতে আবার বাড়ির মেয়েছেলেরাও হইযাছে অবুঝ, কোথায় বুঝাইয়া-সুজাইয়া জামাইকে দুইদিন পূর্বেই কার্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে, না, সব জামাইয়ের তরফেই দল পাকাইতে ব্যস্ত। ওদের আস্কারা পাইযাই তো সেবাব ছুটিব উপর সাতদিন এক্স্টেনশন হইল।

এদিকে সাহেবের চিঠি আসিয়াছে, সে ১৬ তারিখে পৌছিবে। আর দিন-আষ্টেক বাকি! বড়বাবু একটা টেলিগ্রামের ফর্ম উঠাইয়া লইলেন, ঠিকানাব জায়গায় লিখিলেন—Dr. Sarbani Bose, Ph. D., Sadardihi, Sindurali. তাহার পর অনেকক্ষণ ভাবিযা নীচে আবম্ভ কবিলেন—Burra Sahib এই পর্যন্ত লিখিয়াই কলম তুলিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। একটু পবে নিজের মনেই বলিলেন, "না, বাবাজি ভাববেন শ্বশুর ব্যাটা আচ্ছা চামার তো—না-পৌছতেই তাগাদা লাগিয়েছে।" ডাকিলেন, "বেয়ারা!"

বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল।

"টাইপিস্ট বাবুকে ডাক একবাব। আছে, না সিগারেট টানতে বেরিয়েছে?"

বেয়ারা যাইয়া টাইপিস্ট বাবুকে পাঠাইয়া দিল। সর্বাণীর সমবয়সী এবং বন্ধুও। একটু অন্যমনস্ক হইলেই দুই হাতের আঙুলগুলা টাইপ করার ভঙ্গিতে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

বড়বাবু বলিলেন, "তুমি বাপু টেবিল থেকে সরে দাঁড়াও, তোমার আঙুলগুলো যেন স্বপ্ন দেখে—সেদিন অতবড় ট্রে-টা উল্টেই দিলে। সায়েব আসছে, সে খবর রাখ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি আর আটদিন⋯"

"হয়েছে, এই রকম হিসেব নিয়েই চাকরি করেছ। আটদিন নয়, ঠিক আটটি ঘণ্টা ধরে রাখবে, বুঝলে?—সেই যে ঝুনো ব্রাহ্মণ চাণক্য বলে গেছে—'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ'—সেটি কক্খনো ভুলো না। চাকরিই হল ধর্ম রে বাবা। সর্বদা 'গেলুম, গেলুম' ভাবটি মনে বজায় রেখে যাওয়া চাই।⋯ ওদিকে বন্ধুটি তো শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তোফা ফুর্তি মারছেন, তাঁর হিসেবে বোধহয়

আট মাস হবে। কবে আসছেন চিঠি পেয়েছ? এবার কতদিন এক্স্টেনশন নেবেন? যাবার সময় বলে গেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"বলেছে, তুমি মুকুচ্ছ।...টেলিগ্রামের ফর্মটা তুলে নাও দিকি। তোমাদেব দুজনকে বাঁচাতে বাঁচাতে আমি এদিকে ঘোর মিথ্যেবাদী হয়ে উঠলাম।...লেখ Burra Sahib returned from Bath—angry—wants you at once (বড সাহেব বাথ হইতে ফিরিয়াছে—ক্রুদ্ধ—শীঘ্র তোমায় চান)।...হয়েছে? নীচে তোমার নাম দিয়ে দাও, এই জন্যেই তোমায় ডাকা। আমার জবানি দেওয়া ভালও দেখায় না, আর বাবাজি গা-ও করবেন না, ভাববেন শ্বশুর-ব্যাটা ভাঁওতা দিচ্ছে।· হ্যাঁ, ওটা much angry (অতিশয় ক্রুদ্ধ) করে দাও বরং!"

টাইপিস্ট আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "Much কথাটা ঠিক বসে না; very লিখে দোব?"

"বসে না মানে?"

টাইপিস্ট সেই রকম ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, বোধ হয় গ্রামারে আটকায়..."

"আটকাক, কথাটায় জোর আছে—বেশ আঁটা-শোটা কথা, very ও-রকম তাগাদা দিতে পারবে না। "ভ" অক্ষরটাই কি-রকম ঢিলেঢালা দেখছ না? —যেন শুকনো ছাতুর মত।...কই, আমাদের সময় তো গ্রামারের এ-রকম উপদ্রব ছিল না।...নাও, লিখে দাও। আগে বাছাধন আমার ছটফটিয়ে ফুর্তি ছেড়ে আসুন তো, পরে সামলে নেওয়া যাবে'খন।...আর মেয়ের মুখ দেখা তো হল রে বাপু,—যার জন্যে এত ধড়ফড়ানি, কি বল?...বেয়ারা! এই টেলিগ্রাম দিয়ে আয়! সমস্ত দিনটা কাটিয়ে আসতে পারবি তো?"

পথের মাঝে

সিঁদুরালির পোস্ট এবং টেলিগ্রাম আপিস সদরডিহিতে—পূর্বেই বলা হইয়াছে চার ক্রোশের ধাক্কা।

পোস্টমাস্টার ভবানীশঙ্করবাবু নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির লোক। বরাবর লেখালেখি করিয়া ভিড় হইতে সরিতে সরিতে শেষ বয়সে এই নিরিবিলি জায়গাটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। সকালে খান চল্লিশেক চিঠি আমদানি হয়, আর দুপুরের ঝোঁকে খান চল্লিশেক চিঠি পাঠানো—কাজ মোটামুটি এই। ইহার উপর কোনদিন একটা মনি-

অর্ডার আসিল কি গেল, কি একখানা টেলিগ্রামের হাঙ্গামা পড়িল তো ভবানীশঙ্কর গরগর করিতে থাকেন—"পরের হ্যাপা সামলাতেই জীবনটা গেল। শেষ বয়সটাতেও নিরিবিলিতে একটু আফিন সেবা করে কাটাব তা আর হতে দিলে না ব্যাটারা ; সমস্ত জীবনটা তো নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিলি রে বাপু, আর কেন ?…"

আজ খানিকটা পাটনেয়ে আফিম সওগাত হিসেবে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে, তোয়াজ করিয়া আর খাওয়া হইল না। সমস্ত ভূভারতের কাজ আজ সদরডিহিতে আসিয়া জড় হইয়াছে যেন। সকালেব ঝোঁকে তিনখানা রেজেস্টারি, একখানা টেলিগ্রাম পাঠানো—তখনকার জমাট নেশা ঐতেই উবিয়া গেল। দুপুরে একখানা মনি-অর্ডার! ঠিক যখন মৌতাতটি জমিয়া আসিতেছে। …কেন, আর মনি-অর্ডার করিবার দিন ছিল না, সময় ছিল না ? সাত ব্যাটার সাধ্য-সাধনা করিয়া একটু ভাল জিনিস যোগাড় করা গেল তো কেবলই বাগড়া, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া যে তার লইবে মানুষে তাহার উপায়টি নাই।

ভবানীশঙ্কর ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে হাঁক দিলেন, "গুপীকেষ্ট, বলি আছিস না গেছিস রে ?"

"এই যে ঠাকুরমশায়!" বলিয়া গুপীকেষ্ট সামনেই টেবিলের আড়াল হইতে সট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একেবারে পিয়ন, স্ট্যাম্প ভেণ্ডার, সর্টার, পোস্টমাস্টারবাবুর 'বামন' আরো অনেক কিছু। ভবানীশঙ্কর একটু চমকিয়া বলিলেন, "হঠাৎ এমনি করে দাঁড়িয়ে ওঠে লোকে ?…কোথায় যে থাকিস, তখন থেকে ডেকে ডেকে হায়রান হলাম…"

গুপীকেষ্টর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কোন জবাব দিল না।

"—একটু দেখিস বাবা, আর যেন কোন ব্যাটা এসে না জ্বালাতন করে। বলিস, মাস্টার-মশায়ের শরীরটা খারাপ, কাল তখন এসে কাজ করে নিয়ে যাবেন।…আমি একটু চেখে দেখি জিনিসটা কেমন দিলে ; কেনই যে আমায় দেয় সব খাতির করে, বলে মরবার ফুরসৎ নেই।…একটু মিষ্টি কথায়ই বলিস, না হলে আবার বিনি-খরচায় নালিশ করে দেবে…"

কুয়াসার উপর কুয়াসার মতো নেশাটি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। গুপীকেষ্ট একটি লোককে খানিকটা বচসা করিয়া সরাইল। ভবানীশঙ্করের অভিভূত ইন্দ্রিয়ের কাছে বোধ হইল গুপী যেন একটা ফৌজকে কথার তোড়ে হঠাইয়া দিল। মুখে একটু হাসি ফুটিল, মনে মনে বলিলেন "সাবাস ব্যাটা!". এমন সময় টেলি-

গ্রামের যন্ত্রে শব্দ হইল, টকাটক্—টেরে—টকটক্! ছয়দিন পরে দিন বুঝিয়া ঠিক আজই!

"বলে, 'কপালে নেইকো ঘি, ভাঁড চাঁচলে হবে কি'? দেখলি গুপী, ব্যাটাদের আক্কেলখানা?·· হ্যাঁ, যাচ্ছি, আর সবুর সয় না!" বলিয়া ভবানীশঙ্কর অর্ধনিমীলিত নেত্রে মন্থরগতিতে গিয়া যন্ত্রে বাম হস্তের আঙুল দিয়া বসিলেন ও দক্ষিণ হস্তে লিখিতে লাগিলেন—Doctor Sarbani Bose Ph. D—শেষের অক্ষর তিনটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম হল? ফ্যড্!" তারে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একই উত্তর পাইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "মরুকগে; ফ্যড্ তো ফ্যডই, বলে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'—আমার কিসের মাথাব্যথা?…"

লিখিয়া চলিলেন—Sadardihi Sindurali—Burra Sahib returned from bath—muc hangry—ভবানীবাবু ওদিকে থামিতে সঙ্কেত করিয়া মনে মনে বলিলেন, "মাক্ মাক্—এ কি রকম হল? আবার হ্যাংরি কি রে বাবা!" রিপিট করিতে বলিলেন—বিরক্তভাবে ফাঁক ফাঁক হইয়া অক্ষরগুলা বাজিতে লাগিল—m-u-c-h-a-n g-r-y—

ভবানীশঙ্করের নেশায়-আচ্ছন্ন মগজে একবার হঠাৎ যা বসিয়া গিয়াছিল, এই নিঃসম্পর্ক আলাদা আলাদা অক্ষরে সেটা আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল। "দুত্তোর, যত গরজ যেন আমারই" বলিয়া লিখিলেন, wants you at once—Binode —শেষ হইল।

সমস্তটা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই তিন বার পড়িলেন। শেষে নেশার ধোঁয়া ভেদ করিয়া মুখে যেন একটু জ্ঞানের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। Hangry কথাটা নিজের বুদ্ধিমত একটু বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, "তাই তো বলি, টেলিগ্রাম নিয়ে মাথার চুল পাকালাম, আর আজ এই একটা সামান্য লাইনের মানে বুদ্ধি এড়িয়ে যাবে?—Burra Sahib returned from bath muc hangry wants you at once—Binode,

"বুঝলি গুপী? বড সায়েব নেমে এসে খিদেয় চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না, তাই ডাক্তারকে তার করা হচ্ছে, শীগগির চলে এস।…একেই বলে তরিবৎ! সাধ করে কি বলে, সাহেবের কুকুর হওয়াও ভাল?…আর আমি অভাগা একটু তোয়াজ করে একরত্তি আফিন সেবা করব সমস্ত দিনে তার ফুরসৎ হয়ে উঠল না।"

তার পর নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, "এটা কি? এম, ইউ, সি—মাক্

মাক—কই, 'মাক্' বলে কোন কথা কখনও শুনি নি তো! তবে কথাটা যেন জোয়ালো গোছের—মাক্ হাঙ্গরি! যেন খাই খাই করছে! মরুকগে, মানে তো দিব্যি বেরিয়ে এসেছে, কথায় বলে 'ভাষাসমুদ্র'—ক'টা কথাই বা জানি আমি? বিদ্যে তো ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত…"

গুপীকেষ্টকে বলিলেন, "সিঁদুরালির বিট কাল না? যাক্, আনা দুয়েক ট্যাঁকে আসবে। আমার মাঝে পড়ে ভরি খানেক মাল স্রেফ নষ্ট সকাল থেকে—আব মালের সেরা মাল গো!"

একটুর মধ্যেই আবার নিঝুম হইয়া পড়িলেন।

ভগ্নদূত

বাড়িটি আনন্দের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ প্রীতিভোজ। সুভাষ আর সর্বাণীর শালাদের সকাল থেকে আর ফুরসৎ নাই,—মাঝে মাঝে সর্বাণীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত করিয়া যাওয়ার অবসরটুকু ছাড়া। সুহাস লজ্জায়-গরবে অলসগতি হইয়া এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও সখীদের সহিত খানিকটা গল্প করিল, কখনও ছেলেমেয়েদের সাজগোজে মন দিল। একবার গিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল। বৌদিদি লুচি বেলিতেছিল, ব্যালনটা থামাইয়া বলিল, "ওমা, তুমিও এলে ঠাকুরঝি? ঠাকুরজামাইকে দেখবে কে? আমরা সব এদিকে ব্যস্ত, তোমার ভরসাতেই চলে এসেছি…"

সুহাস আব্দারে-অভিমানের সুরে বলিল, "দেখছ মা, তোমার বৌকে?"

তিনি কড়ায় খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমরা কেন বাপু ওর পেছনে লেগেছ?"

ঝিয়ের আজ সবচেয়ে পায়াভারি। সে গয়না-গোট-পরা খুকিকে লইয়া সকলেরই কৌতূহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং খুকির বাপ এবং বাপের বাড়ি কলিকাতা নগরী সম্বন্ধে বিস্ময়কর কাহিনী সব বিবৃত করিয়া সকলের কৌতূহল দশগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহার উপর কানে একটু খাট বলিয়া কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না, এই ধারণার বশে দশগুণ চীৎকার করায় সে একাই বাড়িটা দশগুণ গুলজার করিয়া তুলিয়াছে।

এর উপর আছে ছেলেমেয়েদের হট্টগোল, বাড়িটিতে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছে।

এমন সময় সুখের এই ঐকতানের মধ্যে একটা বেসুরা আঘাত দিয়া বাড়িব সরকার মশায় রান্নাঘরেব সামনে আসিয়া ডাকিলেন, "মা আছেন ?"

তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই যে যেমন ভাবে কাজ করিতেছিল, সে সেই ভাবেই নিশ্চল হইয়া গেল। গৃহিণী বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করিলেন, "কি সরকাব মশাই, খবর ভাল তো ?"

"হ্যাঁ·· আপনি একটু বাইরে আসুন, সদবেব পানে।· তোমবা কাজ কব মা, কোন ভাবনার কথা নয়।"

গৃহিণী হাত ধুইয়া কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে বাহিরেব দিকে চলিলেন। যাহাদের সান্ত্বনাব কথা বলা হইল তাহাবা বিহ্বলভাবে পবস্পবেব মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। একটা নিরিবিলি গোছের জায়গায় আসিয়া সবকার মহাশয় উদ্বেগকম্পিত হস্তে ফতুয়ার পকেট হইতে একটা টেলিগ্রামের বন্ধ খাম বাহিব করিয়া শুষ্কমুখে বলিলেন, "হঠাৎ এই এক টেলিগ্রাম এল মা।"

কথাটা শেষ না হইতেই—"ওমা, সে কি গো।" বলিয়া গৃহিণী ব্যাকুলভাবে সরকার মহাশয়ের মুখের পানে চাহিয়া বহিলেন। "কাব নামে, সরকাব-মশাই ? আমার যে ভয়ে পেটের ভেতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে।"

সরকার মহাশয় তেমনি ভাবে বলিলেন, "জামাইয়ের নামে মা,—এই আনন্দের দিনে বিনা মেঘে এই বজ্রাঘাত—কি যে শুনতে হবে কিছুই আন্দাজ কবতে পারছি না, আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ভটচাষ্যি মশাযের কাছে লোক দৌড করিয়ে দিয়েছি, এসে একটা লগ্ন দেখে বলুন। সে ওদিক থেকে ঈশেন মাস্টারকেও ডেকে আনবে। ভাল সময় দেখে খুলে পড়ুক, তাব পর—যেমন হয় করা যাবে। জামাইকে আর এখন দেখানো উচিত নয়। কি অক্ষণে কুক্ষণে যাত্রা করেছেন যে···আজকালকার ছেলে···"

"যা করে ফেলেছেন তাব তো চার নেই, সরকার-মশাই, এখন মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষে করেন তো রক্ষে! দোহাই মা, ষোল আনাব পুজো দোব, দেখো যেন···"

এমন সময় যে ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ঈশান মাস্টারের খোঁজে গিয়াছিল সে আসিয়া খবর দিল ভট্টাচার্য ভিনগাঁয়ে গিয়াছেন, ঈশান মাস্টার একটু পরে আসিতেছে।

গৃহিণীর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল! ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতি যে ভয়ানক একটা দুর্লক্ষণ তাহাতে সরকার মহাশয়েরও কোন সংশয় রহিল না! খানিকক্ষণ কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিলেন না! তাহার পর বলিলেন, "কাজটুকু আজ হয়ে

যাক মা, কাল খোলাই ভাল হবে। আপনি বুক বেঁধে থাকুন একটু—না হলে সব পণ্ড হবে। আমি গোবিন্দজিউর পায়ে ঠেকিয়ে খামটা বাক্সয় তুলে রাখছি আজ।"

নিরুপায়, তাহাই স্থির হইল। ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া গৃহিণী একেবারে রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। খালি বৌ আর স্বভাবই ছিল, আসন্ন বিপদের কথা তাহারা শুনিল।

ভয়ের ছোঁয়াচ তাহাদের মনেও সংক্রামিত হইয়া গেল। স্বভাব একটু পরে কিন্তু বলিল, "আচ্ছা ভাল খবরও তো থাকতে পারে।"

মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষি রাখ সুভাষী, তারে নাকি আবার ভাল খবর আসে। শুনলে গা জ্বলে যায়! অমঙ্গুলে খবর দেবার জন্যেই তো কোম্পানি ওটা করেছে—আকাশের বাজ টেনে!"

স্বভাব একটু ভয় কাটাইয়া উঠিয়াছে, বলিল, "কেন, সেবারে দত্তদের মেজ ছেলের পাসের খবব তো টেলিগ্রামেই এসেছিল…"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, "ছেলেটা বাঁচলে শেষ পযন্ত? আর জ্বালাস নি, আজকালকার মেয়ে সব যেমন ধিঙ্গি হয়েছে…তুমি গিয়ে যেন আজ কথাটা জামাইবাবুর সামনে পেড না…গা-জুরি কথা শুনছ বৌমা?"

তিনিও দুই তিনটি সন্তানের মা, মানৎ করিতে করিতে বুকের সাহস অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বলিলেন "কে জানে, মা! আমার তো গুলিয়ে যাচ্ছে সব; তবে সুহাস ঠাকুরঝিকেও শুনিয়ে কাজ নেই বাপু, আজকের দিনটা যাক।"

সে দিনটা গেল। উৎসবের উপর দুইখানি বিষণ্ণ মুখের ছায়া পড়িয়া রহিল। সর্বাণী সুহাস—কাহারও মনে কিন্তু কোনও সন্দেহ জাগিবার অবসর হইল না। সুভাষ তাহার বয়সের গুণেই বোধ হয়, কাল্পনিক ভয়কে অতটা আমল না দিয়া আমোদটা সাধ্যমত বজায় রাখিল।

তাহার পরদিন ভট্টাচার্য আসিয়া পাঁজি দেখিলেন এবং তিনচারখানি ভয়ত্রস্ত মুখে অনবরত দেবদেবীদের নামোচ্চারণের মধ্যে ঈশান-মাস্টার তিনবার কপালে ঠেকাইয়া টেলিগ্রামখানি খুলিলেন। প্রথমে মনে মনে পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আ মর্, রাক্কস নাকি!"—বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আড়ঘোমটার আড়াল হইতে অর্ধস্ফুটভাবে বলিলেন, "সরকার মশাই, শীগগির বলতে বল না—আমার যে হাত পা কাঁপছে—ও কথা কেন বললেন উনি।"

ঈশান-মাস্টার বলিলেন, "নতুন বৌ, মানে করলে তো এই হয় যে—সায়েব নেয়ে এসে বেজায় ক্ষুধিত হয়ে পড়েছেন, তোমায় এক্ষুনি চান—তারের একটা কথার শেষের অক্ষরটা ওঠে নি—ও রকম হয়ে থাকে—টেলিগ্রাম অফিসের বিদ্যে কিনা···তার করেছে কে একজন বিনোদ। কিন্তু এ-রকম লেখার উদ্দেশ্য তো বুঝতে পারছি নি বাছা—ভূত নয়, রাক্কস নয়···"

কথাটা শেষ না হইতেই গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন—আতঙ্কে চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি গো! কি অলুক্ষুণে কথা! নেয়ে এসে ক্ষিধে পেয়েছে, তোমায় এক্ষুনি চান! শুনলে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মা, কি হবে! রাক্কসের জাত, ক্ষিধে পেয়েছে শোর গরু গেল্‌না বাপু বাকড ভরে!···ও সরকার মশাই, একি অনর্থ? আর কারুর বিষয় কিছু লেখে নি?"

ঈশান-মাস্টার লেখার পানে চাহিয়া খুব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বলিলেন, "না, কই কর্তার বিষয় তো কিছু লিখছে না।"

গৃহিণীর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া আঁচলে মুছিয়া বলিলেন, "একি এক সর্বনেশে তার এল মা?" শাশুড়ির অবস্থা দেখিয়া পুত্রবধূও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সুভাষ শুধু চিন্তিতভাবে বলিল, "কি রকম যেন খাপছাড়া কথাগুলো। তার আসতে কিছু ভুল হয় নি তো?"

মা ধমক দিয়া উঠিলেন, "তুই ক্ষ্যামা দে দিকিন বাছা। তোর নিজের কথাগুনোই শুধু বাঁধন-সই, আর সবই খাপছাড়া। বলে, তারে কোম্পানির রাজত্বটা চলছে।···আমার একটা কথা মনে নিচ্ছে সরকার মশাই—সাহেব পাগল হয়ে দৌরাত্ম্যি করছে না তো? উনি প্রায়ই বলেন—ঠাণ্ডা দেশের লোক একটুতেই মাথা গরম হয়ে ওঠে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই বাড়াবাড়ি হয় নি তো?"

ভট্টাচার্য, ঈশান-মাস্টার, সরকার-মশাই সবাই একসঙ্গে বলিলেন, "সম্ভব।"

ভট্টচার্য, বলিলেন, "আমার প্রথম থেকেই যেন ঐরূপ সন্দেহ হচ্ছিল মা।"

গৃহিণী বলিলেন, "সন্দেহ নয়—ভট্টাচায্যি-মশাই, ঐ ঠিক। দেখছ না, নেয়ে এসে কি রকম আবোল-তাবোল লাগিয়েছে? জামাইয়ের ওপর ঝোঁকটা বেশি। এখন ক'দিন আর গিয়ে কাজ নেই; কি জানি—সামনে পেলেই কি-একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবে। তুমি নিজে ওঁকে এক্ষুনি তার করে দাও সরকার-মশাই, পত্রপাঠ চলে আসুন। না হয় নিকে দাও—আমি মরমর—এমন কিছু মিথ্যে কথাও নেকা হবে না। তার পর ঠাণ্ডা হলে শ্বশুর-জামাইয়ে আবার চলে যাবেন'খন।

তদ্দিন ভাল করে শান্তি-স্বস্ত্যেন করে বাবা বুড়োশিবের পুজোটুজো দিই।... এখুনি ঈশান-মাস্টার নিকে দিন।...আমার যেন গেরোর ওপর গেরো আসছে ...ভালয় ভালয় সবকটিকে রেখে যেতে পারলে বাঁচি...”

ভট্টাচার্য কহিলেন, “হ্যাঁ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন একটা হওয়া দরকার।”

বধূ ফিস্ ফিস্ করিয়া শাশুড়ির কানে কি বলিল। তিনি শঙ্কাকুল মুখে সরকার-মহাশয়কে বলিলেন, “বৌমা বলছেন, জামাই নাকি কালই যেতে চান। ছুটি ফুরিয়েছে। বলছেন নাকি এবারে কাজের বড্ড ভিড। একদিনও বেশি থাকতে পারবেন না,—উপায় ?”

সকলে চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে সরকার মহাশয় বলিলেন, “একটা উপায় আছে, মা। কিছু খরচ পড়ে যাবে কিন্তু।”

গৃহিণী বিরক্তভাবে বলিলেন, “প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর তুমি খরচের কথা ভাবছ সরকার-মশাই! শ-দুশো যা লাগে—বল উপায়টা কি ?”

“শ-দুশোর কথা নয়, কিছু লাগবে। পোস্টাপিসের ছাপ দেওয়া একটা নকল তার জোগাড করতে হবে। যেন কর্তা জামাইকে তার করছেন—তোমার এখন কয়েকদিন এসে কাজ নেই। আমি নিজেই আসছি...ক’দিনের কথা লিখব ?”

গৃহিণী একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, “মন্দ নয়, ভাগ্যিস তোমরা দু-তিনজন পুরুষ মানুষ একত্তর হলে! কথায় বলে, পুরুষের বুদ্ধি, আমি একা নারী যে কি করতুম’! একেবারে দশ দিনের কথা নিকে দাও—দশ দিন এসে কাজ নেই—আমি নিজেই আসছি। তুমি নিজের হাতেই সব ঠিকঠাক করে নিয়ে এস।... ওঁরা দু’জন কি বলেন ?”

ভট্টাচার্য এবং ঈশান-মাস্টারও সম্মতি দিলেন।

সুভাষের লজ্জা নাই বলিতে হয়, কহিল, “তারটা জামাইবাবুকে একবার দেখিয়ে নিলে হয় না ?”

গৃহিণী জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তোর ফোড়ন দেওয়ার জ্বালায় আমার মাথা মুড খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় সুভাষী, কবে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে বল্ দিকিন ? ...খবরদার, জামাইয়ের কানে কি সুহাসের কানে যদি এর এক বর্ণও ওঠে তো তোর আর কিছু বাকি রাখব না। এতগুলো লোক হল মুখ্যু, আর উনি হাইকোটের জজ এসেছেন!...বড় সুখের খবর, না ?...উনি না-আসা পর্যন্ত তোমরাও সব খবরটা চেপে রাখ বাপু!”

রাত দুপুরে

১

রাত্রি দুপুর। সিনেমা থেকে একটা বোম্বাই ফিল্ম দেখিয়া ফিরিতেছিলাম। দ্বিতীয় শো'তে গিয়াছিলাম, রাত্রি হইয়া গিয়াছে।

একটা নাক পর্যন্ত মুখোশ-পরা ছোকরা ডাকাত যে কত কাণ্ড করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই ; খুন, ডাকাতি, মোটর উল্টানো, ট্রেনের সঙ্গে কলিশন, পাহাড় থেকে ঘোড়ার পিঠের মাঝখানটিতে লাফাইয়া পড়া, তদবস্থাতেই নদী ডিঙাইয়া যাওয়া প্রভৃতি যত রকম ব্যাপার একটা বেপরোয়া লেখক এবং ততোধিক বেপরোয়া ডিরেক্টারের মাথায় আসিতে পারে, কিছু বাকি রাখিল না ছোকরা! শেষে ধরা পড়িল, একজন তাহারই মত ছোকরা অ্যামেচার ডিটেক্‌টিভ আর তাহার প্রণয়িনীর কৌশলে। সেটা আরও বিস্ময়কর।

মন্থর-গতিতে বাড়ি ফিরিতেছি। একটা চিন্তা মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। চটকল কাপড়ের কল মিলাইয়া শহরে গোটাচারেক কারখানা ; যত নোঙর-ছেঁড়া বিদেশীদের আড্ডা। একে বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ হইয়াই রহিয়াছে, তাহার উপর এই উগ্র রকম সিনেমা-বিষ পান করাইয়া দিন দিন অবস্থা যেন আরও শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। জিনিসগুলা দেখিলাম ওদের খুব মনঃপূত। হাততালি আর "কামাল কিয়া কামাল কিয়া"র চোটে ঘর তো প্রায় ফাটাইয়া দিয়াছিল। আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়—ডিটেক্‌টিভের কৃতিত্বে তালিও নাই, সাবাসও নাই। ছিটাফোঁটা যা একটু আধটু জুটিতেছিল, তাহাও ঐ সঙ্গিনীটির ভাগ্যে।

চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছি। আগে পিছে হন হন করিয়া সিনেমা ফেরত সবাই চলিয়াছে। চলায় কথাবার্তায় বেশ সজীবতার লক্ষণ, সিনেমা-হল থেকে তাহাদের মনের উপযোগী খোরাক লইয়া ফিরিতেছে সব! বিড়ির ধোঁয়ায় এবং বস্তির নিজস্ব ভাষায় নানাবিধ মন্তব্যে রাস্তার হাওয়াটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পশ্চিমাই নয়, নিম্নশ্রেণীর বাঙালীও মাঝে মাঝে, অবশ্য সংখ্যা কলেও যেমন কম, সেই অনুপাতে এখানেও কম। কথাবার্তার ছাপই এক অন্য ধরনের!

"স্‌সালা যেন পেল্লাদ মাইরি—এসা কড়া জান সাল্লার!"

পাশ দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হন হন করিয়া দুইজন চলিয়া গেল। কালো মলমলের পাঞ্জাবি গায়ে সাঁটিয়া রহিয়াছে, শীর্ণ গলা, ফাঁপা চুলের রাশিতে

মাথাটা রাস্তার পাতলা অন্ধকারে উৎকট রকম ভারী বোধ হইতেছে। এই হইল নমুনা!

যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, রাস্তার গলিতে ভাগাভাগি হইয়া ভিড় পাতলা হইতে লাগিল। মিল এরিয়ার রাস্তাটা ডান দিকে চলিয়া গিয়াছে, আমি যাইব বাঁ দিকে, মোড়ের পর থেকে আমি প্রায় একা পড়িয়া গেলাম। প্রায় পনরো মিনিট হাঁটিয়াছি তখন। ওদিকটায় তবুও এক আধটা দোকানপাট খোলা থাকে, এদিকে একেবারে নিষুতি। কোন মন্তব্য কানে আসিতেছে না আর। সিনেমাব বোঝাটা ধীরে ধীরে মাথা থেকে নামিয়া গিয়া এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়িল। কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সিনেমায় গিয়াছিলাম; বাড়িতে সবাই চিন্তিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে। পাড়ায় দুই তিনটা চুরি হইয়া গিয়াছে, একটাকে তো ছোটখাটো ডাকাতিই বলা চলে। ভাল হয় নাই কাজটা।

বড় রাস্তা দিয়া গেলে বেশ খানিকটা ঘুর পড়িবে; অবশ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু এত রাত্রে অমন জায়গায় বাড়ির কথা মনে পড়িলে যত রকম বিপদের সম্ভাবনার খেয়াল যেন হুড়াহুড়ি করিয়া আসিয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া এতক্ষণ যে-সব সঙ্গীদের মধ্যে ছিলাম। একটু ইতস্তত করিয়া গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। গলিটা বেশি ভাল নয়, অনেক দূরে দূরে ম্যুনিসিপালিটির এক একটা নড়বড়ে ল্যাম্প-পোস্ট—কেরোসিন তেলের টিমটিমে আলো মাথার উপর। কয়েক পা চলিয়া আবার একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম; সত্য কথা বলিতে কি—গা ছমছম করিতেছে। ভাবিলাম, বড় রাস্তাতেই ফিরিয়া যাই, তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল লক্ষ্মীর বাড়ির কথা।

লক্ষ্মী তাহার বউকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতে গিয়াছে। বাড়িতে বুড়ি মা, লক্ষ্মীর বোন আর তাহার দুইটি ছোট ছোট মেয়ে। পুরুষের মধ্যে এক আফিমখোর মামা। সমস্ত রাত ঘুমায় না, তবে ঝিমায় এবং ডাকাত পড়িলেও এই ঝিমানোর অধিক সজাগ হইতে পারে না। ঠিকা ঝিটা থাকিবে, যদি নাই আসে তো আমায় একটা ব্যবস্থা করিতে বলিয়া গিয়াছিল লক্ষ্মী। আজ সিনেমায় যাওয়াটা বড়ই ভুল হইয়া গেছে সব দিক দিয়াই।

গলি দিয়া যাওয়াই ঠিক করিলাম। একটা হাঁক দিয়া উঠাইয়া খোঁজ লইয়া যাইতে হইবে।

লক্ষ্মীর বাড়ির কথা মনে পড়ায় একটু পা চালাইয়া দিলাম। লক্ষ্মীর বউয়ের

কথা ভাবিতেছি। শান্তশিষ্টটি দেখিতে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি জাহাবাজ মেয়ে। স্বামী-বাহনটিকে তো যখন যে দিকে যে ভাবে ইচ্ছা, ঘুরাইতেছে। তাহার কালো নরম নরম হাত দুইটি দেখিলে মনে হয় না, এই হাতই অত কড়া করিয়া রাশ টানিয়া ধরিতে পারে। আর লক্ষ্মীর মত একটা পুরুষ। আজ সকালে বলিয়াওছিলাম "কি রে তুই! এত বড় কাঠামোটাই সার! বউ হুকুম করছে তো অমনি তাকে ঘাড়ে করে বাপের বাড়ি ছুটতে হবে! বাড়িতে একটা পুরুষের মত পুরুষ রইল না; না হয় তোর ছোট ভাইই আসুক, দুদিন পরেই তো তার কলেজ বন্ধ হবে।"

উত্তরে শুধু ঘাড় বাঁকাইয়া বিকলভাবে হাসিল একটু, তাহার পর বলিল, "একটু মাঝে মাঝে এসে দেখে যাস শৈলেন। তোরা তো রইলি। আমার দুটো রাত্তিরের বেশি লাগবে না। এই দুটো রাত,···ব্যস্।"

লক্ষ্মীদের বাড়ি ঠিক গলির উপর বলিলে একটু ভুল হয়। গলির ঘেঁষাঘেঁষি শেষ বাড়িটার পরে একটা মাঝারি সাইজের পুকুর, তাহার পর লক্ষ্মীদের দোতলা পুরানো বাড়িটা, লাগোয়া ওদেরই আমবাগান; রাস্তাটা যেখান থেকে ঘুরিয়া চাটুজ্জে-পাড়া হইয়া আমাদের ওদিকে চলিয়া গিয়াছে। চকমিলানো বাড়ি। তিন শরিকের সম্পত্তি, লক্ষ্মীদের অংশটা পিছন দিকে। অন্য শরিকেরা এখানে থাকে না, সামনের অংশটায় তালা দেওয়া। সমস্ত বাড়িটার সদর-দরজা এক। লক্ষ্মী গলি থেকে এক ফালি রাস্তা লইয়া গিয়া ওদিকে একটা দুয়ার ফুটাইবে ফুটাইবে করিতেছে, কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না।

বউয়ের ফরমাস খাটিয়াই ফুরসৎ নাই, ও আবার দুয়ার ফুটাইবে!

একেবারে নিষুতি হইয়া গিয়াছে। মাঝে আওয়াজের মধ্যে শুধু কানে গেল, হারানের কচি ছেলেটা বায়না ধরিয়াছে, আর তাহার মা হারানকে সুদ্ধ জড়াইয়া উৎকট গালাগালি দিয়া তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে।

একটা হাঁক দিলাম—"জেগে নাকি হারান?"

উত্তর পাইলাম না। আমার ডাকে ওর ছেলে আর পরিবারের গলার আওয়াজটা হঠাৎ থামিয়া গিয়া গলিটা যেন আরও থমথম করিতে লাগিল।

একটু পরেই লক্ষ্মীদের বাড়ি আসিয়া পৌছিলাম। আশ্চর্য, বাড়ির সদর-দরজা একেবারে হাট আদুড়!

২

শরীরটা আমার যেন হিম হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কি যে করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। চেঁচাইব? ছুটিয়া গিয়া হারানকে ডাকিয়া আনিব? আগে আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়া দেখিব, ব্যাপারটা কি?—বেশ মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারিতেছি না বলিয়া কোন্‌টাতে যে কি রকম ফল দাড়াইবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রাত এদিকে সাড়ে বারোটা হইবে।···কতজন আছে? কি অস্ত্র হাতে? এখনও আছে সব, না, কাজ সাফাই করিয়া চম্পট দিয়াছে? একটা শব্দও তো কানে আসিতেছে না!

এমন সময় কানে আসিল শব্দ। মনে হইল, লক্ষ্মী উপরের যে ঘরটা বৈঠকখানা করিয়া ব্যবহার করে, সেই ঘরে একটা জটলা হইতেছে। একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ। বাহিরে বেশ জোর এলোমেলো হাওয়া, কতকগুলা কথা কানে আসিতেছে অসংলগ্নভাবে, কতকগুলা একেবারেই বাদ যাইতেছে, তাহার মধ্যে কতকগুলা নারীকণ্ঠের আর্ত মিনতি, কতকগুলা রূঢ় পুরুষ-কণ্ঠের হুমকি-গোছের। কতকটা এই রকম—

"এই নাও আমার যা আছে—আমায় ছেড়ে দাও।"

"টাকা থাকে তো দাও।···আর নেই একেবারেই?"

একজন গলা খাটো করিয়া একটু সদারী-টোনেই হুকুম করিল, "চেপে রে, গলাবাজি করে লোক জড় করবি শেষকালে? একে তো···"

আমার যেন কালঘাম ছুটিয়া গেল। আমি ভির্মি লাগিয়া বোধ হয় পড়িয়া যাইতাম, তাড়াতাড়ি চৌকাঠটা ধরিয়া ফেলিলাম।

মিনিটখানেক আমি বোধ হয় কিছু দেখিতেও পাই নাই, শুনিও নাই।

তাহার পর আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন একেবারে উগ্ররকম সজাগ হইয়া উঠিল। মিশ্রকণ্ঠের কতকগুলা কথা,—এক দিকের করুণ ব্যাকুলতায় আর অপর দিকের ক্রুর উগ্রতায় সুতীক্ষ্ণ—"দিচ্ছি, রক্ষা কর! রক্ষা কর!"

"দাও; নইলে এই ছুরি!"

ঠিক এই সময় উগ্রকণ্ঠে "হুঁশিয়ার!" বলিয়া কে যেন সেই ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিল। এইটুকু বেশ বুঝিলাম সে মামা নয়,—আফিমের নেশা কাটাইয়া তাঁর এতটা হুঁশ হইবে যে অত জোরে 'হুঁশিয়ার!' বলিতে পারিবে, এটা সম্ভব নয়।

আবার একটা উৎকট রকম ধস্তাধস্তি, অসংলগ্ন গোটাকতক কথা—কে বলিতেছে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না—"মরদ ?···ব্যস্···সাবধান !"

তাহার পরেই "ওফ !" করিয়া নিদারুণ একটা শব্দ হইল এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন লোকের দ্রুত ভারী পায়ের আওয়াজ ;—যেন দুদ্দাড় করিয়া পলাইতেছে সব। আমারও পা আপনা-আপনি উঠিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় আওবাজটা থামিয়া গেল, অর্থাৎ পলাতকেরা যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে এমন বোধ হইল না। সমস্ত বাড়িটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বিদ্যুতের মত কতকগুলা কথা আমার মাথায় খেলিয়া গেল যেন—ধারাবাহিক চিন্তা নয়, অনুভূতি-গোছের—সাহায্যের জন্য কেহ আসিয়া পড়িয়াছে—একজন বা একাধিক—একটা খুন হইয়াছে যেদিকেই হোক—এবাব এরা পলাইবে, থামিয়া গেল, বোধ হয় লাস লইয়া পলাইবে।

যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি—ভীরুতা হইয়াছিল কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হইয়াছিল, সে কথা এখানে আসে না। আমি একটা ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিতেছি মাত্র, বীরত্বের মেডেলের জন্য বিচারক-মণ্ডলীর নিকট তদ্বির নয় এটা আমাব।

আমি বাহির থেকে দুয়ারের শিকল চড়াইযা দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম—থানাটা খুব কাছে, মিনিট পাঁচেকের রাস্তা—একেবারে সেইখানে।

বারান্দায় উঠিতেই সামনে পড়িল হেড কন্‌স্টেবল অর্জুন পাঁড়ে। বোধ হয় কোন তদারক হইতে এইমাত্র আসিয়াছে, বেন্টটা আলগা করিয়া দিয়া গায়ের শার্টটা খুলিতেছিল, আমায় দেখিয়া দুইটা হাত অর্ধোত্থিত অবস্থাতেই শার্টের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রশ্ন করিল, "মুকুর্জীবাবু যে, খবর কি আছে ? এত্তো রাতে ?"

তখন হাঁপাইতেছি, বুকটা হাপরের মত উঠা-নামা করিতেছে, বলিলাম, "খুন হয়েছে পাঁড়েজী !"

বিচলিত তো হইলই না, কতকটা শ্রান্তির সহিত বলিল, "সচ্ ? কোথায় ? বসেন, আরে মুকুর্জীবাবুকো একঠো কুরসি দে।"

একটু বিরক্তির সহিত বলিলাম, "আরে কুরসি থাক্ এখন, তুমি চট করে একবার দারোগা সাহেবকে ডেকে দাও। আমি লোকগুলোকে আটকে রেখে এসেছি, আর দেরি ক'রো না। বাড়িটা ঘেরাও করতে হবে।"

বোধ হয় আটকাইয়া রাখার কথায় পাঁড়েজীর একটু চাড় হইল, বাঁধা শিকার

ধরাই অভ্যাস তো। হুকুম করিল, "আরে, জলদি দারোগাবাবুকে বোলা তো রে, আর ডিব্‌টিকা দশ আদমী তৈয়ার হো যাও।"

দারোগা নিতাইচরণবাবু শার্টটা গায়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করিলেন, "কি ব্যাপার মশায় শৈলেনবাবু এত রাত্রে? কোথায় খুন?"

সুপ্তির মধ্যে বাধা পাইয়া তাঁহার বর্তুল গোঁফজোড়া খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলাম, "লক্ষ্মীর বাড়িতে!"

অভিজ্ঞতাটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। তাঁহার তন্দ্রালু ভাবটা ভালভাবে বিদূরিত করিবার জন্য একটু রঙও ফলাইলাম। ডাক্তারদের যেমন রোগ সম্বন্ধে, এদেরও দেখিতেছি তেমনই অপরাধ সম্বন্ধে খানিকটা ঔদাসীন্য আছে। অবশ্য ঠিক যে গড়িমসি করিতেছে এমন নয়, তবে আমার মত 'গেল-গেল' ভাবটা আনিতে পারিতেছি না। সঙ্গেই চাকরটা য়ুনিফর্ম আনিয়াছিল; পরিতে পরিতে সব শুনিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "একেবারে খোলা ছিল দোরটা?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

গোঁফজোড়াটা উঠিয়া নাকে সাঁটিয়া গেল। বলিলেন, "শেকল দিলেন, কিন্তু অন্য দিক দিয়েও তো পালাতে পারে। আপনি কাছেই সবাইকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন না কেন?"

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করিতেছিলাম, আমার গোয়েন্দাগিরিতে শহরে কাল একটা 'বাহবা' পড়িয়া যাইবে; কিন্তু তাহার মধ্যে যে এতবড় দুইটা ফাঁক ছিল, তখন কেন হুঁশ হয় নাই, জানি না। একটু অপ্রতিভভাবে যা হোক একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, নিতাইবাবু প্রশ্ন করিলেন, "হুয়া তুমলোগকো?"

টুপিটা চাকরের হাত থেকে লইয়া নিজের রিস্টওয়াচটা দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "চলুন। বৃথা কিন্তু।"

গোঁফজোড়াটা ঠেলিয়া নাকে চাপিয়া ধরিলেন।

আমি আসিবার প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা অকুস্থানে উপস্থিত হইলাম। বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, শিকল যেমন চড়াইয়া গিয়াছিলাম, তেমনই রহিয়াছে। নিতাইচরণের আদেশে পুলিসরা বাড়িটা ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিতাইচরণবাবু বলিলেন, "খুব সম্ভব সরে পড়েছে, কোন রকম করে লোক না ডেকে আপনি ভুল করেছেন মশাই শৈলেনবাবু।" বলিয়া কড়া টর্চটা বাগানের

দিকে ফেলিয়া একবার ঘুরাইয়া লইলেন। এমন সময় ভিতরে যেন আবার কথাবার্তা শুনা গেল। নিতাইবাবু দুয়ারের ফাঁকে একবার কান দিলেন, তাহার পরই আস্তে আস্তে শিকলটা খুলিয়া পাঁচজন পুলিসের সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমায় বলিলেন, "আপনি পেছনে থাকুন।"

এতবড মনের মত হুকুম বা পরামর্শ আমি জীবনে কখনও পাই নাই। আমার পা-টা তখন বেশ কাঁপিতেছে।

দুয়ার খুলিতেই ভিতরের কথাবার্তা হঠাৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিল, "এই আলমারি তো?"

"হ্যাঁ, এই আলমারি—চাবি?"

কথাবার্তা হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার পর ত্রস্তকণ্ঠে একজন বলিল, "এই, নীচে যেন কারা এসেছে মাইরি!"

ঘরের মধ্যে ত্রস্তভাবে চলাফেরা করার আওয়াজ জাগিয়া উঠিল।

একজন বলিল, "বাগানের দিকে যেন এই এইমাত্র টর্চের আলো পড়ল, দোর খোলা রেখে এসেছিলি নাকি?"

আমরা তখন ভিতরের উঠানে। হঠাৎ সামনের দোতলায় জানালা দিয়া দুইটা টর্চের আলো আসিয়া আমাদের মধ্যে পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই টর্চগুলা নিবিয়া গিয়া অত্যন্ত ভীতকণ্ঠে চাপা আওয়াজ হইল, "পুলিস রে! সর্বনাশ!"

একটা গোলমেলে শব্দ, পলায়নের চেষ্টার মত; তখনই সেটা কিন্তু বন্ধ হইয়া গেল।

লোকগুলা যেন সাধারণ প্রাণধর্মের বশেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া আবার নিজেদের অসহায়তার কথা উপলব্ধি করিয়া থামিয়া গেল।

ওদের টর্চ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিতাইবাবুর হাতের দীর্ঘ চার সেলের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গোঁফের চেহারা অবর্ণনীয়; বজ্রনির্ঘোষস্বরে আদেশ হইল,—"সব যেমন আছ ঠিক সেই রকম থাকবে। বাড়ি কুড়িজন পুলিসের হাতে; সবার কাছেই সিক্স চেম্বার রিভলভার। নড়লেই মৃত্যু।"

একটি উত্তর হইল না উপর হইতে; সবাই বজ্রাহত হইয়া অসাড হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ খানচারেক ঘর পরে দোতলার অপর প্রান্তের জানালা খুলিয়া গেল। শঙ্কিত প্রশ্ন হইল—"কে?"

"পুলিস।"

জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর পুরুষ ও নারীকণ্ঠের চাপা বিশৃঙ্খল আওয়াজ। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া ওদিককার দোতলার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। নীচে দুইটা দরজায়ই দুইজন সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন রহিল।

৩

দুইটি দল সামনা-সামনি হইয়া কয়েক মিনিট নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। শেষে আমিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "তোমরা এখানে! ব্যাপার কি ?"

হরিশ ব্রহ্মচারীর ছেলে দ্বিজেন বলিল, "পুলিস কেন ?

"আগে তোমরা কেন, তাই বল !"

"রিহার্সাল হচ্ছে আমাদের।"

কি প্রশ্ন করিব, সেকেণ্ড কয়েক তো মাথায়ই আসিল না। অনুভব করিতেছি, দারোগা নিতাইচরণের ছোট ছোট গোল গোল চক্ষু দুইটা আমার বাঁ রগটাকে যেন বিদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। দৃষ্টি এড়াইয়া দ্বিজেনকে প্রশ্ন করিলাম, "তা—ছুরি—রক্ষা কর—আলমারি—চাবি—এসব কেন ? রিহার্সাল কি কেউ দেয় না ?"

বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত দ্বিজেন বলিল, "বইয়ে রয়েছে ঐ সব কথা, আমাদের অন্য রকম বললে চলবে কেন মশাই ?"

অপর একজন ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "সে কথা যদি বলেন তো ডি. এল. রায়কে বলা দরকার, যিনি লিখেছেন 'বঙ্গনারী' বইটা। আমরা নিরীহ মানুষ, আমাদের ওপর তম্বি করলে চলবে কেন ?"

পিছনে একজন বলিল, "আর অন্যরকম বললে আপনারাই তো অডিটোরিয়াম থেকে গাল পাড়বেন মশাই !"

সুমিষ্ট মন্তব্যটা গায়ে না মাখিয়া দ্বিজেনের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তা এই রাত একটার সময় রিহার্সাল ?

"লক্ষীদা বলে গেল যে বাড়িটা আগলাতে একটু ; আমরা ফুল রিহার্সালের বন্দোবস্ত করেছি আজ আর কাল। একসঙ্গে থাকি, এই সামান্য উপকারটুকু করব না ?"

ও প্রান্তের দুয়ার খুলিয়া লক্ষীর মামা বাহির হইল বোধ হয়। একটা শব্দ

হইল ; কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেই নিতাইচরণের সহিত চোখোচোখি হইবে। দ্বিজেনের পানে চাহিয়াই বলিলাম, "সমস্ত রাত ধরে এই খুনে ফুল রিহার্সাল। থানার দারোগা পুলিস পর্যন্ত টেনে হাজির করা! একে তো দিবারাত্রির মধ্যে একটু আরাম কাকে বলে, ওঁরা জানতেও পান না।"

এইবার একটু হাসিয়া পিছন ফিরিয়া বলিলাম, "পাগলামি নয়? এমন উদ্ভট কাণ্ড দেখেছেন দারোগাবাবু?"

নিতাচরণের গোঁফে নাকে এক হইয়া গিয়াছে। আমাব মুখেব উপব দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, "ওর চেযেও বেশি উদ্ভুটে কাণ্ড আজ দেখলাম মশাই শৈলেনবাবু।"

সাঙ্গোপাঙ্গদের অনুগমন কবিতে হুকুম কবিযা গটগট কবিয়া নামিযা গেলেন।

বাতের মহৌষধ

১

শ্বশুরের চিঠি আসিয়াছে—

"বাবাজি, নিত্য আশীর্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তদনুযায়ী ইহার সহিত অপর একখানি কাগজে তোমার বন্ধুর 'বাতশক্তিশেল'এর জন্য প্রশংসাপত্র পাঠাইতেছি ; কিন্তু…

জামাতা চিঠি ছাড়িয়া আগে প্রশংসাপত্রটাই তাড়াতাড়ি পড়িয়া ফেলিল। লেখা আছে—

"আজ আট বৎসর যাবৎ উগ্র রকম বাতে আক্রান্ত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছিলাম। চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি রাখি নাই। আমেরিকা-ইউরোপের একেবারে নবীনতম ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া ইউনানি, টোটকা, স্বপ্নাদ্য—কিছুই বাকি রাখি নাই। জলের মত অর্থব্যয় হইয়াছে, ফল কিছুই হয় নাই। অবশেষে আমার এক বাতজর্জরিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট আপনার 'বাত-শক্তিশেল'এর প্রশংসা শুনিয়া ঔষধটি আনাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই যে আশ্চর্য ফল পাইয়াছি তাহাতে আপনার ঔষধের একমুখে প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। কলির ধন্বন্তরি এতদিন একটা কথার কথা ছিল, আপনি সেটাকে সার্থক

করিয়াছেন। আমাকে অবাধ গতিতে চলাফেরা করিতে দেখিয়া আমার কয়েকটি বাতগ্রস্ত বন্ধু আপনার ঔষধের জন্য নিতান্ত অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। বাতে পঙ্গুত্বের অবস্থায় অধৈর্য হওয়া কিরূপ সঙ্কটজনক জানেনই, সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া ফেরৎ ডাকেই আর এক ডজন শিশি ভি-পি-পি যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

বিনীত

রহিমগঞ্জ — শ্রীরামসদয় সেনগুপ্ত (রায় বাহাদুর)

জিলা মুর্শিদাবাদ — রিটায়ার্ড সবজজ"

আর একবার পড়িয়া লইয়া পরেশ মূল চিঠিখানির বাকিটুকু পড়িতে লাগিল।—

"—কিন্তু বাবাজি, তোমার প্রেরিত দুইটি শিশিই নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়াও বিন্দুমাত্রও উপকার পাই নাই। অতএব, তোমার বন্ধুকে এতৎসহ প্রেরিত প্রশংসাপত্রখানি দিও, কিন্তু ঔষধ যেন আর না পাঠানো হয় সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও। শুধু তাহাই নয়, তোমার বন্ধুমহলে যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে এরূপ বোগস ঔষধ চালাইয়া গৃহস্থকে— বিশেষ করিয়া বাত-পীড়িত নিরুপায় গৃহস্থকে—প্রবঞ্চিত করিবার অতি নীচ মনোবৃত্তি রাখে ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। এরূপ বন্ধু বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ঔষধ সেবন করিয়া তিলমাত্র উপকার তো পাই নাই-ই, অধিকন্তু মনে হইতেছে এদানি ব্যাধিটার প্রকোপ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার বন্ধুর অনুরোধ,—তুমি ক্ষুণ্ন হইবে, সেই আশঙ্কায় প্রশংসাপত্রটি দিলাম, কিন্তু মনে মনে বুঝিতেছি একটি নিতান্ত গর্হিত কার্য করা হইল। পূর্বজন্মের না জানি কতই পাপের ফলে আজ প্রায় বৎসরাবধি আমি বাতে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, আবার এই জন্মে ঐ রোগকে ভাণ্ডাইয়াই পাপের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছি, অদৃষ্টে যে কি আছে জানি না। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ,—আমি বাতে জবুথবু, ওদিকে একজন সেইটাকেই মূলধন করিয়া, প্রশংসাপত্র লিখাইয়া পরম উৎসাহে রোজগারের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ঘোর কলি নয় তো কি?

"যাই হোক, তুমি যত শীঘ্র পার এরূপ বন্ধুকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিও।

"বিপদ একা আসে না। তোমার শাশুড়ির এক দূরসম্পর্কের পিসতুত ভগ্নীর স্বামীর চাকরি গিয়াছে। কোন এক সাহেব-বাড়িতে কাজ করিত। লোকটা খুব ধড়িবাজ, এক দিনও বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়; চাকরি যাইবার

কয়েক দিনের মধ্যেই একটা স্বপ্নাদ্য বাতের মাদুলি পাইয়া বসিয়াছে। কি করিয়া সন্ধান লইয়াছে আমি এক বৎসর হইতে ভুগিতেছি। তাহাকেও প্রশংসাপত্র দিতে হইবে; তোমার শাশুড়ির বোন অতিরিক্ত কাঁদিয়া তোমার শাশুড়িকে লিখিয়াছেন। তোমার শাশুড়ি বলিতেছেন—লোকে রিটায়ার হইয়া কত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুণ্য অর্জন করে, আমি বাড়ি বসিয়াই যদি সামান্য এক-আধটা চিঠি দিয়া লোকের উপকার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি তো সে সুবিধা ছাড়া উচিত নয়; তাহা ভিন্ন তাঁহার মতে দৈব মাদুলির প্রশংসা—সে এক হিসাবে দেবসেবাই বলিতে হইবে! বিপদটা বোঝ বাবাজি।

"হাতের কাছেই আর এক উপদ্রব! এখানে রসময় সরকারের ছেলে বছর-তিনেক নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় ঘুরিয়া অবধূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বলিতেছে বাতটা কিছুই নয়, যোগের কয়েকটা আসন অভ্যাস করিলেই কোথায় যে পলাইবে তাহার ঠিক নাই। প্রমাণস্বরূপ বলিতেছে রামায়ণ-মহাভারতের কোথাও বাতের উল্লেখ নাই, তাহার কারণ সে-যুগে নানাবিধ যৌগিক আসনের প্রয়োগ ছিল। তোমার শাশুড়িকে দলে টানিয়াছে এবং আমাকে আসন শিখাইবার জন্য এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে যে আমি রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি! যোগের একটা আসন দেখাইতে সে পায়ের গোড়ালি দুইটা মাথার ব্রহ্মতলে তুলিয়া বসিয়া থাকে। বলে, সব আসনই প্রায় এই রকম সহজ, শুধু একটু অভ্যাসের দরকার। এদিকে পুরুত-ঠাকুর বলিতেছে—বেশি না পারেন মাসে গোটাছয়েক নির্জলা উপোস দিন, আর রাত্রের খাওয়াটা একেবারে ছাড়িয়া দিন। তোমার শাশুড়িও সায় দিতেছেন।

"আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, এই সব প্রশংসাপত্র, আসন আর উপবাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমার কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। একেবারে কয়েক মাসের অজ্ঞাতবাস! বাতব্যাধিটা রিটায়ার্ড জীবনের সঙ্গী—কখনও বাড়িতেছে, কখনও কমিতেছে, প্রাণে মারিবে বলিয়া কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু পুরানো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিষেধকের যে-রকম উপদ্রব জুটিতেছে, আর পরমাত্মীয়েরা যে-রকম অত্যাচার লাগাইয়াছেন তাহাতে ক'টা দিন সরিয়া থাকাই ভাল। বাতের এই মারাত্মক খ্যাতিটা কমিয়া আসিলে আবার তখন ফেরা যাইবে।

"তোমার শাশুড়ি ঠাকরুনকে বাপের বাড়িই পাঠাইয়া দিব। সেই সঙ্গে চপলাও দিনকতক মামার বাড়ি বেড়াইয়া আসুক। কথাটা গোপনীয়; তবে

তোমায় না বলিলেই নয়। সঙ্গে যাইবার জন্য আমার একটি বিচক্ষণ চাকর চাই, তোমায় যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। আমার চাকরটা বাহিরে যাইতে নারাজ। পূর্বে কবে একবার হাওড়া স্টেশনের দিকে গিয়াছিল। অত লাইনের মাঝে নিজের লাইনটি বাছিয়া গাড়ি যে কি করিয়া নিজের গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে ওব মাথায় সেটা কোনমতেই ঢোকে না। ফলে বিদেশ যাওয়ার নামেই কান্নাকাটি জুড়িয়া দেয়।

"তুমি যথাসম্ভব শীঘ্র একটি বেশ চটপটে চাকর যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিবে, আর কি উদ্দেশ্যে যে তোমার শাশুড়িকে বাপের বাড়ি পাঠাইতেছি ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দিবে না।

"আব ঐ যা বলিলাম, ও-রকম সাংঘাতিক বন্ধুর সংসর্গ একেবারেই পরিত্যাগ কর।

"তোমার শাশুড়ির মাথাব্যথা আজকাল অনেকটা কম। খগেনের ডায়াবেটিস্‌টা আবার একটু বাড়িয়াছে, মাস দুয়েকের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। শৈলজার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। লিখিয়াছে ভালই, তবে ডিস্‌পেপসিয়ায় শরীরটা একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে; লক্ষ্ণৌয়ে ওর মেসোর কাছে যাইবে বলিতেছে। যাক, একটু ঘুরিয়া আসুক। তবে হ্যাঁ, তোমার বন্ধুটিকে এসব অসুখের কথা বলিয়া কাজ নাই। প্রত্যেক রোগের জন্য দু'টা করিয়া শিশি পাঠাইয়া দিয়া তোমায় ধরিয়া বসিবে প্রশংসাপত্র আনাইয়া দাও। ও-ধরনের লোক সব পারে। না, লোকটাকে এড়াইয়া চলিও বাবাজি!

"চাকর পাঠানোর কথা ভুলিও না। খালি একটি ঠাকুর আর একটি চাকর লইয়াই যাইব, বেশ স্মার্ট হওয়া চাই, যেন ফাঁকিবাজ না হয়!

"অত্রস্থ সমস্তই কুশল। তোমাদের কুশলদানে সুখী করিবে।

ইতি—"

২

চিঠি পড়িয়া জামাতা বাবাজী একেবারে গুম হইয়া বসিল। আত্মধিক্কারে তাহার মনটা যেন একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিটা একবার মুড়িয়া সুড়িয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর আবার ভাঁজ খুলিয়া বন্ধুর সম্বন্ধে যেখানে তীব্র, নম্র মন্তব্যগুলা রহিয়াছে সেগুলা পুনর্বার পড়িয়া গেল। প্রশংসাপত্রখানা

পড়িয়া মনে যে একটা উল্লাস আসিয়াছিল সেটা জমিতে না জমিতেই বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল।

কারণ আছে ;—মন্তব্যগুলা কোন বন্ধুর ঘাড়ে পড়ে নাই, পড়িয়াছে তাহার নিজেরই উপর। আসল কথা 'বাত-শক্তিশেল'-এর আবিষ্কর্তা পরেশ নিজেই, তবে বন্ধুর নামে কেন চালাইতেছে, অথবা যে-নামে চালাইতেছে সে-নামের কোন বন্ধু আদৌ আছে কিনা, বা শ্বশুরের সঙ্গে এত লুকোচুরির কারণই বা কি—এসব কথা তুলিতে গেলে এত অল্পে কুলাইবে না, তাই সেটা আপাতত বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম। মোট কথা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে-ভাবেই আসুক, কথাগুলা পরেশকে বিঁধিয়াছে—মাঝখানে একটা মনগড়া বন্ধুর পর্দা থাকিলেও শ্বশুর-জামাইয়ের সম্পর্কই তো!

পরেশের প্রথমে মনে হইল কড়া করিয়া একটা উত্তর দেয়—অবশ্য কাল্পনিক বন্ধুর নিরাপদ অন্তরাল হইতে।···রাগটা ও-পর্দা থেকে নামিলে মনে করিল প্রশংসাপত্রটাই ছিঁড়িয়া ফেলে,—তিন পাতার কটু রসে জড়ানো আধ পাতার প্রশংসাপত্রের আর কিসেব এত মোহ? ছিঁড়িতে গিয়া কিন্তু চক্ষু দুইটা নিতান্ত অবাধ্য ভাবেই লাইনগুলার উপর আবদ্ধ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া চিঠির নিম্নে স্বাক্ষর আর ঠিকানাটার উপর। প্রশংসা মিথ্যা হোক, কিন্তু রিটায়ার্ড সব্-জজ তো মিথ্যা নয়!—রহিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—এসব তো মিথ্যা নয়। এই পরশপাথরই যে ঐ মিথ্যার রাংকে সত্যের স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

সোনার স্পর্শে মনেও সোনার স্বপ্নের রং ধরিল।···প্রশংসাপত্র ছেঁড়া চলে না; আর কড়া জবাব?—শ্বশুরকে! ভগবান্ বহু পুণ্যে অমন একটি জীব দেন।—তুমি সংসার করিবে, গোড়াপত্তন করিয়া দিল শ্বশুর; তোমার ক্ষমতা নাই, বুনিয়াদের উপর ভিৎ তুলিয়া দিল শ্বশুর,···তুমি স্বপ্নাস্ত্র চালাইবে?—মন, বাক্য, কায়া লইয়া তিনি হাজির আছেন—বাতগ্রস্ত কায়া, নিতান্ত তোমারই জন্য··· এমন শ্বশুরকে কড়া জবাব দেয়? বরং, যদি নিজের ক্ষতি না হয় তো পারতপক্ষে মাঝে মাঝে একটু উপকারই করা ভাল···

কি উপকার করা যায়?

কেস্ হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া কেসের ডালার উপর কয়েক বার ঠুকিয়া, ঠোঁটে চাপিয়া পরেশ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। তাহার পর কৃতজ্ঞচিত্তে শ্বশুরের উপকারের সুযোগ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—শ্বশুর সম্প্রতি একটি চাকরের জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—এই চিঠিতেই তো লিখিয়াছেন।

এই আবার এক ফ্যাসাদ! চাকর কি এখানে গাছে ফলিতেছে যে ছুট বলিতেই একটা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইবে? শ্বশুরের যদি একটু আক্কেল আছে! এখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কোথায় চাকর, কোথায় চাকর করিয়া ফের!

উপকারের ইচ্ছাটা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ঘাড়ের উপর উপকারের তাগাদায় মনটা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চিন্তিত ভাবে খানিকক্ষণ সিগারেট টানিল পরেশ, তাহার পর মনে হইল—দেখা যাক তার নিজের চাকরটা যদি একটা যোগাড় করিয়া আনিতে পারে। ডাক দিল, "রামকানাই?"

উত্তর না পাইয়া আবার একবার ডাকিল। উত্তর নাই।···মরেছে!—বেটা ঠিক কোথাও পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কিন্তু এইমাত্র তো দুই বালতি জল লইয়া বাথরুমের দিকে গেল। কখন বাহির হইয়া গেছে? চোখে পড়ে নাই তো। এতই কি অন্যমনস্ক ছিল পরেশ?···আরও জোরে হাঁক দিল, "রামকেনো!"

ঠাকুর রান্না করিতেছিল। পরেশ প্রশ্ন করিল, "রামকানাইকে কোথাও পাঠিয়েছ ঠাকুর?"

ঠাকুর দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কই, না তো বাবু।"

"দেখ তো বাইরে কোথাও আছে কিনা।"

ঠাকুর বাইরে গিয়া বিস্তর হাঁকডাক করিল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নিশ্চয় কোথাও ঘুমুচ্ছে, বাবু।"

"এই মিনিট দু-একও হয় নি বালতি নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, এর মধ্যে কখন বেরুল, কোথাই বা গেল···"

"দাঁড়ান, দেখি বাবু"—বলিয়া ঠাকুর বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একবার দেখে যান বাবু কাণ্ডটা, শীগগির আসুন।"

বাথরুমে জলে ভরা দুইটি বালতি, তাহার একটির কাণাকে বালিশ করিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া রামকানাই নিদ্রামগ্ন! গাঢ় নিদ্রায় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ওঠানামা করিতেছে, বালতির জলে বীচিভঙ্গ হইতেছে, সামনের বড় বড় চুলগুলা বালতির জলে ভাসিতেছে। অনেক করিয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া তুলিতে ঘুমের আমেজে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিল, "এই নাইবার জল রেখে দিলুম।"

রাগে পরেশের বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছিল না; বলিল, "এই না তুই আধ ঘণ্টা

আগে মশলা বাটতে·বাটতে এক চোট ঘুমিয়ে নিলি ?···না, ঠাকুর, তুমি দেখ অন্য লোক।"

"আমি তো বলছিই বাবু কদ্দিন থেকে আপানাকে—তা লোক যোগাড় করে আনলেই, আপনি বলবেন—'থাক, বারটান নেই, চুরিচামারির দোষ নেই··· চুরি!—কিছু সরাতে সরাতেই যদি ঘুমিয়ে পড়ে তো হাতে-নাতে ধরা পড়বে' —সেটুকু কি ও বোঝে না ?"

পরেশের রাগটা শ্বশুরের উপর গিয়া পড়িল। বাহিরে আসিতে আসিতে বলিল, "নিজের চাকর নিয়ে এই অবস্থা, আবার ওদিকে শ্বশুরের ফরমাস হয়েছে চাকর যোগাড় করে পাঠাও। ওঁর আর কি, দিব্যি রাতে বিছানা কামড়ে' পড়ে আছেন···বে-আক্কেলেপনার একটা সীমা-থাকে···"

"কাজ যদি খালি থাকে তো···"

রামকানাই বলিতেছে! ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—পরেশ ধমকের স্বরে প্রশ্ন করিল, "কাজ যদি খালি থাকে তো কি ?—বল্, চুপ করে রইলি কেন ?"

রামকানাই মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "তাহলে আমার দাদাকে ভর্তি করে দেন যদি; বছরখানেক থেকে বসে রয়েছে···"

পরেশ কপালে চক্ষু তুলিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তোমার দাদা! তিনি চাকরি করবেন! বছরের মধ্যে ক'দিন চোখ খোলেন তিনি জিগ্যেস করি ?"

৩

পরেশ বাহিরের বারান্দায় থামে পা আটকাইয়া একটি ডেকচেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। মনটা খুব প্রসন্ন। শ্বশুরের প্রশংসাপত্র মন্ত্রবৎ কাজ করিতেছে, ছাপানো অবধি 'বাতশক্তিশেলে'র কাটতি হুহু করিয়া বাড়িয়াগিয়াছে, বিশেষ করিয়া শ্বশুরবাড়ির অঞ্চলে। আজ ডাকে পাঁচটি ভি. পি. সরবরাহ করিল। অবশ্য অন্য কয়েকটি প্রশংসাপত্রও আছে, কিন্তু অমন জোরালো নয়, তাদের তো আর জামাই নয় পরেশকুমার; আর নিজের গড়া প্রশংসাপত্রগুলো অতটা লাগসই হয় না, তাহাদের নামধাম কোনটারই পরেশের মস্তিষ্কের বাহিরে স্থান নাই কিনা!···গ্রাহকদের ভগবান কেমন একটা সূক্ষ্ম শক্তি দেন, তাহারা মেকি নামধাম আর ঠিকানা কেমন করিয়া যেন ধরিয়া ফেলে।

রামকানাই রকের কোণটার ধারের দিকে একটা থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। কাজ না থাকিলে তাহাকে আজকাল কাছেই বসিয়া থাকিতে হয় এবং

মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রভুর নিকট হইতে নস্য লইয়া নাকে দিতে হয়। নিদ্রাকর্ষণের আপাতত এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঁচ দু-গুণে দশটি মুদ্রার ভি. পি.! শ্বশুরের প্রতি ভক্তিরসে মনটি আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে। শ্বশুর মাত্রেই ভাল, তবে ইনি যেন আবার একেবারে দেবতুল্য। বহু পুণ্যে এমন শ্বশুর মেলে। এদিকে যেমন কাটতি বাড়িয়াছে তেমনই সদ্য সদ্যই কোন একটা উপকার করা যাইত!...একটা উপকার অবশ্য চলিতেছে,—বধূ চপলা আজকাল পিত্রালয়েই। তাহাকে একটা চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে—সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়। একে বাপ, তায় ওদিকে আবার পরমগুরু স্বামীর শ্বশুর—দুইদিক দিয়া সম্বন্ধটা গুরুতর কিনা।

ডাকপিয়ন আসিল। পরেশের চক্ষে আজকাল এ-লোকটি দেবদূতের মতই শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি অর্ডার—তাহার মধ্যে দুইটি শ্বশুরবাড়ির অঞ্চল হইতে।

তৃতীয় একখানি পত্র খামে। খুলিয়া দেখিল, শ্বশুরের লেখা। সেই এক কথা!—বাত বাড়িয়াছে, অবধূতের আসনের ভয়, প্রশংসাপত্রের তাগিদ বাড়িতেছে, না পালাইয়া উপায় নাই; একটা মস্ত সুযোগ, গৃহিণী বাপের বাড়ি গিয়াছেন ক'দিনের জন্য; ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন। সঙ্গে চপলাকেও এক রকম জোর করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু এখন চাকর আসার অপেক্ষা। যেদিন চাকর আসিয়া পৌঁছিবে সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িবেন; কোথায় যাইবেন, কোথায় উঠিবেন সে-সব ঠিক হইয়া আছে।—চাকর চাই, এদিকে তো চাকর খুব সুলভ, এই পনরো দিনেও সংগ্রহ হইল না?

চিঠি পড়িয়া পরেশের মাথায় যেন আগুন জলিয়া উঠিল।—আরে, চাকর কি রাস্তায় রাস্তায় এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যে, একটাকে পাকড়াও করিয়া চালান করিয়া দেওয়া হইবে? আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক তো! বাতে ভুগিয়া ভুগিয়া কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল নাকি মানুষটার? আর এখন তাহার ফুরসৎই বা কোথায়? এই সব গাছ-গাছড়া তুলিয়া আনয়ন, ধোওয়ানো, শুকানো, বাটানো—এই সব ছাড়িয়া ওঁর চাকরের পিছনে ঘুরিতে পার তো উনি খুশি থাকেন। স্বার্থপর। তাহা ভিন্ন, দুনিয়াসুদ্ধ এই এত লোকের বাত সারিতেছে,—ঔষধ সরবরাহ করিতে করিতেও হয়রান হইয়া যাইতেছি। আর শুধু ওঁরই বাত কায়দা হইল না! মিথ্যা কথা, একটা ভান; বাত নয়, ও বুজরুকি একটা।

পরেশ ডাকিল, "ঠাকুর!"

উপস্থিত হইলে প্রশ্ন করিল, "দেখেছিলে একটা চাকর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে রেখেছি দু'তিনজনকে—"

"না, বলে রাখলে চলবে না। আমার রিটায়ার্ড সব জজ শ্বশুর মহামহিম রায়বাহাদুর রামসদয় সেনগুপ্ত মশাইয়ের হুকুম—আজই চাই, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ...এই পরোয়ানা এসেছে।...কি বে-আক্কেলে লোক বল দিকিন! আরে চাকরের কথা বলেছ, তা আমরা করছি চেষ্টা—চারিদিকে বলে রাখা হয়েছে, এলেই দোব পাঠিয়ে—না..."

এমন সময় ধপ করিয়া পাশেই গুরুভারপতনের একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরের ছানা আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দুই জনেই ঘুরিয়া দেখিল, রামকানাই ঘুমন্ত অবস্থায় রক থেকে একেবারে নীচে গড়াইয়া পড়িয়াছে—জিমির বাচ্ছা দুইটা খেলা করিতেছিল—একেবারে একটার ঘাড়ের উপর! ঘুমের ঘোর ভাল কাটে নাই, ঠাকুর গিয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া দাঁড় করাইল।

পরেশ এ-অবস্থায় আজকাল রাগের মাথায় চড়টা কিলটাও বাকি রাখিতেছে না। আজ কিন্তু কিছু বলিল না; শুধু প্রশ্ন করিল, "নস্যি নিয়ে যাস্ নি কেন এতক্ষণ?" রামকানাই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরেশ কিছু বলিল না। মুঠায় মুখটা চাপিয়া চিন্তিতভাবে একটু পায়চারি করিল, তাহার পর রামকানাইয়ের সামনে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিল, "তোর দাদা বাড়িতে আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।"

"বাইরে কাজ করতে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব যাবে।"

"ঘুমোয় কেমন?—শুধু খাবার সময় ছাড়া আর উঠবে না তো?...খবরদার, মিছে কথা বলবি নি।"

রামকানাই হাত দুইটা একত্র করিয়া একটু মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর কুণ্ঠিতভাবে মুখটা তুলিয়া বলিল, "তা মিছে কথা বলব না বাবু, ঘুমোয় একটু,...মানে, আমার মতন অতটা সজাগ নয় বেশ..."

পরেশ বলিল, "যা ডেকে নিয়ে আয়—ঠিক একটি ঘণ্টা সময় দিলাম,—এই নস্যির ডিবে নে। নস্যি নিতে নিতে যাবি, তার নাকে নস্যি দিয়ে তুলে দু'জনে নস্যি নিতে নিতে আসবি—কোথাও বসা নয়, দাঁড়ানো নয়—যা। এক টিপ নস্যি নিয়ে নে আগে।"

শ্বশুরকে পত্র লিখিল—

"প্রণামাবহুবনিবেদনঞ্চাগে,

চাকর পাঠাইতেছি। আমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শোনা গেল কাজে খুব তৎপর। আপনি যে লিখিয়াছেন চাকর পৌছিবার দিনই যাত্রা করিবেন সেই পরামর্শই ভাল।

"আমার বন্ধু ঔষধে আপনার ফল হয় নাই শুনিয়া বিশেষ মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি কয়েকটি কারণে এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে চান। একটি কারণ, তিনি আপাতত একটি ভাল চাকরি লইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। তবে তাঁহার বিশ্বাস এইবার ঔষধে আপনার উপকার হইবেই। সেই জন্য আরও দুই শিশি এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন এবং বিদেশে নির্ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বেশ নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। তিনি ঔষধের স্বত্ব আমায় বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি আপনি উপকৃত হন তো আমিই ঔষধটি চালাইবার প্রয়াস করিব…"

৪

ঠিক সতেরো দিবস পরে একদিন বৈকালে পরেশ কার্যান্তর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল বাহিরের রোয়াকে একটি লোক দেয়ালে ঠেস দিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে। রামকানাই ভাবিয়া গালিগালাজ দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। পরে বোঝা গেল, রামকানাইয়ের দাদা। ঠেলাঠেলি করিতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইল না, তবে তাহার শরীরের কোথা হইতে একটা লেফাফা খসিয়া সামনে পড়িল।

পরেশ তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া পড়িল—

"বাবাজি,

নিত্য আশীর্বাদ জানিবে। আমি এক রকম পূর্ণভাবেই সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমার বন্ধুর 'বাত-শক্তিশেল' নিয়মিত ভাবে আবার ব্যবহার করিয়াছি বটে, কিন্তু মহৌষধটি তোমার বন্ধুর এই তৈল, কি তোমার ভৃত্য রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সে-সম্বন্ধে এখনও মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই পনরোটা দিন নিজের হাতে মালিসের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা প্রকারে প্রচুর অঙ্গসঞ্চালন করিতে হইয়াছে,—তাহার মধ্যে নিজের শয্যারচনা, স্নানের জল তোলা, কাপড় কাচা এমন কি জুতা পালিস করা পর্যন্ত আছে, কেননা এক

আহারের সময় উঠিয়া আহারটুকু সারিয়া লওয়া ব্যতীত রামতারণ আর আমার অন্য কোন উপকারে বিশেষ লাগিত না। ছাত্রজীবনে যে দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারিতাম এখন সেই শক্তি প্রায় ফিরিয়া পাইয়াছি।

"যাহাই হোক, তোমার বন্ধুর ঔষধের স্বত্বটা কিনিয়া রাখিও। রামতারণ পৌছিল কি না জানিবার জন্য খুবই উদিগ্ন রহিলাম। ফিরিবার সময় টিকিট কিনিতে ভিড়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পৌছিলেই পত্র দিবে। তোমার শ্বশ্রূ এখনও পিত্রালয়েই। অন্যান্য সংবাদ কুশল। ইতি"

বাঁটুলের রবীন্দ্রনাথ

১

অখিল প্রথম ব্যাচে বসিয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে, ঢেকুর তুলিতে তুলিতে আসিয়া ফরাশের উপর চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বাঁটুলের পানে চাহিয়া বলিল, "বেঁটল যে, তোর পেট কি বলে আজ?"

বাঁটুল রগ দুইটা আলগাভাবে টিপিয়া বসিয়া ছিল। পেট-রোগা মানুষ, সেই অনুপাতে খাওয়ার শখটাও একটু বেশি। বলিল, "পেটের আর আমার কি হয়েছে? তোদের যেমন সব—! কপালটা একটু যেন টিপটিপ করছে, সামান্য।…রান্নাবান্না কেমন হয়েছে রে অখিল?"

অখিল শুইয়া শুইয়াই ঘাড়টা উলটাইয়া বলিল, "তুই দ্বিতীয় বারেও বসলি না? মরবি দেখছি, ফাঁকি পড়বি।"

বাঁটুল কপাল হইতে হাত নামাইয়া একটু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন বল্ দিকিন?"

"এরা কলকাতা থেকে যে রসগোল্লা আনিয়েছিল, বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, হাত টেনে দিচ্ছিল।…তুই সেকেণ্ড ব্যাচটা বাদ দিলি কেন?"

বাঁটুল আরও উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, "ফুরিয়ে এসেছে? তাহলে—"

অনুকূল কবিরাজের ভাগিনেয় রাখাল বাঁটুলের উপর দিয়া চিকিৎসায় হাত পাকাইতেছে; বলিল, "সেকেণ্ড ব্যাচে বসে নি, তার কারণ ওকে একটা বৃকোদর-বটিকা দিয়েছি ঘণ্টাখানেক হল; সেটার কাজ আরম্ভ হোক একটু—"

বাঁটুল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, পেটটাতে দুইটা মৃদু আঘাত দিয়া বলিল, "আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ; দেখব তাহলে, সেকেণ্ড ব্যাচে আর জায়গা আছে কি না ?"

অখিল বলিল, "তিলমাত্র নেই। রসগোল্লা ফুরিয়ে এসেছে বলে কানাঘুষো হতেই একটা আতঙ্ক হয়ে গেল ; আসন সব ভরে যেতে লোকেরা নিজেরাই কোথা থেকে আসন গেলাস পাতা খুরি যোগাড় করে নিয়ে, কোণে-কানে যেখানে একটু জায়গা ছিল সব ভরাট করে ফেললে। মোটা-জগন্নাথ বেচারাকে এমন দেয়াল চেপে বসতে হয়েছে, খানকয়েক লুচি পেটে পড়লে যখন আড়ে বাড়বে, তখন কি যে হবে !"

বাঁটুল উঠিয়া পড়িল।

প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় চললি ? শুনছিস জায়গা নেই।"

বাঁটুল বিরক্তভাবে ঘুরিয়া বলিল, "আচ্ছা, কি লাভ হল তোর পেছু ডেকে ? একবার ভাঁড়ারের দিকে যাব ভাবলাম, রসময় কাকা ইন্‌চার্জ আছে, একবার চেহারাটা দেখিয়ে আসি। দিলে ডেকে পেছনে! একে তো বাড়ি থেকে বেরুতেই খেঁদী টুকে দিয়েছে, পদে পদে দুঃসংবাদই শুনে যাচ্ছি এখন পর্যন্ত !"

২

প্রায় মিনিট পনরো পরে বাঁটুল ফিরিল। ডান হাতে কাগজের একটা পুটুঁলির মত, নীচের দিকটা ভিজিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "রসময়কাকা বললেন, ততটা ভয় নেই, তবে সব ছেড়ে লোকে যেমন রসগোল্লার দিকে ঝুঁকেছিল, ব্রেক্ না কষলে এতক্ষণ সব লোপাট করে দিত। তবুও বললাম, 'কাকা, বেঁটলোর অদেষ্ট, বিধাতাপুরুষ আঁতুড়ে-ষষ্ঠীর দিনে কপালে টিকে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছিল। তুমি গোটাকতক নমুনা ছাড়, সরিয়ে রাখি।' টিনের ভেতরে হাত ডুবিয়ে এক মুঠো দিলে বের করে, ভরা মুঠো, মিথ্যে বলব না। গোটা দশেক উঠেছিল, ছ'টা রয়েছে এখন—মানে, তবু ধুকপুকুনিটা খানিকটা গেল। একবার ঘুরে এলাম কিনা ও দিক দিয়েও, এ ব্যাচে আবার বেছে বেছে যেমন সব বসেছে—"

রাখাল বিমূঢ় এবং ক্রুদ্ধ ভাবে বসিয়া ছিল, বলিল, "রাখালের কথা ছেড়ে দে, স্বয়ং ধন্বন্তরি এলেও তোকে বাঁচাতে পারবে না ; ওষুধটা না ধরতে ধরতে তুই

অতগুলো রসগোল্লা কি বলে গিলে বসে থাকলি বল্ তো? নে, এই বড়ির আদ্দেকটা ফেলে দে। নিজে তো মরবিই, আমারও বদনাম করবি তুই।"

হরিশ আসিল। তাহারও আহার হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতেছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "ওটা কি রে অখিল?"

অখিল বলিল, "বাঁটুলের রসগোল্লা।"

হরিশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "রসগোল্লা! ছাঁদা বেঁধেছে নাকি? আমার তো দুটোর বেশি আদায় করতেই জিব বেরিয়ে গেছল।"

অখিল বলিল, "তোর যদি ইচ্ছে থাকে তো খা না গোটাকতক আরও। নে না বাঁটুল, সামান্যর জন্যে মনে একটা সাধ অপূর্ণ রাখাটা কাজের কথা নয়। হরিশ যতই নীরোগ হোক না কেন, মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে জল—"

হরিশ শাসাইয়া বলিল, "খবরদার, নীরোগ-নীরোগ করে খুঁড়বি নি অখিল, একে খাওয়াটা একটু চাপ হয়ে গেছে।"

কাগজের বাণ্ডিলটার উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ক'টা আছে রে বাঁটুল? করেছে ভাল, এখনও মুখে তারটা লেগে রয়েছে—

বাঁটুল উঠিল। ছয়টা রসগোল্লাই একসঙ্গে মুখে গুঁজিয়া দিয়া কাগজটা ফেলিয়া দিল, তাহার পর রসগোল্লা-গাদা মুখে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া নিজের হাতের বুড়া-আঙুল দুইটা একবার নাড়িয়া দিল।

হরিশ বলিল, "বাব্বাঃ, মরবে কি বাঁচবে জ্ঞান নেই, তবু যদি ট্যাঁকে কবিরাজ গুঁজে না বেড়াত!"

রাখাল মুখটা গোঁজ করিয়া উঠিয়া পড়িল; দুয়ার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া বলিল, "আমি জবাব দিলাম বেঁটল, আমার বাবার সাধ্যি নেই।"

অখিল পরিত্যক্ত কাগজটার পানে চাহিয়া ছিল, বাঁটুলের পানে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিল, "তুই এ কাগজটা কোথায় পেলি রে বেঁটল?"

বাঁটুল কাগজটার পানে আড়চোখে চাহিয়া লইয়া বলিল, "একটা ক্যাটলগ না কি থেকে ছিঁড়ে নিলাম।"

আগাইয়া আসিয়া কাগজটা তুলিয়া অখিল বলিল, "তুই একেবারে আজ চরম করলি বেঁটল! এই তোর ক্যাটলগের পাতা? রসগোল্লার নামে একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলি?"

দেখি, 'রবিবার' নামক রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত গল্পের প্রথম তিনটা পাতা।

অখিল রাগতভাবে প্রশ্ন করিল, "একবার আন্ তো তোর ক্যাটলগটা।...উঃ, তুই খুন করতে পারিস!"

বাঁটুল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বেশ গতরওলা আর রংচঙে দেখলাম বাইরেটা, তাই ভাবলাম বুঝি একটা ক্যাটলগ হবে, দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলাম।"

অখিল বলিল, আচ্ছা, বেশ করেছিস, তোর উপযুক্ত কাজই হয়েছে, এখন ক্যাটলগটা নিয়ে আয় একবার দেখি।"

আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বহুদিন পরে রবিবাবুর একটা গল্প বেরিয়েছে, পড়েছিস তুই শৈলেন?"

বলিলাম, "না, এখনও যোগাড় করে উঠতে পারি নি, বড্ড কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে কাগজটা নিয়ে।—যা না বাঁটুল।"

বাঁটুল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "যা না বাপু, গরজ থাকে তো। আমার মধ্যে অত কাব্যি নেই, তায় ক্ষিদেয় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে, তার ওপর আজ আবার পূর্ণিমে, রগ দুটো টিপটিপ করছে।"

দুইটা আঙুলের ডগা দিয়া রগ টিপিয়া বসিয়া রহিল।

দুই একজন করিয়া ততক্ষণে আরও সবাই জুটিয়াছে; বেশির ভাগই অভুক্ত। সুধেন, বিমল, আলোক প্রভৃতি রবিবাবুর কয়েকজন গোঁড়া ভক্তও আছে তাহাদের মধ্যে। বাঁটুলের লাঞ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের চাহিদা বাড়িয়া গেল। কাগজ লইয়া আসিতে বাঁটুলকে কোনমতেই রাজি করা গেল না, অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, "সন্ধান দিচ্ছি, নিয়ে আয় গরজ থাকে তো, ভাঁড়ার ঘরে টেবিলের ওপর যেখানে পানের গাদা আছে সেখানে পড়ে আছে। যে যাবে সে যেন রসময় কাকার কাছ থেকে আরও গোটাকতক নিয়ে আসে, রেখেছিলাম অনেক করে বাঁচিয়ে, কিন্তু যা সব রেয়োভাটদের পাল্লায় পড়া গেল..."

"দেখি, এদিকে কতদূর!"—বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, কয়েকজন মিলিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল। বিমল বলিল, "না, তোর সাজা হওয়া উচিত, তুই রবিবাবুর গল্প ছিঁড়ে নিয়ে রসগোল্লার ছাঁদা বেঁধেছিস! তোর অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত নেই, তবুও কিছু একটা সাজা তোকে নিতেই হবে। ওদিকে সবাই নেমন্তন্ন খাক, তুই বসে বসে এখানে রবিবাবুর লেখা শোন্; তোর পক্ষে এই সবচেয়ে বড় সাজা।"

তুমুল কলরবের সঙ্গে সকলে কথাটা সমর্থন করিল। একজন গিয়া ভাঁড়ার-

ঘর হইতে কাগজটা সংগ্রহ করিয়া আনিল। অখিল তাহার হাতের রস-মাখানো পাতা তিনটা একটু আলগা হাতে মুছিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

বাঁটুল ছাড়া পাইবার অনেক চেষ্টা করিল, মাথা টিপটিপ করার অজুহাত হইতে রাগারাগি পর্যন্ত, কিন্তু কোনমতেই সফল না হইয়া নোঙরে-ফেলা নৌকার মত হাত পা আবদ্ধ হইয়া নিরুপায়ভাবে স্থির হইয়া রহিল।

৩

গল্পটি একটু দুষ্পাচ্য—ভাব, ভাষা দুই দিক দিয়াই। নেহাৎ বিমল, আলোক, অখিল ছাড়া সবার উৎসাহই একটু এলাইয়া আসিয়াছে। যখন প্রায় পাতা দুয়েকের কাছাকাছি শেষ হইয়াছে, ওদিকে ঢেকুরের শব্দে ও জুতা-খোঁজার আর্ত চেঁচামেচিতে বোঝা গেল সেকেণ্ড ব্যাচ উঠিয়াছে। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অভুক্ত, অখিলের উপর তাগাদা হইল, একটু তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইতে; থার্ড ব্যাচটা যেন না হাতছাড়া হয়।

একজন বলিল, "না হয় ঐ পর্যন্ত থাক না; এসে আবার শোনা যাবে।"

উত্তর দিল বাঁটুল, চারিটা আঙুলের ডগা দিয়া পেটে ধীরে ধীরে আঘাত করিতেছিল, বলিল, "পরিষ্কার করে আসন পাততে, পাতা গেলাস খুরি সব দিতে একটু দেরি হবে, ততক্ষণে সেরে নিক না।"

ভক্ত, অভক্ত সকলেই একবার বিস্মিতভাবে বাঁটুলের পানে চাহিল। যাহারা নোঙর হইয়া উহার হাত চাপিয়া বসিয়া ছিল, একটু আলগা দিল। গল্প শোনায় যাহাদের উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা আবার অন্তত লোকদেখানি মনোযোগী হইয়া উঠিল; বাঁটুলের উপরে থাকিতে হইবে তো!

প্রায় মিনিট-কুড়িক হইয়াছে, গল্পের প্রায় মাঝামাঝি, এমন সময় ডাক পড়িল। আমাদের ঘর হইতেই একজন গলা পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া কিছুক্ষণ আগে উঠিয়া গিয়াছিল, সেই আসিয়া খবরটা দিল। ওদিকে পাতের দিকে বুভুক্ষুদের যে একটি স্রোত নামিয়াছে, একটা অসংলগ্ন কলরবে তাহারও পরিচয় পাওয়া গেল।

বাঁটুলের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। মুহূর্ত-খানেকের জন্য তাহার মনে যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল, তাহার পর কতকটা যেন ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমরা আসছি—কতটা আর আছে রে অখিল?"

যে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাকে বলিল, "আমাদের ক'জনের জন্যে একপাশে গোটাকতক আসন রিজার্ভ রাখবেন।"

সবাইয়ের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "এই থান-আষ্টেক আসন, বেশি নয়।...নে অখিল, শেষ করে ফল্। আগেই মানা করেছিলাম, করিস নি আরম্ভ।"

একটা কথা আছে, ভূতের মুখে রামনাম। যদি তাহাও শুনিতাম তো এতটা বিস্মিত হইতাম না। বাটুল সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। বিমলকে লইয়া তিন চার জন প্রায় অর্ধেক উঠিয়া প'ড়িয়াছিল, কবিবরের প্রতি ভক্তি এবং নিষ্ঠার অভাবে একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার খুব সন্তর্পণে বসিয়া পড়িল। কেহ আর কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। আমার মুখে একটা হাসি ঠেলিয়া আসিতেছিল, গোপন করিবার জন্য মুখটা ফিরাইয়া লইলাম। সাবাস বাঁটুল! লোক-দেখানো ভক্তবৃন্দকে খুব জব্দ করিয়াছে; এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি বাঁটুলের ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত পেটেও ছিল!

যে ডাকিতে আসিয়াছিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বাবুদের নভেল পড়া হচ্ছে বলে আসন রিজার্ভ রাখতে হবে! থাকবে'খন রিজার্ভ ভাল করে।"—বলিয়া কালক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল।

অখিল আবার পড়িতে লাগিল।

ওদিকে গোলমালের বহরে বোঝা যাইতেছে, রিজার্ভ তো দূরের কথা, পাতা লইয়া যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে—'ওদিকে হে, ওঁদের ওদিকে পাঠিয়ে দাও;' 'বারান্দার ওদিকটাও দেখ' দিকিন;' 'না, এদিকে আর পাঠিও না কাউকে; আসনের চেয়ে ক্যাণ্ডিডেট বেশি—'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিল, "ঐ পর্যন্ত থাক না অখিলদা, খেয়ে এসে আবার শোনা যাবে'খন, চমৎকার লাগছে—"

পাছে বাঁটুল উঁচুদরের কিছু একটা বলিয়া বসে, সেই ভয়ে বিমল তাড়াতাড়ি বলিল, "তাতে একটু রসভঙ্গ হয়, তবে কথা হচ্ছে—"

অখিল বলিল, "তোমাদের যার শোনবার সে শোন, আর যার যাবার সে যাও, আমার তো আর খাওয়ার হ্যাঙ্গাম নেই, যখন ধরেছি শেষ করে ফেলি।"

দেখিতেছি বাঁটুল একটা অসহ্য-রকম দোটানার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিল, "বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি—"

এমন সময় একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,

"তোমাদের সব হয়ে গেছে নিশ্চয়, না আছ কেউ বাকি ? গোটাকতক আসন আছে খালি এখনও বারান্দার একেবার ওদিকে।"

কয়েকজন আর এ সুযোগটা হারাইল না। "আছে নাকি খালি ? দেখি তো।"—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, একেবারে বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষুলজ্জার ভয়ে কাহারও দিকে চাহিল না। বাকি রহিলাম আমি, বিমল, আলোক, সুধেন আর বাঁটুল। পড়া আবার আরম্ভ হইল। আলোক আর সুধেন বাঁটুলের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, এরই মধ্যে কখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমন ওষুধ-গেলা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনিতে এর পূর্বে কখনও দেখি নাই। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিতেছি। প্রথমে যে ভাবিয়াছিলাম, বাঁটুল সবাইকে জব্দ করিবার জন্য কপট ভক্ত সাজিয়াছে, সে ধারণা টিঁকিতেছে না। অবশ্য বাঁটুলের মুখে রসগ্রাহিতার কোন ভাব দেখিতেছি না; ও যে কিছুই, অন্তত অনেক কিছুই, বুঝিতেছে না এটা ঠিক, কিন্তু চক্ষে ওর দারুণ উদ্বেগ। আসন সব দখল হইয়া গেল—সেজন্য ? কিন্তু তাহা হইলে বসিয়া আছে কেন ? কে উহাকে মাথার দিব্য দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে ? ওর মুখে কোন রকম আক্রোশের ভাবও তো নাই। তবে কি বাঁটুল সত্যই রবীন্দ্রভক্ত হইয়া উঠিল ? আশ্চর্য কি ! কবিবর হঠাৎ বোধ হয় কোন্ তন্ত্রীতে ঘা দিয়াছেন ! কবিবরের ভক্তের শুনিয়াছি অনেক রকমারি আছে, এও এক রকমের নাকি ?

আলোক, বিমল, সুধেন এক এক বার জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে আড়চোখে বাঁটুলের পানে চাহিয়া চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছে। ওদিক হইতে শব্দ আসিতেছে—'এখানে বেগুনভাজা পড়ে নি,' 'কুমড়োর তরকারিটা নিয়ে এস,' 'লুচি'। 'এত কমে হবে না, ঝুড়িটা ভর্তি করে নিয়ে এস।' 'এ ক'খানা পাত খালি রইল কেন ? তাহলে উঠিয়ে নাও।'

সুধেন বলিল, "এক মিনিট অখিলদা, বলে আসি, পাত তোলবার দরকার নেই—হাফ-এ-মিনিট।"

অবশ্য ফিরিল না।

প্রায় মিনিট দুয়েকের কাছাকাছি যখন হইয়াছে, বাঁটুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "হাফ-মিনিট। যত্তো ! পড না অখিল, ও আর এসেছে, মিছিমিছি একটা ভাঁওতা দিয়ে—"

বিমল রাগটা ঝাড়িবার একটা সুবিধা পাইয়া একেবারে নাকমুখ খিঁচাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল, "মিছিমিছি ভাঁওতা মানে ? আর তুই যে এই কিছু বুঝছিস না

সুঝছিস না, মহাভক্ত সেজে বসে আছিস, এটা বুঝি খুব সত্যি ? রাখ্, বটতলার একটা নভেল বুঝতে ভির্মি লেগে যায়, উনি একেবারে রবীন্দ্রনাথের মহা-সমঝদার হয়ে দাঁড়ালেন ! আচ্ছা, দাঁড়া, ঐখানটার মানে বল্ দিকিন, বের কর্ তো অখিল, সেখানটা—"

একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "সুধেনদাকে ওরা আটকে' রাখলে। জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছে, তিনটে সীট এখনও ধরে রেখেছে, আপনারা যাবেন নাকি ?"

বিমল বলিল, "আটকে' রাখলেই হল ? জবরদস্তি নাকি ? চল তো দেখি। অখিল, একটু থেমে যা ভাই, ছ্যাও না পড়ে যায়।"

"তুই একলা টেনে আনতে পাববি না ; এক সেকেণ্ড, অখিল !—" বলিয়া আলোক উঠিয়া পড়িল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রসভঙ্গ হয়ে গেল ; দলের সবাই ওদিকে কালিয়া মুড়ি-ঘণ্টের ফরমাস দিচ্ছে, এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথেও মন বসানো অসম্ভব। শেষ করে আমার হাতে দিস কাগজটা, যারই হোক চেয়ে নিয়ে যাবে। ওঠ্ বাঁটুল, জমবে না !"

বাঁটুল গভীর মিনতিভরে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "শৈল ভাই, আমার জন্যে একটা জায়গা কোন রকম করে আটকে' রাখিস, আর মিনিট কয়েকের মধ্যে এসে পড়ব। একটু তাড়াতাড়ি করিস অখিল।"

খানিকটা উষ্মার সহিতই মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "বলেছিলাম এইজন্যে যে করিস নি আরম্ভ এখন। নে, শেষ কর্ বাপু শীগগির···হ্যাঁ, তার পরে কি হল ?" হাতে কপালটা চাপিয়া গভীর অভিনিবেশের ভঙ্গিতে শুনিতে লাগিল। এই নূতন অভিজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে একটু মন্থর গতিতেই গিয়া বিমলের পাশে একটা আসন দখল করিলাম। বাঁটুল কি শপথ করিয়া রাতারাতি রবিভক্ত হইয়া উঠিল ?

কচুরি পাঁপরভাজা শেষ করিয়া চাটনিতে হাত দিয়াছি, এমন সময় বাঁটুল আসিল।

দলের সকলেই যে আহারটা উপভোগ করিতেছিল, এমন বলা যায় না। বাঁটুল সবার জিভেই বিস্বাদ আনিয়া দিয়াছে, আলোক বিমল প্রভৃতি যে যত বড় ভক্ত, তাহার জিভে তত বিস্বাদ।

আমাদের সামনে হারান-মাস্টার বসিয়াছিলেন। লুচির সঙ্গে মাছের কালিয়ার একটা দলা মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলেন, "তোরা সবাই রয়েছিস, বৈটলকে

দেখি না যে? পেট ঠিক আছে তো? অবশ্য না থাকলেও সে ছাড়বার পাত্র নয়। রাখালই বা কোথায়?"

বলিলাম, "অখিল রবীন্দ্রনাথের একটা নতুন গল্প পড়ছে, বাঁটুল বসে বসে শুনছে!"

মুখে গ্রাসটা দিয়াছিলেন, দারুণ বিস্ময়ে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেঁটল! রবীন্দ্রনাথ!"

আর কিছু বলিবার আগেই বিষম লাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন।

বিমল আমার পানে চাহিয়া বলিল, "থাম্, হয়েছে। শুনছে যা তা আমিই জানি, একটা স্টাইল—"

কে একজন বলিল, "বাঁটুলের স্টাইল হয়েছে! সেটাও তো একটা মস্ত আশার কথা।"

রাজেন বলিল, "সিন্সিয়ারও হতে পারে। বাঁটুলের মত ছেলে যে স্রেফ স্টাইলের জন্যে থ্যাঁটা ভুলে বসে থাকবে, আমার বিশ্বাস হয় না। ওসব ওপরে ওপরে হাঁদা লোকদের ধাত বোঝা দুষ্কর, ভেতরটা ওদের অনেক সময় এমন সরস থাকে—"

যতীন দত্ত বলিল, "তোমরা গোড়াতেই একটা মস্তবড় ভুল করেছ। যার জিভে, শুধু জিভে বলি কেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে-কোনটায় রসজ্ঞান আছে, তার সাহিত্যরসের জ্ঞানও নিশ্চয়ই থাকবে। স্থূলটা রয়েছে অথচ সূক্ষ্মটা নেই, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না; হয়ত লোকচক্ষুর আড়ালে আছে।"

হাওয়াটা প্রশংসার দিকে বহিল—

"না না, তোমরা কেউ জান না। আমি জানি বেঁটলের স্টাডি আছে; শুধুই ডিস্পেপসিয়া, নেমতন্ন, রাখাল আর অমাবস্যা-পূর্ণিমের হিসেব নিয়ে পড়ে নেই।"

"কার কথা বলছেন, বাঁটুলের? রবিবাবু ওর মোস্ট ফেবরিট অথর, আমি কাঁড়ি কাঁড়ি বই যুগিয়েছি।"

যতীন দত্ত এক থাবলা চাটনি মুখে পুরিতে যাইতেছিল। বলিল, "তোমরা এত আশ্চর্য কেন হচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না, বাঁটুল এমন কিছু অমানুষিক কাজ করে নি। রবিবাবু আর তাঁর মত বড় বড় প্রতিভাদের অনেকগুলো স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কোন্টা যে কার কাছে অ্যাপীল করবে বলা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে তোমার রবীন্দ্রনাথ আমার রবীন্দ্রনাথ এক নয়, তেমনই বেঁটলের।"

এই সময়টায় হন্তদন্ত হইয়া বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইল। চোখের দৃষ্টি প্রায়

পাগলের মত ; হা-হুতাশভাবে চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর হইতেছে। "তোর জন্যে এই সীট রেখেছি, বাঁটুল"—বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া লইলাম।

এর ওর পাত ডিঙাইয়া বাঁটুল আসিয়া বসিয়া পড়িল। একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "সেরেছে! চাটনি পর্যন্ত হয়ে গেছে।"

একেবারে পুরাদমে বিলম্ব সারিতে লাগিয়া গেল।

বিমল প্রশ্ন করিল, "শেষ পর্যন্ত কি হল রে বাঁটুল?"

"কিসের কি হল?"—বলিয়া উত্তরের দিকে খেয়াল না করিয়া বাঁটুল হাত চালাইয়া চলিল। একবার শুধু সামনে ঝুঁকিয়া এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া লইল। বেশ বোঝা গেল, রাখালকে খুঁজিতেছে।

আমি বলিলাম, "হবে না চাটনি আরম্ভ? তোকে তখন থেকে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে—"

বাঁটুল একটা আস্ত লুচি তরকারিতে বোঝাই করিয়া মুখে দিতে যাইতেছিল, মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "মেলা বকিস নি শৈল, তোদের সবতাতেই তামাশা। আজ সকাল থেকে পেটটা বাঁদ সাধবার মতলব করছিল, রাখালের হেফাজতে যদি কোনমতে সেটাকে সায়েস্তা করে আনলাম তো দোসরা এক ফ্যাচাং এনে হাজির করলে সব!"

সকলেই খাওয়া বন্ধ করিয়া বিস্মিতভাবে বাঁটুলের পানে চাহিল। সত্যই অত্যন্ত চটিয়াছে। বলিলাম, "ফ্যাচাং তুই কাকে বলছিস? তুই তো নিজেই শখ করে বসে রইলি; দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তো বললামও তোকে আগে খেয়ে নিতে।"

ওদিককার বারান্দার ও-কোণে রসগোল্লা দেখা দিল। বাঁটুল তখনও মাছের কালিয়ায়। একবার ওদিকটায় চাহিয়া লইয়া কালিয়ার মুখে আধখানা পাঁপর ও খানিকটা চাটনি পুরিয়া দিল; তাহার পর এক রকম ভ্যাংচাইয়াই আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে খেয়ে নিতে! খুব শুভার্থী, থাম্‌। আরম্ভ করে সবটা না শুনে উঠে এলে আধকপালে ধরত না? একে তো কানের কাছে কি সব হিজি-বিজি পড়ে গেল,—এমনিই রগদুটোয় টিপটিপিনি বেড়ে গেছে…"

আমরা কয়েকজন মুখ থামাইয়া এক রকম চীৎকার করিয়াই উঠিলাম—"আধকপালে! আধকপালের ভয়ে তুই এতক্ষণ বসে বসে…"

বাঁটুল আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়াই খিঁচাইয়া উঠিল, "মিছে বকাস নি শৈল,

আমায়,—একে যত সব লুভিষ্টিদের পাল্লায় পড়ে পেছিয়েই গেছি। তোদের সব কথাই ইয়ার্কি বলে মনে হয়,—রাখালে জানে একবার আধকপালে ধরলে কি রকম কাবু করে দেয় আমায়! এদিকে আবার পূর্ণিমের ঝোঁক চলেছে, তার ওপব আধা-খ্যাঁচড়া করে গল্পটা শুনে একটা কাণ্ড ঘটাই আর কি, ওদেব ফুর্তিটা বাড়ুক। লোকে একটু নেমতন্ন খেতে আসবে, সেখানেও বাবুদেব ববিঠাকুর!·· দেখ গেবো, রসগোল্লাব তিজেলটা আরও ওদিকে আটকে' গেল! মোটা-জগন্নাথ, অমর্ত কবরেজ—বেছে বেছে যত সব রাঘববোয়ালগুলো ওখানে একাট্ঠা হয়েছে।

যাহারা এতক্ষণ প্রশংসায় মাতিয়াছিল, মুখ গোঁজ করিয়া আহারে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া উঠিল, কাহারও আব মাথা তুলিবাব অবস্থা নাই।

শুধু হারান-মাস্টাব একটা স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাঁচালি বেঁটুল, এদিকে আমারই কপালে টিপটিপিনি ধবে গিয়েছিল,—কি দারুণ সমস্যাতেই যে এতক্ষণ ফেলে রেখেছিলি!"

ফুটবল

আবার সেই ফুটবল আসিয়া পড়িল।

ক'দিনই বা বন্ধ ছিল? এই তো সেদিনকার কথা,—গজাননের নাক থেতো হইয়া সেরখানেক রক্ত পড়িল, ষষ্ঠীচরণের পায়ের দফা রফা হইল। ষষ্ঠীব ল্যাংচানো এখনও পর্যন্ত ভাল করিয়া সারে নাই, গাঁটে ব্যথা, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এখনও উপোস দিতেছে।

ফুটবল আসিল। এবার আবার কাহার হাত পা মাথা নাকের উপর কি রকম দৃষ্টি কে জানে। পাঁজিতে ফুটবলের বর্ষফল দেয় না কেন? যেমন নিকল্‌স্ রাজা, গুপ্ত মন্ত্রী, ফল—অনাবৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বিবাদ, অরাজকতা··· জ্যোতির্বিদরা কি বলিতেছেন?—জিনিসটা তাঁহাদের গণনার বাহিরে? কিন্তু তাঁহারা কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে ওটা নগণ্য?

গণনার যে বাহিরে একথা আমিও স্বীকার করি, কেননা কোথায় যে যাইবে গড়াইতে গড়াইতে কিছুই ঠিকানা নাই—মাঠের ফুটবল, হোক, কিম্বা গুলির

টেনিস বলই হোক, কিংবা বৈঠকখানার আলোচনাই হোক—অর্থাৎ শরীরী ফুটবলই হোক, বা অশরীরী ফুটবলই হোক।

গজাননদেব কথাটাই ধরা যাক।

সমস্ত দিনই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তাহার উপর প্রায় সাড়ে চারটে হইতে যে রকম তোড়ে আরম্ভ হইল, কেহ আর বাহির হইতে পারিল না। অথচ আজ নিজেদের পাড়াব দলের খেলা,—হাসি-ঠাট্টার খেলা নয়, আই-এফ্-এর সেকেণ্ড রাউণ্ড! অনুপমদেব বৈঠকখানায় জুটিযাছে কয়েকজন। সবাই এখনও আসিতে পারে নাই, বৃষ্টি যে রকম জোর চলিযাছে এখনও, আজ যে পুরা আড্ডা জমিবে না এটা ঠিক। সবাই ম্যাচের ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিয়া আছে। যাহারা আসে নাই তাহাদের মধ্যে আছে গজানন। নটু বলিল, "গজা এলেই খবর পাওয়া যাবে, বৃষ্টি হোক বাজ পড়ুক, সে তো যাবেই দেখতে।"

ষষ্ঠীচরণ বলিল, "কিন্তু, আমার যেন মন বলছে, খেলা বন্ধ করে দেবে আজ—এ দুর্যোগে খেলা অসম্ভব ; মাঠে দাঁড়াতেই পারবে না, তা খেলা!"

আড্ডার নিয়মই হইতেছে প্রায় প্রত্যেকেরই অন্তত একজন করিয়া বিরুদ্ধবাদী থাকে ; ষষ্ঠীচরণ কথা কহিলে হৃষীকেশের গায়ে বিষ ছড়ায়। বলিল, "তোর মন বলছে তো?—তাহলে নির্ঘাত খেলা হয়েছে আজ। তোর মনকে জিগ্যেস কর্ দিকিন কারা হারলে,—তাহলে বুঝতে পারব তারা জিতেছে।"

ষষ্ঠীচরণ হেলান দিয়া ছিল, সোজা হইয়া বসিল। মুখটা একটু বিকৃত করিয়া হৃষীকেশের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "খেলিস তো ঘরের কোণে শালীদের সঙ্গে টেবিল টেনিস, বৃষ্টি হলে যে খেলা বন্ধ হয় তুই কি করে জানবি? হয় বন্ধ, আমার কাছে শুনে শেখ্—সেবারে মোহনবাগান-ডালহৌসির খেলা বন্ধ হল, তার আগের বারে এর চেয়েও কম বর্ষার জন্যে এরিয়ান্সদের অমন ম্যাচটা পোস্‌পোন্‌ড করে দিলে। কত শুনতে চাস?"

নটু বলিল, "দেবেই যে বন্ধ করে তার কোন মানে নেই। সেবারে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের ফাইনালটা করলে বন্ধ? আজকাল সে আগের মত কুড়ি-বাইশটি টীম নিয়ে খেলা নয় তো, হুট করে বন্ধ করে দিলেই হল…"

সমর্থন পাইয়া হৃষীকেশ শালী-শালাজ তুলিয়া বিদ্রূপের শোধ লইল। মুখ-বিকৃতি করা চেঁচামেচি করা তাহার প্রথা নয়। একটু বিরক্তিভাবে নটুর পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি জানেন না নটুবাবু, কেন বকছেন মিছিমিছি!—বলে

ষষ্ঠীর হুকুম না নিয়ে আই-এফ-এ এক পা নড়তে পারে না। সে যখন বলছে খেলা বন্ধ আজ, তখন বন্ধ…"

ষষ্ঠীচরণ আরও রাগিয়া উঠিল; বলিল, "আলবৎ বন্ধ। যদি মরদ হ'স তো ফ্যাল বাজি রিযে—দশ টাকা। অমন মেয়ে মানুষের মত চিপটেন কাটতে সবাই পারে।…নে, এই আমি বলছি, যদি আজ খেলা বন্ধ থাকে তো…"

এমন সময় নিতাই আসিয়া ছাতা মুড়িতে মুড়িতে ঘরে প্রবেশ করিল। হৃষীকেশ বলিল, "এই তো হাতে পাঁজি মঙ্গলবার,—নিতাই এসে গেছে,—কি রে নিতু, তোর মামা খেলতে গেছল, ফিরেছে?"

খেলোয়াড় মামার গর্বে নিতাইয়ের কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত। বলিল, "খেলা শেষ না করেই?"

অনুপম বলিল, ষষ্ঠী কি যেন বাজির কথা বলছিলি, থেমে গেলি কেন?—আজ বর্ষার দিনটা দিব্যি হত দশটা টাকা হলে…"

"হ্যাঁ, বাজি চলুক, বাজি চলুক—কথা পালটালে চলবে না…" বলিয়া একটা তুমুল সমর্থনের কলরব উঠিল।

নটু বলিল, "হ্যাঁ, তোমরা দুজনে একটা রফা করে ফেল; আমি ততক্ষণ একটা লিস্ট তোয়ের করে ফেলি—কি কি হবে। আর—রফাই বা কি—ষষ্ঠীকেই তো দিতে হয় টাকাটা…"

ষষ্ঠীচরণ বলিয়া উঠিল, "যা-যা-যাঃ, ঐ বুদ্ধি নিয়ে টাকা নিবি সব!—নিতের মামা বাড়ি ফেরে নি—কাজেই বুঝে নিতে হবে মাঠে খেলা হচ্ছে! বলিহারি লজিক মাইরি!…নিতের মামা যদি রাস্তায় মাতলামি করবার জন্যে সমস্ত রাত হাজতে কাটায় তো বুঝতে হবে সমস্ত রাত মাঠে খেলা হয়েছে,—বাঃ!"

নিতাই বলিল, "তুই মাতাল বললি কাকে রে?"

"তোর মামাকে। তুই তো নিজেই সেদিন বললি—'রিসেসে এক পেগ না টানলে মামার সেকেণ্ড টাইমে পা-ই ওঠে না'…"

নিতাই ডান হাতের ঘুষি বাগাইয়া বলিল, "এক পেগ মানে মাতাল?"

ষষ্ঠীচরণ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "বাড়ি আসে নি মানে মাঠে খেলা হচ্ছে?"

"আলবৎ হচ্ছে।"

"আলবৎ মাতাল।"

"তাহলে নে, এই মাতালের ভায়ের তাল সামলা…"

ঠিক নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষিটা ছুটিত,—সকলে উভয় পক্ষকে থামাইয়া দিল।

ঘবেব এই গুলতানের মাঝখানে গজানন আসিয়া প্রবেশ করিল। খাঁটি ফুটবল-বাজের পোশাক,—মাথায় ওয়াটাবপ্রুফ টুপি ও গাযে ওয়াটারপ্রুফ কোট, পাযে ববাবের জুতা। ভিতরে প্রবেশ কবিয়াই পকেট হইতে একটা চীনেবাদাম বাহিব কবিযা ভাঙিযা মুখে ফেলিযা কোটটা খুলিতে লাগিল। ঘরের কলরবটা উহাদেব দুজন হইতে সবিযা গজাননকে কেন্দ্র করিয়া জমিয়া উঠিল।—"এই যে গজা এসেছে…বললাম না?—আকাশ ভেঙে পডলেও গজু ম্যাচ দেখতে যাবেই যাবে…ফুটবল গজাব প্রাণ—বললাম না?…কি খবর রে গজা—কারা হারল… এই সুযোগ, তুই গেলি কি বলে?—হ্যাঁ বুঝতাম—গিযে পডেছিস, হঠাৎ বৃষ্টি আবম্ভ হল, তা নয়…খেলা না দেখলে গজাননবাবুব ভাত হজম হয় না… আচ্ছা ঝোঁক মাইরি!…

ষষ্ঠীচবণ গজাননেব অভ্যুদয়ে মোক্ষম হার খাইযা গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে। নিতাইও মামাব অপমানেব প্রতিশোধ লইতে না পারায মনে মনে আপশাইতেছে এবং মাঝে মাঝে ষষ্ঠীচরণের পানে আডচোখে চাহিতেছে। গজানন কোট টুপি ছাডিযা দুয়ারের কাছে একটা দেওয়াল আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়া বলিল, "চা হয়ে গেছে নাকি?—আগে এক কাপ চায়ের বন্দোবস্ত কর অনুপম। মনে কবলাম যাব না, কিন্তু না গিয়েও কেমন থাকতে পারি না। সেই এতটুকু থেকে অব্যেস।…ষষ্ঠী আর নিতে অমন করে বসে কেন রে?—যেন রাম-লক্ষ্মণ এইমাত্র বনবাসের খবর শুনেছিস…"

হৃষীকেশ বলিল, "ষষ্ঠী দশ টাকার বাজি রেখেছিল আজ খেলা হবে না…"

গজানন চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কতকটা উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করিল, "তার পর? জিতিছে নাকি?"

হৃষীকেশ বলিল, "না, জিতবে আর কোথা থেকে?—কবেই বা জেতে?… সেই জন্মেই তো ও রকম করে বসে আছে।…তার পর,—ওদিকে কারা জিতল? ‥আমাদের এরা খেললে কেমন বল্।"

গজানন চেয়ারে হেলান দিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ঠোঁটে আটকাইয়া দিল; দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল, "কারা জিতল বলে দিতে হবে"…খেলার কথা আর বলে কাজ নেই, হাঁটু পর্যন্ত জল মাঠে, এক গজ বল যায় না—তবে হ্যাঁ, তার মাঝেও ডাক্তার যা খেললে—মার্ভলাস!"

নিতাই চৌকির মাঝখান থেকে কোণের দিকে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আর মামা?"

গজানন মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "থার্ড ক্লাস। এবার যেদিন খেলা হবে তোর মামাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখিস নিতে, যেন বেরুতে না পারে।"

ষষ্ঠীচরণের গলা হইতে 'থুক্' করিয়া একটা শব্দ হইল, নিতাই একবার রোষকষায়িত লোচনে তাহার পানে চাহিয়া গজাননকে বলিল, "তুই খেলাব বুঝিস কি? বলে দিলি ধামাচাপা দে, আগে তোকে কে ধামাচাপা দেয় তাই দেখ্। ডুটো বুকনি শিখে..."

নটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আঃ, এই এক মামাব ভাগ্নে জুটেছে!.. ও বোঝে না তো ওকে জিগ্যেস করতে গিয়েছিলি কেন বাপু?...এদের আজকে সব এগারো জোড়া বুট পবে নামবাব কথা ছিল মহোমিডেন স্পোর্টিঙেব মত, নেমেছিল রে গজা?"

গজানন বলিল, "হাঁটু পর্যন্ত তো জলে ডোবা—কে বুট পবে কে খালি পায় বোঝবার জো আছে? ফুটবল হয়েছে না ওয়াটার পোলো?...তবে হ্যাঁ, খেলেছে জান্ দিয়ে। ডাক্তাবেব খেলা দেখে আমাব সেই খেলা মনে পড়ে যাচ্ছিল—কি ড্যাশ!—কি ড্রিবলিং—কি বল ডিস্ট্রিবিউশন্...ছুটল তো যেন কামান থেকে একটা গোলা ছুটেছে। ঠিক ওই জিনিস দেখেছিলাম ক্যালকাটাব হোসীর মধ্যে, বল যদি একবাব পেল..."

ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ ঘুরিয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই হোসীকে কবে দেখলি রে গজা? হোসী যখন খেলে তখন তোর দুধের দাঁত ভাঙে নি।"

চা আসিল। কাপে একটা চুমুক দিয়া গজানন মুখটা আরও বিকৃত করিয়া বলিল, "আর তুই বুঝি হোসীর গলা ধরে ইয়ার্কি মারতিস!...ক'টা ফুটবলারকে দেখেছিস রে ষষ্ঠে?—কাগজ পড়ে তোর যত দৌড..."

হৃষীকেশ বলিল, "ওর কথা বাদ দে না!...একে বাজে কথা ভিন্ন বলে না, তায় বাজি হেরে মাথার ঠিক নেই।...তুই টাকাটা নিয়ে আয় না ষষ্ঠে, এখানে বসে বাজে গজর গজর করছিস কেন?...আজ পাড়ার টীম জিতেছে, তোর টাকা দিয়েই একটা ফীস্ট হয়ে যাক।"

"যা-যাঃ, খাবি—গঙ্গার জলে মুখ ধুয়ে আয়; ফীস্ট খাওয়ার ঐ মুখ! তার চেয়ে হ্যাংলার মত যেমন হাঁ করে বসে আছিস সব বসে থাক, গজা তার মিথ্যে বড়াইগুলো ঠুসে ঠুসে দিক, পেট ভরিয়ে বাড়ি যা।"

গজানন সোজা হইয়া বলিল, "মিথ্যে বড়াই কে বলে রে?"

"আমি বলি।"

গজাননের রাগে খানিকটা বাক্‌স্ফূর্তিই হইল না। তাহাব পর কাঁপিতে কাঁপিতে ষষ্ঠীচরণের চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "কোন্‌টে মিথ্যে বলেছি, বল্‌ যদি মবদ কা বাচ্চা হ'স তো···হোসী খেলত না ক্যালকাটায ?"

ষষ্ঠীচবণ একটু তেরছা হইয়া বেঁকিয়া দাঁডাইয়া বলিল, "তুই মরদ কা বাচ্চা বললি কাকে বে ?"

"যে আমায মিথ্যেবাদী বলেছে তাকে।"

"আলবৎ মিথ্যেবাদী, ডাক্তাব ক্যালকাটাব হোসীব পায়ের নখের কাছে লাগে না। সে একটা ছিল ইণ্টার-ন্যাশনাল প্লেয়াব···"

"যে আমায় মিথ্যেবাদী বলে তাব গুষ্টিসুদ্ধ মিথ্যেবাদী। আজ যে ডাক্তারের ড্যাশ আর ড্রিবলিং না দেখেছে···"

"খববদাব গজা! গুষ্টি তোলালে বত্রিশ পাটি দাঁত ঝেড়ে দেব। দুটো কথা শিখে বেখেছিস,—কি বুঝিস বে তুই ড্যাশ আর ড্রিবলিঙেব ?···"

ব্যাপার অচিরেই ঘোরালো হইযা দাঁডাইল!

দুইজনেই ঘুষি বাগাইয়াছে,—দুই হাতেই। লডাইয়ে মুর্গিব মত ঘাড দুইটা ধনুকাকাব, ঠোট তীব্র ব্যঙ্গ এবং চক্ষে ততোধিক তীব্র ঘৃণা। বাকি সবাই ঠাণ্ডা কবিবার ভাষায় দুই জনকেই আগুন করিয়া তুলিবাব চেষ্টা করিতেছে।

"ছেড়ে দে গজা, দরকার নেই, তা ভিন্ন তুই পাববিও না ও গোঁয়ারের সঙ্গে··· থাম্‌; ষষ্ঠী, রাগের মাথায় তুলিয়ে ফেলেছে গুষ্টি, আর কি হবে ?···তুই মিথ্যে কথা বললে যে তোর গুষ্টিসুদ্ধ মিথ্যে বলে এসেছে তার প্রমাণ কি।···যাক, যা হয়ে গেছে,···নে চা-টা খেয়ে ফেল গজু, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে···মুঠো নামা ষষ্ঠী, রাগের মাথায় শেষকালে সত্যিই বসিযে দিবি দাঁতের ওপর···আবার এও মুশকিল···যদি মারব বলে ঘুষি বাগিয়ে না মাবে, বলবে গুষ্টিসুদ্ধ মিথ্যেবাদী···"

গজানন সোজা ষষ্ঠীচরণকেই উত্তর দিল, "লে-লে, দাঁত ঝেড়ে দেয় সব সম্বন্ধী, এই চেয়ে দেখ্‌ শ্রীচরণখানির বহর, এসা একখানি কিক্‌ ঝাডব! উঠে আয়···"

আর অগ্রসর হইতে হইল না—"তবে রে, সম্বন্ধী বললি যে বড ?···বলিয়া ষষ্ঠীচরণ তীব্র হুঙ্কারে গজাননের গায়ে ঝাঁপাইয়া পডিল। তাহার পর লুটোপুটি, ঠেলাঠেলি, ঘুষি, চাপড়, চুলের মুঠি—কখনও উল্টানো চেয়ারের পায়ার উপর, কখনও টেবিলের নীচে···ভাবা যা বাহির হইতেছে তাহার সামনে "গুষ্টি" "সম্বন্ধী" এ সব তো শিষ্টাচার!···নিতাই গোটা কতক ঘুষি দিল—ষষ্ঠীচরণ গজানন,

দুজনকেই—কেননা দুজনের উপরই চটিয়া ছিল; বাকি সবাই ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অসম্ভব,—যেন দুজনে জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ অনুপম বলিয়া উঠিল, "ওরে, গজার নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে মাইরি! খুন!"

সবাই লাগিয়া পড়িয়া দুইখানা চেয়ার আর ষষ্ঠীচরণের নীচে হইতে গজাননকে টানিয়া বাহির করিল। সোজা হইয়া বসিতেই তাহার নাক দিয়া আরও জোরে গলগল করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।…"জল আন্,·· টিংচার আইডিন, খানিকটা ন্যাকড়া·· গ্যাঁদাপাতার রস…"—একটা গোলমেলে শঙ্কিত রব উঠিল।

হাজার করিয়াও রক্ত বন্ধ হয় না। নানারকম আন্দাজ আর অভিমতে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল।—কেহ বলিল—মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কেহ বলিল নাকের এবং তাহার আশপাশের হাড় একখানিও আস্ত নাই। কেহ বলিল, "দেখ দিকিন দাঁতগুলো ঠিক আছে কিনা"…কেহ পরামর্শ দিল, "এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে দাও—একেবারে মেডিকেল কলেজে তোল।" কয়েকজন বলিল, "অতক্ষণ বাঁচবে না!"

সামনে দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। অনুপম দাঁড় করাইল। বলিল, "ওসব কাজের কথা নয়, আমাদের ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে নিয়ে চল।"

নটু বলিল, "ডাক্তার তো ওদিকে খেলতে গেছে। খেলার পরে টেণ্টে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ফেরে।"

অনুপম বলিল, "তা হোক, কম্পাউণ্ডার ধনেশ বাবু ফার্ষ্ট-এড্‌টা দিয়ে দিতে পারবে। তার পর না হয়…তোল গজাননকে…গজা ওঠ…ভয় নেই, কিছু হয় নি তো তোর—শুধু একটুখানি ছড়ে গেছে মাত্র।"

চোরা ঘুষি লাগাইবার জন্য নিতাইয়ের বোধ হয় মুমূর্ষুর প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল। সহানুভূতির স্বরে বলিল, "কিছু ভয় নেই, তুই ইষ্ট দেবতার নাম কর গজু, ভাল হয়ে যাবি।…কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল্ তো?…মাকে দেখবি?…"

এতক্ষণ সকলে গজাননকে ঘেরিয়া ছিল। তাহাকে তোলা হইলে কয়েকজনের দৃষ্টি ষষ্ঠীচরণের দিকে গেল। সে মুখটা যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া পায়ের গোছটা দুইহাতে টিপিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিতে—পাছে কেহ ওটা গজাননের কীর্তি বলিয়া মনে করে সেইজন্য—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "চেয়ার পড়ে একেবারে ··উফ্! বাপ রে!…"

অনুপম, নটু, হৃষীকেশ গজাননকে ট্যাক্সিতে তুলিতেছিল. নিতাই তাড়াতাড়ি

কপাটের কাছে গিয়া বলিল, "দাঁড়া, যেন চলে যাস নি তোরা, ষষ্ঠীকেও সঙ্গে নিতে হবে, তারও ঠ্যাঙের দফা নিকেশ।"

... .

ডিসপেনসারিতে পৌঁছিতেই ডাক্তার ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল।--"ব্যাপার কি? মোটর অ্যাকসিডেণ্ট নাকি?...নিয়ে এস শীগগির ওপরে...এঃ ...খুব সাবধানে...ষষ্ঠচরণের কোথায় লেগেছে?"

কপাউণ্ডার আর ডাক্তার—দুইজনকে লইয়া পড়িল। ব্যাণ্ডেজ করিতে করিতে ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "ফুটবলের তর্ক করতে করতে এই ব্যাপার? তোমরা সব কোন্ দিন মরবে এই করে।"

অনুপম একটু মুরুব্বিয়ানি টোনে বলিল, "আজই মরেছিল; ভাগ্যিস আপনি খেলেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন...নৈলে অন্তত গজানন তো..."

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিল, "খেলা!...খেলা তো বৃষ্টির জন্যে আজ বন্ধ; ফোনে জানিয়ে দিলে; আমি বেরুই নি তো..."

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। ষষ্ঠীচরণ একটা কি বলিতে গিয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। নটু বলিল, "তবে যে গজু তুই অত ফলাও করে গল্প করলি—নিজের চোখে খেলা দেখে এসেছিস?—বললি...ওকি ডাক্তার বাবু, দেখুন দেখুন!—গজুর কি দাঁতকপাটি লাগল নাকি?"

ডাক্তারের মুখে যেন একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল; বলিল, "লাগে নি, তবে লাগতে পারে, তোমরা ওকে একেবারেই বকিও না এখন...।"

আগামী প্রভাত

হার্ডিঞ্জ পার্ক। পাটনা।

সূর্যাস্ত হইতেছে। আজ খণ্ড খণ্ড মেঘ ছিল সমস্ত দিন, অস্তরশ্মি পড়িয়া রঙের বিচিত্র এক সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে। অন্য কখনও হয়তো এ দৃশ্য অন্যভাবে দেখিয়াছি, আজ মনে হইতেছে এ সূর্যাস্ত যেন একখানি যুগের অবসান। স্থবির শীতের অন্ত্যেষ্টি সূচনা করিয়া এ যেন ফাল্গুনের হোলি খেলা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, একটা রাত্রির অন্তরাল, তার পরই আসিবে

নব প্রভাত। সহ্য করিব এ রাত্রিকে আমি, হয়তো অনুভবই করিব না। আমার মন যে চলিয়াই গিয়াছে পূর্ব দিগন্তে, আগামী দিনের প্রভাতকে সম্বর্ধনা করিয়া লইতে।

কি আনিবে সে প্রভাত? কোন্ নবীন পুষ্পদলকে প্রাণ দিয়া জাগাইয়া তুলিবে?

... ...

সামনে পার্কের রেডিওটা বাজিতেছে। কি বিশ্রী!—যেমন কদর্য রিডিও, তেমনি কদর্যভাবে অবহেলাভরে রাখা—একটা কোথা হইতে ধার করা টুলের ওপর। তাও সহ্য হয়; কিন্তু সহ্য হয না ওব সঙ্গীত। একটা বাঁশি গেল—পূরবীতে; এখন একটা গলাবাজি চলিয়াছে গজলে—লয়লা-মজনু—ইশ্ক্! হে ভগবান, আর কতদিন অসহায়ভাবে এই পূরবীর কাঁদুনি আর প্রেমের ভ্যান ভ্যানানি শুনিতে হইবে? ঝুলি ঝাড়িয়া দেখ, নূতন কিছু শোনাও এ জাতটাকে।

রাস্তা দিয়া কয়েকখানা মিলিটারি লরি শহরের দিকে চলিয়া গেল; অত্যুগ্র বেগে। পিচের রাস্তার উপর তাহাদের মসৃণ গতি করাতের মত একটা একটানা শব্দের জের টানিয়া চলিয়া গেল,—মনে হইল, বাতাসে যে লয়লা-মজনুর প্রেম-সঙ্গীতটা জমিয়া উঠিতেছিল, সেটাকে যেন দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল; খুশি হইলাম—এই ছিল ওর প্রাপ্য সাজা।

বুঝিতেছি মনটা একটু অন্যায় রকম বেশি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে আজ এই সন্ধ্যায়। সভ্যতা অন্তরের দরদ দিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার উপর এতটা আক্রোশ শোভা পায় না। এ যেন কতকটা যাহারা সেন্ট পলের উপর বোমা ফেলিয়া যুগ-যুগের শিল্পসাধনার নিদর্শনটাকে নষ্ট করিতে চায় তাহাদের মনোবৃত্তি। স্বীকার করি, এক দিক দিয়া আমার আজিকার মনোভাবের সঙ্গে মিল আছে, তবুও মনে হইতেছে যাহারা এতদিন ধরিয়া শুধু পূরবী আর গজলই গাহিয়া আসিয়াছে তাহারা একটু সরিয়া দাঁড়াক—যাহারা নবযুগের নূতন সঙ্গীত গাহিবে তাহাদের আসরটা ছাড়িয়া দিক, অন্তত কিছুটা দিনের জন্য।

পিছনে একটা কিসের চেঁচামেচি হইতেছে। ফিরিয়া দেখি মদীয় বন্ধু শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের শিশু পুত্রটির সহিত তাহার চাকরের কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। কাছে ডাকিলাম। প্রশ্ন করিলাম, "ব্যাপার কি?"

চাকর বলিল, "বাবু, ও গাড়িতে থাকবে না, নেমে লাফালাফি করবে।"

একখানি পেরামবুলেটার—এক দিকে অরুণের ছেলে এক দিকে, একটি মেয়ে,

—সেদিন দেখিয়াছিলাম অরুণের বাড়িতে, ওর এক বন্ধু আসিয়াছে কলিকাতা থেকে, তাহারই কন্যা। মেয়েটি ছোট, কিন্তু ছেলেটির বয়স হইয়াছে, সে-বয়সে এক বাঙালীব ছেলেকেই পেবামবুলেটারে চড়িতে দেখিলাম। মনে মনে হাসিলাম —নকল যে! আসলকে একটু ছাড়াইয়া যাইবেই।

চাকরকে বলিলাম—"তা ছেড়ে দে না, বাগানের মধ্যে গাড়িতে চড়ে থাকবার দরকারই বা কি?"

"জামা নষ্ট করে বাবু, গায়ে ধুলো লাগায়, পাউডার নষ্ট হয়ে যায়। দুষ্টু আছে, রাস্তাযও ছুটে চলে যায়।"

বলিলাম—"তা যাক, নামিয়ে দে, আমি বাবুকে বলে দেব, বকবে না তোকে।"

খোকা নামিযা গালেব মধ্যে দুইটা আঙুল পুরিয়া দিয়া মুখটা গোঁজ করিয়া দাঁড়াইল—আমার পানে একটু আড়ে চাহিয়া।

কৌতুক বোধ হইতেছিল, প্রশ্ন করিলাম,—"কি?"

"খুকু যাবে।"

আদামেব ভাবটা তো বোঝা গেল, ঈভ কি বলেন জানিবার জন্য প্রশ্ন কবিলাম—"কি খুকু?"

"আমি যাব।"

বেশ, উভয়েরই তাহা হইলে নিরাপদ পেরামবুলেটারে বৈরাগ্য আসিয়াছে। যুগ-লক্ষণ ভাল। চাকরটাকে বলিলাম, "দে নামিয়ে ওকেও।"

এত বড় অভাবনীয় ব্যাপার খুকুর জীবনে বোধ হয় কখনও হয় নাই। নামিয়া মুক্তিদাতার মুখের পানে একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। খোকা ডাকিল— "এসো খুকু।"

হাত-পা-কে পূর্ণ মুক্তি দিয়া দুইজনে যেন প্রজাপতির মতই সামনের হরিৎ ক্ষেত্রটুকুতে ছড়াইয়া পড়িল।

... ...

হার্ডিঞ্জ পার্কের রেডিওতে হঠাৎ একটা মিলিটারি ব্যাণ্ডের মূর্ছনা উঠিল। অভাবনীয় ব্যাপার একটা, এর আগে কখনও শুনি নাই। আমার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল,—কাঁদুনি গাহিয়া গাহিয়া সেট্টা নারীত্ব পাইয়া গেছে, ওর গলায় আর ধ্রুপদের উদাত্ত মন্দ্র উঠিতেই পারে না।

অরুণের ছেলে হঠাৎ খেলার মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গিনীকে

ডাকিয়া বলিল—"খুকু, এদিকে এসো, সুন্দর বাজনা বাজছে।…এমনি করে দাঁড়াও, আর এমনি করে চলতে হয়।"

ঘাস ছাড়িয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া কাঁকরের রাস্তায় নামিয়া গেল, এবং বাজনার তালে তালে পা ফেলিবার প্রয়াসের সঙ্গে খস্ খস্ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

… … …

আমার হাসি পাইল—একেবারে মেয়ে পুরুষে উভয়ে মিলিয়া? মনের কোথায় উত্তর পাইলাম—'নবযুগের এই তো গতি; যে-কোন দিকে আজ চাহিয়া দেখ না।'

—কিন্তু আসিল কোথা হইতে এ খেয়াল, এ আদর্শ?

মনই উত্তর দিল—'নবযুগের হাওয়াতেই আছে বোধ হয়।'

… … …

নূতন হইয়া জন্ম লইবার জন্য সূর্যদেব আঁধারের গর্ভ আশ্রয় করিলেন।

মোহিনী রূপ

সুকুমার আসিয়া মলিনার সামনে দাঁড়াইল, মুখের উপর চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ এ অসময়ে ডেকে পাঠিয়েছ যে?"

অসময়—যেহেতু সন্ধ্যা, জায়গাটাও নিভৃত, একটা বকুল গাছের ঘনপল্লবিত-শাখা ছাতের এ-কোণটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সুকুমারের প্রশ্নটা ভুল হয় নাই।

মলিনা একটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু যেন হাসিয়াই বলিল—"আজ আমায় দেখতে আসছে, শুনেছ বোধ হয়?"

সুকুমারের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, উত্তর করিল—"না শুনলেও তোমার মুখ দেখে বোঝা শক্ত হত না।"

মলিনা এবারে স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বাঃ, আমার বিয়ের সূচনা হচ্ছে, হাসি আসবে না মুখে? যাদের বিয়ে নয় তারা মুখ চুন করে বেড়াক।"

বোধ হয় সুকুমারের মুখের ভাবটা কেমন হয় সেটা লক্ষ্য করিবার জন্যই অল্প

একটু বিরতি দিল, তাহার পর সত্যই বিপন্নভাবে বলিল—না, ঠাট্টার কথা নয় ; বড্ড একটা বিপদে পড়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

সুকুমার একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল—"বিয়ে হবে—এর মধ্যে বিপদটা কোথায় ? নিজের মুখেই তো এই বললে যে…"

"আছে। শুনছি তারা পাঁচজন মিলে আসছে…"

একটু ব্যঙ্গের স্বরেই উত্তর হইল—"তাতে বিপদটা কিসের ? পঞ্চপাণ্ডব তো নয় যে…"

মলিনা এবার রাগিল, বলিল—"ঠাট্টা রাখ, ঠাট্টা করবার জন্যে ডাকা হয় নি তোমায়।…আমি অত লোকের সামনে বেরুতে পারব না, কনের মত সেজেগুজে। তা ভিন্ন পাঁচজনে যখন পাঁচ দিক থেকে প্রশ্ন করতে থাকবে…"

সুকুমারও প্রগল্‌ভতার ভাবটা ছাড়িয়া বলিল—"শোন মলিনা, ঠাট্টা ছেড়ে দিলে আমায় একটা কথা সীরিয়াস্‌লিই জিগ্যেস করতে হয়,—তুমি রাজি হয়েছ—তাই না তোমায় দেখাবার এই ব্যবস্থা ? কাকা-খুড়িমা তো এ বিষয়ে তোমার মত না নিয়ে…"

মলিনার রাগটা রহিলই, তবে এবারে বোধ হয় কৃত্রিম ; বলিল,—"বাঃ, এ হিংসের কথা আমি বুঝি না ; পাঁচ জায়গা থেকে দেখতে আসবে না,—একটু হৈ-চৈ হবে না,—আমিও পাঁচরকম দেখব না, চুপি চুপি গিয়ে বিয়ের পিঁড়েতে বসব…"

আবার হাসিয়া ফেলিল।

সুকুমার বলিল—"বেশ তো, তুমি বাড়িতে জানিয়ে দিলেই তো পার যে বেশি লোক দেখতে আসে এটা তোমার পছন্দ নয় , আমায় আর এর মধ্যে কেন…"

মলিনা আবার রাগিল, বলিল—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে,—তার মানে কি এই হয় না যে শুধু পাত্র আর তার মাত্র একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে, যাতে দেখতে আর কথাবার্তা কইতে সুবিধে হয় আমার ?—কি বলে বললে তুমি কথাটা তাই ভেবে সারা হচ্ছি !"

সুকুমার কি ভাবিতেছিল, কিছু একটা উত্তর দিবার পূর্বেই মলিনা তাহার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল—"না, লক্ষীটি, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তোমায়। মোটে আর বোধ হয় আড়াইটি ঘণ্টা সময়, সাতটা বেজে গেছে, সাড়ে ন'টার সময় তাদের এসে পৌছুবার কথা। কতটুকুই বা দূর বিডন স্ট্রীট থেকে বল ?…তা ভিন্ন আমিই বা কতক্ষণ এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি ?…শীগগির বল কি ব্যবস্থা হতে পারে…"

বেশ একটু চুপচাপ গেল, একজন চিন্তা করিতেছে, একজন মুখের পানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মলিনা তাগাদা দিল—"করলে কিছু একটা ঠিক ?"

দৃষ্টিটা একটু অন্যমনস্কভাবেই তাহার পানে ফিরাইয়া সুকুমার বলিল—"একটা পৌরাণিক গল্পের কথা মনে পড়ে গেল, তাহলে কিন্তু একজন মেয়েছেলে থাকা দরকার।"

মলিনা চমকিয়া উঠিল—"মেয়েছেলে!"

"সুন্দরী এবং তরুণী। দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা সাজানো জিনিস পণ্ড করতে মেয়েছেলে ভিন্ন কারুর সাধ্যি আছে বলে আমার জানা নেই!"

মলিনা একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"ধন্যবাদ মেয়েদের সম্বন্ধে মশাইয়ের অভিমতের জন্যে ; কিন্তু মেয়েছেলে আমি কোথায় পাব ?"

"ওকথা আমি জিগ্যেস করতে পারি ; তুমি যখন নিজেই মেয়েছেলে তখন তোমার আর পাবার দরকার কি ?"

"কী বলছ তুমি ?...তোমার মাথার ঠিক আছে ?..."

"বরং আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে।"

মলিনা জ্বালাতন হইয়া অসংলগ্নভাবে বলিল—"কী গেরো!—একেবারে সময় নেই!—মেয়েছেলে—অমন মেয়েছেলে আমি পাই কোথায় এখন ?—আগে বললেও না হয় হোস্টেলে গিয়ে সুনুর সঙ্গে পরামর্শ করে...কি উদ্দেশ্য তাও তো বলছ না...না, তোমার তামাশা বোধ হচ্ছে...আর এর মধ্যে মেয়েছেলের কি দরকার হতে পারে মাথায় আসছে না আমার...কি করতে হবে তাকে শুনি ?"

"শুধু তাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

"আমি তাদের সঙ্গে আসব !! সত্যি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"বরাবর আসতে হবে না, মাঝখানে কোথাও নেমে অন্যপথে চলে আসবে।"

"পাগলের মতন কথা জেনেও জিগ্যেস করছি—ধর এলাম, কিন্তু আবার এসে তারা সেই-আমাকে এখানে দেখবে তো ?"

"অন্য বেশে। পথে থাকবে অতি-আধুনিকা, স্বাধীনতাপন্থী তরুণী, এখানে..."

মলিনা আর একবার রাগিল, এবারকার রাগের সঙ্গে এমন একটা অসহায়তার ভাব যে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়া বলিল—"তোমার ভাল লাগবে না জেনেও একটা কথা না বলে আমি পারলাম না, আমাদের এই শেষ দেখা বুঝে তুমি বাজে কথা বলে আটকে' রাখছ আমায় ; অথচ আমার মনের অবস্থা যে..."

গলা বেশ স্পষ্টই ধরিয়া আসিল, চোখ দুটোও ছল ছল করিয়া উঠিল। এবার

সুকুমার তাহার একটি হাত ধরিল, একটু দ্রবকণ্ঠেই বলিল—"আমি একটিও বাজে কথা বলছি না লিনা, অবশ্য আমার বুদ্ধিতে যেটুকু এসেছে সে হিসেবে বলছি—তুমিই যাও বা অপর কেউ যায়—সেকথা আলাদা। তাহলে তোমায় খুলে বলি—একবার আমি একটা ভাবি মজার ব্যাপার দেখেছিলাম লিনা, ট্রামে একটা মেয়ের উপকার করবার জন্যে কয়েকজন ছোকরার মধ্যে…"

একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এই সময় নীচের তলায় বাড়ির অন্যপ্রান্ত থেকে খুড়িমার গলার আওয়াজ শোনা গেল—মলু, তোর হল গা-ধোওয়া ?"

সুকুমার খুব তাড়াতাড়ি গল্পটা বলিয়া সমস্ত প্ল্যানটা বুঝাইয়া দিল, তাহার পর এদিককার সিঁড়ি দিয়া বাগানের পথে বাহির হইয়া গেল। নামিবার মুখে একবার ঘুরিয়া বলিল—"তোয়ের থাকবে, আমি ঠিক দশ মিনিট পরে আবার আসছি।"

মলিনা যখন ভিতরের সিঁড়ির মাঝামাঝি, তখনও তাহার মুখে একটা হাল্কা হাসি লাগিয়া, পাছে বিয়ের আনন্দ বলিয়া লোকে মনে করে—সেই জন্য তাড়াতাড়ি সেটা মিলাইয়া লইল।

২

রাস্তাটা অনেকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বিডন স্ট্রীটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পরও অনেকটা যাইতে হয়, তাহার পর চিৎপুর রোডের ট্রাম। এই রাস্তায় সাঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়ি হইতে চারিটি যুবক লঘু হাস্যপরিহাসের সঙ্গে বাহির হইয়া ফুটপাথে দাঁড়াইল। একজন পকেট থেকে একটি সিগারেট-কেস বাহির করিয়া ডালা খুলিয়া একে একে তিন জনের সামনে ধরিল; তাহারা তুলিয়া লইলে নিজের ঠোঁটে একটি চাপিয়া ধরিয়া সবগুলিতে কায়দামাফিক অগ্নিসংযোগ করিল। তাহার পর একটা টান দিয়া দরজার দিকে চাহিয়া হাঁক দিল—"কৈ হে রমেন, বেশ তো আসছিলে, আবার কি হল ?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবক বাহির হইয়া আসিল, হাসিয়া বলিল—"বাবাঃ, তোদের আর তর সয় না।"

একজন তাহার বাহুটা একটু খামচাইয়া চাপা গলায় বলিল—"বলি কত আর সাজতে হবে? কেল্লা তো ফতে হয়েই আছে।"

"সাজছিলাম, না হাতী,—ভয় হল ভুলে বুঝি বাক্সটা খোলাই রেখে এসেছি, তাই…"

"ভুলকে আর ভয় করলে চলবে? এই তো আরম্ভ, এবার থেকে তো পদে পদেই ভুলের পালা!"

পাঁচ জনেই একটু হাসিয়া উঠিল। রমেন বলিল—ইয়ারকি থাক্, ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে; নাও, এগোও!"

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা, ব্ল্যাক্‌আউট। ঘরের কড়া আলোকের ভিতর থেকে বাহির হইয়া কয়েক পা একটু বুঝিয়া চলিতে হইলে, সে ভাবটা কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি যেই একটু স্বচ্ছ হইয়াছে হঠাৎ একটি দৃশ্যে পাঁচ জনেই বিস্মিত হইয়া প্রায় দাঁড়াইয়া পড়িল।—

খানিক দূরে, গলির মোড়ে—ব্ল্যাকআউটের পরিমিত আলোকবৃত্তের প্রায় মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে যেন বিপন্নভাবে সামনে, পিছনে, এক একবার আবার দুই পাশের বাড়িগুলোর পানে চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। কম বয়স—আলোয় মনে হয় আঠারো, উনিশ—এই রকম। একেবারে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত,—পায়ে হিল-তোলা জুতা, পরনে নূতন ছাপ-পাড়ের একটা সাদা শাড়ি, বাঁ হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, ডান হাতে একটা মেয়েলি ছাতা, ঘাড়ের দুইদিক থেকে দুইটি সুপুষ্ট বেণী কোমরের নীচে নামিয়া গেছে।

পাঁচজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল, রমেন বলিল—"যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে না? রতু না হয় একবার জিগ্যেস করবে?"

যে যুবকটি সিগারেট বিলি করিয়াছিল, তাহারই নাম রতু—বোধ হয় রতিকান্তের সংক্ষিপ্তসার;—উত্তর করিল—"করা দরকার যেন মনে হচ্ছে।... তোমাদের পাড়ার মেয়ে নয়?"

আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে, রমেন চাপা গলায় বলিল—"সব চিনে রেখেছি?"

ততক্ষণে মেয়েটিও যেন ইহাদের দেখিয়াই সামনে একটু আগাইয়া আসিয়াছে—চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত; সে-ই প্রথমে কথা কহিল, বলিল—"একটু দয়া করে দাঁড়াবেন কি?"

সকলে দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, রতুই প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার বলুন তো? কোন রকম..."

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"এটা কোন্ জায়গা বলতে পারেন?"

বলিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, পাঁচজনেই একসঙ্গে উত্তর করিল,—কেহ

পাড়ার নাম বলিল, কেহ গলিটার নাম বলিল, অতুল নামে একটি রোগা গোছের যুবক পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, রমেন আর রতুর মাঝখান দিয়া একটু ঠেলিয়াই সামনে আসিয়া পাড়ার নাম, গলির নাম—দুইটাই বলিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার বাড়ি কি এদিকপানে নয় ? এত রাত্তিরে—এ অজানা জায়গায় !…"

রমেন একটু লাজুক নিরীহ প্রকৃতির ; দ্বিতীয় যুবক, যে ঠেলা খাইয়া পিছনে পড়িল, তাহার ডাক-নাম মোটা-বঙ্কু—বোধ হয় পাড়ায় আরও একটা রোগা বা মামুলি কাঠামোর বঙ্কিম আছে,—একে বুদ্ধি করিয়া বেশি কথা বলিতে পারিল না, তায় একটা ঠেলা খাইয়া আড়ালে পড়িল—আধ-অন্ধকারে বেশ একটু বিরক্তভাবেই অতুলের মাথার উপর একটা বক্র দৃষ্টি হানিল।

অতুলের কথার উত্তরে যুবতী যেন আরও ভীত হইয়া উঠিল, চারিদিকে একবার আতঙ্কের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"না, আমার বাড়ি শ্যামবাজার ; তাহলে তো আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছিলাম দেখছি…কি করি আমি ?…"

"কি হয়েছে ?…বিপদটা কি ?…আমাদের দ্বারা কি হতে পারে ?"—বলিয়া সকলে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব আরও ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। অতুল রোগা হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল—"আপনার কোন ভয় নেই ; আমরা রয়েছি।"

মোটা-বঙ্কু মুখের এবং ডান চোখের কোণ দুইটা কুঁচকাইয়া, অতুলের মাথার উপর দিয়া একবার রতুর পানে চাহিল, জিহ্বা এবং তালুর সাহায্যে 'চ্যুক্' করিয়া একটা মৃদু শব্দও করিল ; অতুল অবশ্য গ্রাহ্য করিল না।

সবচেয়ে পিছনে ছিল নিখিল, কলেজে রমেনের সহপাঠী। একটু কবিপ্রকৃতির, এদের মত আতঙ্কে অভিভূত না হইয়া নিভৃত হইতে স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া ছিল, বলিল—"উনি না-হয় আলোর নিচে দাঁড়িয়ে বলুন না ব্যাপারটা কি, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার কেমন নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।"

তাহার পানে একবার চাহিয়া লইয়া যুবতী বলিল—"সত্যি, উনি ঠিক বলেছেন, আমার এখানে দাঁড়িয়ে কেমন গা ছম-ছম করছে।"

"সেই ভাল…আলোতেই চলুন…হ্যাঁ, চলুন দয়া করে…" সমর্থনের একটা আগ্রহপূর্ণ গুঞ্জন উঠিল।

যুবতী দুই পা পিছাইয়া গিয়া আবার আলোর মাঝখানটিতে দাঁড়াইল। আলোটা অনুজ্জ্বল হইলেও সবাই একবার ভাল করিয়া দেখিল এবার। যুবতী বেশ সুন্দরী ; বয়স প্রথমে সতেরো-আঠারো মনে হইয়াছিল, এখন নিকট হইতে এবং স্পষ্টতর আলোকে মনে হইল আরও একটু বেশি হইবে, কুড়ি-একুশ হওয়া আশ্চর্য

নয়। বেশ সুগঠিত দেহ, আপাতত আতঙ্কে একটু নিষ্প্রভ বোধ হইলেও মুখটিতে বেশ একটি সপ্রতিভভাব আর শিক্ষার দীপ্তি আছে। সজ্জা একেবারে আধুনিক,—মুখে একটু রুজ-পাউডারেরও হালকা স্পর্শ আছে। সবার মুখের পানে একবার ভীত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল—"আমি তাহলে তো সত্যিই বড বিপদে পডেছিলাম দেখছি!—রিক্‌শা করে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিলাম…"

নিখিল কাতর উদ্বেগের সহিত একটু অনুযোগের স্বরেই বলিল—"একলা কেন আসছিলেন? রাত্তির বেলা, তায়—অজানা জায়গা!…"

চারজনেই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইল—কম-বেশ করিয়া সবার দৃষ্টিতেই বিরক্তি মাখানো। বঙ্কু ধৈর্য হারাইতেছিল, বলিল—"ওঁকে বলতেই দিন না।… হ্যাঁ, বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিলেন…"

যুবতীর চক্ষু সেইরূপভাবেই চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে ঘুরিয়া আসিতেছে; নিখিলের দিকে যেন একটু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতেই চাহিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল—"জানা পথ, আমি যে প্রায়ই আসি একলা; আমার কলেজ-ফ্রেণ্ডের বাড়ি। আজ হঠাৎ যেন মনে হল রিক্‌শাওয়ালাটা আমায় অন্য পথ দিয়ে নিয়ে আসছে। বার দুয়েক টুকলাম লোকটাকে—বললে ঠিক যাচ্ছে। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারছি না। ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা, আমার কেমন ভয় হল, শেষে এই পর্যন্ত এসে বললাম—তুই থামা, নইলে আমি এবার চেঁচাব, তখন নামিয়ে…"

নিখিল বেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, "উস!"—করিয়া শব্দ করিতে যাইবে, রতু তাহাকে সন্তর্পণে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত টানিয়া লইল, বলিল—"ঘাডে পডবেন নাকি?"

অতুল ঘুষি বাগাইয়া শুনিতেছিল, বলিল—"তাকে ফলো করা দরকার তো!"

মোটা-বঙ্কু একটু হাসিয়া বলিল—"তুমি করবে নাকি ফলো?"

অনেকক্ষণ হইতে ইশারা-টিপ্পনী চলিতেছে, এবার শরীর এবং শক্তি লইয়া যুবতীর সামনে স্পষ্ট-বিদ্রূপ, অতুল চটিয়া গেল, বলিল—"না, উনি ষণ্ডা-গুণ্ডার কথা বলছেন, তার পেছনে ষণ্ডা-গুণ্ডা গোছেরই একজনকে পাঠানো দরকার।"

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুবতীর দৃষ্টি একবার মোট-বঙ্কুর উপর গিয়া পডিল, বঙ্কুর কান দুইটা হঠাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার অতুলের পানে আডে চাহিল, কিন্তু কিছু বলিবার বা করিবার পূর্বেই যুবতী মিনতির স্বরে অতুলকে বলিল—"না, তাকে ধরবার চেষ্টা করে আর চেঁচামেচি করবেন না; একটা গোলমাল হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়, পুলিস-কেস হলে আরও খারাপ।…

আপানারা যাবেন কোন্ দিকে? অন্তত ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত যদি আমায় পৌঁছে দেন…”

রতু বলিল—“আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন…”

ওর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিখিল সেটাকে সম্পূর্ণ করিল—“আমরা কোথায় যাই সে তো পরের কথা, আগে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে…”

যুবতী অতুলকেই বলিতেছিল, উত্তরটা অতুলেরই দিবার কথা; ইহারা ওপর-পড়া হইয়া দিয়া ফেলায় নিখিলের পানে চাহিয়া বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলিল—“ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত পৌঁছেই সটকান দেবেন? বাঃ দিব্যি!…”

নিখিল একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করিল—“তাই বললাম?”

মোটা-বন্ধুও সুযোগটা ছাড়িল না, অতুলের পানে ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—“তাই বললেন উনি?—পারেন কখনও বলতে?—এই বুদ্ধি নিয়ে…”

রতু বলিল—“থাম তোমরা, উনি বিপদে পড়েছেন, আর এই সময় বুদ্ধি নিয়ে…”

যুবতীকে প্রশ্ন করিল—“হ্যাঁ আপনি কোথায় যাবেন তাই বলুন, ট্রাম-স্টপ কেন, আগে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের নিজেদের গন্তব্যের কথা ভাবব।”

রমেন একটু গলাখাঁকারি দিল, মেয়ে দেখায় দেরি হইয়া যাওয়ার কথা বলিবে বুঝিয়া—রতু তাহাকে বাঁ-হাতে একটু টিপিয়া মানা করিয়া দিল। যুবতী বলিল—“আমি যাব তিয়াত্তর নম্বর হরু বোসের গলিতে, গ্রে-স্ট্রীটের ট্রাম থেকে নেমে…”

“হরু বোসের গলি!!—সকলে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রতু বলিল—“হরু বোসের গলি? বাঃ, আমরাও তো ঐ দিকেই যাচ্ছি…আমাদের নম্বরটা কত হে রমেন?”

রমেন, নিখিল এবং অতুল একসঙ্গে উত্তর করিল—“তেরো।”

“বাঃ, তবে তো কোন কথাই নেই; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে…”

বন্ধু প্রশ্ন করিল—“আগে তিয়াত্তরটা পড়বে কি আগে তেরোটা?—যদি তিয়াত্তরটা পড়ে তো…”

অতুল বুদ্ধির সম্বন্ধে খোঁচা খাইয়া—মুখাইয়া ছিল, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই বলিয়া উঠিল—“না, তিয়াত্তর তো চিরকালই তেরোর আগে, ধারাপাতে মুখস্থ করেন নি?…”

বন্ধু উত্তর দিবার আগেই যুবতী বলিল—"না, উনি মীন্ করছেন, এটা যদি গলির উল্টো দিক হয় তো বেশি নম্বরগুলোই আগে পড়বে কিনা। আর ব্যাপারও তাই, এই দিকটাই শেষ দিক গলির।"

অতুল কথাটা বলিয়াই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"তাহলে চল রতু, আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছে গুলতান করা কেন?"

যুবতীকে মাঝে রাখিয়া এবং একেবারেই পাশে থাকিবার জন্য একরকম ঠেলাঠেলি করিতে করিতেই সকলে অগ্রসর হইল।

৩

বন্ধু বলিল—"একটা রিকশা ধরে নিয়ে আসব না হয়?"

সে আর জিগ্যেস করতে আছে?…দু'মিনিট—এক্ষুনি নিয়ে আসছি এই মোড় থেকে"—বলিয়া নিখিল তাড়াতাড়ি পা বাড়াইতেই যুবতী ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"না, না, এটুকু যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না, অব্যেস আছে হাঁটা…"

এক রমেনের মাথায়ই উপকারের নেশা ঢোকে নাই, বরং সমস্ত ব্যাপাবটি সে একটা দৈব উপদ্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—"তা ভিন্ন ওঁর দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে? রিক্‌শা আনতে-করতে…"

রতুর দিকে চাহিয়া আরম্ভ করিল—"ওদিকে আমাদেরও…"

রতু চোখের ইশারা করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল।

নিখিল বলিল—"ওঁকে কিন্তু ভাল করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাওয়া দরকার, কে জানে কার কি রকম অভিসন্ধি আছে। আশেপাশে কেউ ওৎ পেতে আছে কিনা…"

আগলানোর মধ্যে কোন খুঁত ছিলই না, তাহার উপর আরও ভাল করিয়া আগলাইবার জন্য যে একটু ঠেলাঠেলি হইল তাহাতে খানিকটা ভারসাম্য হারাইয়া অতুল যুবতীর প্রায় ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছিল, মোটা-বন্ধু বেশ কড়া হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পিছনে টানিয়া লইল, ছাড়ার সময় ইচ্ছাকৃতই হোক বা যাই হোক, একটা ঝাঁকানি লাগিল অতুলের। ওরা তিনজনে একটু আগাইয়া পড়িল।

অতুল রুখিয়া দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল—"এর মানে?"

বন্ধু বলিল—"ঘাড়ে পড়বে নাকি ভদ্রমহিলার ?"

টেব না পাইয়া উহারা আরও একটু আগাইয়া গেছে। অতুল সেইরূপ উগ্রভাবেই বলিল—"আলবৎ পড়ব, তোমার কি ?—হোয়াট ইজ ছাট টু ইউ ?"

এত রোগা লোকের মুখে এতটা বেপরোয়া উত্তর বন্ধু আশা করে নাই, একটু থতমত খাইয়াই মুখের পানে চাহিয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, রমেন ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"ওকি, তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে, দেরি হয়ে যায় যে !"

যুবতী, নিখিল এবং রতুও ফিরিয়া তাকাইল, যুবতী দাঁড়াইয়া পড়িয়া ভীতভাবে বলিল—"কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে ?"

অতুল বন্ধুব পানে একটা কটাক্ষ হানিয়া সহজ কণ্ঠে বলিল—"না, বন্ধুর চোখে একটা কি পোকা পড়ল, তাই…"

বন্ধু দাঁতে দাঁত পিষিয়া চাপা গলায় বলিল—"যে বলে তার চোখেই পোকা পড়ুক।"

তাড়াতাড়ি আসিয়া যখন নিজের নিজের জায়গা লইল চাপা আক্রোশে তখন দুই জনেরই ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

গলি বহিয়া সকলে বিডন স্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। রমেনের মনটা অন্য দিকে, বাকি সবাইএর মধ্যে একটু উপকার করিবার জন্য, একটু কথা কহিবার জন্য, একটা কথার একটু উত্তর দিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে। বিদ্রূপগুলা ক্রমেই বেশ স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়া উঠিতেছে, চাহনি আরও উৎকট। বিশেষ করিয়া নিখিল, অতুল আব মোটা-বন্ধুর মধ্যে। রতু অনেকটা সংযত, একটু কাণ্ডজ্ঞানও আছে ; যখন খুব বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িবার মত হইতেছে, দু'একটি কথা বলিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে।…কেমন হাসিতে হাসিতে সবাই একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল, এখন কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধটা ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। যুবতী একবার এর সঙ্গে একটু কথা কহিয়া, কি ওর দিকে একটু মিষ্ট, লজ্জিত দৃষ্টিপাত করিয়া, কি তাকে একটু সমর্থন করিয়া বিষটাকে যেন মাঝে মাঝে আরও তীব্র করিয়া তুলিতেছে।

শুধু উপকার আর কথা কওয়া লইয়াই নয় ; যাহার যাহা লইয়া পরিচয় সে সেইটাকেই বড় করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াতেও গোলমাল, কথাকাটাকাটির সৃষ্টি হইতেছে।…নিখিল কলেজের কথা তুলিবার চেষ্টা করিল কয়েকবার, কলেজ ম্যাগাজিনে একটা পদ্য দিবার জন্য এডিটার অস্থির করিয়া তুলিতেছে—সে কথাটাও। মোটা-বন্ধু কলেজ বা কবিতার ধার ধারে না বিশেষ, রমেনের

বাল্যবন্ধু, পাড়ার থিয়েটার, জিমনেসিয়ামের পাণ্ডা, সেই হিসাবে চলিয়াছে, কবিতার কথায় বলিল—"ওসব র‍্যাবিশ কবিতা-টবিতা এখন ধামাচাপা দিন মশাই, এখন দেশ চায় সোলজার—নার্ভ্—সিনিউজ্—মাস্‌ল্…"

নিজের দক্ষিণ হাতটা মুঠা করিয়া বাঁকাইয়া ধরিল।

কথাবার্তায় যুবতীর একটু পরিচয়ও পাওয়া গেছে, প্রশ্ন করিল—"মিস্ সেন কি বলেন?"

মিস্ সেন একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিল—"আমি যে অবস্থায় পড়েছি তাতে আমায় জিগ্যেস করাই বাহুল্য নয় কি?"

বিশেষ এমন হাসির কথা না হইলেও সবাই হাসিয়া উঠিল,—অবশ্য নিখিল ছাড়া।

অভ্যাসবশেই ডান হাতটা একটু শক্ত করিয়া বাঁকাইয়া বঙ্কু বলিল,—"একদিন আসুন না আমাদের জিমনেসিয়ামে আমাদের কাপ, মেডেল সব আপনাকে দেখাই। সেদিন ডক্টর মুখার্জি এসেছিলেন, সব দেখেশুনে…"

অতুল হিংসায় একেবারে জ্বলিয়া খিঁচাইয়া বলিল—"আরে রেখে দাও তোমার জিমনেসিয়াম,—গুণ্ডামির আড্ডা একটা, সেবারে হাতীবাগানের অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে আমার ও জিনিসটার ওপরই বিতেষ্টা ধরে গেছে…"

বঙ্কু দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুটো বড় করিয়া গলাটা বাড়াইয়া বলিল—"তোমার বিতেষ্টা ধরে গেছে!—এতবড় একজন এ্যাথলেট মিস্টার পাম লীফ সিপয়?—আমি কালই গিয়ে তুলে দোব জিমনেসিয়ামটা…"

অতুল আর বঙ্কুকে কিছু বলিল না, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রমেনের পানে চাহিয়া বলিল—"রমেন, আমি এখান থেকেই ফিরলাম ভাই, দুঃখ ক'রো না, এমন একজন অভদ্র যে কম্পানিতে…"

বঙ্কু বাঁকিয়া দাঁড়াইল, গর্জন করিয়াই বলিল—"অভদ্র!!"

রতু দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া এ-ঝোঁকটাও সামলাইয়া লইল। ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা জানিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"মিস সেন কতটা দুঃখিত হচ্ছেন ভাব দিকিন!"

৪

দুঃখিতই হইয়াছে মিস সেন, একটু নিরাশও; একটা সুযোগ নষ্ট হইলে কে না হয়? তবে সে-ভাবটা চাপিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"না, না, এতে আর দুঃখের কি আছে। নিজের নিজের ব্যক্তিগত অভিমত…"

বঙ্কু আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, শরীরটাকে শক্ত করিয়া লইয়া বলিল "ব্যক্তিগত অভিমত! অভদ্র বললে সমস্ত কম্পানিটাকেই অভদ্র বলা হল না? অথচ আপনি একজন ভদ্রমহিলা সেই কম্পানিতে…"

অতুল আবার রুখিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "খবরদার ওঁকে এর মধ্যে টানবে না বঙ্কু, লেডিদের আমি কতটা সম্ভ্রম করি তুমি জান না…"

রতু আবার অগ্রসর হইয়া আসিল, দুইজনকে দুইদিকে সরাইয়া দিয়া বলিল —"আঃ, থাম না ভাই; বেশ তো, সম্ভ্রম কর তো অমন করে আস্তিন গুটোচ্ছ কেন?"

রমেনের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, বিরক্ত এবং অধীরভাবে নাকটা কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—"তার চেয়ে আমি বলি, অতুল যেমন যেতে চাইছিল ওকে যেতেই দাও না…"

অতুলের ভাব একেবারে বদলাইয়া গেল,—অভিমানে মুখটা গম্ভীর করিয়া রমেনের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল—"তুমি এই কথা বললে রমেন—? তুমি—ইউ?"

রমেন থতমত খাইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, না, তুমি নিজে বললে, তাই…"

"বললে তো এই কথা?—নিজে ইনভাইট্ করে?"

"না, না; মানে, এদিকে এঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে…"

"মনে রেখো, আমার আর দোষ রইল না,—নিজেই ডেকে নিজেই তাড়ালে…"

"না, না, আমায় ভুল বুঝ না অতুল, এঁরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও একজন মেয়েছেলে কন্‌সারও—তাই…"

"মাইণ্ড্, তোমার কাজেই যাচ্ছিলাম…গুড্ বাই…"

মনে হইল যেন গলাটাও একটু ধরিয়া গেছে। ঘুরিয়া মাথার উপর হাতটা তুলিয়া আবার দুইবার "গুড্ বাই, গুড্ বাই" বলিয়া উল্টা দিকে পা বাড়াইতেই রতু ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"কি ছেলেমানষি হচ্ছে অতুল—মিস সেনের সামনে?…"

যেমন হয়, অভিমানটা বাড়িয়াই গেল। "তবে তুমি অতুল মিত্তিরকে চেন না ভাই।"…বলিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়াই হাতটা ছাড়াইয়া অতুল অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

সকলে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তার পর রতু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—“আমাদের মার্জনা করবেন, মিস্ সেন!”

এবারেও মিস্ সেন একটু মিষ্ট হাসিয়াই বলিল,—“সে কি! এতে মার্জনার কি আছে? নিজের নিজের অভিরুচি…”

দলটা আবার অগ্রসর হইল।

গলি অপেক্ষা সদর রাস্তায় লোক-চলাচল বেশি, অন্ধকার তো আছেই; এদিকে চারজনেরই এমন করিয়া আগলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা যাহাতে মিস্ সেনের গায়ে অন্য কাহারও গাটি না লাগে। ব্ল্যাকআউটের রাস্তায় লোকে একটু ব্যস্ত বিব্রত হইয়াই চলে, কয়েকজনের সঙ্গে ছোটখাট একটু সংঘর্ষও হইয়া গেল। বেশি নয়, কথা-কাটাকাটি পর্যন্তই, কেননা মোটা-বঙ্কু সবক্ষেত্রেই আগাইয়া দাঁড়াইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটা বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তবু বিলম্ব হইতে লাগিল।

হয়ত নিখিলই শুরু করিল—“চোখ নেই মশাই? দেখছেন একজন মেয়েছেলে যাচ্ছেন…”

“যান না উনি, আমি তো তফাতে আছি।”

“যান না উনি মানে? আমি এগিয়ে না এলে আপনি তো ঘাড়ে পড়ছিলেন ওঁর।”

“ঘাড়ে পডব—পাগল না খ্যাপা?”

“উলটে আমাকেই পাগল না খ্যাঁপা বলছেন?…”

“কি অন্যায়টা বলেছি? নাহক যেমন গায়ে পড়ে ঝগডার যোগাড়…”

নিজের দর বাড়াইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মোটা-বঙ্কু অন্ধকারে একটু আড়ালে থাকে, এই রকম মোক্ষম সময়টিতে আসিয়া সামনে দাঁড়ায়। নিজের শরীরটাকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বলিল—“কি ঝগড়ার যোগাডের কথা হচ্ছে যেন? আমি একটু শুনতে পাই?”

লোকটা আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। বলিল, “না, বলছিলাম—সন্দে রাতে যদি এতটা বেহুঁশ হই যে একজন ভদ্রমহিলার ঘাড়ে পড়ি তো পাগল ভিন্ন কি বলবে লোকে আমায়?…এই কথাই বলছিলাম ওঁকে।”

একটু হাসিবার চেষ্টাও করায় আর গোলমাল বাড়িল না।

কিন্তু অন্যদিকে গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। নিখিল ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। একবার সামান্য উপলক্ষেই ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল

উত্তাপটা। নিখিল বলিল—"আঃ, এবার আপনিই যে ঘাড়ে এসে পড়বেন মশাই!"

বন্ধু প্রশ্ন করিল, "কার?"

"আমার, আবার কার?"

"সরে দাঁড়ান আপনি, একটু গায়ে গা ঠেকলেই যদি মনে করেন ঘাড়ে পড়ছি তো..."

"সরে দাঁড়ান মানে? সবাইকে কি অতুলবাবু পেয়েছেন নাকি? আমার ঘাড়ে একটা কর্তব্যের বোঝা আছে, যতক্ষণ না সে বোঝা নামছে ততক্ষণ নিখিল গাঙ্গুলী নিজের পোস্ট ছাড়বে না জানবেন। এই তার প্রিনসিপল্—এর জন্যে সে আত্মবলি দিতেও প্রস্তুত, আমি অতুলবাবুর মতন..."

বন্ধু ঠোট কুঁচকাইয়া শ্লেষের দৃষ্টিতে শুনিতেছিল, বলিল, "শুধু ফাঁকা ভাষার জোরে যদি এ-সব ডিউটি সারা যেত..."

নিখিল দাঁড়াইয়া পড়িল, অল্পপরিসর বুকটা চিতাইয়া বলিল—"অন্য রকম শক্তিরও অভাব নেই, যদি মনে করেন গুণ্ডাদের মতন আখড়ার মাটি মাখলেই..."

বন্ধু একেবারে ঘুষি বাগাইয়া দাঁড়াইল, হুঙ্কার করিয়াই বলিল—"আর একবার বলুন তো ও-কথাটা..."

রতু, রমেন দুইজনেই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকের চলাচল বেশি, বেশ কয়েকজন ঘিরিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসাবাদ, মন্তব্য, সালিশি—বেশ খানিকটা গোলমালের পর যখন সবাই সরিয়া গেল, দেখা গেল অতুল আবার কখন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল—"আমায় ডাকছিলে তোমরা কেউ?"

সকলেই অন্ধকারে যেন ভূত দেখিয়াছে এইভাবে একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রমেন, রতু, নিখিল একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"তুমি! চলে গিয়েছিলে যে, আবার.."

অতুল একটু অপ্রতিভভাবে বলিল—"না, ইয়ে—যাচ্ছিলাম—যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হল কে যেন দুবার 'অতুল, অতুল' বলে ডাকলে—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবলাম, তার পর কোন বিপদ হয়েছে মনে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি..."

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসার মত হাঁপাইতেছে না মনে পড়িয়া যাওয়ায় তখনই সেটা আরম্ভ করিয়া দিল। মিস্ সেন একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—মনে হইল যেন "খুক্-খুক্" করিয়া দুইবার চাপা হাসির শব্দ হইল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জোর

কাসির শব্দ আরম্ভ হওয়ায় কাহারও সে সন্দেহটা আর বাড়িবার অবসর রহিল না।

কিন্তু গোলমালটা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। একে নিখিলই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পর অতুল গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল—চাপা রাগে মোটা-বঙ্কু ফোঁস ফোঁস করিতেছিল, মনের ভাবটা আর চাপিতে পারিল না, বলিল—"বঙ্কার একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে বদনাম আছেই—পেটের কথা চেপে রাখতে পারে না,—তুমি যদি সত্যিই চলে যেতে অতুল তো এতক্ষণ বোধ হয় মাইল খানেক তফাতে—নিখিলবাবু বার দুয়েক তোমায় নাম করেছেন কি না করেছেন অতদূরে তার আওয়াজটা…"

অতুল গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল—"যাই নি তো আমি চলে—গোঁয়ার-গোবিন্দের হাতে ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে…

মাথায় যে আগুনটা ধোঁয়াইতেছিল, একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—বঙ্কু হুঙ্কার করিয়া উঠিল—"জিব টেনে বের করে নোব!"

একেবারে মাথার উপর ঘুষি তুলিয়া ধরিল। এবারে আর রতু, রমেন আসিয়া পড়িতে পারিল না; তাহার আগেই "কি করছেন, কি করছেন, ছিঃ!" —বলিয়া বারণ করিবার অছিলাতেই নিখিল মাঝখানে পড়িয়া বঙ্কুর বুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে প্রায় পড়-পড় হইয়াই নেহাৎ জিমন্যাস্‌টিকের জোরে কোনমতে সামলাইয়া লইল। তাহার পরই সামনে একটা লম্ফ দিয়া দুইজনকে এক সাপটে তাহার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের মধ্যে মরণ-বাঁধনে জড়াইয়া ধরিল।

হাত পা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের ভয়টা লাগিয়া থাকে বলিয়া কলিকাতার রাস্তায় মারামারি স্থায়ী হয় না। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই যে যার কাজ ভালভাবেই সারিয়া লয়।…ওইটুকুর মধ্যেই জায়গাটায় ভিড় জমিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারও হইয়া গেল। রহিল মাত্র দুইজন, তাহার মধ্যে একজন রমেন। তাহার সঙ্গী বসিয়া পড়িয়া দু'হাতে মুখটা চাপিয়া গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল, রমেন বলিল…"ওঠ, পুলিস এসে পড়বে এক্ষুনি—ওদিকেও দেরি হয়ে গেল। তুই কে? অতুল, না, নিখিল? সে ছুঁড়িটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না; কোথা থেকে কালসাপিনী এসে জুটল এক, যেন ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে গেল।"

… … …

পরদিন সন্ধ্যার পর সেই বকুল-শাখার আড়ালে আবার দুইজনের সাক্ষাৎ

হইল। মলিনার হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়া সুকুমার বলিল, "এই নাও তোমার শাড়ি, ব্লাউস আর ভ্যানিটি ব্যাগ ; আর এই ছাতা…ক'জন এসেছিল দেখতে ?"

মলিনা চাপা গলায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "এবার যেদিন থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করবে তোমায় মেডেল দোব আমি।…এসেছিল দু'জন ; আহা, সে যদি অবস্থা দেখতে! একজন লজ্জায় তো মুখ তুলতেই পারলে না ; অতদূর থেকে এসে দুটি প্রশ্ন 'কি নাম, আর কি পড' ; যেন কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে ; আর একজন বাঁ হাতে গালটা চেপে মাঝে মাঝে শুধু গ্যাঙিয়েই কাটিয়ে দিলে। হঁ্যাগা, মার খাওয়ালে কি করে ? আহা…"

হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিল।

সুকুমার বলিল—"ঐতেই হেসে সারা হচ্ছ, সব ইতিহাসটা শুনলে তো পাড়ার লোক জড় করে ফেলবে।"

মলিনা জিদ ধরিয়া বসিল—"না, শুনতে হবেই আমায়।"

একটু কি ভাবিয়া বলিল—"এক কাজ কর ; খুড়িমা-টুড়িমা সবার সামনেই কর গল্পটা, তুমিই যে মেয়ে সেজেছিলে আর আমায় দেখার কথা বাদ দিয়ে…হঁ্যা, তাই কর…"

"পাগল হয়েছ ? এত তাড়াতাড়ি করা চলে এ গল্প ? একজন আবার এসে গ্যাঙাচ্ছিল বলছ…তবে বলব'খন একদিন—শীগগিরই…শুধু খুড়িমা থাকবেন না…"

"কবে ?"

সুকুমার স্মিত-দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল মলিনার পানে, বলিল—"বিয়ে হয়ে গেলে একদিন।"

মলিনা একটু চটুল হাসিতে ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল—"তবে তো খুবই শীগগির!—বসে থাক সে আশায়—অন্তত দশটা জায়গা থেকে দেখে না গেলে আমি রাজিই হব না, দেখো ; খান দশেক নমুনা আমি দেখব এখনও… মিলিয়ে নিয়ো…"

হাসি চাপিবার জন্য আবার আঁচল মুখে গুঁজিয়া দিল।

নীচে বাড়ির ও-কোণ হইতে খুড়িমার গলা শোনা গেল—"মলু, সাবান, তোয়ালে এখানে ফেলে রেখেই গা ধুতে চলে গেলি ? কি ভুলো মন বাপু মেয়ের!…"

নিকটেই ছিল

ই. বি. রেলের নর্দার্ন সেকশনে যাঁহাদের গতায়াত আছে, তাঁহারা গাড়ির দেওয়ালে আঁটা একটি এনামেল প্লেটের উপর নিম্নলিখিত সতর্কবাণীটি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—

"নিজে টিকেট কেন,—মালের উপর নজর রাখ ; জুয়াচোর, চোর ও পকেট-মার নিকটেই আছে।"

এই সতর্কবাণী সম্বন্ধে সতর্ক করাই এই কাহিনীর উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে বাণীটি বেদের মন্ত্রের মত অপৌরুষেয় নয় ; সুতরাং এর ভাষার চটকে ঘাবড়াইয়া না গিয়া মন্তব্যগুলি একটু ঢিলা-ঢালা ভাবে লইলে ক্ষতি নাই।—না লইলে ক্ষতি আছে কিনা সেই কথাই হইতেছে—

গাড়িখানি পশ্চিমে চলিয়াছে, বাঙালী আর পশ্চিমা মিলিয়া বেশ ভিড। রাত্রিকাল, কার্তিক মাসের শেষাশেষি, অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। যে কামরাটার কথা হইতেছে তাহাতে পশ্চিমাদের সংখ্যাই বেশি। বাড়িমুখো যাত্রা, তাহারা সব ফূর্তিতেই চলিয়াছে, ভজন গাহিতে গাহিতে পরস্পরের পরিচয় লইতে লইতে, স্বদেশের গুণকীর্তন এবং বাংলা মুলুকের মুণ্ডপাত করিতে করিতে।

একধারে ঘেঁষিয়া কিছু বাঙালী যাত্রী। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ বোঝা যায়, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের ভাবটা বডই অপ্রসন্ন আর বডই সন্ত্রস্ত—যেন প্রতি মুহূর্তেই সবাই একটা মারাত্মক রকম বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। সন্ত্রস্ত বটে ; কিন্তু ত্রাসের ভাবটা মুখচোখে ফুটিয়াছে মাত্র, তাহা ব্যতীত সবাই স্থির, অসহায়ভাবে স্থির। জুতার মধ্যে সযত্নে পা দুটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কোলের মধ্যে পুঁটুলি সামলাইয়া জডসড় হইয়া বসিয়া আছে। যা একটু নড়াচডা করিতেছে তা গায়ের কাপড়টা একটু গুছাইয়া লওয়া বা নিজের নিজের পকেট কিংবা ট্যাকটা দেখিয়া লওয়ার জন্য। উপরের বাঙ্কে যাহার ট্রাঙ্ক কি বড কোন বোঝা আছে, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া একবার হাত বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া আবার সামলাইয়া-সুমলাইয়া বসিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও কথা নাই।

বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই লেখাপড়া-জানা এবং এনামেল-ফলকের সতর্ক-বাণীটি পাঠ করিয়াছে—"জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।"

রংপুরে এই কামরায় দুই প্রান্তের দরজা দিয়া দুইজন যাত্রী উঠিল। যেদিকে বাঙালীরা ছিল, সেই দিকে উঠিল একজন পশ্চিমা কুলি, হলদে কাপড় পরা, গোলাপী গেঞ্জির উপর হাঁটু পর্যন্ত কালো মলমলের পাঞ্জাবী, পায়ে ফুলকাটা নূতন

পাম্প্‌শু—এখনও আয়ত্ত হয় নাই—গোড়ালির পেছনে সাদা কাগজের একখানি করিয়া গোঁজ দেওয়া। মাথায় একটা রঙচঙে সস্তা ট্রাঙ্ক, বগলে মাদুর। মুলুক যাইতেছে।

বাঙালীরা একযোগে খাঁ-খাঁ করিয়া উঠিল। "ইধার কেন আয়া, ওদিকে তো আমাঢ জাযগা পডা হ্যায়"•• "যা না বাপু নিজের দলে, এদিকে জ্বালাতে এলি কেন?"…"হিঁয়া ভদ্রলোকেব মাথা'পর বসেগা?"

"যাতা হ্যায় বাবু, যাতা হ্যায়"—বলিয়া লোকটা সামনের দিকে চলিয়া গেল। যেদিকে পশ্চিমার দল, সেদিকে একজন বাঙালী বৃদ্ধ উঠিলেন। রোগা, লম্বা, একমুখ ঘন অবিন্যস্ত দাড়ি—শীর্ণ মুখখানিব সহিত এমন বেমানান যে, মনে হয় যেন পরচুলা। হাতে একটা তালা-আঁটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

উঠিয়াই প্ল্যাটফর্মের দিকে গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"তাহলে আসি বেহাই মশাই, আব বেশিদিন থাকতে পারলাম না বলে দুঃখু কববেন না, আমি গিয়েই সোনাটুকু সেকরাকে দিয়ে দিচ্ছি। বানিব টাকাটা তাহলে শীগগির…"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মুখটা গাড়ির ভিতর টানিয়া লইয়া বিড়বিড় করিয়া বলিলেন—"চামাব! তাড়া দিয়ে দিয়ে এত জোবে ছক্কবটা দৌড করালে যে হাড কখানা যেন চুর হয়ে গেছে। আর একটা দিন না-হয ফেলই করতাম গাড়ি বে বাপু!•• আহা, ঘোড়া দুটো•• শ্রীকৃষ্ণের জীব!—আ-মর! একেবারে খোট্টার পালের মধ্যে ঠেলে তুললে? জানি আজ যাত্রা খারাপ!…এই, কোথায় যাবি? …মাথায় তেল চাপড়েছে দেখ না!"

লোকটা মনোযোগ সহকারে একটা পোঁটলার গেরো খুলিতেছিল। খুলিয়া একটা মোটা চাটুর আকারের রুটির গোছা হইতে একখানা তুলিয়া লইল, পাশ থেকে খানিকটা তরকারি লইল, তাহার পর পুঁটুলিটা আবার সযত্নে বাঁধিয়া সরাইয়া রাখিয়া, খালি জায়গাটুকু হইতে একটা তরকারির টুকরা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—"আঁই, বৈঠি বুঢ়া বাবা; আপনি বরাহ মন্ দেওতা আছে? পাঁও লাগি।"

"নিপাত যাও, বেটা ম্লেচ্ছ কোথাকার"—অর্ধস্ফুটস্বরে এই আশীর্বাদ করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

চারিদিকেই প্রায় এই অবস্থা।—জল, কাদা, নোংরা পোঁটলাপুঁটলি এবং ততোধিক নোংরা মানুষ;—ছেলেবুড়া-স্ত্রী-পুরুষ সব ধরনের—যেন একরাশ চুন সুরখি খোয়া মাখানো মানুষ-কংক্রিটের চাপ।…বেহাইকে গালাগালি দিতে দিতে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন—"ছি, ছি, এমন চামারের বাড়ি থেকেও মেয়ে আনে! চোখের একটু পরদা নেই। একে তো মুখ ফুটিয়ে বলিয়ে নিলি তবে একখানে টিকিট করে দিলি ;—তা কোন্ একটা ইণ্টের ক্লাসের টিকিটই বা কিনে আনতে পারলি প্রাণ-ধরে? তাহলে তো আর এ রকম যন্ত্রণা হয় না⋯চামার আর বলেছে কেন!"

বাঙালীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল ; অনেকটা নিজের সংসারে ফিরিয়া আসার মত। একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া আত্মীয়তা করিয়া বলিলেন, "যাক্, সব সজাতি দেখছি, বুড়োকে একটু জায়গা করে দিতে হবে, উঃ, বেটারা যেন নরককুণ্ড করে রেখেছে ওদিকটা।"

আত্মীয়তার কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। স্বজাতির প্রায় সকলেই যেমন কাঠের পুতুলের মতো অনড় হইয়া বসিয়া ছিল তেমনই রহিল ; শুধু এইটুকু বোঝা গেল বৃদ্ধের দাড়ির দিকে যেন সবার একটু বেশি কৌতূহল।

অতি শীর্ণ মুখে অতি সুস্পষ্ট দাড়িটি প্রায়ই লোকের নজরে পড়ে। একটু অপ্রতিভ হইয়া পোঁটলা আর ব্যাগটা বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিয়া ডান দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। বাম পাশের যাত্রীটি মোটাসোটা গোছের মাঝবয়সী লোক, তাঁহার ক্রোড়ে একটা টিনের সুটকেস, একটা বিছানা আর একটা মুখবাঁধা হাঁড়ি—বাম হস্তে সামলাইয়া বসিয়া আছেন, ডান হস্তটি পকেটের মধ্যে।

দক্ষিণ পাশে একজন মুসলমান,—কালো সূচালো দাড়ি, মাথায় ফুলকাটা একটা টুপি। তাঁহার পাশের লোকটি বৈষ্ণব, গায়ে নামাবলি, কপালে একটি তিলক ; নাকে রসকলি। বয়স ৫০।৫৫ হইবে।

নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া মনটা প্রফুল্ল হইল, এবং আবার একটু আলাপ জমাইবার ইচ্ছা হইল ; বিশেষ করিয়া, বদ্ধ ঘরে ধুঁয়ার মত বেহাই-বাড়ির কটু ইতিহাসটা পেটের মধ্যে আটক থাকিয়া যেন দম বন্ধ করিয়া দিতেছে—তাহাকে একটু মুক্তি দেওয়া চাই ই। বাড়ি পর্যন্ত অপেক্ষা করা,—সে অনেক দেরি। একটু গলাটা ঝাড়িয়া কাহাকেও না লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"খোট্টাদের জ্বালায় আর গাড়িটাড়ি চড়বার জো রইল না⋯"

টোপটা কেহই গিলিল না।

আর একবার চেষ্টা করিলেন। ডাহিনে বাঁয়ে একবার অনির্দিষ্টভাবে চোখ বুলাইয়া লইলেন, তাহার পর নিজের মন্তব্য সম্বন্ধে নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ থাকিলেও বলিলেন—"যাহোক, এদিকটা সবাই ভদ্রলোক দেখছি।"

কোন উত্তর নাই। তখন মরীয়া হইয়া সোজাসুজি পাশের মুসলমান যাত্রীটিকে প্রশ্ন করিলেন, "মশাই কোথায় যাবেন ?"

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া একটু খিঁচাইয়া উত্তর করিলেন—"যেখানকার টিকিট কিনেছি সেখানেই যাব মশাই, আপনি স্থির হয়ে বসেন তো। আপনি কোথায় যাবেন বলুন দেখি।"

"ডালিমার্গাঁও হয়ে…"

"কি করেন ?"

"কিছু চাষবাস আছে, আর কয়েকঘর…"

"কি ছেলেপিলে ? কোথা থেকে আসছেন ?—কত বয়েস ? ব্রাহ্মণ না কায়েৎ ? অত রোগা কেন ? রোগা তো বেহিসেব দাড়ি কেন…"—বলিতে বলিতে পরিবর্ধমান রাগের চোটে সোজা হইয়া রুখিয়া বসিয়া বলিলেন—"আসুন, দেন উত্তর কত দেবেন।"

বৃদ্ধ একেবারে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেলেন। বিনীতভাবে বলিলেন—"হয়েছে, আপনি স্থির হয়ে বসুন।"

"আজ্ঞে না ; আর অত খাতিরে কাজ নেই, বোঝা গেছে। গাড়িতে ভাব করে স্থির হয়ে বসার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেছে,—একমাসও হয় নি। এই নিন আপনাদের গাড়ি ; আপনারাই ভাল করে বসুন। এইটুকু আসতে তিনবার গাড়ির কামরা বদলাতে হল, নয় আরও একবার সই।"

দুই পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। একটু পরেই গাড়ি স্টেশনে পৌঁছিল ; বৃদ্ধের প্রতি এবং পাশের বৈষ্ণবটির প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিতে হানিতে নামিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ বাম পাশের মোটা লোকটিকে প্রশ্ন করিলেন—"পাগল নাকি ?"

তিনি কোলের জিনিসপত্র একঝোঁক সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধের দিকে আড়ে চাহিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "অবস্থা গতিকে হয়ে উঠেছে।"

"যা বলেছেন, পশ্চিমেদের যা ভিড়, মাথা ঠিক রাখা দুষ্কর।—মশাইয়ের কোথায় যেতে হবে ?"

…ভদ্রলোক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলেন, "এই কাছেই।"

"তবে তো কর্মভোগ শেষ হয়ে এসেছে, আমার এখনও মেয়াদ অনেকক্ষণ। তা, জিনিসপত্রগুলো কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিন না ; কষ্ট হচ্ছে মিছিমিছি। জায়গা তো রয়েছে, আমি আর একটু নয় সরে বসছি, নিন।"

কোলের জিনিসগুলি নামানো দূরে থাকুক লোকটি গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি পর্যন্ত কোলে তুলিয়া লইলেন। ভদ্রতার উত্তর স্বরূপ বৃদ্ধের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিলেন মাত্র।

বৃদ্ধেরও রাগটা সপ্তমে চড়িয়া গেল। আচ্ছা লোকদের পাল্লায় পড়া গেছে তো, সোজা কথাটা বুঝিবে না কেহ!···শরীরে একটা ছোট রকম ঝাঁকানি দিয়া তিনিও লোকটার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন, ওদিকে যেমন ইশারায় অপমান, এদিকেও তাহার যোগ্য উত্তর!

ঝোঁকের উপর উল্টাইতেই বৈষ্ণব-বাবাজীর গায়ে একটু পা ঠেকিয়া গেল। গায়ে করস্পর্শ করিতে যাইতেই, তিনি হাতটা দুইহাতে ধরিয়া সস্মিত মিনতিস্বরে বলিলেন,—"থাক্, থাক্, সবই শ্রীকৃষ্ণ, থাক্;···কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশায়ের?"

২

মরুপ্রান্তর ঘুরিয়া এ যেন ওয়েসিস। শুধু একসঙ্গে এতগুলি কথা নয়; বলিবার ভঙ্গিতেও এমন একটি বৈষ্ণবোচিত মধুর গদগদ ভাব যে সমস্ত শরীরটি যেন জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ দায়ে-খালাস গোছের একটা নমস্কার করিতে যাইতেছিলেন মাত্র, বাধা পাইয়া—পরম ভক্তি সহকারে মাথা নোয়াইয়া বলিলেন, "প্রণাম হই বাবাজী, যাক, রামা-শ্যামার কাছে তাড়া খেয়ে সাধুসঙ্গ হল, পরম ভাগ্য।"—শেষের কথাগুলি, একটু আগাইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিলেন।

বাবাজী মৃদু হাসিয়া বিনয়ভাবে কহিলেন,—"কিছু না, সকলেই সাধু, সবার অন্তরেই তিনি বিরাজ করছেন, শুধু বিভিন্ন ভাবের-লীলা। তিনি লীলাময়, তিনি ভাবময়, তাঁর ভাবের কি অন্ত আছে? অনুরাগ, বিরাগ···"

বৃদ্ধের এসব তত্ত্বকথার দিকে তেমন কান ছিল না, ভাবিতেছিলেন এমন বেয়াড়ারকম সমদর্শী লোকের কাছে কি করিয়া বেহাই-বাড়ির কুৎসাটা উপস্থিত করিবেন। বলিলেন, "ঠিক ঠিক, একা রাগই একশ রকম পড়ে রয়েছে!···রাধে গোবিন্দ···তা বৈকি, সবাই হল শ্রীকৃষ্ণের জীব, তাঁর লীলার আধার···হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণের জীবের কথায় আমার বেহাই-বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল, সেইখান থেকেই আসা হচ্ছে কিনা,—মশায়, আহা-হা-হা, হাড় জিরজিরে দু'টি ঘোড়া—বেহাইকে যত বলছি—বেহাই মশাই, গাড়োয়ানকে বারণ করুন,—আহা শ্রীকৃষ্ণের

জীব—না হয় আর একটা দিন ফেলই করলাম গাড়ি—ততই গলা বাড়িয়ে গাড়োয়ানটাকে তাগাদা দিচ্ছে—গাড়ি ফেল করলে একটি পয়সা পাবি নি; বেহাইকে ভালমানুষ পেয়ে তোরা যে ক্রমাগতই তাঁর কাজের ক্ষেতি করাবি… অথচ আমি সমানে বলে যাচ্ছি—আর একটা দিন থেকে গেলে আমার কাজের কিচ্ছু ক্ষেতি হবে না বেহাই মশাই…চণ্ডাল! অতবড চণ্ডাল আপনি দেখেন নি কোথাও…"

বাবাজীর মুখে সেই প্রসন্নতার ভাব। বৃদ্ধ অপ্রতিভভাবে ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না, আপনি যে সবার অন্তরে তাঁর বিরাজ করার কথা বললেন তা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—লোকটা এমনি খুব সাধু, তবে ব্যাভারে চণ্ডাল। সব আগাগোডা শুনলে আপনিও বুঝবেন। তাহলে ছেলের বিয়ের কথাবার্তার সুরু থেকে সব কথা আপনাকে বলতে হল।… দাঁড়ান, তবে হয়ে আসি একবার—বহুমূত্র রোগ আছে কিনা…রাধেশ্যাম, গোবিন্দ বল…এই গায়ের কাপডটা দয়া করে একটু…"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই, যান।"

বাঙ্কের বাজু ধরিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে চলিলেন। ল্যাভেটরির দরজাটি খুলিতে যাইবেন, বামদিকে দেয়ালে আঁটা চৌকা একখানি নীল ফলকের উপর দৃষ্টি পড়িল; বিদ্যুতের আলো পডিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখিয়া, চোখ কুঁচকাইয়া বিড-বিড করিয়া বলিলেন, "খেলে কচুপোড়া! আবার কি বলে? এর জন্যে আবার আলাদা পয়সা নেবে নাকি! আগে তো এসব ছিল না! কি বলছে?

'নিজে টিকিট কেন ·'

"হ্যাঁ, তাহলেই আর কি! বেহাই অমন ঝানু শহুরে, তার পকেট থেকেই দেডটা টাকা বেমালুম সরিয়ে নিলে—গেঁয়োই হও, আর শহুরেই হও; আঁৎঘাৎ জান, আর নাই জান—নিজে টিকিট কেন…তোর উপদেশের নিকুচি করেছে!"

দরজাটা খুলিয়া ভিতরে একটা পা দিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া আবার পা-টা টানিয়া লইয়া পডিলেন—'মালের উপর নজর রাখ'…তা মন্দ কথা নয়… 'জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

"আ মর!" বলিয়া বৃদ্ধ একরকম হতভম্ব হইয়া পা-টা টানিয়া লইয়াই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাতটা যেন নিজে নিজেই ঘুরিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, একবার সমস্ত গাড়িটা দেখিয়া লইলেন। ফলকের কথা-কয়টি

একটা মস্ত বড় রহস্যের টীকা-টিপ্পনী করিয়া দিয়া, তাঁহার কাছে সেটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিল—ও! তাই সব কথাবার্তা বন্ধ করিয়া যে যাহার নিজের নিজের সামলাইয়া বসিয়া আছে! তাই সে মুসলমান বেচারি হন্যে কুকুরের মত ক্রমাগত এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়ি করিয়া বেড়াইতেছে! তাই ভক্ত-বিটেল সাজিয়া, তিলক কাটিয়া, ভাব করিয়া অত তত্ত্ব বুঝাইবার ধুম!—বটে বে!

তাড়াতাড়ি ফিরিলেন। সেখান থেকে একরকম চোখ-মুখ খিঁচাইয়া বাবাজীর দিকে চাহিতে চাহিতে মনে মনে বলিলেন, 'যান, আমি রয়েছি, কোন ভয় নেই'…ওরে আমার সাতপুরুষের গুরঠাউর! উনি রয়েছেন!

আর এই ছিষ্টিছাড়া কোম্পানির লোকদেরই বা আক্কেলখানা কি?…'চোর পকেটমার সব নিকটেই রহিয়াছে'—কেতাত্ত হলাম, তাঁদের ত্রিভুবনময় যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, খবর দিলেন—'তাঁরা সব সভা আলো করে নিকটেই আছেন। আপানাদের যথা-সর্বস্ব তাঁদের সেবায় দিয়ে চরিতার্থ হন।'

"নিকটেই আছে তো পাকড়াও কর্ না রে বাপু…ঢং একটা!"

এক আধজন প্রশ্ন করিল, "ফিরলেন যে? কৈ ভেতরে তো কেউ যায় নি।"

জায়গার কাছে আসিতে বাবাজী একটু অধিকতর বিস্মিত হইয়া প্রশ্নটা করিলেন। বৃদ্ধ উত্তর করিলেন না; মনে মনে বলিলেন, 'তাই তো, আপনি ভারি বদ লোক তো! আমি এত আশা করে রয়েছি, প্রায় আপনার মুণ্ডুপাত করেছিলাম, আর আপনি কিনা ফিরে এলেন!… বাবাজী না ওর গুষ্টির শ্রাদ্ধ!'

র‍্যাপারটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। উপর হইতে ব্যাগ, পোঁটলা আর খাবারের চাঙারি নামাইয়া নীচে রাখিলেন। ব্যাগের ডালাটা একবার বেশ করিয়া টানিয়া দেখিয়া লইলেন, অতঃপর গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া সমস্তগুলি একে একে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বোধ হয় বৈষ্ণব বাবাজীর সহিত প্রীতি-ভঙ্গের নোটিশ স্বরূপ বলিলেন, "কালীতারা—কালীতারা বল মন।"

বাবাজী বেচারি এক বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গিয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি একটু কম বলিয়া বিজ্ঞাপনটি তাঁহার চোখে পড়ে নাই; তাই তিনি ঠিক যে-বিশ্বপ্রেমিক বৈষ্ণবটি গাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই বজায় আছেন। কিন্তু ব্যাপার-খানা কি? গাড়ির যেন ভাবই আলাদা! একটা মানুষ তবু যদি পাওয়া গেল, গাড়িতে একরকম পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-তাহারও এই রূপান্তর! যাক, সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলেন না—"মশাই বুঝি তাহলে এইখানেই নেমে যাবেন ?"

বৃদ্ধ উত্তরে একটি বক্র দৃষ্টি হানিলেন মাত্র। মনে মনে বলিলেন, 'তাইতো গা! আমি কোথায় আশা করে আছি লম্বা শফরের মধ্যে একবার না একবার দাঁও পাবই, আর তুমি কিনা নেমে পড়ে রসভঙ্গ করে দিতে চাচ্ছ!...রসিক আমার, নাকে রসকলি চড়িয়েছেন!

—সমস্ত অবস্থাটি পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন—সব বেটা চোর। সে বেটা গলাবাজি করিয়া সাধুগিরি ফলাইয়া নামিয়া গেল—মস্ত বড পীর! আসলে এখানে আর সুবিধা হইল না ; গাড়ি গাড়ি রেঁাদ দিয়া বেড়াইতেছেন—যেখানে কপাল খুলিয়া যায়। এরা সবাই চিনিয়া ফেলিয়াছে কিনা।...আর কে কাহাকেই বা চিনিবে?...পাশের ইনিই যে মালের গন্ধমাদন করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বসিয়া আছেন—ওর মধ্যে তাঁহার নিজের ক'টা কে জানে?

ঊর্ধ্বমুখ লোকটি ওদিকে অনেক কষ্টে একটা প্রলোভন দমন করিয়া বসিয়া আছে, বুঝি আর রাখা যায় না। ইচ্ছা হইতেছে—দিই অতর্কিতে বেটা বুড়োর দাড়ি ধরিয়া একটা টান—তাহা হইলেই ব্যস, ছদ্মবেশ বাহির হইয়া পড়ে।

কেনা দাড়ি যে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, শুধু সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না। এরা সব মরীয়া লোক, ধাঁ করিয়া ছুরি বসাইয়া দিতে দেরি লাগে না।—তার পর চেন টানিয়া গাড়ি থামাইয়া অন্তর্ধান। প্রায়ই তো এই রকম শোনা যাইতেছে।

এককথায় এদিকে গাড়ির পনের আনা লোকেরই এই চিন্তা, এই ধারণা, অর্থাৎ সমস্ত গাড়িতে মাত্র একজন সাধু—সে নিজে, বাকি সব হয় চোর, নয় জুয়াচোর, নয় পকেটমার। কোম্পানি কিছু একটা আন্দাজ না পাইলে কি অমন করিয়া লিখিতে পারে?

সময় বড অশান্তিতে কাটিতেছে।

৩

গাড়ি যখন বদনগঞ্জ স্টেশন ছাড়িল চলন্ত গাড়িতেই দুইজন লোক টপ করিয়া পা-দানির উপর লাফাইয়া পড়িল। দরজার কাছের দুইজন লোক হৈ হৈ করিয়া দরজা চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিল আগন্তুকদের মধ্যে সামনেরটি পকেট হইতে [illegible]

একটা চোখের সামনে ধরিতেই তাহারা দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। যাহারা ব্যাপারটি বুঝিল না, তাহারা তীব্র উৎকণ্ঠায় নবাগতদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

লোক দুইটি দরজা খুলিয়া গাড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চারিদিকটা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সামনের লোকটি যে পরোয়ানাটির জোরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা এতক্ষণ মুঠার মধ্যেই মুড়িয়া সুড়িয়া ধরিয়াছিল, পকেটের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ করাইতে যাইতেই সেটা নীচে পড়িয়া গেল। লোকটা সন্ত্রস্তভাবে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া পকেটে পুরিয়া ফেলিল; কিন্তু কড়া বিদ্যুতের আলোকে সকলেই দেখিয়া লইল যে সেটা ঝকঝকে বোতাম আঁটা খাকী রঙের একটা মোড়া টুপি।

বাঙালী ভদ্রলোকের সাধারণ বেশ। পায়ে একজোড়া হাফ-শু, গায়ে কামিজের ওপর একটা এণ্ডির কোট; সব পকেটগুলোই ভারী ভারী। চেহারাটাও বেশ ভারিক্কে গোছের, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। হাতে একটি ছোট স্যুটকেস। সঙ্গের লোকটি পশ্চিমা। বাম বগলে একটা পোঁটলা, হাতে কাঠের ফ্রেমে জলের কুঁজা ঝুলিতেছে; এইভাবেই, একহাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া গাড়িতে উঠিয়াছে। বাবুর চাকর—সহজেই বোঝা যায়।

গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আগন্তুকদ্বয় দারোগা ও পুলিস, কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে বহ্নি নিজেকে ভস্মের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বেশ একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

"আসুন, আসুন; এইখানটায় জায়গা রয়েছে।"

"মশাই বরঞ্চ এইখানটায় আসুন, কম্বলের ওপর।"

"এই যে আমি ট্রাঙ্কটা উঠিয়ে রাখছি, দু'জনকারই জায়গা হবে।"

"কেন কষ্ট করে অত ভেতরের দিকে যাবেন? আপনি বরং এইখানটা—বৈষ্ণব বাবাজী আর আমার মাঝখানে বসে পড়ুন।···বাবাজী পরম সাধক লোক, তখন থেকে আলাপ করে বুঝলাম কিনা···আর সিং-জি, তুমি আমার এ-পাশটায় এসে বস বাবা। কতদূর যাওয়া হবে মশাইদের?"—বলিয়া বৃদ্ধ বোধ হয় ভদ্রলোকটিকে ধরিয়া বসাইবার আগ্রহেই হাত বাড়াইলেন।

"আহা-হা, বৃদ্ধমানুষ আপনি কষ্ট করেন কেন?—বেশ, আমি বসছি, বসছি। হাঃ-হা-হা, ও-বেটার চেহারাটা দেখে সবাই ভুল করে; কোন সিং ফিং নয়—জেতে কুর্মি। আমি এই এইখানটায় বসি বরং, হোটেল থেকে

একপেট পাঁঠা গিলে এলাম, বাবাজীর আর জাত মারব না—হাঃ, হাঃ, হাঃ। বুধন, তুম্ উস্ কোণাপর বৈঠো…হাঁ ঠিক।"

নিজে বৃদ্ধ আর মোটা লোকটির মাঝখানে বসিলেন। বসিয়া একটু নীচু গলায় বলিলেন, "ছোট জাত, ও বেটারা একটু দূরে থাকে সেই ভাল; দাদ, চুলকানি তো বেটাদের অঙ্গের ভূষণ। এ বিষয়ে আমি মশাই আমাদের গান্ধীজির সঙ্গে একমত হতে পারলাম না; আপনারা রাগ করেন তো নাচার।…হ্যাঁ, কোথায় যাওয়া হবে আপনাদের?"

মাথা ঘুরাইয়া পর পর দু'পাশে দুজনের পানেই চাহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি নাব্‌ব ডালিমগাঁও।"

"আর মশাই?"

মোটাসোটা লোকটি বলিল, "আমি যাব বড়চক; কিশেনগঞ্জ লাইনে সুধাসি ইস্টিশান থেকে নেমে যেতে হবে।"

"ওঃ আপনার পৌঁছুতে সেই যার নাম বেলা দশটা; তাও যদি বরাৎ জোরে ট্যাক্সি পাওয়া যায়।"

"আপনার ওদিকে যাওয়া আছে নাকি?"

"শুধু ওদিকে কেন? এই লাগোয়া ক'টা জেলার সব বড় বড় বাজার-হাটেই বছরে দু'একবার করে ঢু মারতে হয়। দিনাজপুরে সামান্য একটু আড়ৎ আছে কিনা। অধীনের নাম বনমালী কুণ্ডু। আর ব্যবসাতেও সুখ নেই মশাই, বাবার মুখে গল্প শোনা গেছে—"

হঠাৎ সামনে বেঞ্চির ও-কোণের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "বুধন!" সে চাহিতেই চোখের কড়া চাহনির দ্বারা একটা ইশারা করিলেন। সতর্কতা সত্ত্বেও সকলেই দেখিল বুধন অপরাধীর মত পোঁটলা হইতে অর্ধেক বাহির হইয়া পড়া, বেল্টসুদ্ধ একটা চাপরাশ তাড়াতাড়ি ভিতরে পুরিয়া ফেলিল। বনমালী কুণ্ডু দাঁতে দাঁতে চাপিয়া অস্ফুটস্বরে নিজের মনেই বলিলেন, "বেটা অসাবধান কোথাকার!"

একটু একটু করিয়া নানারকম গল্প জমিয়া উঠিল—গান্ধীজি, এবারের ম্যালেরিয়া, পাটের অবস্থা, রাধারাণী অপহরণের মামলা। এতক্ষণ পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব লইয়া যাহারা দম আটকাইয়া মরিতেছিল, তাহারা সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতা মত আলোচনায় যোগদান করিল, গাড়ির মধ্যকার অস্বাভাবিক স্তব্ধতার ভাবটা কাটিয়া গেল। কথাবার্তার মধ্যেই বনমালীবাবু

একবার কয়েকজনের কোলের দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না—যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—সবার কোলে একরাশ করে পোঁটলাপুঁটলি কেন?"

ছলনা!—বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, আপনি আর বুঝবেন কোথা থেকে?"

বনমালীবাবু তবুও বিস্মিতভাবে হাঁ করিয়া রহিলেন। মোটা লোকটি বলিলেন, "জোচ্চোর পকেটমার এদের অত্যাচার বেড়ে গেছে মশাই, জিনিসপত্র আর হাতছাড়া করে রাখতে সাহস হয় না, কত ভেখ ধরে কত লোক যে ওৎ পেতে বসে আছে। এই ধরুন না আমরাই কথা, দাড়িগোঁফ কামানো লোকটি, পরিচয় পেলেন,—নাম এই—পেশা এই—পরের ইস্টিশনে নেমে একমুখ দাড়িগোঁফ চড়িয়ে যেন মহর্ষি বাল্মকি হয়ে…"

বৃদ্ধের দিকে একটা কটাক্ষ হানিলেন। বৃদ্ধ কথাটা কাড়িয়া লইয়া বনমালী বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক তো—কিংবা ধরুন, এই আমি বুড়ো লোক, এক মুখ দাড়িগোঁফ রয়েছে—পরের ইস্টিশনে নেমে গিয়ে, দাড়িগোঁফ চেঁচে ফেলে দিয়ে টোলের স্থায়রত্ন মশাই হয়ে—"

মোটা লোকটির উপর একটি মর্মান্তিক প্রতিকটাক্ষ বর্ষণ করিলেন।

"আপনি স্থায়রত্ন কাকে বললেন মশাই?"

"আপনি মহর্ষি বাল্মীকি কাকে বললেন মশাই?

বনমালীবাবু দু'দিকে হাত দিয়া থামাইয়া দিলেন—"হয়েছে, হয়েছে। ও, বুঝেছি ব্যাপারটা, তাই বুঝি আপনারা সব গেরস্থালি ঘাড়ে করে বসে আছেন? —হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেশ, বেশ, যত সাবধানে থাকা যায় ততই মঙ্গল, কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ—"

"না, আর এখন অত সাবধান হওয়ার দরকারও নেই"—বলিয়া বৃদ্ধ কোলের বোঝাগুলি আস্তে আস্তে নীচে নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর উঠিয়া, সেগুলি একে একে বাঙ্কের উপর উঠাইয়া রাখিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন। আরও কয়েকজন নিজের নিজের কোল আজাড করিয়া বসিল। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বলিলেন, "আঃ বাঁচা গেল; ভাগ্যিস্ মশাই এসেছিলেন।"

বনমালীবাবু ছলনাসূচক একটা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "ঠিক তো, সামান্য একটা আড়ম্বর…মশাই, মরতে চললাম, আর লোক চিনি না? হ্যাঁ, চিনতে পারি নি শুধু এক রংপুরের মাধব চৌধুরীকে। বেটা চামার, মিষ্টি কথায়

ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েটিকে গছিয়ে দিলে,এখন পস্তাচ্ছি। তা আমারও বিশেষ দোষ ছিল না।...তার কথা যদি উঠলই আপনা হতে তো গোড়া থেকে আপনাকে...”

মোটা লোকটি বনমালীবাবুর পাশে একটু ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা কোন্ থানার সংলগ্ন আছেন মশাই? আর যদি কিছু মনে না করেন তো...”

বনমালীবাবু আস্তে আস্তে তর্জনীটি ঠোঁটের উপর রাখিয়া দুইদিকেই চাহিয়া দুইজনকে চুপ করিতে ইশারা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলিলেন—“শুনুন।”

দুইজনেই দুই দিক থেকে মাথা সরাইয়া আনিলে ধীরে ধীরে বলিলেন, “যখন জেনেই গেছেন, তখন আর উপায় নেই; আর আপনাদের দ্বারা একটু সাহায্যও হতে পারে—হ্যাঁ, দারোগাই, গভর্নমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস,—বনমালী কুণ্ডু নয়, হিমাংশুশেখর দত্ত, বুধন কুর্মি নয়, মহাবীর চৌবে,—ওর পুঁটুলির মধ্যে দু'জনের স্বরূপ। যাঁর পেছু নিয়েছি তিনি এই গাড়িতেই বিরাজমান; কিন্তু এখন স্রেফ অন্য কথা, বুঝলেন তো?”

বৈষ্ণববাবাজী এ গাড়ির লোকের সহিত আর আলাপ করার খেয়ালই তুলিয়া দিয়া গাড়ির জানালায় মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। বৃদ্ধ দারোগাবাবুর দিকে একটু ঘেঁসিয়া বসিয়া, ডান চোখের ডান কোনাটা টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন, “ইনি নাকি?”

“আর বেশি বলা ডিপার্টমেণ্টের নিষেধ”—ফিস্ ফিস্ করিয়া এইটুকু বলিয়া হিমাংশুবাবু মুখ তুলিলেন। সকলে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া আছে। ব্যাপারটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য একজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া সহজ গলায় বলিলেন, “তা আমি বললাম বলে আপনারা সবাই যথাসর্বস্ব সব আলাদা করে বাক্সের উপর রেখে থুলেন? না, এটাও আবার ঠিক নয়। মশায়, আমার সব জিনিস ঐ বেটার কাছে—বলতে নেই, অতি বিশ্বাসী লোক, আজ এগার বছর সঙ্গে রয়েছে, আড়তের সকল জিনিস ওর হাতে; কিন্তু এই যে দেখছেন ছোট্ট স্যুটকেসটি এটি প্রাণ থাকতে হাতছাড়া করি না; যেহেতু আড়ৎসংক্রান্ত আসল জিনিস সব এইতে। কে জানে মশাই—পৃথিবীর লোককে মেলা বিশ্বাস করতে নেই,—বেটা শেষ পর্যন্ত একটা মোক্ষম ঘা দেবার জন্যে বিশ্বাস জমাচ্ছে কি না, তাই বা কে বলতে পারে।”

পরিচয়টা প্রায় মুখে মুখে সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ট্রাঙ্ক, ব্যাগ, পোঁটলা প্রভৃতি খুলিয়া কেহ একটা মানিব্যাগ, কেহ কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি পুঁটুলি,

কেউ হয়তো মকদ্দমার নথিপত্র—যাহার যেরূপ মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে ছিল, কাছে লইয়া বসিল। হিমাংশুবাবু বলিলেন,—"এই ঠিক করেছেন। কি জানেন?—বিছানা বাক্স মাথায় করে বসে থাকাটা যেমন বোকামি, আবার সবচেয়ে দামী জিনিস-পত্র কাছছাড়া রাখাও তেমনি বোকামি—বরং বেশি। চোর জুয়াচোরের কথা ছেড়ে দিন, ধরুন যদি হঠাৎ একটা কলিশনই হল। যদি বা দৈবক্রমে, কোন গতিকে বেঁচে গেলেন তো টাকা-কড়ি, গয়না-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মানে সবচেয়ে দামী যা সেগুলো তো…"

বৃদ্ধ কি ভাবিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগের তালাটা খুলিয়া আন্দাজ আধহাত লম্বা, ডালার ওপর আংটা আঁটা একটা টিনের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সটি হিমাংশুবাবুকে ধরিতে অনুরোধ করিয়া সযত্নে ব্যাগের ডালা আঁটিয়া বসিলেন। হিমাংশুবাবু বাক্সটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ঠিক করেছেন, ডান হাতে নিয়ে বসুন, বেশ সাবধান হয়ে।"

ডানদিকে বৈষ্ণব বাবাজী। বৃদ্ধ বলিলেন, "না, না, বাঁ হাতে নিয়েই বসি। বাঁ হাতটা ভুলো হাত, এই তো? তা আপনি রয়েছেন, কোন ভয় নেই।"

হিমাংশুবাবু অল্প একটু হাসিয়া চুপ করিয়া কি একটু ভাবিলেন; বেশ বোঝা গেল অসহায় বৃদ্ধের এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায় তাঁহার মনটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে। একটু থামিয়া মুখটা সরাইয়া আনিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি রয়েছি বটে, কিন্তু যার উপর লক্ষ্য তাকে নিয়ে শীগগিরই নেমে যাব, তখন? আর একটা গেলেই যে গাড়ি নিষ্কণ্টক হল এমন নয় তো? বুড়ো মানুষ, ভাল করেন নি রাত্তিরে অত গয়না-গাঁটি নিয়ে একা বেরিয়ে।"

বৃদ্ধ একটু খিঁচাইয়া উঠিলেন—"অত কোথায় পাব মশাই? যা বেল্লিকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছি, অত দেবার পাত্র কিনা। তবে নেহাৎ ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোক হয়ে ভরি দু'এক বের করেছি, এই যা! সে চামারের কথা যদি উঠলই তো…"

৪

এই সময় গাড়িটি আসিয়া একটি স্টেশনে দাঁড়াইল। হিমাংশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন—"আমি এক্ষুনি আসছি, এসে শুনছি সব কথা। এইখান থেকে হেড্‌কোয়ার্টারে একটা টেলিফোন করে দিতে হবে।" গলা নামাইয়া বলিলেন—

"বাবাজীর ওপর একটু নজর রাখবেন, আমি এলাম বলে। যদি তেমন বোঝেন মহাবীরকে দিয়ে আটকে রাখবেন।"

স্টেশন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। টুপিটা হাতে লইয়া স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে কথা কহিয়া টেলিফোনের দিকে চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"বেহাইয়ের কথা আমায় আর বলবেন কি—আমি নিজেই ভুগছি। মশাই, নরম ধাতের ভালমানুষ দারোগা বলে আমার মোটেই বদনাম নেই, কিন্তু ঐ একটি জীবকে আমি এখন পর্যন্ত শায়েস্তা করতে পারলাম না। আমারও প্রথম ছেলেটির বিয়ে আর বছর দিলাম কিনা।"

একে এমন শ্রোতা, তায় ভুক্তভোগী, বৃদ্ধ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, বলিলেন—"কথা যদি উঠলই আপনা হতে তো একটু অপেক্ষা করুন, একবার হয়ে এসে নিশ্চিন্দি হয়ে সব বলছি। বহুমূত্রের রোগ আছে কিনা। সেই গাড়িতে উঠেছি ইস্তক—একবার গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু·· "

"তা হলে একটু থেমে যান, ঝাঁকানিতে বড্ড কষ্ট হবে, একে বুড়ো মানুষ। এই স্টেশন এল বলে। এখানে বড্ড ভিড় হয় বটে, তা হোক, আমি রয়েছি।"

গাড়ির গতিবেগ কমিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"তা হলে এই বাক্সটা—নিয়ে যাওয়া তো সুবিধা হবে না।"

হিমাংশুবাবু বলিলেন—"ব্যাগে বন্ধ করে যান, কিংবা এর কাছেই একটু রেখে যান না, সেই-ই ভাল।"—মোটা ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটি ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না মশাই। ও অনুরোধ করবেন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বেশ তো, ওঁকে দিতেই বা আপত্তি কি। তা উনি যখন রাজি নন, আপনিই ধরুন মিনিট দু'এক; গভর্নমেন্টের ট্রেজারিতে রইল মনে করব।" বলিয়া নিজের রসিকতায় একটু হাসিলেন।

গাড়ি প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন—"দিন তা হলে। শেষকালে মুসলমানদের—'আপ পহিলে চড়িয়ে তো আপ পহিলে চড়িয়ে' —করতে করতে গাড়ি ফেল হবার যোগাড় হবে? যান, বেশ ভাল করে দেখে শুনে বসবেন, গাড়ি এখানে দাঁড়াবে খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, যাচ্ছেন তো ও ব্যাটা কুম্ভকর্ণের টিকিটা ধরে নেড়ে দিয়ে যাবেন তো; ব্যাটা বেহুঁশ কোথাকার!"

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে মোটা লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন—"বড় ভাল

লোক বেচারি ; কিন্তু আজকাল আবার বেশি ভাল হওয়াই যে…উঃ, ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল !…মহা—ইয়ে বুধন !”

বৃদ্ধ যাইবার পথে “বুধন বাবু ! বুধন বাবু !” বলিয়া একটু নাড়া দিয়া গিয়াছিলেন, সদ্যোত্থিত মহাবীর মনিবের ডাকে জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল—জী হুজুর !”

“চট করে এদিকে আয় তো একবার, তোর পোঁটলা, কুঁজো থাক্, আমি দেখছি।”

মহাবীর আসিলে তাহার ঘাডটা ধরিয়া নামাইয়া নীচু গলায় আদেশ করিলেন—“কাঠিহার গ্যাং-কেসে (gang case) এখানে বড সাহেব আসবার কথা ছিল ; চট করে দেখে আয় তো, তাহলে একবার সেলাম বাজিয়ে আসি।”

চাপাস্বরে বলিলেও, বেশি উৎকর্ণ থাকার দরুণই হোক বা যে জন্যই হোক, অনেকেই কথাটা শুনিল।

মহাবীর গাডি হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠিলেন। দুয়ারের কাছে গিয়া হাঁকিয়া বলিলেন—“স্টেশন ঘরে দেখবি, না থাকে ওয়েটিংরুমে।”

দু’পা ফিরিয়া আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন—“নাঃ, নিজেই একবার দেখি, ওর ঐ পোঁটলাটার আর আমার সুটকেসটার ওপর একটু নজর রাখবেন আপনি, আর বৃদ্ধের এইটেও।…ও ! আপনি আবার এটা রাখতে নারাজ !”

আরও দু’একজনকে অনুরোধ করিলেন, কেহই রাজি না হওয়ায় বলিলেন—“তবে থাক আমার কাছে, এখনি তো আসছি।”

কথাগুলা বলিতে বলিতেই দুয়ার পর্যন্ত গেলেন এবং সেখানে পাঁচ-সাত সেকেণ্ড একটু ইতস্তত করিয়া দুয়ারের পাশের লোকটিকে ঘুমন্ত বাবাজীকে দেখাইয়া বলিলেন—“একটু নজর রাখবেন, ওদের ঘুম যে সর্বদা ঘুমই তা নয়”—বলিয়া টুপ করিয়া নামিয়া গেলেন।

… … …

শরীরটি বেশ হালকা করিয়া মাঝপথ থেকেই বৃদ্ধ বেহাইয়ের গল্পের সূত্র ধরিয়া আসিতেছেন—যত বেশি জন শোনে ততই সার্থকতা—“সাধ করে কি আর বলি—পাষণ্ড, চামার ? বিয়ের কথাবার্তা কইবার সময় সে কি নীচু ভাব !—‘আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি দেবতুল্য—আপনার…’ কই, কোথায় গেলেন ?”

মোটা লোকটি বলিলেন—“বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বুঝি, এক্ষুনি আসছেন।”

বৃদ্ধ ভেতরে ভেতরে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। বলিলেন—"আর বুধন—ই'য়ে মহাবীর চৌবে? তাকেও দেখছি না তো"

"তাকে আগে সন্ধান নিতে পাঠালেন যে।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আশা রহিল—এই বুঝি আগেকার মত লাফাইয়া চলন্ত গাড়িতে দুইজনে উঠিয়া পড়েন। পোঁটলা, স্যুটকেস পড়িয়া রহিয়াছে—

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম্ ছাড়াইয়া গেল। তখনও দু'একজন প্রবোধ দিল—নিশ্চয় অন্য গাড়িতে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের এই কাজ—

বৃদ্ধ তবুও দরজার কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া ডাক দিলেন—"হিমাংশুবাবু! বুধন! চৌবেজী! আমাদের গাড়ি এইখানে!"

পরের স্টেশনে সমস্ত গাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল—কোথায়ই বা দারোগা হিমাংশুশেখর, আর কোথায়ই বা কনস্টেবল মহাবীর চৌবে? শূন্য-গহ্বর, ভাল ঢাকনা দেওয়া পুরানো স্যুটকেসটা, আর পোঁটলার মধ্যে কতকগুলা ছেঁড়া নেকড়া ও একটা নকল চাপরাশ তাহাদের 'স্বরূপে'র পরিচয় দিতে লাগিল।

—এবং 'কুম্ভকর্ণ' 'বেহুঁশ' মহাবীর চৌবের পাশে দু'টি লোকের কাটা পকেট সে পরিচয়টা আরও নিঃসন্দেহ করিয়া দিল।

জগন্নাথ

দেবতা চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন,—ভক্তকে বিজয়দান করিয়া স্বয়ং যে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িবেন এতটা ভাবিয়া দেখেন নাই।

দেশজয় করিয়া রাজচক্রবর্তী ইষ্টদেবের দেউল রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিরাট রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিরাট পরিকল্পনা। উন্মুক্ত সমুদ্রসৈকতে গগনস্পর্শী প্রস্তরমন্দির উঠিবে; ক্রোশব্যাপী প্রাচীর বেষ্টিত তাহার বহিরঙ্গন, তাহার পর অন্তর্বেষ্টনী, তাহার পর চতুষ্কোণে পার্শ্বমন্দির চতুষ্টয়, কেন্দ্রস্থলে ইষ্টদেবের সুবিশাল মূল-মন্দির।

প্রথমেই বহির্বেষ্টনীর লৌহনির্মিত তোরণ, সে তোরণ অতিক্রম করিয়া অন্তর্বেষ্টনীর চন্দনকাষ্ঠনির্মিত তোরণ, তাহার পর প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরের চত্বর।

চত্বরটি উত্তীর্ণ করিয়া গোপুর, তাহার পর নাটমন্দির, সর্বশেষে গর্ভ-মন্দির। গর্ভ মন্দিরের মধ্যস্থলে উর্ধ্বস্থাপিত মর্মরবেদী। বিজয়ী রাজার আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়োজিত হইয়া গেল। প্রস্তর যোগাইতে দূরের একখানি পর্বত সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ধীরে ধীরে দেবমন্দির উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিল।

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিবৃন্দ বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার লগ্ন নির্ধারণে ব্যাপৃত ; দেবতা কিন্তু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহাকে নিজের সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিতান্ত নিজেকে মাত্র লইয়া, প্রস্তরের পর প্রস্তরস্তূপ দিয়া ঘেরা ঐ অন্ধকার বেদীর উপর উপবেশন করিয়া একইভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ অতিবাহিত করিতে হইবে! এই বিরাট বিশ্ব থাকিবে বাহিরে পড়িয়া, মহাকাশে আলোছায়ার মধ্য দিয়া দিবারাত্রির অভিযান চলিবে, রূপরসাদির বিচিত্র সমন্বয়ে চলিবে ঋতু-বিবর্তন, মহাকালের নাটমঞ্চে চলিবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিরাট নাট্য—তাঁহারই আনন্দলীলা। তাঁহাকে কিন্তু স্বল্পালোকিত তোরণপথে একইভাবে শূন্যনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কাটাইতে হইবে! প্রতিদিন নিয়মিত লগ্নে একই মন্ত্রের উচ্চারণ, পুষ্পে-চন্দনে, ধূপ-ধূনায়, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খের নিনাদে একই পূজাবিধি, ভক্তের সেই একই আকুতি, শত শত আতুর কণ্ঠে সেই একই রূপ প্রার্থনা—রজনীর শান্তিটুকুও আগামী দিবসের দুঃস্বপ্নে থাকিবে আচ্ছন্ন হইয়া!—পরিণতি কল্পনা করিয়া দেবতা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় নাই, দেবতা যে ভক্তাধীন। ভক্তের ইচ্ছার কাছে তাঁহার নিজের ইচ্ছা যে নিতান্তই শক্তিহীন ; এইখানে দেবতা যে নিজের সৃষ্টির কাছে পরাভূত।

অবশেষে নিরুপায় ভাবে একদিন তিনি ভক্তেরই দ্বারস্থ হইলেন।

প্রতিষ্ঠাদিবস ধার্য হইয়া গিয়াছে। মহাযজ্ঞের আয়োজনে সমস্ত রাজ্যে চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। রাজধানী উৎসবমুখর। জীবনের পুণ্যতম সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে, সম্রাটের চিত্তে আনন্দের পরিসীমা নাই, এমন সময় একদিন ইষ্টদেব স্বপ্নে দেখা দিলেন।

অদ্ভুত স্বপ্ন,—তাঁহাকে যেন আর চেনাই যায় না। দেবতার করযুগল শৃঙ্খলিত, যুদ্ধাবসানে যে-কোন বন্দীর মতই তিনি নিষ্প্রভ। যজ্ঞের সূচনাতেই এই অশুভ দৃশ্যে সম্রাট শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যজ্ঞায়োজন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়া প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য অমাত্যগণকে মন্ত্রণাগৃহে আহ্বান করিলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল ইষ্টদেবের বন্দীরূপ পরিগ্রহ কল্যাণেরই সূচনা। দেবতা চিরদিনই ভক্তের প্রেমে আবদ্ধ, সম্রাটের সঙ্কল্পসিদ্ধির অব্যবহিত পূর্বেই ইষ্টদেবের এই রূপে আবির্ভাব হইবার অর্থই এই যে তিনি চিরতরে ভক্তের প্রেমাধীন হইয়া রহিলেন। নরলীলায় একদিন মাতার হাতের বাঁধন স্বীকার করিয়াছিলেন তো ইনিই।

আবাব আদেশ প্রচার হইল যজ্ঞানুষ্ঠানেব, নিরুদ্ধ কর্মস্রোত আবার দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইল।

বজনীতে সম্রাট আবাব স্বপ্ন দেখিলেন,—বন্দীদশাপ্রাপ্ত ইষ্টদেব আরও নিষ্প্রভ, তাঁহার চক্ষেব দৃষ্টি আবও আর্ত, আরও করুণ।...

প্রভাতে যজ্ঞাযোজন বন্ধ বাখিবাব আদেশ দিয়া সম্রাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদবর্গকে আহ্বান করাইলেন। বহু তর্কবিতর্কেব পব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই হইল যে স্বপ্নের মধ্যে বিরাট শুভেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে, অকল্যাণের লেশমাত্রেরও দ্যোতনা নাই। বিশ্বরাজের বন্দীরূপ পরিগ্রহের একই অর্থ হয়, তাহা এই যে সমস্ত জগৎকেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকাব করিতে হইবে। যজ্ঞসমাধানেব পবই সম্রাট তাঁহার সেই বিবাটতম বিজয়াভিযানের জন্য যেন প্রস্তুত হন। ইষ্টদেবের আশিস তাঁহাব জন্য উদ্যত হইয়া রহিযাছে।

আযোজন আবার বিপুলতর উদ্যমে আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রতিষ্ঠার লগ্ন একেবারে সমাগত—মাঝখানে মাত্র একটি দিবসের অবকাশ। সেই বাত্রে দেবতা যে অবস্থায় দেখা দিলেন—তাহা একেবারেই কল্পনাতীত। শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে সমস্তদেহ লুপ্তপ্রায়; দৃষ্টি বোধ হয় অশ্রুর উদ্গমেই ভূমিলগ্ন।

এবার আহূত হইলেন কবি।

বলিলেন—"মহারাজ, ইষ্টদেব আপনার সত্যই বন্ধনভয়ার্ত; বন্দী অবস্থায় সাক্ষাৎদান প্রহেলিকা মাত্র নয়, ওর অর্থ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। যিনি বিশ্বনাথ তিনি নিজের রচিত এই বিশ্বে চিরমুক্ত; শুধু তাই নয়, তাঁর মুক্তি এই বিশ্বের গণ্ডিও অতিক্রম করে, তিনি দেশকালাতীত, কোন সীমার বন্ধনীর মধ্যে তাঁর শাশ্বত রূপ ধরা পড়ে না, তাঁর লীলার সমাধান হয় না...কিন্তু মানুষের সে-রূপ ধারণাতীত, দেবতাকে গ্রহণ করতে হলেই তাঁকে তার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নিয়ে গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ইট-প্রস্তরের মন্দিরের মধ্যেই বিগ্রহরূপে সঙ্কুচিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভক্ত আর ভক্তাধীন উভয়েই এই অদৃষ্ট-সূত্রে আবদ্ধ, এ থেকে কারুরই মুক্তি নেই।

আমি জানি না, ইতর কেউ দেবপ্রতিষ্ঠা করতে গেলে দেবতা এরূপ আচরণ করতেন কিনা, কিন্তু আপনি মনীষী, মহাপ্রাণ, বিরাট পুরুষ, আপনার বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার মধ্যে, আপনার পূজার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই চান একটা বিরাট মুক্তির সুর। ঠিক যে কি চান তা মানুষের বোধাতীত, তবুও আপনি নূতন ভাবে ওর পূজা করুন, যাতে শুধু এইটুকুই না সত্য হয়ে ওঠে যে আপনি পূজার নামে দেবতাকে প্রস্তর প্রাচীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করে রাখলেন। আর কিছু না হ'ক ওকে আপনি মানুষের সঙ্গে এক করে দিন—মানুষের ক্ষুদ্র অদৃষ্ট, তার জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখের প্রতিঘাতে তার প্রতিদিনের হাসিঅশ্রু, তার আশা আশঙ্কা, তার মিলনবিরহ—সহস্র অনুভূতি দিয়ে গড়া তার বিচিত্র জীবন যেন তার দেবতায় প্রতিবিম্বিত হয়। উনি এই কামনা করেই একদিন নবদেহ পরিগ্রহ করেছিলেন। বিগ্রহশরীরেও উনি এই মুক্তির পূজা পান, এই বোধ হয় ওর অভিপ্রেত। আপনার ইষ্টদেবের জন্য সর্ববিধ আচারমুক্ত এক নূতন পূজার প্রবর্তন করে আপনি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এই জন্যেই তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর দীনবেশে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছেন।"

.. . .

লক্ষ মানুষের চলার পথে লক্ষ লক্ষ নরনারীতেই দেবতার রথ টানিয়া মন্দির তোরণে উপস্থিত করিল—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, আর্য, অনার্য কিছুরই প্রভেদ নাই। আচার-শূন্য পূজা,—পুষ্প নাই, অর্ঘ্য নাই, মন্ত্র নাই,—শুধু লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রাণের আবেগময় প্রবাহ, সামনের ঐ মহাসমুদ্রে যেমন লক্ষ লক্ষ জলধারা উচ্ছল আবেগে আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে। দেবতা একক নয়, দেব-সভাসীনও নয়, মানুষের মতই পরিজনবেষ্টিত। মানুষ কি তাঁহার পূজা করে, না, তাঁহার মধ্যে পায় এক পরমাত্মীয়কে?—মানুষেরই রূপ, কিন্তু সমস্ত তুচ্ছতারই বহু ঊর্ধ্বে বলিয়া মানুষ হইয়াও আবার দেবতা।

সবার রূপকেই তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং তিনি রূপহীন।

আরও কাছের তিনি—মানুষের যা সবচেয়ে দুরদৃষ্ট তিনি তাহাকেও নিজের সত্তার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মৃত্যুর অধীন। তাঁর বিগ্রহ কালবিজয়ী পাষাণে নির্মিত নয়। দারু-মূর্তি,—প্রতি দ্বাদশ বৎসর দেবতার কলেবর পরিবর্তন হয়, আবার নূতন করিয়া হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

গাড়িতে ভীষণ ভিড ছিল। গার্ডের গাড়ির পর থেকে ইঞ্জিনের আগে পর্যন্ত সমস্ত গাড়িগুলায় চেষ্টা করিলাম—কোনখানে পশ্চিমার পাল দাঁতমুখ খিঁচাইয়া রুখিয়া আসিল, কোনখানে কাবুলীওয়ালা দরজার হাতল ধরিয়া উল্টা দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল, কোনখানে বাঙালীবাবু ইংরাজী ও বাংলায় রেলওয়ে আইনকানুন সম্বন্ধে একটু শিক্ষা দিয়া বিদায় করিল।

ইউরোপিয়ান থার্ডে জায়গা ছিল।—মাত্র একটি পাদ্রী ও গোঁয়ারগোবিন্দ গোছের তাহার একটা ক্রিশ্চান কাফ্রী সহকারী বসিযা ছিল। আমি দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। পাদ্রীটি ধর্ম বিষযে বেশ হিসাবী বলিয়া বোধ হইল, কারণ নিজে কিছু বলিল না, শুধু কাফ্রীটাকে টিপিয়া দিল—"He must not come, - see to it" অর্থাৎ দেখো যেন কোনমতে না ঢোকে। কাফ্রীটাকেও ষোল আনা পাপের ভাগী হইতে হইল না, কারণ সে তাড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি 'স্থানত্যাগেন' তাহাকে বাঁচাইয়া দিলাম।

ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিংরুমে গিয়া ব্যাগটা খুলিলাম। জেঠামহাশয় মাপ দিয়া দিয়াছিলেন - তাঁহার জন্য চাঁদ্‌নি থেকে একটা পুরা স্যুট কিনিয়া লইয়া যাইতেছিলাম—মায় টুপি নেক্‌টাই সমেত। আমার যাহা পরা ছিল সে সব তো রহিলই, তদুপরি সেইগুলা চড়াইলাম। পেণ্টুলুনটা বুক পর্যন্ত তুলিয়া বাঁধিলাম, এবং নীচে পাযের গোছের কাছে তিন চার পাট করিয়া মুড়িয়া দিলাম। টুপিটা মাথায় না দিয়া সাহেবী কায়দায় বগলদাবা করিলাম—সে এক বীরভদ্দর সোলার টুপি—পরিলে একপ্রকার পুরুষ-ঘোমটা হইয়া পড়িত, পথ চলিবার উপায় থাকিত না; একটা দেশী গেরো দিয়া নেক্‌টাইটা বাঁধিলাম, কোটটার আস্তিন ভিতর দিকে কনুই পর্যন্ত তুলিয়া মুড়িয়া দিলাম—ওদিকে হাঁটু পর্যন্ত লটকাইয়া রহিল—

একটা কাপড়ের পুঁটলিতে পুরোহিতদর্পণ, সত্যনারায়ণ-কথা, সরলচণ্ডী, মনসা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি মিলিয়া প্রায় ৬০ কাপি বই এবং একরাশ বাঁধানো অ-বাঁধানো ঠাকুর দেবতার ছবি বাঁধা ছিল,—গ্রামের ফরমাশ! সেই বোঝাটা একটা কুলির মাথায় দিয়া একেবারে ইউরোপিয়ান থার্ডের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং টুপিটা কপালের উপর একটু টানিয়া দিয়া, দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। কাফ্রীটা আমায় সজাতি মনে করিয়া সম্ভাষণ করিতে যাইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল; সন্দিগ্ধভাবে খানিকটা উত্তেজনার সহিতই বলিল—"তুমি না এই আসিয়াছিলে?...জোচ্চোর!"

সেকেণ্ড বেল বাজিতেছিল ; আমি কুলির মাথা হইতে বইয়ের পুটলিটা নামাইতে নামাইতে সংক্ষেপে বলিলাম—"নেটিভ ক্রিশ্চান—ন্যাশন্যাল ড্রেস্"…

"সবে দাঁড়াও, র‍্যাঙ্কিনের বড়সাহেব আসছেন"—বলিতে বলিতে তিন চারজন বখাটে বাঙালী ছোকরা আমার সামনে ভিড় সরাইতে সরাইতে আসিয়াছিল। টুপি নাড়িয়া ইংরাজিতে বলিলাম—"তোমাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, বন্ধু সব মনে রেখ, এখন বিদায় !"

তাহারাও কতকটা অপ্রতিভ হইয়া গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল, কাফ্রীটাও বোধহয়, আমি দলে ভারী আছি ভাবিয়া আর তখন কিছু বলিল না। শুধু নরখাদকের মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

পাদ্রীও মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছিল। ইহাদের গতিক দেখিয়া আমি আর দরজার নিকট হইতে নড়া নিরাপদ মনে করিলাম না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া ব্যাঙ্কের উপর পুঁটুলিটা অস্বস্তির সহিত নানাভাবে গুছাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং ইহারা কিরূপ ব্যবহার করিলে আমি কি উপায় অবলম্বন করিব মনে মনে তাহারই একটা খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলাম।

পাদ্রীসাহেব কাফ্রীটাকে হুকুম করিল—"জিজ্ঞাসা কর ত, ও কি ইউরোপিয়ান যে এ গাড়িতে চাড়িয়াছে ?"—হুকুম করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও উত্তর না দিয়া কাফ্রীটার মুখ দিয়াই প্রশ্নটা শুনিবার অপেক্ষায় রহিলাম। সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"Don't you hear, you fool, are you a European ?" অর্থাৎ, কথাটা কানে ঢোকে নি, মূর্খ, তুমি কি ইউরোপিয়ান ?

বলিলাম—"Yes, just as much as you are" (হ্যাঁ, ঠিক তোমারই মত)—বলিয়া মাথার কাছে গাড়ি থামাইবার শিকলটা বাগাইয়া ধরিলাম—উঠিয়াছে কি টানিয়া দিব—

সাহেব একটু হাসিল এবং তাহাতে কাফ্রীটা অপ্রতিভ হইয়া একটু কাসিল—একবার জানালার বাহিরে চাহিল, একবার গাড়ির ছাদের পানে চাহিল এবং অবশেষে কোন্‌খানে চাহিলে বেশ সপ্রতিভ দেখাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিজের নেক্‌টাইটা খুলিয়া আবার বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সাহেব বিশুদ্ধ বাংলায় আমায় শুধাইল—"টুমি বাঙ্গলা ভাষা জাট আছ ?"

হঠাৎ বাংলা শুনিয়া প্রথমটা চকিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু প্রশ্নটার প্রয়োজন

প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বাঙালীর ছেলে, বাংলা ভাষা 'জ্ঞাট' হইব না কি রকম! তাহার পর বুঝিতে পারিলাম, সাহেব যে নিজে বাংলা জানেন এ কথা নমুনা দিয়া আমায় বিদিত করা হইল। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত ইংরাজী বাংলা মিশাইয়া উত্তর করিলাম—"পবিত্র যীশুক্রীষ্টের ধর্ম গ্রহণ করা অবধি প্রাণপণে এই অপবিত্র ভাষাটা ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি—এখনও সম্পূর্ণ সমর্থ হই নাই।...আপনি তো চমৎকার বাংলা জানেন দেখিতেছি; একেবারে প্রাণে গিয়ে লাগে। কোন বাঙালীকে এমন বাংলা বলিতে শুনি নাই।"—বলিয়া চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া অন্তরের প্রশংসা জানাইলাম। শেষের কথাটা একেবারে মিথ্যা বলা হয় নাই, এইটুকু সান্ত্বনা রহিল।

সাহেব যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। বলিল—"না, আমি কিঞ্চিটও বাঙ্গলা জ্ঞাট নহি। ইহা হয় সট্য যে বাঙ্গলা হিডেনডিগের অপবিট্র ভাষা ছিল, কিন্তু ইহাটে বাইবেল অনুবাডিট হওয়া অবটি ইহা পবিট্র হইয়া গিয়াছে। টুমি ইহাকে স্বচ্ছণ্ডে মনে রাখিতে পার,—ভুলিবার প্রয়োজন নাই।...ডাঁড়াইয়া কেন, এখানে এস"—বলিয়া সামনের জায়গা হইতে টুপিটা উঠাইয়া লইল।

সাহেবের মুখোমুখি হইয়া বসিলাম। কাফ্রীটার নেক্‌টাই বাঁধা হইয়া গিয়াছিল, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপ্রসাদ করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বিড়বিড় করিতে লাগিল। বুঝিলাম নিজের ভাষায় গাল দিতেছে—আমাকেও এবং পাদ্রী সাহেবকেও।

সাহেবের সহিত কথাবার্তা চলিল। গাড়ি গাঁক্ গাঁক্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; সাহেবের গলার আওয়াজ টবর্গসঙ্কুলশব্দ বাংলা ঘাড়ে করিয়া তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিল। সাধারণের সুবিধার জন্য ভাষাটাকে এখানে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া লিখিয়া দিলাম—

সাহেব প্রথমে একটু বাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি মিছামিছি পোশাক বদলাইয়া আসিয়াছ, না সত্য সত্য নেটিভ ক্রিশ্চান আছ?"

আমি বলিলাম—"সত্য সত্যই আমি নেটিভ ক্রিশ্চান বলে মিছেপোশাকটা বদলে এসেছি, ধর্মাবতার।"

সাহেব ঠোঁট দু'টা চাপিয়া গোঁফদাড়ি একত্র করিয়া সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল। আবার বলিল—"কি জন্য?"

"তোমাদের কাছে অপবিত্র পোশাক প'রে আসতে লজ্জা করতে লাগল।"

"হুঁ, অপবিত্র পোশাক পরিধান করিয়াছিলে কেন ?"

"না হলে হিঁদেনরা তাদের গাড়িতে ঢুকতে দেয় না, গরিব মানুষ, থার্ড ক্লাসে ভিন্ন যেতে পাবি না"

"এ গাড়িতে আসলেই হইত, ক্রিশ্চান গবর্নমেণ্ট তোমাকে আশ্রয়দান করিত।"

"এটা ইউরোপিয়ান গাড়ি সাহেব—সব সময় ঢুকতে দেয় না। দযাব অবতার তুমি ছিলে বলেই আসতে সাহস কবলাম।"

সাহেব হাসিল। অবতারে বিশ্বাস কবে না বটে, কিন্তু বুঝিলাম এ ক্ষেত্রে ফল হইয়াছে। আমি কালক্ষেপ না কবিযা আবও কতকগুলো ঐ গোছেব কথা জুড়িয়া দিলাম,—সাহেবের জেরার বোখটা কাটিয়া গেল, প্রসন্ন ভাবে বলিল—"তুমি প্রকৃত ক্রিশ্চান আছ। তোমার হৃদযে আলোক আছে,—কতদিন হইতে হইয়াছ -"

"এই অল্পদিন থেকে।"

"তোমার পিতামাতা সকলেই পবিত্রধর্ম গ্রহণ কবিয়াছেন ?"

বলিলাম—"না ধর্মাবতার, বরং আমি আলোকে এসেছি পযন্ত তাঁবা সকাল-সন্ধ্যায় তোমাদের সগুষ্টি গাল না দিয়ে জল খান না।"

সাহেব হাসিতে লাগিল, বলিল—"কি বলেন ?—'হে মাতা কালী, জোড়া পাঁঠা দিব, সাহেবদিগকে মারিয়া ফেল'—হাঃ হাঃ হাঃ—তাহাব পব তোমাদেব—তাহাদের কালীর সহিত আমাদেব পবিত্র ভূতের ঘোবতর যুদ্ধ হয—কালী হারিয়া যায়—তাহাব ম্যালেবিয়ায় মরিযা যায়—ভূত হয়, আমরা সুখে বাজত্ব করিতে থাকি। তাহাদের দেবতাবা চিরকালই হারিয়া যায়—ইহাকে বিজ্ঞানে বলে—"Survival of the Fittest."

আমি।—"ঠিক কথা সাহেব, বাংলা দেশটা দেখলে তোমাব কথায় আব সন্দেহ থাকে না। এমন ভূতের ওপব রাজত্ব করতে কোন জাতই পারে নি। দিন দিন পবিত্র ভূতের আশীর্বাদে তোমাদের প্রজাও হু হু করে বেড়েই যাচ্ছে।"

সাহেব।—"হাঃ হাঃ হাঃ, তবুও তোমাদের দেশের লোক আমাদের ধর্মকে চিনিতে পারে না ; তুমি কি কবিয়া চিনিলে ?"

আমি।—"খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় নি, এক আঁচড়েই চেনা গিয়েছে। তার পর অসভ্য জামাকাপড়গুলো ছেড়ে, এই সুসভ্য সেজে বেরিয়ে এসেছি"—

বলিয়া নিজের নূতন শ্রীতে সাহেবের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একবার দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

সাহেব হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"বস, বস; জামাগুলা একটু ঢিলা আছে। কে দান করিয়াছে?"

আমি।—"যে পাদ্রী সাহেবের কাছে ব্যাপটাইজ্‌ড হয়েছি তিনিই দিয়েছেন; মস্ত বড দানী ব্যক্তি। তাঁর সবই এই রকম বড বড দান।"

সাহেব।—"দেখ, আমাদের ধর্ম্মে কত দয়া আছে। আমিও তোমায় ক্রিশ্চান জানতে পেরে কেমন এই বিলিতি কামরায় আশ্রয় দিয়াছি। হিন্দুদের পুরোহিত হইলে দিত?"

জোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া ফেলিলাম—"রাধামাধব"—সঙ্গে সঙ্গে ভুলটা শুধরাইয়া লইয়া বলিলাম—"কখনই না; তারা দেবার পাত্র!"

সাহেব।—"আমরা আমাদের মেষ সকলকে এইরূপভাবে রক্ষা করি। বাহিরের শত্রু তাহার কিছুই করিতে পারে না।"

কাফ্রীটা থাকিয়া থাকিয়া সেইরূপ দৃষ্টি হানিতেছে। আমি একবার চাহিয়া লইয়া সাহেবকে বলিলাম—"ধর্ম্মাবতার, আপনার অসীম দয়া, কিন্তু ওকে আগে একটু বুঝিয়ে দিন যে আমিও সামান্য একটি মেষ, ও যেন এখনও আমায় বাইরের শত্রু ঠাউরেই বসে আছে।—একটি মেষ আপনার এক্ষুনি কমে যেতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।"

সাহেব হাসিয়া বলিল—"না, না ও লোকটা কাফ্রী হওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত রাগী আছে বটে, কিন্তু তোমার কোন ভয় নাই। আমার বাঙ্গালী সহায়কটি অসুখে পতিত হইয়াছে, তাই ওকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। সে লোকটা পবিত্রহৃদয়—খুব বক্তৃতা দিতে পারে এবং হিন্দুদের দেবদেবীকে খুব গালি দিতে পারে।...আজ আমায়ই বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতে হইবে..."

আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিলাম, সাহেব বলিল—"আমরা গোবিন্দপুরে রথের মেলায় যাইতেছি—পথভ্রষ্ট আত্মাদের আলোক দেখাইবার জন্য।"

বুঝিলাম—আর কিছু নয়, ইহারা মেলায় গিয়া আমাদের ঠাকুরদেবতাদের গালমন্দ দিয়া, আমাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টায় চলিয়াছে;—কোন্ না দুই একটাকে পথভ্রষ্ট করিয়াই লইবে।—মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। প্রতি মেলাতেই এমন একশত জায়গায় গিয়া ইহারা এমনি করিয়া আমাদের সর্বনাশ

করিতেছে, অথচ আমরা বেশ নিশ্চিন্ত আছি। আমরা যে মানুষ—আর নেহাৎ যে-সে মানুষ নয়—সেটা আমরা দেখাইব শুধু হুঁকা-তামাক বন্ধ করিবার সময়। ইতিমধ্যে হুঁকা তামাকের মায়া কাটাইয়া একশত আপন লোক যে পর হইয়া যাইতেছে, তাহার হুঁশ নাই আমাদের।—হায়, যদি কোন উপায়ে আপাতত এ যাত্রাটা পণ্ড করিতে পারিতাম, সামান্যও একটা সান্ত্বনা মনে থাকিয়া যাইত।…

এতক্ষণ অন্যমনস্ক দেখিয়া বোধকরি সাহেবের সন্দেহ হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিল—"কি চিন্তা করিতেছ ?"

বলিলাম—"একটা কথা ভাবছিলাম, ধর্মাবতার, কিন্তু বলতে মোটেই সাহস হচ্ছে না।"

"আমি সাহস দিতেছি, বল ; কাফ্রীকে এত ভয় কেন ?"

"কাফ্রীকে ভয় নয়, ধর্মাবতার, তোমার মুখে বাংলা বক্তৃতা শোনবার বড় লোভ হচ্ছে, যদি দয়া করে সঙ্গে নাও…"

সাহেব উল্লসিত হইয়া উঠিল ; বেঞ্চের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিল—"নিশ্চয় যাইবে, নিশ্চয় যাইবে। আমার বাঙ্গলা জ্ঞানের জন্য গোল্ড মেডেল অর্থাৎ স্বর্ণ তক্‌মা আছে। আর তোমায়ও আমার বাঙ্গালী সহকারীর স্থানে বক্তৃতা দিতে হইবে।—বাইবেল জানা আছে তো ?"

"তা আর নাই!"—বলিয়া Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Issac থেকে শুরু করিয়া ইজ্‌রেলাইট ইস্‌মেলাইট প্রভৃতি বাইবেল-প্রসিদ্ধ কতকগুলা জাতির কুলুজি গড়গড় করিয়া আওড়াইয়া গেলাম। মিশনারি কলেজে পড়ি—ঔষধ-গেলা করিয়া বাইবেলের অনেকটা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি।

সাহেবের চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল আমায় একটি রত্নবিশেষ ঠাহরাইয়াছে, আমিও তাহার রাশি রাশি প্রমাণ দিয়া যাইতে লাগিলাম। শেষে এমন হইল যে কোথায় আমিই খোশামোদ করিব, না, সেই আমার হাত দুইটা ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল,—"শুধু আজ বক্তৃতা দিলে চলিবে না এলফ্রেড্‌ গোসা ; তোমায় আমাদের মিশনে থাকিতে হইবে ; আমি কোনমতে ছাড়িব না…"

আমি বলিলাম—"আমাকে সর্বদা কষ্ট করে ধরে রাখতে হবে না সাহেব—মিশনে থাকা তো পরম সৌভাগ্য, ক'টা ক্রিশ্চানের ভাগ্যে ঘটে ? তবে ও রকম রাগী কাফ্রী সেখানে কজন আছে জেনে রাখা দরকার।"

"ও ব্ল্যাক (কেলে্ট) তোমার কি করতে পারে?—আমি রক্ষা করিব তোমায়" বলিয়া সাহেব কাফ্রীটার দিকে একটা নির্মম দৃষ্টি হানিল।

কাফ্রীটাও প্রায় সেই রকম ভাবেই দৃষ্টিটা ফিরাইয়া দিল। খুব চটিয়া গিয়াছে। আমার দিকে যা চাহিল সে আবার আরও তীব্র। আমি তাহার মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলাম—"তা হলে ধর্মাবতার, বোধ হয় এখন থেকেই রক্ষার কাজ আরম্ভ করতে হয়…"

কাফ্রীর আমারই মত কালো বুকের ভিতরে যে হৃদয়টা আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিলাম—'ভাই, লাঞ্ছনায় আমরা সব কালোই আজ এক; এ অনুগ্রহটা ক্ষণিক—এই তোমার উপর ছিল, এই আমার উপর হইয়াছে। তবে যুগব্যাপী গোলামির পরও তোমরা এখনও যে কড়া নজরটা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিতে পার দেখিতেছি—তবু ভাল।

২

এই সব কথাবার্তা, চিন্তার মধ্যে গাড়ি আসিয়া স্টেশনে দাঁড়াইল। পাদ্রী সাহেব ঠাকুরদেবতাদের উপর যে বাক্যবাণ সব ছাড়িতে লাগিল সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া কাহারও দৃষ্টি কলুষিত করিতে চাহি না। নিজে মুখটি বুজিয়া শুনিয়া গেলাম, অনেকটা শোনা অভ্যাসও আছে। মনে মনে বলিলাম—'তেত্রিশ কোটির মধ্যে একজনেরও যদি তিলার্ধও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে তো শুনিয়া রাখ!—বিশেষ করে হে মা কালী, তোমারই ওপর দেখছি যত আক্রোশ—রাতারাতি একটা বিলি করা। কোন হিন্দু হলে মিনতি করতাম না মা, তুমি নিজেই ওপর-পড়া হয়ে ব্যবস্থা করতে,—এর সিকি ভাগও বলে রেহাই পেত না…"

স্টেশন হইতে গোবিন্দপুর পাক্কা তিন ক্রোশ। একটা প্রশস্ত পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে,—গাড়ি থামিবার কয়েক মিনিট পরে তাহার জনস্রোতে বান ডাকিল। নামিয়া দেখিলাম ছোটবড় রাস্তা দিয়া, ক্ষেতের আল দিয়া, পিঁপড়ার সারের মত উত্তর দিকে লোক চলিয়াছে। দেবতা আজ পথে নামিয়াছেন, আমার হিন্দু-আত্মা এই উৎকট বেশের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত পাখা ঝাপটাইতে লাগিল। মনে হইল এই প্রবঞ্চনা ছাড়িয়া ঐ সব ছোটবড় যাত্রীর সাথে আজ পথিক-দেবতার সঙ্গ লই। কিন্তু মাথায় দুষ্টামির প্ল্যানটা

জাঁকিয়া বসিয়াছিল এবং অনেকদিনের লাঞ্ছনা শোধ লইবার লোভটাও অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িল, সুতরাং সাহেবের সঙ্গেই থাকিয়া গেলাম এবং আপাতত তাহারই কথায় সায় দিয়া চলিলাম।

কাফ্রী জিনিসপত্র নামাইতেছিল। সাহেব একবার চারিদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অনেক পথভ্রষ্ট আত্মা!"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, গাদি লেগে গেছে একেবারে, পথ চলা দায়!"

সাহেব।—"একটা গাড়ি দরকার।"

আমি।—"খুব বেশি রকম, বিশেষ করে আমায় লুকুবার জন্যে, দেখছেন না কি রকম ঘিরে ফেলেছে?" কথাগুলা ইংরাজিতেই বলিলাম।

সাহেব হাসিয়া ফেলিল; ইংরাজিতেই বলিল—"মিশনে ফিরিয়াই তোমার একটা ভাল স্যুট করাইয়া দিতে হইবে।...তোমরা সকলে কি দেখিতেছ, দশহস্তযুক্তা দুর্গা আছি, মহাদেবের বুকের কালী আছি, না দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গণেশ আছি?"—এ কথাগুলি বাংলায় দর্শকদের প্রতি বলা হইল।

আমরা তিনজনে, তাহার মধ্যে আবাব বিশেষ করিয়া আমি যে কি এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাদের অভ্যুদয় তাহা লইযা চারিপাশে নানান রকমের মতামত, জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। একটা দজ্জাল গোছেব মাগিই বেশি রকম অভিমত দিতেছিল; সাহেবকে ভেঙাইয়া বলিল—"দুর্গার পুত্র শুঁড়ওয়ালা গণেশ আছি' ...মুখে আগুন মা, আবার তোমায ছেলে করবেন!...আমি বন্নু এরা যিশুখিষ্টের দল, রথে ঠাকুর দেবতাদের গাল পাড়তে এয়েচে, তা তোমরা তো শুনবে নি। ওরা ঐজন্য কোম্পানিথে' ট্যাকা পায গো—ঘেন্নার কথা বলবো কাকে, আমার গদার বাপকেও তো একরকম কলমা পড়িয়ে নেছলো...আমি সেই মেযেমানুষ কিনা—মিন্সেকে ঝ্যাটাব মুড়ো দিয়ে আবার জেতে তুলেছি।...তুই আবার কার কুল মজিয়ে এয়েচিস্ রে ছোঁড়া? আহা কিবে মানিয়েছে—একে বেড়াল কালো তায় গাং সাঁতরে এলো..."

বলা বাহুল্য এই গাং-সাঁতরানো বেড়াল আমিই। গদার বাপের হেফাজতের কথা স্মরণ করিয়া আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া অতি ভালমানুষের মত সাহেবের একটা বাক্সের তালা গভীর মনোনিবেশের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সাহেব এই ছাঁকা বাংলার সব বুঝিতে না পারিলেও অস্বস্তির সহিত ইংরাজিতে বলিল—"চল আমরা গাড়ি ঠিক করিয়া রাখি; জোসেফ কুলি দিয়া সব লইয়া আসিবে।"

আলোচনা জোর চলিতেছে এবং সেই মাগিটা হাতমুখ নাড়িয়া, তাহার 'গদার বাপ'-এব কলমা পড়ার অথরিটিতে খুব ব্যাখ্যান করিয়া যাইতেছে। কে একজন বুঝি কাফ্রী জোসেফের কুলশীল সম্বন্ধে সংশয় জানাইয়াছে ;—গদার মা বলিতেছে "তা কেন হবে ?—আহা ও-ও আমার গদারই মত কোন বাঙালী মাযেব নাড়ী ছেঁড়া দুলাল গো, এখন শোব গরু খেযে ওবকম চোয়াড মেরে গেছে। হঁ্যাগা, তা যাবে নি ? এই তো আমাব শবীল দেখছ, ভাবছ মাগি কি ক্ষীর ননীই না খায ; বলতে নেই—তা যদি জাত খুইয়ে অখাদ্যি কুখাদ্যি খেতাম তো তোমরা কি ত্যাখন বলতে পারতে—'এই সেই গদাব মা গো'—"

সাহেব গদার মাকে ভয় পাইলেও বোধহয স্বভাবের দোযে তর্কের লোভটা সংবরণ করিতে পারিল না। বিশেষ কবিয়া এই একটু আগেই সে আমার টীকার সাহায্যে আলোকপ্রাপ্ত গদার বাপের আবার অন্ধকাবে ফিরিয়া যাইবার বোমাঞ্চকব ইতিহাসটি শুনিয়াছিল।—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কি জন্য শুয়ার গরু খাইবে না ? ঈশ্বর ফল সৃষ্টি করিয়াছেন, মাছ সৃষ্টি করিয়াছেন—গরু শুয়ার-কেও সৃষ্টি করেন নাই ? তাহাবা কি অপরাধ কবিয়াছে ? তোমাদের অসভ্য, পক্ষপাতী ধর্মে—"

গদাব মা নিজের দলের দুই তিন জনকে সাক্ষী মানিয়া বলিল—"দেখ বৈরিগী ঠাকুর, দেখ ঘোষের পো, দেখ্ কালবৌ—কথাগুনো একবার শুনে থুস—এ-নাগাদ ক্ষেমী বাগদিনীর ধর্মে কেউ হাত দিতে হেম্মৎ করে নি ; যদি এর নেয্যো জবাব দি, তোরা গাঁয়ে গিয়ে রটাতে পারবি নি, ক্ষেমী মন্দ সেজে সাহেবের সঙ্গে নড়াই কবেছে—"

এদিকে ঠাকুর্দার কাঁধে চড়িয়া একটা সাত আট বছরের ছোঁড়া অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত আমাদের পরিচয় লইতেছিল। তাহার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর্দা বলিল—"ও সাহেব, আমাদের রাজা ; সেলাম করতে হয়।" ছোঁড়া—"সাহেব, সেলাম" বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, তাহার পর আমার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"আর ওটা কি !"

ঠাকুর্দা একটা সদুত্তর খুঁজিতেছিল। সেটা আমার পক্ষে সুশ্রাব্য হইবে না জানিয়া আমি সাহেবের জামায় একটা টান দিয়া ইংরাজিতে বলিলাম—"ও একটা অক্ষরজ্ঞানহীন মেয়েমানুষ,. অত সূক্ষ্ম তর্ক কি বুঝতে পারবে ?—চলুন, আসুন—"

"ওদিকে জোসেফ হাঁড়িপানা মুখ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে জিনিসপত্র

সুশৃঙ্খলায় নামাইবে কি, সেখানেও একপাল লোক গাড়ির দরজা ঘেরিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—গতিক দেখিয়া বোধ হইল 'গদার মা' গোছের কেহ যেন ছিল।

সাহেব বলিল—"সব পুঁটুলিগুলা নামানো হইয়াছে ?"

জোসেফ পুটলিগুলার দিকে না দেখিয়াই বলিল—"হ্যাঁ, হইয়াছে।"

"তা হলে কুলিব মাথায় করিয়া ঐখানে লইয়া এস—আমরা গাড়ি করিগে—" বলিয়া সাহেব আমায় লইয়া স্টেশনের বাহির হইয়া আসিল। কতকগুলি লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল, কতকগুলা গদার মার লেকচার শুনিতে শুনিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল, কতকগুলা জোসেফের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বেশিক্ষণ আর বিলম্ব হইল না ; একটু পবেই আমাদের গাড়ি মেলার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল, যতই অগ্রসর হইতে লাগিল লোকের ভিড় ততই পুরু হইতে লাগিল। গরমে, ঘামে, ধূলায় কিম্ভূতকিমাকার হইযা জোসেফ ঢুলিতে লাগিল এবং এক একবার তন্দ্রার ঝোঁকে সাহেবের বিপুল পেটে ঢু মারিতে লাগিল, কিংবা প্রেমিকের মত আমার ঘাডে হেলিয়া পডিতে লাগিল এবং তাডা খাইয়া ক্ষণিকের জন্য সচকিত হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পডিতে লাগিল। কলির কুম্ভকর্ণ !

সাহেব উদ্ব্যস্ত হইয়া পডিল, জোসেফের বজ্রসম মস্তক হইতে নিজের ভুঁডিটাকে বাঁচাইবার জন্য হাতের একটা আগল সৃষ্টি করিয়া বলিল—"I never knew a christian could sleep under these conditions." (কোন ক্রিশ্চান যে এ অবস্থায় ঘুমাইতে পারে তাহা জানিতাম না।)

শেষে হাতের আগলেও যখন বাগ মানিল না, একটা জবরদস্ত ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং যাহাতে জাগ্রত থাকে সেই উদ্দেশ্যে বলিল, "বইয়ের পুঁটুলিটা বাহির কর এবং কয়েক মিনিট অন্তর তিন চার খানা করিয়া কপি রাস্তার লোকদেব বিলাইতে বিলাইতে চল।" আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ইহাতে রথ বেচা কলা দেখা দুইই হইবে।" নিজের বাংলা জ্ঞানের গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; আমিও জ্ঞানের বহর দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম।

জোসেফ মুষ্টিদ্বয় কোলের উপর রাখিয়া সাহেবের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাহেব বলিল—"কথাটা কানে গেল ? পুঁটুলিটা খোল ; কোথায় রেখেছ ?"

"গাড়ির বাক্সের উপর।"

"ঘোড়ার গাড়ির ওপরটাকে বাক্স বলে না, ছাত বলে। বস্তা রাখলেই সেটা বাক্স হয়ে যায় না! জ্বালাতন!—যাও নিয়ে এস, কোচম্যানকে দাঁড়াতে বল।—এই—খাড়া হোও।"

জোসেফ সেই একই ভাবের শূন্য দৃষ্টিতে সমস্তটাই শুনিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "বেলগাড়ির বাক্সের উপর আছে, তাড়াতাড়িতে নামানো হয় নি।"

সাহেব লাফাইয়া উঠিল—"কি সর্বনাশ! নামানো হয় নি? পাঁচশত বই গাড়িতে রয়ে গেল! লেকচার দিয়ে আজ কি ফল হবে? লোকে বই না পেলে কেন একত্র হবে, বিশ্বাস করবে? বই নামানো হয় নি! কিসের এত তাড়াতাড়ি ছিল? কখন টের পেলে?…"

জোসেফ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, "গাড়ি ছেড়ে গেলে।"

"গাড়ি ছেড়ে গেলে? বলিতে লজ্জা করছে না? এতক্ষণ বলা হয় নি কেন শুনি?"

"বলব বলব করছিলাম।"

"শুনেছ এলফ্রেড গোসা? উনি যে এতক্ষণ নাক ডাকাইয়া তোমার আমার ঘাড়ে পড়িতেছিলেন ওঠা ঘুম নয়। ভাবিতেছিলেন, কথাটা কি করিয়া বলি; এমন গর্দভ আর দ্বিতীয়টি দেখিয়াছ? জানোয়ার; ক্রিশ্চানিটিকে ইহারা কলঙ্কিত করিয়াছে। একটুও অনুতাপের ভাব দেখিতে পাইতেছ? আবার চেহারা দেখিতেছ?—যেন—যেন…"

সমস্ত রাস্তা পাদ্রী সাহেব ক্ষিপ্তভাবে এই রকম বকিতে বকিতে চলিল। কাফ্রীটার উপর ইহার কি ফল হইল ভাল বোঝা গেল না, কারণ সে খোলা জানালার মধ্য দিয়া হাত দুইটা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার উপর থুথনিটা চাপিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাতে তাহাকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখাইতে লাগিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার মাথাটা যেরূপ জানালার ফ্রেমে ঠুকিয়া যাইতে লাগিল তাহাতে আমার যেন বোধ হইল সে অনুশোচনার সাগরে নিমগ্ন হইয়া দিব্য নিদ্রা যাইতেছে।…

মেলায় গিয়া আমরা প্রায় পাঁচটার সময় পৌছিলাম। অত্যন্ত ভিড়, এক মুঠা তিল ছড়াইলে বোধ হয় মাটিতে পড়ে না। আমাদের গাড়ি গিয়া মেলার বাহিরে একটা ঝাঁকড়া গাছতলায় দাঁড়াইল। পাদ্রীসাহেব তাহার পরদিন ভোরে বাসায় পৌছিবে, সুতরাং কতকগুলা লটবহর ও একটা ছোট্ট তাঁবু পর্যন্ত আনিয়াছিল। জোসেফ লোক দিয়া তাঁবু খাটাইয়া জিনিসপত্রগুলা ঠিক করিয়া রাখিয়েছে

লাগিল। আমরা মুখ হাত ধুইয়া, পোশাকের ধূলা ঝাড়িয়া, ঠাণ্ডা হইয়া গাছের শেকড়ের উপর বসিলাম। সাহেব একটা লেমনেড পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল ; চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "বড বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ; আচ্ছা কি করিয়া বক্তৃতা দিব বল ত ? ইহা মোটে আমার এই তৃতীয়বার বক্তৃতা দেওয়া হইবে। অবশ্য আমার বাংলা জ্ঞানের জন্য মেডেল…"

আমি বলিলাম—"আমি কি এতটা একসঙ্গে এসেও সে পরিচয় পাই নি সাহেব ? বক্তৃতার কথা যদি জিগ্যেস করলেন—সকলের চেয়ে লাগসই হবে আগে ওদের ঠাকুরদেবতাদের আজগুবি আজগুবি কীর্তিগুলো সোজাসুজি বলে যান ; তার পর—একধার থেকে সমালোচনা, চুটিয়ে একেবারে ; তাহলে যারা শুনবে তাদের মধ্যে কম লোকেরই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আর যদি আগে থেকেই ওদের ঠাকুরদেবতাদের গালমন্দ শুরু করে দেন তো সব ভড়কে যাবে। আমি ঠিক এই রকম সাজানো বক্তৃতা শুনেই তো আলোকে এসেছি।… সে ছিলেন রেভারেণ্ড উড সায়েব—ভাল বাংলাও জানতেন না—আর আপনার মুখে যা বাংলার তোড শুনলাম—"ইত্যাদি।

তোডটা আবার নামিল। অনেক স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল,—অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর। সাহেব বক্তৃতা দিতে শুরু করিয়া দিল। আমি উঠিবার সময় আর একবার টুকিয়া দিলাম—"দেখবেন যেন প্রথমেই গাল দিয়ে আরম্ভ করবেন না, আর বাংলাটা খুব শুদ্ধ হওয়া চাই"—মনে মনে বলিলাম যাহাতে একবর্ণও কেউ বুঝিতে না পারে।

সাহেব উঠিয়া দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া দাঁডাইল, তাহার পর একটু ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়া লইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। যাহাতে পূর্ণ-রসগ্রহণ হয় সেজন্য সেটা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবেই এখানে ধরিয়া দিলাম—

"ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, (একটি স্ত্রীলোক বলিল—চল্ তাঁতিবৌ ; বস্ন, গাল পাডবে) আপনারা যে হৃষ্ট-পডহীন ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ ডেবটার ডর্শন করিটে আগট করিয়াছেন সে কে আছে ? টাহার বাল্যকালের ইটিহাস বর্ণনা করিলে টাহা আপনাডের ভক্টির মূলে কুঠারাঘাট করিবে। প্রঠমট আপনাডের বিচার বুড্ডি প্রয়োগ করিয়া ডেখুন এই ডেবটা কে আছেন। আপনাডের বলা বাহুল্য যে অড্ভুট ডেবটাটি আপনাডের শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যিনি বাল্যকালে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ডারা গোবর্ডন ঢারণ করিয়াছিলেন। হাঃ হাঃ—গোবর্ডন ঢারণ করিয়াছিলেন !… ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আমি কি আপনাডিগকে প্রশ্ন করিবার স্বাটীনটা

লাভ করিটে পারি যে যাহার হস্ট ডুইটাই কটিট টাহার আবার অঙ্গুলী আসিল কোঠা হইটে ?…এ প্রশ্নের উট্টর আপনারা ডিটে পারিবেন না, কিণ্টু, আমি পারিব। এই কৃষ্ণ নামক ডেবটা বাল্যকালে এট ডুস্কর্ম করিয়াছিল যে বড হইয়া পূজার লোভে উহাকে সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় চেহারা বডলাইয়া ফেলিটে হইয়াছে…'

আমি উঠিযা একান্তে ইংরাজিতে বলিলাম—সাহেব, সমালোচনা পরে হবে, এখন এক এক করে আজগুবি গল্পগুলা সোজাসুজি শুনিয়ে যাও, যেমন কংসবধ, পুতনাবধ, বিশ্বরূপ দেখানো, কালীয় দমন—এই সব।"

"—ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আসুন আমরা প্রঠমে সযট্ন সহকারে ডেখিবার চেষ্টা করি, এই ডুই রকম চেহারার অড্ভুট ডেবটা বাল্যকালে কি কি কীর্টি করিয়াছিল। এই অণ্ঢকার ডেবটার জন্ম হইয়াছিল এক অণ্ঢকার রাট্রিটে। আমাডের ট্রাণকর্টা খৃষ্টের যে জন্ম হইয়াছিল টাহার টারিখ লিখিট আছে ; কিণ্টু কৃষ্ণের কী টারিখ আছে ?—কি অকাট্য প্রমাণ বর্টমান আছে টাহার জন্মের ? (আমি জামার খুঁটটা একটু টানিয়া দিলাম) আচ্ছা সে ইটিহাসের কঠা পরে পর্যালোচনা করা যাইবে। সে সময় বসুডেব সড্যজাট কৃষ্ণকে বক্ষে লইয়া ভীরুর ন্যায় নণ্ডর গৃহে পলাইটেছিল সেই সময় হইটেই যট অসম্ভব অসম্ভব ঘটনা বেচারি পৃঠিবীটে সংঘটিট হইটে আরম্ভ হইল। টাহাকে বৃষ্টি হইটে ট্রাণ করিবার নিমিট্ট বাসুকি সহস্র মুখের ফণা বিষ্টার করিয়া পিছনে পিছনে পশ্চাট্গমন করিটে লাগিল। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, আমি সট্বর আমাডের পবিট্র ঢর্মপুস্টক হইটে ডেখাইটে চেষ্টা করিব যে এই সর্প অটি ক্রূড় জাটি।—শয়টান সর্পের রূপ…" (আমি নিরস্ত করিবার জন্য জামাটা টানিয়া দিলাম)…"আসুন এইবার আমরা নণ্ডের গৃহে প্রবেশ করি—"(একটা বুডি বলিল—শোন কথা, নন্দের জাত মারবে নাকি !—যত সব…) "সেখানে হটভাগ্য শ্রীকৃষ্ণ রাজার টনয় হইয়া গরু চড়াইয়া বেডাইটে লাগিল। কঠায় বলে টুমি যাও বঙ্গে, টোমার কপালও পশ্চাটে পশ্চাটে গমন করে। বাসুকি বৃষ্টি হইটে রক্ষা করিটে পারে কিণ্টু অডৃষ্ট হইটে এক আমাডের ট্রাণকর্টা ভিন্ন কে পরিট্রাণ করিবে ? ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লা অটিশয় ডুরাট্মা জাটি। আমাকে যে গোবর্ডন গয়লা ডুগ্ঢ বিক্রয় করে সে ঈশ্বরের নামে শপঠ করিয়া বলে যে আমার নিমিট্ট চারিসের রেটে যে ডুগ্ঢ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না এবং আমার কুকুরের জন্য ডশসের রেটে যে ডুগ্ঢ ডেয় টাহাটেও জল মিশ্রিট করে না। অঠচ যডি মডীয় ডুগ্ঢ কোনডিন খারাপ

প্রমাণিট হয় টো কহে বোঢ হয় ভুলক্রমে সেই কুকুরের ডুগ্ঢ পান করিয়াছি। একডিবস অট্যণ্ট ক্রুড্ঢ হইয়া আমি টাহাকে চাবুক আঘাট করিয়াছিলাম। ইহাটে টাহার বৃড্ঢা ভগ্নী ও যুবটী পট্নী আমার প্রাচীরের বাহিরে ডণ্ডায়মানা হইয়া যে প্রকাব বিবিঢ অঙ্গসঞ্চালন সহকারে অসভ্য গালি ডিটে লাগিল টাহাটে বুঝা গেল যে স্ত্রীগয়লারাও” (আমি জামার খুঁট ধবিয়া টানিয়া দিলাম)… “ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, ইহা হইটে স্বচ্ছণ্ডে বুঝা যায শ্রীকৃষ্ণ এই গয়লা স্ত্রী-পুরুষডিগের মঢ্যে ঠাকিয়া ও টাহাডেব বালকবালিকাডের সঙ্গে মিশ্রিট হইয়া চরিট্র হারাইয়া ফেলিল এবং অট্যণ্ট ডুর্ডাণ্ট এবং বখাটে ছোকরা হইয়া ডাডাইল। বিষাক্ট বৃক্ষ রোপণ করিলে টাহাটে কি উট্পাডিট হয়?—কণ্টক উট্পাডিট হয় এবং বিষাক্ট ফল উট্পাডন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ডুষ্ট হইয়া পডাশুনা করিল না, ক্ষীর ননী চুরি কবিটে লাগিল, প্রটিডিন চরিট্র হারাইটে লাগিল। টাহার খারাপ চরিট্রের বৃক্ষে কি ফল উট্পাডিট হইল!—জল-কেলি এবং বস্ট্রহরণ;—উঃ, লেডির বস্ট্রহরণ!—আমাডের শ্বেটডিপেব লেডি হইলে শ্রীকৃষ্ণকে শুট্ করিট। ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লারা একটি ভয়ঙ্কর জাটি।—বিডেশী ভালমানুষেরা টাহাডের ডবল ডাম ডেয় টঠাপি টাহাডের ডুগ্ঢে জল মিশ্রিট করে; স্ট্রীগোয়ালারা টাহাডের কুটসিট গালি ডেয়, অন্যট্র শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের মহিলাডের বস্ট্রহরণ করা সট্টেও টাহাকে পূজা করে, ভক্তি করে। আমি কি ন্যায়হীন কার্য করিয়াছিলাম যে মডীয় গয়লার বৃড্ঢা ভগ্নী এবং যুবটী পট্নী একট্র হইয়া…”(আমি জামার খুঁট টানিলাম)…“ভড্রমহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, শ্রীকৃষ্ণের অট্যাচার অনলে বিণ্ডাবন প্লাবিট হইয়া গেল। ঘরে ঘরে ক্রণ্ডনের অট্টরোল উডিট হইটে লাগিল। গোপিকারা বিরহানলে কাঁডিটে লাগিল।—শ্রীকৃষ্ণ টাহাডের সবাইকে কঠা ডিয়া কঠা রাখিটে পারিল না। টাহাডের স্বামীরা স্ত্রীডের ব্যবহারে কাঁডিটে লাগিল। পুটনা নামক রাক্ষস-বঢূকে শ্রীকৃষ্ণ লজেঞ্জেসের ন্যায় চুষিয়া মারিয়া ফেলিল বলিয়া টাহার বিঢবা-যুক্ট স্বামী এবং সণ্টানেরা কাঁডিটে লাগিল। হায়, হায়, সে কি ডৃশ্য! ভড্রমহিলা এবং ভড্র-মহোডয়গণ, এরূপ ডুর্ডাণ্ট ছেলে ঠাকিলে কখন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হইটে পারে? এই নিমিট্ট কংসমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে হট্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিটে লাগিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণ কংসের কে ছিল? ভগ্নীর পুট্র, ভাগিনেয় ছিল; টঠাপি কি জন্য ইহাকে হট্যা করিটে চেষ্টা করিল?—কর্টব্যপরায়ণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যড্যাপি আমাডের শ্বেটডিপে জন্মগ্রহণ করিট টাহা হইলে টট্রট্য লোকেরা কাহার পূজা

করিট?—কংসমহারাজের পূজা করিট; যেহেটু টাহার অট্যণ্ট কর্টব্য-জ্ঞান প্রবল ছিল। সে টুলাডণ্ডের একডিকে কর্টব্যপরায়ণটাকে বসাইল, অপর ডিকে ভগ্নীয় পুট্র ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণকে বসাইল; কর্টব্যপবায়ণটা ভারী হইয়া গেল...”

বলা বাহুল্য লোকে সাহেবের বক্তৃতার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। চাবিদিকে যেমন সং তামাসা দেখিয়া বেড়াইতেছিল সেইরূপ ভাবে এইখানেও আসিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া, একটু শুনিয়া, কতকটা রুচি অনুযায়ী অভিমত দিয়া আবার ভাসিয়া পড়িতেছিল;—কারণ এখানে সং-এর কোন অভাব তো ছিলই না, ববং বেশ একটু নূতনত্ব ছিল। অবশ্য এমনও অনেকজন ছিল যাহাবা অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া মন দিয়া শুনিতেছিল। তাহাদের অনেকেই সেই জাতীয় ভাবুক বৈষ্ণব যাহারা কৃষ্ণনাম শুনিলেই—আত্মহারা হইয়া পড়ে। বাল্যলীলা কথন হইতেছে,—তাহাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। যেখানে একটু আধটু বুঝিতে পারিতেছে—“আহা হা হা” করিয়া উঠিতেছে; যেখানে মোটেই বুঝিতে পারিতেছে না আবও আবেগের সহিত “ওহো হো হো” করিয়া উঠিতেছে। অনেকে পাদ্রীর এ-সুমতি হইল কেন বুঝিতে পারিতেছে না, অনেকে প্রভুর ইচ্ছা বলিয়া মীমাংসা করিয়া লইয়াছে; আবার অনেকে ‘পাদ্রী’ বলিয়া যে আলাদা একপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের জীব আছে তাহার খবরও রাখে না, সুতরং তত্ত্বের দিকে না গিয়া দিব্য বাল্যলীলা শুনিতেছে। আমার, যতটা সম্ভব ইহাদের দিকেও কান আছে, আবার পাদ্রীর কথাও শুনিতেছি এবং প্রয়োজন মত তাহার জামার খুঁটটা টানিয়া বক্তৃতার মোড়ও ফিরাইয়া চলিয়াছি।...পাদ্রী বলিয়া চলিয়াছে “কর্টব্য-পরায়ণটা ভারী হইয়া গেল, টখন কংসমহারাজ মনষ্ঠ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের আর নিস্টার নাই। এবং ক্রোঢে ক্ষিপ্ট হইয়া আহার নিড্রা ট্যাগ করট গালে হাট দিয়া চিণ্টা করিটে লাগিলেন...”

আমি এইবার একটু অন্যদিকে নজর দেওয়া দরকার মনে করিলাম, কারণ কিছু সময় পর্যন্ত কংশবধের কাহিনীটা একটানা চলিবে, এবং আমার জামা টানিবার দরকার হইবে না। সাহেব মাথা নাড়িয়া ঘুষি চালাইয়া কংসের সভাঘটিত ব্যাপার বর্ণনা করিতে লাগিল...।

কাক্রীটা সেই আধ-হাত তাঁবুর মধ্যে মহা আনন্দে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। আমি সাহেবের অজ্ঞাতসারে তাহার নিকটে গিয়া নীচু গলায় ডাক দিলাম—“জোসেফ!”

কোন উত্তর নাই। আমি ফিরিয়া দেখিলাম সাহেব খুব গর্জন করিয়া বক্তৃতা

দিতেছে—আমার আওয়াজ তাহার কানে পঁহুছিবে না। আর একটু জোরে ডাকিলাম—"জোসেফ! মিস্টার জোসেফ !!"

উত্তর দিতে জোসেফের দায় পড়িয়া গিয়াছে। তখন বাধ্য হইয়া ভয়ে ভয়ে একটু ধাক্কা দিতে হইল। জোসেফ একেবারে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বলিল— "What is it, fire ?" (আগুন লেগেছে নাকি ?)

ঠেলা দিয়াই আমি দুই পা পিছাইয়া গিয়াছিলাম ; সেইখান হইতে উত্তর করিলাম—"না, সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছেন। তোমার এই বইগুলা বিলি করবার হুকুম হয়েছে।"

জোসেফ সাহেবকে একটা গাল দিয়া বলিল—"সে আপদ তো চুকে গিয়েছিল, আবার কোথা থেকে এল ?"

আমি সেকথার উত্তর না দিয়া বলিলাম—"আর কিছু কিছু হিঁদেনদের দেব-দেবীর ছবিও এইসঙ্গে আছে—এদের আকর্ষণ করিবার জন্য বিলি করে দিতে বলছেন।"

জোসেফ কিছু সন্দেহ করিল না ; গর্ গর্ করিতে করিতে পুঁটুলিটা তুলিয়া লইল। সাহেবের একেবারে সামনা সামনি যাহাতে না পড়ে সেইজন্য বলিয়া দিলাম—"আর দেখ, ঐ কোণটাতে গিয়ে বিলি করতে আরম্ভ কর,—এদিকে আরম্ভ করলে সাহেবের বক্তৃতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে,—একে তোমার ওপর ভয়ানক চটে রয়েছে…"

সাহেবকে কিছু বলিতে না পারিয়া জোসেফ সাহেবের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাকেই চোখ রাঙাইয়া বই, ছবির বস্তা লইয়া বিলি করিতে গেল।…"

সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কংসবধ হইয়া গিয়াছে, তখন কালীয়-দমন চলিতেছে। ঠিক কোন্‌খানটা ব্যাখ্যান হইতেছে বোঝা গেল না, কারণ সাহেব গোবর্ধন গয়লার 'বৃড্‌ঢা ভগ্নী এবং যুবটী স্ত্রীর কথা আবার পাড়িয়া বসিয়াছে, বলিতেছে—"ভড্র-মহিলা এবং ভড্রমহোডয়গণ, গয়লা অটি ভয়ঙ্কর জাটি ;—অড্যাই স্টেশনে একটি 'গডার মা' নামক স্ত্রীলোকের সাক্ষাট হইল, সে নিশ্চয়ই গয়লা, কারণ টাহার অঙ্গসঞ্চালন এবং ভাষা প্রয়োগ আমার ডুগ্‌ঢ বিক্রেটা গোবর্ধন গয়লার বৃড্‌ঢা ভগ্নী এবং যুবটী স্ত্রীর অনুরূপ, এবং সে নিজের পটিকে—যাহাকে টোমরা পটি-ডেবটা বল টাহাকে ঝাঁটা মারিয়া, আমাডের পবিট্র ঢর্ম হইটে ভ্রষ্ট করিয়াছে…"

বেশি বেলাও নাই, তাহা ভিন্ন সাহেবের এইরূপ গয়লা-প্রীতির নিদর্শনে

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমি সাহেবের জামার খুঁট ধরিয়া একটু জোরে টান দিলাম। সাহেব এমন রুচিকর বিষয়টির মাঝখানে ক্রমাগতই বাধা পাইয়া বিরক্ত-ভাবে আমার পানে তাকাইল। আমি মিনতির সহিত কহিলাম—"বলছিলাম, দুরাচার গয়লাদের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে নেমে আসবেন কি?—আমায়ও একটু বলতে বলেছিলেন; আর বেলা নেই, তাই মনে করে দিলাম—"

সাহেবের বিরক্তিটা কাটিয়া গেল, বলিল—"টাহা হইলে এইবার—সমালোচনা কবা উচিট···টুমি পারিবে কি?···ডেবটাদের খুব গালাগালি ডিটে জান?"

আমি উত্তর করিলাম—"নিজের প্রশংসা কবা ক্রিশ্চানের পক্ষে শোভা পায় সাহেব, তবে এইটুকু বলতে পারি রেভারেণ্ড উড সাহেব এই জন্যই এই স্যুটটা পুবস্কাব দিয়েছিলেন···"

সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তবে উঠ, there's a good boy (খাসা ছেকরা)!···খুব গালাগালি ডিবে, বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এবং কালীকে। আমি অট্যণ্ট ক্লাণ্ট হইয়াছি; একটু টাটকা হইতে যাই···"সাহেব তাঁবুর দিকে চলিয়া গেল।

আমি বাক্সটার উপর দাঁড়াইয়া ঘরোয়া বাংলায় বলিতে লাগিলাম—"ভাইসব, পাদ্রী সাহেবের মুখে তোমবা বৃন্দাবনের সেই ননীচোরা আর গোপীমনোহরার ছেলেবেলার কীর্তির কথা শুনলে। এখন আমার ওপর সাহেবের ফরমাস হয়েছে তাঁকে গালাগালি দিতে হবে। বেশ, মনিবের হুকুম, আমি এই উঠেছি; কিন্তু কি গালাগালি দোব তাঁকে! তোমরা সব একবার বলে দাও ভাই। সাহেব খোদ যাঁকে গাল দিতে উঠে হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁকে বাঙালীর ছেলে আমি, কি গালাগালি দোব? গাল দিতেই তো এসেছিলাম, কথা ছিল পাদ্রীও গাল দেবে, আমিও গাল দোব, আর ঐ যে তোমাদের সত্যনারাণ-কথা, মনসার-কথা আর দেবদেবীর ছবি বিলুচ্ছে ও-ও গাল দেবে, কিন্তু সে আর হল কৈ? কোথা থেকে মা সরস্বতী পাদ্রীর ঠোঁটে এসে বসে সব গোলমাল করে দিলেন। গালাগাল দোব কি?—আজ কতদিন পরে যমুনাপুলিনবিহারী, গোবর্ধন-ধারী, কংসদলনকারী, বংশীধারীর নাম শুনে, প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠছে; মনে হচ্ছে এই রাক্ষুসে ধর্ম আর রাক্ষুসে পোশাক ফেলে আবার কৌপীন পরে তাঁর কোলে ফিরে যাই—একবার প্রাণ খুলে 'হরি হরি' বলে ডাকি···(সকলে—"হরি হরি বল")

—"কিন্তু এ কলঙ্কিত শরীরকে কি তিনি আর স্পর্শ করবেন? চৈতন্য অবতারে বটে মহাপাপী জগাই মাধাইকে কোল দিয়েছেন; কিন্তু আমি যে ভাই তাদের চেয়ে ঢের বেশি পাপী,—আমার কি গতি আছে?"…(ভিড়ের মধ্যে)—"অবশ্য আছে—খুব আছে—সাহেবের পর্যন্ত আছে—ঐ কেলেটারও আছে—একবার সবাই 'হরি হরি' বল"—একটি চশমা-পরা যুবক সন্ন্যাসী বলিল—"জয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জয়!")…

পিছনে চাহিয়া দেখিলাম জোসেফ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সহিত সাহেবের বেশ জোর গলায় কথা কাটাকাটি চলিতেছে,—নিশ্চয়ই আমার বই এবং ছবি বিলির ব্যাপার লইয়া। আমি শ্রোতৃমণ্ডলের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—"ভাই সব, আর মায়েরা, পাদ্রী সাহেব যে লোকটিকে এখন গালমন্দ দিচ্ছে তার নাম নিতাই মণ্ডল, জাতে চাঁড়াল; ওদের দমবাজিতে পড়ে কেরেস্তান হয়ে গেছে। কেরেস্তান হয়ে যে কী সুখ তা আমরা দুজনে হাড়ে হাড়ে বুঝছি,—যীশুর পদে প্রার্থনা করি যেন শত্রুতেও কেরেস্তান না হয়। সমাজ থেকে বাড়ি থেকে তো তাড়িয়ে দিয়েইছে তার ওপর যাদের কথা শুনে মাথা মুড়িয়েছিলাম সেই পাদ্রীর ব্যবহারও দেখতে পাচ্ছ। আহা বেচারি নিতাই!—ধর্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু বড়ই নাকি ঠাকুর দেবতাদের ভক্ত ছিল, তাই এখনও তাঁদের ভুলতে পারেনি। তাই যা পয়সা পায় তাই দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের ছবি, তাঁদের বই কিনে রাখে আর এই রকম একটু সুবিধে পেলেই বিলি করে।—বলে—'আর জন্মে কতই না পাপ করেছিলাম, এলফ্রেড দাদা, তাই এই দুর্দশা, তাই নাকাল করেছেন মা কালী; এজন্মে একটুও তো পুণ্যি করে রাখি'—সাহেব এসব মোটেই পছন্দ করে না, গালমন্দ দেয়, মারধোর করে—আহা, কিন্তু ভক্তি এমনি পদার্থ! …তা ভাই সব, তোমাদের ধর্ম কি এতই কঠোর যে আমাদের মত পাপীকে আর নিতাই মণ্ডলের মত ভক্তকে আবার তুলে নেবে না?"…

চশমাপরা যুবক সন্ন্যাসীর দল বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় তুলে নোব—মাথায় করে তুলে নোব—ভয় নেই ভাই নিতাই মণ্ডল, সমান জবাব দিয়ে যাও, আমরা আছি…"

… … …

জোসেফের সঙ্গে বচসার ফলে এবং মাঝে মাঝে জনতার ক্রিশ্চান-বিরুদ্ধ চিৎকার পাদ্রীর আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ লাগিয়া গিয়াছিল, কাছে আসিয়া আমায় ডাকিয়া ইংরাজিতে কহিল—"এলফ্রেড গোসা! এসব কি?"—আমিও

ইংরাজিতে উত্তর দিলাম—যাহাতে জনতার কেহ বুঝিতে না পারে—"মাফ্ করবেন, আমার কোন পুরুষেই কেহ গোসা নয়, আমার নাম শ্রীশ্যামাপদ ঘোষ, জাতিতে কুলীন উচ্চ শ্রেণীব কায়স্থ…" আরও কিছু কিছু পরিচয় দিলাম।

সাহেব নির্বাকভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল—ঘৃণায়, কি রাগে কিংবা বিস্ময়ে ঠিক বুঝা গেল না ; বোধ হয় সব মিশানো ছিল। একটু পরে মাথা নাড়িয়া ক্রোধভবে চিবাইয়া চিবাইয়া বাংলায় বলিল—"হুঁ—ঘোষ! ঘোষ! আমি শুনিয়াছে ঘোষেবা কাযষ্ঠ হয়, আবার গোবর্টনের মটো গয়লাও হইয়া ঠাকে!…"

সাহেবেব দারুণ নিরাশার মধ্যে সান্ত্বনাটুকুতে আমি আর আঘাত করিলাম না।

সোনার-কাঠি

ছেলেবেলায় পড়া পদ্যমালায় ভূতনাথের কাহিনীটি আপনাদের মনে আছে ?

একদিন বিদ্যালয়ে ছুটির সময়
সাব দিয়া দাঁড়াইল ছাত্র সমুদয়,
তার মাঝে এক ছেলে নামে ভূতনাথ
হাতে কালি, মুখে কালি………

তার পর পদ্যটা যথাযথ মনে পড়িতেছে না, তবে কাহিনীটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। যদি বলি ভুলিবার উপায় নাই তাহা হইলেও মিথ্যা বলা হয় না, কেননা, আমাদের ক্লাসেও একটি ভূতনাথ ছিল এবং তাহাকে লইয়া ছুটির পর পদ্য-বর্ণিত অনুষ্ঠানটি প্রায়ই আচরিত হইত।

আমাদের অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিতেন আমাদের থার্ড মাস্টার অম্বিকাবাবু।…সব ছেলেদের সারবন্দী করিয়া দাঁড করানো হইত। ভূতনাথের কায়েমী ভূমিকা ছিল মনীগোপালের। তাহাকে দল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া থার্ড মাস্টার তাহার রূপ ও বেশভূষা বর্ণনা করিতেন—একটু অদল-বদল করিয়া পদ্যতেই বর্ণনাটা হইত, শেষ হইলে ছন্দেই প্রশ্ন করিতেন—"এর মত তোমরা কি কেহ হতে চাও ?"

ঘর ফাটাইয়া শব্দ হইত—"না-না-না!"

এর পর কাহিনী অনুযায়ী ননীগোপালের—"লাজে মুখ হেঁট" হইবার কথা, কিন্তু এইখানে আসিয়া কাহিনীর সঙ্গে আর কোন মিল থাকিত না। ননীগোপাল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে, নিশ্চিন্তভাবে একটু হাসিয়া নাল-গড়ানো মুখে একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ করিয়া প্রশ্ন করিত—"এবার ছুটি মাস্টার মশাই?"

ছুটি হইলে সঙ্গীদের হাসি, ঠাট্টা, গঞ্জনার মধ্যে মুখে অল্প একটু হাসি ফুটাইয়া নির্বিকার চিত্তে ভল্লুকের মত থপ-থপ করিতে করিতে বাড়ি চলিয়া যাইত।

অতবড় নোংরা আর কুৎসিত ছেলে আমাদের ক্লাসে কেন, সমস্ত বাংলা স্কুলটিতে ছিল না। গায়ের রং কালো, মাথাটা তেকোনা আর শরীরের অনুপাতে একটু বড়। মাথার চুল থাকিত দু'রকম—এক বাড়িতে বাড়িতে ময়লা জটপড়া স্তবক ঘাড় আর মুখের খানিকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে, আর এক খুব ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল—পাঁচচুলা করিয়া ছাঁটা—ঢেউয়ের আকারে মাথাটা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ননীগোপালের অভিভাবক ছিলেন তার দিদিমা, বাপ-মাও ছিল কিন্তু তাদেরও অভিভাবক ছিলেন ঐ দিদিমাই। ননীগোপালের নাপিতও তিনিই ছিলেন, মাস তিন চার পরে নিজেই কাঁচি ধরিয়া চুলগুলা কাটিয়া দিতেন। শুধু ঘাড়ের কাছে এক গোছা টিকি ছাড়া থাকিত।...বৃদ্ধা বড় সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন।

নাওয়া সহ্য হইত না ননীগোপালের। সহ্য হইত না বলিয়াই জল যাহাতে ভিতরে প্রবেশ না করে সেই উদ্দেশ্যে দিদিমা খুব তেল-জবজবে করিয়া মাসে একবার নাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাহার পর সমস্ত মাস সেই তেল বাইরের রং-বেরংএর ময়লা আহরণ করিয়া ননীগোপালের জামা-কাপড়ে সংক্রামিত হইত। জামাকাপড় মাসের মধ্যে দিন দুয়েক ফরসা থাকিত, সেই দুইটা দিন ননীগোপালকে কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, তাহার পর আবার ক্রমে ক্রমে ঠিক হইয়া যাইত।

সর্বসাকুল্যে ননীগোপাল পদ্মমালার ভূতনাথকেও এতদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে থার্ড মাস্টার ওর নাম দিয়াছিলেন ভূতনাথের ভূত। ছেলেরা আর অতটা বলিতে পারিত না, পার্ট করার জন্য প্রথমে দিন কতক নাম দাঁড়াইল ভূতনাথ, তাহার পর সেটা 'ভূতো' হইয়া ঐতেই পাকা হইয়া রহিল।

শুধু নাম কেন? রং, রূপ, স্বভাব, সজ্জা কোনটাই বা পাকা না ছিল ননীগোপালের তা তো মনে পড়ে না। অম্বিকাবাবুর নিত্য গঞ্জনাতেও

কোনখানে একটুকু পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। নিম্নতম হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত এক ভাবে কাটাইয়া ননীগোপাল হাই-স্কুলে গিয়া আমাদের সঙ্গে নাম লিখাইল।

হাই-স্কুলের হেডমাস্টার স্বয়ং অখিলবাবুর এসব দিকে একটু নজর ছিল; কিন্তু অনেক ছেলে, তায় আমাদের ক্লাসের সঙ্গে তাঁহার রুটিন-গত কোন সম্বন্ধ না থাকায় ননীগোপালের নাম-ডাক কানে পহুঁছিতে একটু বিলম্ব হইল। তাহার পর একদিন টিফিন পিরিয়ডে হঠাৎ ননীগোপালের হেড-মাস্টারের আপিসে ডাক পড়িল। আমরা সবাই ভিড় করিয়া আপিসের বাহিরে দাঁড়াইলাম। হেডমাস্টার বিস্মিত-দৃষ্টিতে ননীগোপালের পানে চাহিয়া দুইতিন বার তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"তুমি এই স্কুলে পড় অথচ এতদিন আমার চোখে পড় নি যে?"

ননীগোপাল তাঁহার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। হেডপণ্ডিত মশাই একটু রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, বলিলেন—"সে আপনার চোখের দোষ, ও তো লাখের মধ্যে চিনে নেবার ছেলে।"

"তুমি এত নোংরা কেন?"

ননীগোপাল একবার আড়চোখে নিজের পানে চাহিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেডমাস্টার বলিলেন—"তোমার নাম কি?"

"ননীগোপাল। নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝোল-টানার শব্দ করিল।

ননীর পাড়ার একটি ছোট ছেলে হাই-স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িত, ভিড়ের আগে একটু ঠেলিয়া আসিয়া বলিল—"ওর ভাল নাম ভুতো, স্যার।"

অন্যসময় হইলে ছেলেটি বোধ হয় ধমক খাইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হেডমাস্টার কিছু না বলিয়া ননীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ দেখ, তোমার আসল নাম লোপ পেয়ে গেল। 'ভুতো' নামটা পছন্দ তোমার?"

সেই ঝোল-টানা শব্দটার ভয়ে সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন—"তুমি মাথা নেড়েই উত্তর দাও বাপু।"

ননীগোপাল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, পছন্দ নয়।

হেডমাস্টার বলিলেন—"সুখী হলাম। এ স্কুলে তোমায় আজ থেকে যে ভুতো বলে ডাকবে তার সাজা হবে; বুঝলে?"

ননীগোপাল একবার সেকেণ্ড মাস্টারের দিকে চাহিয়া লইয়া আবার ঘাড়

নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে, তবে বুঝিয়া যে আনন্দিতই হইয়াছে মুখের ভাবে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না।

হেডমাস্টার বলিলেন—"কেন তা বোধ হয় টের পেয়েছ? ননীগোপাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, তুমি তাঁর মতনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার চেষ্টা করবে আজ থেকে…"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"তা বলে গোঁষ্ঠ থেকে যখন ফিরতেন তখনকার মতন নয়।"

হেডমাস্টার বলিলেন—"যাও, কাল আবার দেখা করবে প্রথম পিরিয়ডে।"

পরদিন হইতেই হেডমাস্টার নিরাশ হইতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ নামের মর্যাদা রক্ষার জন্য ননীগোপাল স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়া আসিল,—ঘাড কপাল, কানের দুইধার দিয়া ময়লা তেলের ধারা গড়াইতেছে; উপর হাত হইতে গড়াইয়া নীচের হাতে কাদার মত তেল জমা হইয়াছে, কাপড-জামার প্রান্তগুলি তৈলসিক্ত হইয়া হলদেটে হইয়া গেছে। অকালে স্নান করার জন্য সর্দির মত হইয়াছে, একটা শড-শড, ঘড-ঘড শব্দ সঙ্গে করিয়া ননীগোপাল কৌতূহলী-পরিবৃত হইয়া হেডমাস্টারের ঘরে উপস্থিত হইল।

সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন কণ্ঠিধারী বৈষ্ণব; হেডপণ্ডিত একটিপ নস্য লইতে লইতে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—"গুপীবাবু, যমুনা থেকে চান করে উঠলে কেমন চেহারাটা হত একবার দেখে নিন।"

হেডমাস্টার মশাই স্থির দৃষ্টিতে একটু দেখিয়া খানিকক্ষণ মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন; বোধ হয় ঘৃণা, রাগ এবং পরাভবের নৈরাশ্যটা দমন করিয়া লইলেন, তাহার পর মাথাটা তুলিয়া শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সাবান বলে একরকম জিনিস হয়—জান?"

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন—"ঘাড নেড়েই বল বাপু, আজকে আবার বেশি রসস্থ আছ।"

ননীগোপাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—জানে।

হেডমাস্টার বলিলেন—"কাল থেকে তাই মেখে আসবে।"

সেকেণ্ড মাস্টার বলিলেন—"তেলে-তেলে ওয়াটারপ্রুফ করে নিয়ে ওকে নাইয়েছে তাইতেই ঘড়-ঘড়ানি শুনে হৃৎকম্প হয়, সাবান মাখলে ওর সান্নিপাতিক দাঁড়াবে মশাই।"

হেডমাস্টার একটু যেন দাঁতে-দাঁত চাপিয়াই বলিলেন—"তাই ওর ওষুধ।"

ননীগোপালকে বলিলেন—"খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, এটা হাই-স্কুল, মনে থাকে যেন। যাও, আবার ডেকে পাঠালে আসবে।"

নিরাশ হইলেন বটে কিন্তু হেডমাস্টার সহজে ছাড়িলেন না। দুই বৎসর ধরিয়া সমানে পরীক্ষা করিয়া চলিলেন—কিছুদিন ভাল কথার উপর—বুঝাইয়া সুজাইয়া, পরামর্শ দিয়া, হাইজিনের নানাবিধ চার্ট দেখাইয়া, ফল না পাওয়ায় কিছুদিন সাজা দিয়া।—প্রত্যহ আসিয়া ননীগোপালকে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। নির্বিকারভাবে—একটা শ্যাওলা-ছাতা-পড়া স্তম্ভের মতই দাঁড়াইয়া থাকিত ননীগোপাল; অতি অপরিচ্ছন্ন ছেলের ক্রমে যে একটা মূঢ়তা আসিয়া যায়—সেই মূঢ়তার ওদিক হইতে সে যেন বুঝিতেই পারিত না যে তাহাকে লইয়া এদিকে সমস্ত স্কুলজীবন ব্যাপিয়া একটা ব্যাপার চলিতেছে। নিজের নরকের-স্বর্গে নির্বিকল্প পরিতোষের সঙ্গে ননীগোপাল দশমশ্রেণী পর্যন্ত কাটাইয়া দিল।

এই সময় হেডমাস্টার মশাই অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরি লইয়া চলিয়া গেলেন। চার্জ দিয়া যাইবার সময় নূতন হেডমাস্টার অরুণবাবুকে বলিয়া গেলেন —"নিজের মুখে বলতে নেই, তবে দশবছর ছিলাম, স্কুলটাতে অনেক সংশোধন করেছি, অনেক নতুন কিছুও সৃষ্টি করেছি,—অন্তত এমন কিছু মনে পড়ে না যাতে আমি হাত দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছি; খালি এক জায়গায় আমি হার মেনে যাচ্ছি অরুণবাবু, দেখুন যদি আপনার দ্বারা কিছু হয়।"

ননীগোপালকে ডাকাইয়া আনিয়া আদ্যন্ত ইতিহাস সহ পরিচিত করিয়া দিলেন।

২

নূতন হেডমাস্টার একরকম সদ্য পাশ করিয়াই চাকরি লইয়াছেন; বয়স কম, খুব উৎসাহী। তাঁহার সবচেয়ে বিশেষত্ব ছিল, সব জিনিসই একটা নূতন পদ্ধতিতে করিবার চেষ্টা করিতেন।···আমরা তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, অর্থাৎ সে সময়ের গণনা অনুযায়ী, ম্যাট্রিকুলেশন দিতে আর মাত্র দুই বৎসর বাকি,—হেডমাস্টার নিঃসঙ্কোচেই আমাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

ননীগোপালকে তিনি না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলিলেন না। শুধু এইটুকু দেখা গেল ও ক্লাসের মধ্যে যেমন কতকটা অপাংক্তেয় হইয়া ছিল, সে ভাবটা আর থাকিতে দিলেন না।

একদিন ননীগোপালের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া হেডমাস্টার মহাশয় ক্লাসে পাঠ বন্ধ রাখিয়া বেশ খানিকটা লেকচার দিলেন। বলিলেন—"তোমরা সোনার কাঠি বলে রূপকথায় একটা কথা শুনেছ। জিনিসটার প্রত্যক্ষ অর্থ যাই থাক, একটা এ্যালিগরিক্যাল তাৎপর্য আছে; সোনার-কাঠি কি করলে, না, সুপ্ত রাজকুমার কিংবা সুপ্ত রাজকুমারীকে জাগিয়ে দিয়ে একটা নূতন জগতের সম্মুখীন করে দিলে। এ্যালিগরির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সোনার কাঠি সেই যাদু স্পর্শ, যা সুপ্ত কোন এক শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। অনেক সময় শক্তি প্রকটই থাকে—অবশ্য একেবারে যে শৈশবের যুগ থেকেই প্রকট থাকে তা নয়, তবে মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আপনি-আপনিই বা অল্প আয়াসেই প্রকট হয়ে পড়ে, যেমন ধর তোমাদের সকলের মধ্যে যে সৌন্দর্য বা শিষ্টতা জ্ঞান আছে—বোধ হয় দু'একজনের মধ্যে সাহিত্য-প্রবণতাও আছে, কিন্তু অনেকের শক্তি আবার এত প্রচ্ছন্ন যে বোঝবার জো থাকে না, অনেকটা ছাই-ঢাকা আগুনের মতন। এই সবের জন্যে সোনার কাঠির দরকার হয়, তাদের মনটাকে এমন কিছু দিয়ে স্পর্শ করতে হয় যার দ্বারা মনের সেই বিশেষ শক্তি হঠাৎ চকিত হযে জেগে উঠতে পারে। এই যে স্পর্শ এটা আনন্দমূলকও হতে পারে আবার নিরানন্দমূলকও হতে পারে—তবে পরিণামটা আনন্দই, কেন না একটা শুভশক্তির বিকাশ তো? ...আমি তোমাদের সহপাঠী ননীগোপলকে লক্ষ্য করেই যে তুলেছি কথাটা এটা বুঝতেই পেরেছ। ওর বাইরেটা অমন বলে মনে করাই শক্ত যে ওর মধ্যেও সৌন্দর্যজ্ঞান বলে একটা জিনিস আছে; অথচ তা আছেই, কেননা ওটা মানুষের কমন্ হেরিটেজ—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ওটা থাকবেই থাকবে।

"তোমাদের থেকে তফাৎ এই হয়েছে যে ওর ও-জ্ঞানটার স্বাভাবিক বিকাশ হল না, তাই ওর দরকার সোনার কাঠির স্পর্শ।...উইথ অল রেসপেক্টস্ টু দেম—বাংলা স্কুলের থার্ড মাস্টার আর তোমাদের পূর্বতন হেডমাস্টার মশাই দু'জনেই যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল ভুল পদ্ধতি—অর্থাৎ তার মধ্যে কোনটাই ঠিক সেই সোনার-কাঠি নয় যা ননীগোপালের দরকার। কাজেই তাঁরা ফেল করলেন।"

একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সব আমরা, লায়েক হইয়াছি, সবারই নভেল-নাটকে বদহজমী, দু'একজন আবার নিজেরাই গল্প-নভেলে হাত দিয়াছি; সোনার কাঠি সম্বন্ধে একটা যে সরস প্রশ্ন মুখে ঠেলিয়া আসিতেছিল, প্রকাশ করিবার উপায় না থাকিলেও সেটা নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টিতে একটা উদ্বেগ আর চাঞ্চল্য আনিয়া

থাকিবে ; সেটুকু হেডমাস্টারের দৃষ্টি এড়াইল না, তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভিতরকার কথা ধরিতে পারিলেন না—নূতন কলেজ-ছাড়া মানুষ, কতটা যে লায়েক হইয়াছি সেটা আর আন্দাজ করিতে পারিলেন না।···বলিলেন—"বুঝেছি, অর্থাৎ তোমরা জানতে চাও সে সোনার-কাঠিটা কি হতে পারে। আমি চিন্তা করছি, এখনও ঠিক করতে পারি নি। তবে আমি ঠিক করবই, আর ননীগোপালের মধ্যে কি অদ্ভুত সৌন্দর্যজ্ঞান আছে তা দেখিয়ে আমি সমস্ত স্কুলেকে বিস্মিত আর স্তম্ভিত করে দেব একদিন।"

সেইদিনই সমবেদনা এবং সহকারিতার উপর আর একটা লেকচার দিয়া হেডমাস্টার ননীগোপালকে দূরে সরাইয়া না রাখিয়া আমাদের মধ্যে টানিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। একটু অলঙ্কারের অবতারণা করিয়া বলিলেন—"ওকে তোমাদের বুকের কাছে টেনে নিতে হবে।"···পরদিন হইতে ননীগোপাল প্রথম বেঞ্চের ঠিক মাঝখানটিতে জায়গা পাইল। আমরা কোন রকমে, নাকচোখ বুজিয়া, আর এ দিকে বুকের কাছে স্থান দেওয়ার জন্য বুকে দম আটকাইয়া রাখিযা হেডমাস্টার-কথিত সোনার-কাঠির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই হাব-ভাবে বোঝা গেল হেডমাস্টার পাইয়াছেন সোনার-কাঠির সন্ধান। একদিন আমরা কয়জন একটু আবদার করিয়া ধরিলাম—"স্যার, জিনিসটা কি আমাদের বলতে হবে।"

বলিলেন—"বলতাম, কিন্তু তাতে জিনিসটার আকস্মিকতা নষ্ট হয়ে যাবে।—দুদিন পরেই তোমরা টের পাবে।"

দিন চারেক পরে আমাদের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ ছিল। তাহার আগের দিন ক্লাসেই হেডমাস্টার আমাদের জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য সমাচাব শুনাইলেন, বলিলেন, "তোমরা শুনে আনন্দিত হবে, তোমাদের ক্লাসের পরিচ্ছন্নতার জন্য পুরস্কার এবার শ্রীমান ননীগোপালকে দেওয়া হবে।"

একে তাঁহার জীবনের প্রথম কাজ, তায় একটা ছেলেকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, হেডমাস্টার বেশ আড়ম্বরের সহিত আয়োজনটা করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করাইলেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অম্বিকাবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া সামনের একখানি চেয়ারে বসাইলেন।

ননীগোপালকে দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন যা রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে আর ভুলিব না।

জুতাটার অঙ্গে এই প্রথম ব্রস্কো পড়িয়াছে—শিশি থেকে যেটুকু বাহির করিয়াছিল তাহার অর্ধেকটা খাবলা-খাবলা করিয়া জুতায়, অর্ধেকটা ননীগোপালের দুই হাতে। ফিতার বালাই ছিল না, বেশ ছিল একরকম; পুরস্কারের উপযোগী হইবার জন্য খুঁজিয়া পাতিয়া একখানা কোথা থেকে যোগাড় করিয়াছে, বাকি একটি জুতায় লাল কাপড়ের পাড়। কাপড় আব জামা ফর্সা পরিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে এমন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ বাহির হইতেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় এক দুর্গাষষ্ঠীর দিন ছাড়া আর সেগুলো কখনও আলো-বাতাসের মুখ দেখে নাই। গায়ে আর এবার তেল মাখে নাই, হাত পা মুখে এত খড়ি উঠিতেছে, মনে হয় প্রাইজের কথা শোনার পর হইতে সাবান মাখা ছাড়া ননীগোপাল আর কোন কাজই করে নাই।

সবচেয়ে দেখিবার জিনিস হইয়াছে চুল, দিদিমার কাঁচিতে সমস্ত মাথাটি হইয়াছে একটি লাঙ্গল-দেওয়া ক্ষেতের মত—একটা চুলের লাইন, তাহাব পরই একটা গভীর রেখা, আবার চুলের লাইন, আবার রেখা—এই ভাব। জামার উপর ঘাড়ের টিকিটা কুণ্ডলী পাকাইয়া স্প্রিঙের মত দুলিতেছে।

ননীগোপাল সময়ে আসিতে পারে নাই, যখন তাহার নাম ধরিয়া দ্বিতীয়বার ডাক হইল তখন দেখা গেল হলের শেষ প্রান্তে সে সবে প্রবেশ করিয়াছে। অত্যধিক সাবান মাখার জন্য সর্দি আরও বেশি হইয়াছে, শড়-শড় শব্দ করিতে করিতে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া গেল।

অতগুলো লোকের চোখে এমন উগ্র বিস্ময়ের ভাব আমি আর দেখি নাই, অবশ্য এক হেডমাস্টার ছাড়া।

যতদিন ছিলেন স্কুলে ননীগোপালের প্রসঙ্গ আর মুখে আনেন নাই।

স্কুল-জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে বাল্যসঙ্গীদের সহিত প্রায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ননীগোপালের সহিত মাত্র আর একবার আমার দেখা হইয়াছিল—আমরা উভয়েই তখন বি. এ. থার্ড ইয়ারে পড়িতেছি, আমি কলিকাতায়, ননী-গোপাল একটা মফস্বল কলেজে। আম্বিকাবাবুর সেই ভূতনাথের ভূত। হয়তো কাপড়জামাটা ধোপার বাড়ির মুখ দু'একবার বেশি দেখে, মাথাটাও নিশ্চয় দিদিমার কাঁচির নাগালের বাহিরে উঠিয়াছে; কিন্তু সেই অস্নাত শরীর, সেই ধূলা-ময়লার ছোপ, সেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ, সেই ঘড়-ঘড়ে তরল আওয়াজ, তাহার উপর অপরিচ্ছন্নতার যে অনিবার্য পরিণাম—স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া আসিয়াছে, মুখের

হাড বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার দাড়িগোঁফের আবির্ভাব, পাত্র বুঝিয়া তাহারা যেন আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রোগা শরীরে মাথায় সেই তে-এঁটে ভাবটা আরও স্পষ্ট হইযা উঠিয়াছে।

অনেকদিন পরে বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা, কিন্তু সত্য বলিতে কি, যে আধ-ঘণ্টাটাক ছিলাম যেন দম আটকাইয়া গিয়াছিল। একবাব জিজ্ঞাসাও করিলাম —"দিদিমা এখনও বেঁচে আছে রে ননী ?"

এমনি তো যান্ত্রিক প্রথায় পাস করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কথাবার্তায় সেই যে মূঢতার ভাব সেটা ঘোচে তো নাই-ই, ববং যেন বাড়িয়া গিয়াছে। সেই ঝোলটানা শব্দেব সঙ্গে হাসিতে হাসিতে ননীগোপাল বলিল—"হি-হি-হি, কেমন জিগ্যেস করছে শৈলেন!...দিদিমা বেঁচে আছে ননী ?...হি-হি-হি...মা বাবা বেঁচে আছে কিনা জিগ্যেস করছে না—দিদিমা বেঁচে আছে...হি-হি-হি...হ্যাঁ, সে বুড়ী এখনও কুলগাছ আগলে বসে আছে..."

গা ঘিন ঘিন করিতে লাগিল ; মনে মনে কুলগাছের শিরে বজ্রপাত কামনা করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আর দেখা হয় নাই। বছর দুয়েক পরে একবার খবর পাইলাম ননীগোপালের বিবাহ হইতেছে, এবার মাত্র খবরটাই শুনিয়াই, কেন জানি না, গা-টা আবার ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল।

মাস খানেক পরে শুনিলাম—না, হয় নাই। সব ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর ননীগোপাল কলেজ হোস্টেল থেকে দুইজন সঙ্গী লইয়া মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল।...তাহার পরই কথাবার্তা ভাঙিয়া যায়। ওরাও যে ছেলে দেখিয়া ফেলিবে ননীগোপাল অতটা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

৩

ইহার অল্পাধিক বৎসরখানেক পরে আজ আবার ননীগোপালের সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহার নিকট হইতে আসিয়াই কাহিনীটি লিখিতে বসিয়াছি।

নূতন চাকরি লইয়া এই শহরে সবে আসিয়াছি। একদিন আমার স্টেনোগ্রাফার চিঠি দস্তখত করাইতে করাইতে বলিল—"স্যার, ননীবাবুকে আপনি চেনেন ?"

প্রশ্ন করিলাম—"কোন্ ননীবাবু ?"

পরিচয়ে বুঝিলাম—অম্বিকাবাবুর ভূতনাথ। কিছুমাত্র উৎসাহের ভাব না দেখাইয়া বলিলাম—"চিনি।"

"আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

"হুঁ"—বলিয়া চিঠির বিষয় লইয়া একটা অন্য কথা পাড়িলাম। এবাব বিবাহের কথা নয়, তবুও শরীরটা কেমন ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল। কোথায় থাকে ননী, কি বৃত্তান্ত আর জিজ্ঞাসা করিলাম না। বোধ হয় গা করিলাম না দেখিয়া স্টেনোগ্রাফারও আর কথাটা সেদিন তুলিল না।

তিন চার দিন পরে আবার দস্তখত করাইতে করাইতে বলিল—"স্যার, ননীবাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

ননীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথাটা যে এই ছোকবা জানে এটা আমাব তেমন ভাল লাগে নাই, ননী বোধ হয় তাহার সেই ঝোলটানা হাসিব সহিত বলিয়াও থাকিবে আমরা এক ক্লাসে পডিতাম এক সময়, হয়ত বাডাইয়া এও বলিয়া থাকিবে—খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, দুজনে একসঙ্গে ওঠা বসা বেডানো—ইত্যাদি।...একটু গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করিলাম,—"যেতে বলেছে মানে?"

স্টেনোগ্রাফার অতটা বুঝিল না। বলিল—"আমায় বলতে বললেন, তিনি নিজেই আসতেন তবে ডিউটির টাইম বড বিশ্রী, একেবাবে রাত আটটাব পবে ফেরেন, এ রবিবারে আবার একজনের হযে কাজ করবেন...তার ওপব বাসাটাও এখান থেকে অনেক দূবও কিনা..."

আমার কানে লাগিয়াছিল—'রাত আটটার পরে ফেরেন।'...যেমন অপরিচ্ছন্ন জীবন তেমনি কাজও জুটিয়াছে চমৎকার! কোথায় কবে কাজ সেটা জিজ্ঞাসা কবিতে প্রবৃত্তি হইল না।

প্রশ্নটা কবিয়া কিন্তু মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়া পডিয়াছিলাম, ঠিক বন্ধু না হ'ক, সহপাঠী তো বটে। এ রকম আগ্রহের পর একবার দেখাটা না-কবা ভাল দেখায় না। এ ছোকরাই বা কি মনে করিবে?

ঠিকানাটা লইলাম, বলিলাম—"বলে দিও আমি বাড়িতেই আসব, আজ আর হবে না, কাল রাত্রি আটটার সময়, ওকে কোন ব্যবস্থা করে একটু সকাল সকাল ফিরতে ব'লো।"

বিস্মিত করাই যেন ননীগোপালের জীবনের ধর্ম, কিন্তু এবারে যা বিস্মিত করিল—একেবারে চুড়ান্ত।

বাড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশ একটু দেরি হইল। ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে বলাটা ভুল হয়, ঠিকানায় পৌঁছিয়াই বাড়িটা পাইলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতে না পারায় তাহারই সামনে দিয়া দুই তিনবার ঘুরিয়া গেলাম, তৃতীয়বার যখন ঘুরিয়া আসিয়াছি দেখি একটি প্যাণ্ট আর শার্ট পরা ভদ্রলোক বারান্দায় বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। রাস্তাটায় আরও দুইজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাসা দেখিয়া বুঝিলাম ভদ্রলোক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই, উঠিয়া গিয়া ইংরাজিতেই বলিলাম—"মাফ করবেন, আপনি এ বাসায় কবে এসেছেন জানতে পারি কি ?"

বারান্দায় নীলরঙের শেড দেওয়া নরম বিদ্যুতের বাতি, শেডের ছায়াটা ভদ্রলোকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ঠোঁটে সিগারেট ধরাইয়া ইংরাজিতেই প্রশ্ন করিলেন—"কেন জানতে পারি কি ?"

বাড়িটার উপর আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—"মানে,—খবর পেলাম…ভুল খবর বলেই মনে হচ্ছে এখন…খবর পেলাম যে ননীগোপাল বলে এক ভদ্রলোক এই বাড়িতে·· আপনার আসার আগে "

একটা বারান্দা-ফাটানো হাসিতে সচকিত হইয়া প্রশ্নকারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাসিরও বিরাম নাই।…বাক্‌স্ফূর্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম—"ননীগোপাল না ?"—

"ব'স্" বলিয়া ননীগোপাল আমার ঘাড়ে একটি হাত দিয়া একটা উইকারের গদি-আঁটা চেয়ারে বসাইয়া নিজেও বসিল। তার পর মাঝে মাঝে হাসির ছুট দিয়া খানিকটা অনর্গল বকিয়া গেল। "আমি জানতাম এই রকম হবে। বাড়ি ঢুকেই চাকরটাকে বারান্দায় বসিয়ে বলে দিলাম—'আমি এখুনি কাপড় ছেড়ে আসছি, কোন বাবু যদি আসে তো বসিয়ে খবর দিবি আমায়'…জুতো খুলে স্লিপারটা পায়ে দিয়ে টাইয়ের নট্‌টা খুলতে খুলতে মনে হল, না নিজেই গিয়ে বসি বাইরে·· সে বোধ হয় বারান্দার টেবিলে, চেয়ার ফুলের টব দেখেই মানে মানে সরে পড়বে।…যা ভেবেছি ঠিক তাই,—এসে বসেছি, আর তুইও যেন নিশিতে পাওয়ার মতন ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে চাইতে…উঃ! সত্যি, তোর অবস্থাটা মনে হচ্ছে, আর…"

উচ্চ প্রাণখোলা হাসিতে আবার সমস্ত জায়গাটা চকিত করিয়া তুলিল।

বিমূঢ়ভাবেই চাহিয়া আছি, হাসিতে একটু যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি, ঠোঁটে মিলাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে।…ননীগোপালই!—পরিষ্কার করিয়া কামানো ভরাট, নিটোল মুখ, একটু বোধ হয় বেশি খর্ব করিয়াই ছাঁটানো চুলে

পরিষ্কার টেড়ি, গায়ে ধপ-ধপে সিল্কটুইলের হাফ শার্ট, ম্যাটেড বেল্ট দিয়া আঁটা শার্টিনটুইলের ধপ-ধপে প্যাণ্ট।...তেল আর ভাল সাবানের সামঞ্জস্যে গায়ের রংটা কালো হইয়াও এত স্নিগ্ধ যে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।...

ননীগোপাল বলিয়া যাইতেছে—"আমিও বেশিদিন এখানে আসি নি। গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে চাকরিটা পেয়ে এইখানে প্রথম পোস্টিং, তার আগে·· এই দেখ বোকামি! নিজের কথা বলতেই···তুই সিগারেট খাস তো?···নে ধরা···"

নিজেই দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল। নিজের সিগারেটে দুটো দ্রুত টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল—"সত্যি তোকে দেখে এত আনন্দ হয়েছে শৈলেন —কোনটে আগে বলব কোনটে পরে, গোলমাল করে ফেলছি।···এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল ভাই জীবনে···সে সব বোধ হয় বিশ্বাসই করতে পারবি নি···রোম্যান্স!—অকস্মাৎ!—অপ্রত্যাশিত ভাবে! ননের বরাতে রোম্যান্স!—কুড ইউ থিঙ্ক্?"

বিমূঢ় ভাবটা কোনমতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না: ননীগোপালের দিকে চাহিয়া যান্ত্রিকভাবে আস্তে আস্তে সিগারেট টানিয়া যাইতেছি।···ভাবিতেছি —কোথায় গেল সেই ঘড়-ঘড়ানি শড-শড়ানি; প্রতি-কথায় সেই ঝোলটানা শব্দ? কি করিয়াই বা গেল? আর কবেই বা গেল?—এই তো এক বছরের আগে পর্যন্ত খবর ননীগোপাল একেবারে আ-ভাঙাই রহিয়াছে···আর এই কথার স্রোত মুখ দিয়া একটা না বাহির করিতে যে-ননীগোপাল হিম-শিম খাইয়া যাইত!

ননীগোপাল বোধ হয় নিজের ঝোঁকেই বলিয়া যাইতেছিল, আমার অবস্থাটা অতটা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই। একেবার হঠাৎ থামিয়া বলিল, "ওরে বুঝেছি, তুই ছোঁড়া বিশ্বাসই করতে পারছিস না এখনও—অম্বিকাবাবুর ভূতো কি করে অখিলবাবুর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠল।"

হাসিয়া উঠিয়াই ভিতর বাড়ির দিকে চাপিয়া বলিল, "ওগো, তোমাকে একবার শীগগির আসতে হবে চা-টা'এর হাঙ্গাম ঠাকুরের হাতে ছেড়ে···সোনার-কাঠি না দেখলে ও বিশ্বাস করতে পারছে না যে···নাঃ উঠতে হল···

উঠিয়া অগ্রসর হইবার আগেই একটি তরুণী ধীরে আসিয়া আমায় নমস্কার করিল। খুব সুন্দর না হইলেও খুব শ্রীমন্ত, বয়স সতের-আঠার হইবে, সাজসজ্জার বাহুল্য নাই, তবে রুচি যে মার্জিত,—সেটা শুধু কাপড়ের পাড়টুকুর কথা ধরিলেও বোঝা যায়।

সবচেয়ে চমৎকার সপ্রতিভ মুক্ত ভাবটি। আড়ষ্ট ভাবটা অল্প সময়েই কাটিয়া

গিয়া আমাদের আলাপ বহুকালপরিচিতের মতই জমিয়া উঠিল।...ননীগোপাল একবার বলিল,—"আমার বৌকে তা বলে বেহায়া ভাবিস নি শৈলেন, আজ চারদিন থেকে আমাদের মহলা চলছে—শৈলেন এলে ওকে কি ভাবে কথা কইতে হবে..."

বৌ বাধা দিয়া বলিল, "এক বর্ণও বিশ্বাস করবেন না। কথা কইবার জন্যে সবারই জিভ জড়িয়ে যায় না, তার জন্যে মহলা দিতে হয় না..."

মুখ ঘুরাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

ননীগোপাল বলিল..."শৈলেন, এটা তোকে সোনার-কাঠির কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে...আত্মশ্লাঘা..."

বলিলাম—"শ্লাঘার দোষ দিই না ননী; আর সব নয় হল, তোর মাথায় তিনটে আঁটি পর্যন্ত কি করে মিলিয়ে দিয়েছেন, তাই ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি আমি সেই থেকে .."

তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বৌ সেটাকে কতকটা সংহত করিয়া লইয়া চেয়ারের পিঠের দিকে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়াছে—একটা চাকর পরিষ্কার কাঁথায় একটা নবনীর মত মাস আষ্টেকের শিশু বহন করিয়া আনিয়া বলিল—"কোন মতেই আর থাকতে চাইছে না মাইজী।"

আরও গল্প হইল। ননী-দম্পতি না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। বৌ আয়োজনে চলিয়া গেলে সোনার-কাঠির রোম্যান্সের কথাও শুনিলাম, কিন্তু সেটা এ-কাহিনীর পক্ষে অবান্তর বলিয়া আপাতত অপ্রকাশ রাখিলাম।

আলোর নীচে

রবিবারের আলস্য-মজলিসে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যের সাতাশী বৎসর বয়সে বিপত্নীক মরিবার কথা উঠিল। অত বয়সে বিপত্নীক অবস্থায় মরা খুব স্বাভাবিক নিশ্চয়, কিন্তু সেই সময় খবরের কাগজগুলা কি একটা কারণে বাল্য-বিবাহের দোষ-গুণ লইয়া আপোষের মধ্যে খুব গালাগালি করিতেছিল, তাই যে যে-কাগজের ভক্ত সে সেই-কাগজের মত সমর্থন করিয়া এই সামান্য বিষয়টা লইয়াই দুইটা দল খাড়া করিয়া লইল। ক্রমে দিগম্বর বাঁড়ুজ্যে ও বাল্যবিবাহ ছাড়িয়া তর্কটা নিছক বিদ্রূপ এবং গালাগালির কোঠায় নামিয়া আসিল। সদাশিব চক্রবর্তীর

রকের উপর যে রৌদ্রটা প্রথমে বেশ মিঠা ঠেকিতেছিল সেইটাই ক্ষণেকের মধ্যে তার্কিকগুলির কপালের শিরা ফুলাইয়া তাহাদের উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ চলিল। রাস্তার উপর বটুক বাবুদের সহিস, পাড়ার গোটাকতক ছেলেমেয়ে, একজন ঝাড়ুদার, একটা ঝালচানাওয়ালা, একটা হিং-ফিরিওয়ালা কাবুলী প্রভৃতি লইয়া একটা মাঝারি গোছের ভিড জমিয়া গেল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠিক হইল—পাড়ায় একটা 'বাল্যবিবাহ-রোধিনী সভা' হওয়া দরকার। চাঁদার অভাবে পাড়াব থিয়েটারের আখডাটা অনেক দিনই উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া কোনও হুজুগ নাই, সুতরাং বিপক্ষ দলেরও কেহ খুব বেশি আপত্তি করিল না। কেহ বলিল—"তর্ক তর্কের খাতিরে করছিলাম —তার সঙ্গে সভার কি সম্বন্ধ আছে?" কেহ বলিল—"বাল্য-বিবাহ মানে বুঝি কচি খুকির বিয়ে, তা তো রুখতেই হবে।" একজন জোর দিয়া বলিল —"ঐটেকেই বছরখানেকের মধ্যে বাল্যবিবাহ-সাধিনী সভায় দাঁড করাব, আরম্ভ তো কর।" সদাশিব চক্রবর্তী ছোট মেয়ের পাছাপেডে আটহাতি ডুরে শাডিটি পরিয়া হুঁকা হাতে এই মজলিসেই বসিয়া গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে যোগান দিয়া তর্কটিকে চালিত করিয়া আসিতেছিলেন। নিজের বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হইবে, সুতরাং তাঁহার কথার আজ দাম ছিল। মীমাংসা হইয়া গেলে হুঁকাটি দেওয়ালে হেলাইয়া রাখিয়া বলিলেন—"এ তো অতি উত্তম কথা; তোমরা আমার বাইরেব ঘরটিতেই লাগিয়ে দাও না, কে মানা করে? তবে ঐ এক কথা রে দাদা, রাখতে পারা চাই; নইলে শুধু…"

সতীনাথ মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"আলবৎ থাকবে—আপনাকে কিন্তু সভাপতি হতে হবে চক্কোত্তী মশায়; অন্তত প্রথম বছরটা সামলে দিতেই হবে।"

সকলের নিকট হইতে অনুমোদনের একটা অব্যক্ত রব উঠিল।

চক্রবর্তী মহাশয় উৎসাহের সহিত বলিলেন—"সে কি কথা!—দরকার পডে হব বৈ কি, এতগুলো ইয়ংম্যানের উৎসাহ!…"

হারাধনের এ দিকে তেমন মন ছিল না। তর্কের মধ্যে সে যে একটি মোক্ষম উত্তর পাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল, তাহারই একটা লাগসই জবাব খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে মনে মনে হয়রান হইতেছিল। বাহির বা একটা উত্তর

শেষ পর্যন্ত পায়, তাহা হইলেও বিতণ্ডা থামিয়া যাইবার পর দিলে বড় বেখাপ্পা হইয়া পড়িবে ভাবিয়া সে তর্কটিকে সজীব রাখিবার জন্য বলিল—"তা সভা করবেন করুন চক্কোত্তী মশায় ; কিন্তু ছেলেবেলায় বিয়ে করেছিলেন বলেই যে দিগম্বর ঠাকুদ্দা—আপনার গিয়ে সাতানব্বই বছরে বিপত্নীক মারা গেলেন এ কথা আমায় বিশ্বাস করাতে পারলেন না। এর পরে কোন্ দিন আপনারা বলে বসবেন ওঁর বাড়ির দেয়ালটা যে ভূমিকম্পে পড়ে যায়, সেও ছেলেবেলায় বিয়ে করেছিলেন বলে"—বলিয়া, তাহাকে থাবা দিয়া যে থামাইয়া দিয়াছিল সেই সতীনাথের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিল।

সতীনাথ উঠিবার পূর্বসূচনাস্বরূপ আড়ম্বরের সহিত একবার আলস্য ভাঙিবার আয়োজন করিতেছিল, মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটু হাসিল, তাহার পর খুব গম্ভীর ভাবে কহিল—"যদি আপানার কথাই ধরে নেওয়া যায় হারাধনবাবু, তা হলেও বাল্যবিবাহের জন্যে কত বাড়ির শুধু পশ্চিম কেন, পূব, উত্তর, দক্ষিণ—সব দিকেরই দেয়াল ভেঙে যে কত দারিদ্র্যের বান ঢুকেছে তার আর হিসেব হয় না। বাল্যবিবাহ সমর্থন করবার আগে যদি ও ব্যাপারগুলোর একটু খোঁজ করে দেখতেন তো মিছে তর্কের ওপর নিজেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মে উঠত—আর—আর—মিছে তর্ক করেন বলে নিজের ওপরেও..."

এক দিকে যেমন 'বাহবা'-সূচক ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী কতকগুলা কথায় রব উঠিল, অন্যদিকে তেমনি পরাজয়ের উত্তেজনা মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। দলটা ভাঙ-ভাঙ হইতেছিল, তর্কের গন্ধ পাইয়া আবার গুছাইয়া বসিল। হারাধনের একে তো প্রথম উত্তরেরই জবাব দেওয়া হয় নাই, তাহাতে আবার এবারের তর্কের শেষ দিকটায় এই খোঁচা,—সে তর্কের আর ধার দিয়াও গেল না, হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল—"আরে রেখে দিন আপনাদের ওসব বোগাস—ইয়ে ; আমার সভা-টভায় বিশ্বাস নেই। এতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার যত দেয়াল বাল্যবিবাহের দোষে ভেঙে পড়েছে, এইবার না হয় আপনাদের গলাবাজির চোটে পড়বে,—ফল একই..."

সদাশিব কিসের জন্য একটু ভিতরে গিয়াছিলেন। আটহাতি পাছাপেড়ে ডুরের খর্ব কোঁচাটি দুলাইতে দুলাইতে হুঁকা হাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"আবার কি হল ?.. তোমরা সব নেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এস, তর্ক করবার জন্যে তো সমস্ত দিনটাই পড়ে রয়েছে..."

ফেলারাম সমস্ত তর্কের মধ্যে ছাঁকিয়া শুধু এই কথাটি ধীরে ধীরে বলিল—"বিশেষ কিছু হয় নি, আমাদের হারাধনবাবুর সভা-টভায় আর তেমন বিশ্বাস নেই—সেই কথা বলছিলেন"—বলিয়া একবার নির্লিপ্ত ভাবে হারাধনের পানে চাহিল এবং পরে স্বপক্ষীয়দের পানে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল।

সদাশিবের ঠিক এই সময়টিতে যোগদান করিতে হয়; কারণ, দেখা গেল, হারাধনের মুখে এক খণ্ড কাল মেঘ উঠিয়াছে এবং যে ঝড উঠিবে তাহাতে ভদ্রোচিত যাহা কিছু সমস্তই উডাইয়া লইয়া যাইবে।

"খুব ঠিক কথা, শুধু হারাধনের কেন, আমারও তো নেই বিশ্বাস—" বলিযা তিনি ফডাৎ ফডাৎ করিয়া হুঁকায় বড বড টান দিতে লাগিলেন।

গজানন, সতীনাথ, গিরিজা, নেপাল, কয়েকজন উৎসাহী প্রবাসী ছাত্র—যেমন নোয়াখালির রমেন্দ্রচন্দ্র এবং কটকের জগবন্ধু—এককথায় দলের বেশিব ভাগই প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চটিয়া উঠিল এবং প্রশ্ন করিল—"যদি বিশ্বাসই নেই তো সভার জন্যে ঘব ছেডে দিতে গেলেন কেন চক্কোত্তী মশায়? হ্যাঁ…।"

—"তোমরা সভা কবে, সভার কাজ দেখিয়ে আমাদের বিশ্বাস জাগাবে বলে, আমাদের ঘাড ধরে বিশ্বাস করাবে বলে। যতক্ষণ সভাই নেই ততক্ষণ বিশ্বাস আবার করব কি হ্যা?"—বলিয়া হারাধনের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন—"কেমন, এই তো হে হারাধন বাবু?—যে যে-ভাবেই কথা বল রে দাদা, চক্কোত্তী মশায় টেনে বের করবেই করবে।"

উভয় দলেরই মনের কালিমা অনেকটা কাটিয়া গেল। রাগের মাথায় যে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল তাহার এমন সদর্থ হইয়া গেল দেখিয়া হারাধনও হাসিয়া সেটা স্বীকার কবিয়া লইল, বলিল—"অনেকটা তাই; মোট কথাটা কি জানেন চক্কোত্তী মশায়—আপনাদের মত একটা বিচক্ষণ মুরুব্বী লোক থাকলে সভা-সমিতিতে থাকতে রাজি আছি, নৈলে শুধু ছ্যাবলামি…"

বাবো জোডা চোখের মধ্যে বোধ হয় আট জোড়া চোখ ক্ষুধিতভাবে হারাধনের দিকে চাহিয়া ছিল—তাহার কথাটা থামিলে হয়—

থামিবার পূর্বেই হারাধন অপ্রতিপ্রিয় বিদ্রূপে জর্জরিত হইয়া উঠিল—"যা হ'ক হারাধন একটি মুরুব্বী সঙ্গী পেলে"—"আহ্বা, ভ-ভা-ভাগিস্ রাজি হো—লে হা-হা-হারাধন"—"ওঃ, কি- মস্তবড—বিচক্ষণ লোকটাই না রে আমার!"

কেবলা বলিল—"বলি, ছ্যাবলামি কি রে হেরো—কথাটার মানে জানিস ?" একজন বলিল—"বানান করুন তো দেখি ?" আর একজন বলিল—"সন্ধি বিচ্ছেদ…"

সদাশিবের ছোট মেয়েটি বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দোরের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়াই আবার ভিতরের পানে তাকাইয়া ছোট ভাইকে ডাকিল—"ওরে খেনো, আবার লেগে গেছে—দেখসে।"

সদাশিব তাহাকে ধমক দিযা বলিলেন—"তোর মেয়েব নিকুচি করেছে! ভেতরে যাঃ, তামাসা পেয়েছেন…"

আহূত ছেলেটি দুই হাতের মাঝখানে দুইটি খ্যাংরা কাঠি একত্র করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে—'নালোদ্, নালোদ্' করিয়া দিদির জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। ধমক খাইযা সেও চলিয়া গেলে বাড়ির বাচ্চা কুকুরটা ছুটিয়া আসিয়া চৌকাঠের উপর পা তুলিয়া দিয়া গলা উঁচাইয়া ব্যাপারটা কি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হারাধনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে চামড়ার জালের হাল-ফ্যাশানের হালকা চটি জোড়াটা টানিতে টানিতে গোঁ হইয়া চলিয়া গেল—কাহারও আহ্বান—এমন কি চক্রবর্তী মহাশয়ের হুঁকাটা একবার ঘরে 'রাখিয়া' দিয়া যাইবার অনুরোধটাও গ্রাহ্য করিল না।

সে চলিয়া গেলে হুঁকাটাতে দু'টা টান দিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"নাঃ, এ বড অন্যায় তোমাদের…"

"কিসে অন্যায় ?"—"অন্যায়টা কার ?"—"গাজুরি কথা এখানে খাটবে না।"—প্রভৃতি কতক প্রশ্ন ও অভিমতের আকারে তর্কটা আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ভদ্রলোক আসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতে তিনি হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা ও সব আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে'খন, তোমরা এখন নেয়ে খেয়ে নাওগে…এই যে আসুন মোক্তার মশায়—খবর ভাল তো ?…"

২

লোকটি আধসেরা-তালা-লাগানো ক্যাম্বিসের পেটফোলা একটা ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিল।

লিকলিকে খর্বাকৃতি, অথচ শরীরের অনুপাতে মুখটা এবং মুখের অনুপাতে

নাকটা বেজায় বড়—অনেকটা কার্বাইডের বিজ্ঞাপন-চিত্রের মত। খুব ধূর্ত বলিয়া বোধ হয়। গম্ভীর ভাব হইতে হঠাৎ হাসি এবং হাসির মধ্যে গাম্ভীর্য আনিয়া ফেলিবার লোকটার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে,—আবার হাসিলে, বর্তুল নাসিকাটির উপর একটা টান পড়িয়া ধারাল অগ্রভাগটি ঠোঁটের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাতে তাহাকে আরও বেশি করিয়া ধূর্ত দেখায়। কথা কয় চারিদিকে নজর রাখিয়া, আর উচ্চ গলায় কথা কহিতে কহিতে এক এক জায়গায় আওয়াজ এমন নামাইয়া ফেলে যে, শ্রোতার নিকট বিষয়টির গুরুত্ব চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, হাঁ আল্‌বৎ, মোক্তার বলি তো এ'কেই—চেহারায় মোক্তারি, চালে মোক্তারি, কথায় মোক্তারি, এমন কি হাসিটিও মোক্তারিতে মাখানো!…

লোকটি কিন্তু মোক্তার নয়, ঘটক। চক্রবর্তী মহাশয় যে সে কথাও জানিতেন না এমন নয়, তবে আর কেহ—বিশেষ করিয়া পাড়ার ছেলে ছোকরারা কথাটা জানিয়া ফেলে এটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

চক্রবর্তী মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া একটি অষ্টাবক্র চেয়ারের উপর উপবেশন করিলেন এবং সপ্রশ্ন নেত্রে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সে প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া মুখোমুখি হইয়া একটি চৌকির উপর বসিল এবং শুকনো গলায় এক গাল হাসিয়া বলিল—"মোক্তার!—তা খুব এক চাল চেলেছেন ছোঁড়াদের কাছে। বেটারা ঘটক দেখলে যেন ছিঁড়ে খেতে চায়। বলিহারি বুদ্ধি আপনার…" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া চাপা গলায়—"তা আমি তো সেই কথাই মেয়ের মাকে বললুম—বলি, বয়েস যদি হয়েই থাকে একটু, বুদ্ধি কিন্তু এখনও যুবোর মত ধারাল।"

চক্রবর্তী মহাশয় গদগদ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"তা মোক্তার নয়-ই বা কিসে? প্রজাপতির আদালতে তোমরাই তো ত্রাণকর্তা, সদু চক্কোত্তী কখনও ভুল বলে না। আসল কথা কি জান রে ভায়া?—পাড়ার এই অখণ্ডে বেটারা পাঁচ পাঁচটা সম্বন্ধ ভেঙেছে, তাই আর ঘটক নামটা উচ্চারণ করা সুযুক্তি মনে করি না। এখন চেষ্টায় আছি ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই রস্তা দেখাব। সবার মাথায় ঢুকেছে 'বাল্যবিবাহ-রোধিনী সভা' করতে হবে। খুব তাতিয়ে দিয়েছি, বললুম, সে তোমরা আমার ঘরেই কর না কেন…মহা খুশি! এক কথায় সভাপতি পর্যন্ত হয়ে গেলাম।—হ্যাঁ, তা হবু-শাশুড়ী কি বললেন তাতে?"

"ধুর্জটি ঘটক যখন আসরে নেমেছে তখন বিয়ের আর বাকি নেই জেনে রাখবেন দাদা। কথার চোটে একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে এসেছি; মাগী তো আজ হলে আর কাল চায় না। তবে কি জানেন?—কিছু চায় মোটা রকম; বলে—'এই ন্যাটাটা চুকিয়ে একেবাবে কাশীবাসী হব, ঘটকঠাকুর। তা কর্তা তো কিছুই বেখে যেতে পারেন নি, এখন জামাই-ই হবেন আমার ভরসা'—বলে কাঁদতে লাগল…"

চক্রবর্তী মহাশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আহা, কান্না কেন, চক্রবর্তী কি পেছপাও কিছুতে? তাঁরই তো সব, আমি তো সেবক মাত্র—দাসানুদাস।" কন্যাব মাকে মাগী বলিয়া আরম্ভ করিলেও ভাবী জামাইয়ের দরদ দেখিয়া ঘটক একটু থতমত খাইয়া গেল, সে স্বর বদলাইয়া ফেলিয়া তাহার সেই নাকটানা হাসি হাসিযা বলিল, "ঠিক সেই কথাই তো আমি বললাম তাঁকে, বলি—'আপনি সে-বিষয়ে কোন ভাবনা রাখবেন না, সদাশিব চক্কোত্তীব বুকেব পাটা আছে, বড কপালজোরেই এমন সর্বগুণান্বিত জামাই পেয়েছেন আপনি।' তবে একটা বড গোল হয়েছে—" বলিয়া সে অতি নিঃশব্দ গতিতে গিয়া ভেজানো দুয়ারটা সামান্য খুলিল এবং গলা বাডাইয়া বাহিবটা তত্ত্বাবধান করিয়া আবার দুয়ারটি ভেজাইয়া চৌকিতে আসিয়া বসিল। গম্ভীর ভাবে বলিল—"ধুর্জটি ঘটকের সব কাজই এই রকম আটঘাট বেঁধে। আজকাল আর আপনার-আমার যুগ নয়, চক্কোত্তী মশায় যে, কথা শুনব তো বুক ঠুকে সামনে দাঁডিয়ে; কে জানে দোরের আডালে পাড়ার পাঁচ জোডা কান পাতা রয়েছে কি না—কি বলছিলাম হ্যাঁ, এক জায়গায় একটু গোল বেধেছে—" চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া—"বেধেছে একটু গোল…"

উদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ারটা আরও নিকটে টানিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"কি, কি? আবার গোল কিসের?"

"ঐ যে বললাম—আর আপনার-আমার যুগ নেই দাদা, যে, বাপ মা ধরে-বেঁধে, কানা খোঁড়া যা একটা গলায় লট্‌কে দিলে তাই শিরোধার্য। এখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব 'লব' ঢুকেছে। সে যুগে একটা বিদ্যেসুন্দর হয়েছিল, তাতেই পুঁথি লেখা হয়ে গেল; এখন ঘরে ঘরে বিদ্যেসুন্দরের হুড়োহুড়ি—"

"আঃ, কি হয়েছে বল না ছাই—" চক্রবর্তী মহাশয় ঘটকের মুখের উপর উবুড় হইয়া পড়িলেন।

ঘটক গলাটা এত নামাইয়া লইল যে, চক্রবর্তী মহাশয়ের অত কাছে থাকিয়াও শোনা দুষ্কর হইয়া উঠিল। বলিল—"মাগী—ইয়ে, ঠাকরুনের দূর সম্পর্কে এক কুটুম্বের ছেলে—সেই যে বলে না ?—সইয়ের-বৌয়ের-বকুল-ফুলের-ভাইপো-বৌয়ের-বোনপো-জামাই—সেই গোছের আর কি! তিনি নাকি ঘন ঘন যাওয়া-আসা লাগিয়েছেন…"

"সত্যি নাকি ? তা হবু-শাশুড়ীর কি মত ?"

"যদি শম্মা না থাকত তো হবু-শাশুড়ী যে কার হবু-শাশুড়ী হতেন বলা যায় না—তবে…"

"কি করলেন আপনি ?"

এখানে আর চাপা গলায় কুলাইল না; অনেকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াই ঘটক বেশ স্পষ্ট গলায় বলিল—"বললে আত্মশ্লাঘা করা হয় দাদা, এই ধূর্জটি ঘটকেরই প্রপিতামহ সিদ্বু ঘটক একদিন ঘাটের মড়ার হাতে গৌরীদান করিয়েছিল। আজ ধর্মের সে জোরও নেই, কুলীনের সে মর্যাদাও নেই। সিদ্বু ঘটকের সামনে যারা তটস্থ থাকত, তাদেরই নাতি-নাতকুড়েরা একটু বি-এল-এ রে করতে শিখে আজ আমায় 'সিন্ধুঘোটকের পৌত্তুর' বলে ঠাট্টা করে, বাড়ির দেয়ালে গোবর দিয়ে লিখে দিয়ে যায়। আচ্ছা, দিক্, ধম্মের জয় একদিন না একদিন হবেই—" সদাশিব একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলিলেন—"ধর্মই তো আমাদের ভরসা রে দাদা, তা কি করলে তুমি ?"

"দু'তরফেই একটু ভুজং দিয়ে তো আপাতত ঠাণ্ডা করে এসেছি, এখন আপনার কপাল আর আমার হাত-যশ। কনের মাকে বললাম—'দেখ ঠাকরুন, ভাল চাও তো ঐ পীরিত-টিরিতের হাত থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখ—যত নষ্টের কু ঐ সব। এই করে করে বয়েস খোয়ালাম, আমার তো জানতে বাকি নেই—কলেজে পড়বার সময় আজকালকার চ্যাংড়াদের ঘাড়ে ও-একটা ভূত চাপে, ডাক্তারেরা যাকে বলে হিস্টিরিয়া—তার পর পাশ-টাশ করলে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ নিয়ে যখন ঘটক যাওয়া-আসা করে, তখন মেজাজ যায় উল্টে, তখন কে কার কড়ি ধারে ? এই করে করে কত গেরস্ত ঘরের সব্বনাশ হয়ে গেল, তা আর ঘরের কোণে বসে তোমরা কি বুঝবে ? তা ভিন্ন পীরিত করে ছেলের পেট না হয় খানিকটা ভরল, ছেলের বাপ-মায়ের জন্যে তো চাঁদির খোরাক চাই—সে তুমি গরিব লোক কোথা থেকে যোগাবে ? পার যোগাতে, বল না, আমিই আজ ঘটকালি করছি। তা ভিন্ন, ধর যেন

সবই ঠিক হয়ে গেল—সাত মণ তেলও পুড়ল, রাধাও নাচল—কিন্তু চক্কোত্তী ঠাকুরের মত ছেলের বাপ তো উল্টে তোমার পায়ে টাকা ঢালছেন না যে, নিশ্চিন্দি হয়ে কাশীবাসী হবে।'…তা ভিন্ন, সে অনেক কথা—এখন আর মনে পড়ছে না। শেষকালে বলে এলাম—'না পেত্তয় হয় তোমার, সাত দিনের মধ্যে তোমার কাছে পাঁচশো টাকা আগাম হাজির করছি। সোনার চাঁদ জামাই হবে; মোহে ভুলে হাতের রতন'…"

"একেবারে পাঁচ-শো টাকা কবলে এলে?—তা. সে-মাগী কি বললে?"

টাকার কথাটা তুলিয়া ঘটক খুব সতর্কই ছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ভাবী শাশুড়ী ঠাকরুন আপনার দরদী মেয়েমানুষ, দাদা; বললেন—'না, সে কি কথা, ঘটক ঠাকুর!—যাঁর হাতে মেয়ে দোব, তাঁকে পেত্তয় যাব না!—আর আপনার মত লোক যখন মাঝখানে রয়েছে!—তবে কি জানেন, শ' খানেক টাকা এখন পেলে'—একবার চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখের পানে চকিতে চাহিয়া লইল এবং তাহাতে আবার প্রীতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বলিল—'শ' খানেক টাকা এখন পেলে বড় উব্‌গার হত। অমন জামাইয়ের যুগ্যি তো কিছুই করা হবে না, মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে: তবুও মামুলী বরাভরণ-টরাভরণগুলোর একটু আয়োজন করতে হবে তো'…"

চক্রবর্তী মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; ভাঙা চেয়ারটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"আরে সে তুমি একশ' কেন, আরও নিয়ে যাও না—বিশ পঁচিশ যা হয়। তিনি যদি পাঁচশ' টাকাই চাই—হুকুম করতেন তো কি আর আটকাত? এখনই সবই তো তাঁর মেয়েরই—"

ঘটক আনন্দে '*হেঁ-হেঁ*' করিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল, এবং হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে টানা নাকের ডগাটা চক্‌চক্ করিতে লাগিল। চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"তার পর সেই রসিকরাজ নাগরটিকে কি বললেন?—ঠাণ্ডা করলেন কি বলে?"

ঘটকের হাসির মাত্রাটা আরও উৎকট রকম বাড়িয়া গেল। তাহারই মাঝে মাঝে থামিয়া থামিয়া বলিল—"দাদা এত হাসাতেও পারেন—বলেন কিনা—'রসিকরাজ নাগর'! না দাদা, আপনি এত দুঃখের কথায় আর হাসাবেন না—পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে—ওঃ—এত হাসাতেও পারেন আপনি—বলেন কি না—'রসিকরাজ'!"

হঠাৎ স্বরটা আবার একেবারে খাদে নামাইয়া কহিল—"আমি করলাম কি বলতে পারি দাদা?—যাঁর কাজ তিনিই করে যাচ্ছেন। আমি আর কে?—নিমিত্ত মাত্র বৈ তো নয়।...প্রথমত গিয়ে তার বাপকে ধরলাম, বললাম—'এমন সোনার চাঁদ ছেলে আপনার—রূপে কাত্তিক, গুণে গণপতি—বাজারে পড়তে পাবে না; আর সেই ছেলেকে, এমন বিচক্ষণ লোক হয়ে কিনা ঐ হাঘরে মাগীর জামাই করতে যাচ্ছেন!,...খুব একচোট চড়িয়ে দিলাম আর কি...বললাম—'মেয়ে সুন্দর?—আমি ভার নিচ্ছি—হুকুম করুন, ডানা-কাটা পরী এনে হাজির করছি—দুদিকে দুটো হীরের ডানা বসিয়ে'...লোকটি বড় নিরীহ; বলে, 'ঘটক মশায়, সবই বুঝি, তবে অসহায় মেয়েমানুষ, আমাদেরই ঘাড়ে এসে পড়েছে' বললাম—আপনি আমার ঘাড়ে ঝেড়ে ফেলুন, আমরা রয়েছি কি করতে? আগে ও-মেয়ের ব্যবস্থা করে তবে আপনার ছেলের জন্যে লাগব। অমন ছেলে, যদি কম-সে-কম হাজার দশেক টাকা সিন্দুকে না উঠল তো আর হল কি? হাজার খানেক তো আমিই বিদেয় বলে শুনে নোব—করুকরে...'

বুড়োর মুখ দিয়ে নাল পড়তে লাগল দাদা,—যাকে বলে রীতিমত নাল পড়তে লাগল। বললে—'তা হলে, যদি সামলে নিতে পারেন ঘটক মশায়, তো দেখুন; আমি তো পাকা কথা দিই নি,—বলেছি 'যদি অন্যত্র না হয় তো আমার ছেলে দোব...' "

ঘটক কিরূপ প্রভাবটা হইতেছে লক্ষ্য করিবার জন্য একটু থামিল, তাহার পর উৎসাহের সহিত বলিয়া চলিল—"তার পর গেলাম খোঁজে সেই ছোকরার কাছে। প্রথমত সেই সইয়ের-বৌয়ের-বকুলফুলের সম্বন্ধটা ধরে বললাম—'বাবাজি, তোমার গিয়ে 'লব্' জিনিসটা ভাল, কিন্তু তোমাদের যে সম্বন্ধে আটকাচ্ছে তার খোঁজ রাখ? তোমরা তো বেদ-বেদান্ত ঘটক-পুরুত কিছুই মান না, তা বলে কি বোনের সঙ্গে বিয়ে করতে হবে? তবে অন্য সব জেতেরাই বা কি দোষ করেছে?' শুনে চুপ করে একটু হাসলে। দেখলাম, ওষুধ ধরেছে। একটু মিথ্যে কথা জুড়ে দিলাম—ধর্ম্মের জন্যে সবই করতে হয়, দাদা; বললাম—'আর এক কথা, বাবাজি, তোমরা ছেলেমানুষ, অত মারপ্যাঁচ বোঝ না;—মাগী যে এদিকে আমার পাত্তোরের কাছে হাজার টাকা খেয়ে দলিল পত্তর করে বসে আছে। কুটুম্বের ছেলে, এক গ্রামে থাক তাতে আবার, কাজেই চক্ষুলজ্জায় খাতিরে কিছু বলতে পারছে না।

তুমি যখন মাঝ-দরিয়ায় গিয়ে পড়বে সেইসময় ভরাডুবি করবে'…কে হ্যা, দোর ঠেল? একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে,—চক্কোত্তী মশায় বিশেষ ব্যস্ত একটি মকদ্দমার কথা নিয়ে…ও, আপনার সেই বাচ্চা কুকুরটা।—ব্যাটা সব্বঘটে আছে ·" উঠিয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া—বলিতে লাগিল—"কি যে বলছিলাম?—'হ্যাঁ তুমি 'লব-লব' করে যখন মাঝদরিয়ায় সেই সময় ভরাডুবি করবে, মহা জাঁহাবাজ মাগী'…শুনে তো বাছার মুখটি এতটুকু হয়ে গেল। বলে—'ঘটক মশায়, ওর মনে যে এত আছে কে জানে বলুন,—তা হলে ও-বাড়ির ছায়া মাড়ানো নয়'…মনে মনে বললাম—'পথে এস বাছাধন; এ ধুর্জটি ঘটক, হুঁ।'· "

চক্রবর্তী মহাশয়ের হঠাৎ চমক ভাঙিল—"ওরে তামাক দিয়ে যা না রে! দেখেছ, কারুর কি আর চাড় আছে বাড়িতে, ভায়া?—সাধ করে কি আবার একটি 'সংসার' আনতে চাই? বাড়িতে একটা গণ্যিমান্যি লোক এলে, একটু খোঁজ খবর নেবার-ও মানুষ নেই একটা…"

ঘটক শশব্যস্তে বলিল—'থাক্ থাক্, কিসের এত তাড়াতাড়ি দাদা, না—না, আপনি অত ব্যস্ত হয়ে আমায় অপরাধী করবেন না। আমার প্রতিজ্ঞা যে, যতদিন না দিদি ঠাকরুনকে, ঘরের লক্ষ্মী করে আনতে পারছি, ততদিন পান তামাকের নামগন্ধ নয়! নৈলে আমি কি চেয়ে নিতে পারতাম না—এ কি আমার পরের বাড়ি?"

এমন সময় দরজায় কয়েকটা আঘাতের শব্দ শোনা গেল। চক্রবর্তী মহাশয় ঘটকের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিলেন—"স্রেফ মোক্তার মশায়, ফিসের টাকা, আর বাকি খাজনার মোকদ্দমায়; আর অন্য কথা নয়, বুঝলে তো?…"

ঘটক চতুর বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়কে লঘুভাবে একটু ধাক্কা দিয়া সহজ গলায় আরম্ভ করিল—"আসল কথা, হাকিম হয়েছে অবুঝ—আইন কানুনের ধার দিয়েও যায় না—কাজেই…বাইরে কে? ভেতরে এস, এমন কিছু গোপনীয় কথা হচ্ছে না।"

ছেলেটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নাম মহীতোষ, সবে পাশ করিয়া কলিকাতার একটি সওদাগরি আপিসে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। ধূর্জটি ঘটক যখন তাহাকে সব কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিল, মহীতোষ সত্যই মুখটা অন্ধকার করিয়া বলিল—'তা,

হলে আর ও বাড়ির ছায়া মাড়ানো নয়, ঘটক মশাই।' ধূর্জটি ঘটক মনে মনে বলিল—'পথে এসো বাছাধন ; এ ধূর্জটি ঘটক, হাঁ!' মহীতোষও নিশ্চয়ই ঐরকম মনে মনে কিছু বলিয়াছিল। যাহা করিল তাহা হইতে এই রকমই মনে হয়।

৩

ঘটক যখন বিদায় লইল মহীতোষ কামিজটা গায়ে দিল, কাবুলী-চটিটা বকলস্ কষিয়া পায়ে আঁটিল এবং গালে একটা পান পুবিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যাকাল, এই সময়ই ও-পাড়ায় গিয়া তাহাব এক অনিশ্চিত-সম্পর্কের ছোট মাসতুত ভাইকে পড়ায়। ছেলেটির নাম নবকুমার, সাত আট বছর বয়স, দিব্য ফুটফুটে। বেচারার বাপ সম্প্রতি মারা গিয়াছে, এখন আছে মা আর একটি বোন, নাম উমা। আগে ইহারা অন্য কোথায় থাকিত, বাপের মৃত্যুর পর এ গ্রামে আসিয়াছে।

আর একটি কথা বলিয়া দিলেই পরিচয়টা পরিষ্কার হয়, এই উমাই এ কাহিনীর নায়িকা, ধূর্জটি ঘটক ইহার জন্যই হাঁটাহাঁটি করিতেছে। এ দিকে মহীতোষের ঘটা করিয়া নবকুমারকে পড়ানোর অন্তরালে রহিয়াছে এই মেয়েটিই। কাজেই গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবকুমার বাড়ির বাহিরে খেলা করিতেছিল। মহীতোষকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে তাহার বাম হস্তটা দু'হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—"মাসিমা কোথায় রে, নবু?"

"মা ওপরের ঘরে, আর দিদি···"

মহীতোষ চোখ রাঙাইয়া বলিল—"তোর দিদির জন্যে আমার যত মাথাব্যথা পড়েছে!"

নবকুমার ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না ; একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"দিদিরও মাথা ব্যথা করেছে মহীদা—" সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের ঘাড়টা নামাইয়া কানে কানে বলিল—"কিন্তু মিছে কথা মহীদা, আমাকে বললে, মহীদা যদি ডাকে তো বলিস দিদির মাথা ব্যথা করেছে···"

মহীতোষকে হাসিতে দেখিয়া নবকুমার সাহস ফিরিয়া পাইল, কহিল —"হ্যাঁ মহীদা, দিদির নাকি বুড়ো বর আসবে? মা কাঁদছিলেন।"

মহীতোষ আবার হাসিয়া বলিল—"মিথ্যেবাদীদের যদি বুড়ো বর না হয় তো, বুড়ো বরেরা আছে কি জন্যে?"

কথা কহিতে কহিতে তাহারা ভিতরে আসিয়া পড়িল।

ছাতের উপর থেকে নবকুমারের মা মহীতোষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন। মেয়েকে ডাক দিয়া বলিলেন—"উমা, তোর দাদাকে একখানা আসন দিয়ে যা।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করিল—"আজ সেই ঘটক এসেছিল, মাসিমা?—কি সব বললেন আপনি?"

"যে রকম বলতে বলেছিলে সেই রকমই বললাম বাবা।—হ্যাঁ, ভাল কথা—আজ পাত্তোরের ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। তোমার কথামত তোমার, বাবার নাম করে বললাম যে, তিনি একবার দেখে না এলে চলে না—খুব শক্ত হয়ে রইলাম। প্রথম তো দিতেই চায় না ঠিকানা, বলে—আমি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব,—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, অত কি বাড়ির নম্বর-টম্বর মনে রাখতে পারি?...তাতে আমি একটু যখন বেঁকে দাঁড়ালাম তখন কাঁচুমাচু করে যেন কত মনে করবার ভান করে ঠিকানাটা দিলে,—তাও কেমন, তোমাকে দেখাতে মানা—আজকালকার ছেলেদের নাকি বড়দের বিয়ে পণ্ড করা একটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসিও পেল, দুঃখও হল—হ্যাগা, তোমরাই সব করছ-কম্মাচ্ছ আর তোমরাই বাগড়া দেবে?...যাও তো, নবু, দেরাজ থেকে ঘটকের সেই কাগজটা নিয়ে এস তো।...একটু খোঁজ নাও বাবা, তলে তলে, আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি লেগে আছে। চল্লিশের কাছাকাছি হয় বয়েস—কি করব, অত দেখতে গেলে চলবে না তো আমার, কিন্তু কথার মারপ্যাচে ভুলিয়ে যদি নেহাৎই একটা বুড়ো হাবড়াই এনে হাজির করে শেষ পর্যন্ত..."

মহীতোষ বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া বলিল—"কি জানেন মাসিমা? হাতের সম্বন্ধটা পায়ে ঠেলা কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্রও চেষ্টা করতে হবে, এখানে যদি কোন গলদ বেরিয়ে পড়ে তো..."

"দেখ বাবা, তোমরাই যা ভাল বোঝ; মেয়ের দিকে যত দেখছি, আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।"

মাসিমা কাজ ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, উঠিয়া গেলেন। নবকুমার বইএর জন্য দিদিকে হাঁক দিল। সে-ই তাহার বই-শ্লেট আজকাল গুছাইয়া রাখে, আবার পড়িবার সময় বাহির করিয়া দিয়া যায়।

কিন্তু আজ সে আর সামনে আসিল না, নবকুমারকেও ডাকিয়া কেতাব শ্লেট গছাইয়া দিলনা, দুয়ারের আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া সেগুলা রোয়াকের উপর রাখিয়া সামনে ঠেলিয়া দিল।

নবকুমার ভগ্নীর সঙ্কোচ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বই-শ্লেট উঠাইয়া আনিল, এবং বইয়ের পাতা খুলিতে খুলিতে হঠাৎ মহীতোষের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মহীদা, দিদির কথা শুনেছ?—"

দুয়ারের দিকে চাহিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল। মহীতোষ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া অভয় দিয়া বলিল—"কি রে নবু? আমার কাছে ভয় নেই, বল্।"

উমা চোখে রাগের বিদ্যুৎ হানিয়া, একবার দুয়ারের পাশ হইতে মুখটা বাড়াইয়া দৌড়াইয়া উপর তলায় চলিয়া গেল। সেখান হইতে হাঁক দিল—"নবু, তোমায় মা ডাকছেন, শীগগির শুনে যাও'সে।"

নবকুমার মহীতোষের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল, কহিল—"বড চালাক হয়েছেন; মা কলসী নিয়ে ঘাটে গেলেন আমরা যেন দেখি নি। কি বলছিল দিদি জান মহীদা? বলছিল—'বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হলে, ভাই, আমি আপিন খেয়ে মরব,—মাও জব্দ হবে মহীদাও…"

মহীতোষ মনের আগ্রহ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল—"তাই নাকি?—তা হলে কাকে বিয়ে করবে বললে?"

"বিয়েই করবে না বললে মহীদা, বলছিল—"

উমার ডাক আসিল "নবু, শীগগির একবার এস তো, আমি ইয়েটা খুঁজে পাচ্ছি না-—এস শীগগির…"

নবু বুঝিতে না পারিয়া উঠিতে যাইতেছিল, মহীতোষ চাপাগলায় বলিল—"দাঁড়া নবু, একটা মজা করি; বল্ 'আসছি'।"

নবকুমার উত্তর করিল—"যাচ্ছি দাঁড়াও"—বলিয়া সকৌতুকে মহীতোষের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"তুই ব'স্। ও ভাববে তুই যাচ্ছিস—আর সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমি। বেশ মজা হবে না?"

নবকুমারের চক্ষু দুইটা দুষ্টামির আনন্দে নাচিয়া উঠিল—মাথা নাড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ, উঃ।" —আবেগের চোটে হাততালি দিয়া উঠিতে যাইতেছিল, মহীতোষ ধরিয়া ফেলিয়া নিরস্ত করিল; তাহার পর খালি পায়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া—যে ঘরে উমা ছিল সেই ঘরের কাছাকাছি পৌঁছিতেই উমা পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার দিদিকে ভালবাসা, দুষ্টু ছেলে!—আর কক্ষণও—কক্ষণও—কক্ষণও তোমায় যদি কোন কথা…"

মহীতোষ হাসিতে হাসিতে চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইল। উমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল; প্রথমে বিস্ময়ে এবং মুহূর্তেই লজ্জায় অভিভূত হইয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বালিসের উপর উবুড় হইয়া পড়িল।

মহীতোষ একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে নির্জলা কৌতুক করিবারই ইচ্ছা ছিল এমন নয়, কিছু কথাও ছিল বলিবার এবং আজকের যোগাযোগটি সেই বলার বড়ই অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছিল, কিন্তু কি ভাবে বলিলে নিতান্ত থিয়েটারী কিংবা অত্যন্ত খেলো না হইয়া বেশ মানানসই হইবে, তাহাও বোধ হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে, সম্ভবত মনে মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া, যেই চৌকাঠ ছাড়িয়া দুই পা অগ্রসর হইবে, পিছন হইতে নবকুমার হাততালি দিয়া হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"খুব জব্দ হয়েছে দিদি, কেমন মজা!"

মহীতোষ চমকিয়া উঠিয়া হঠাৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এমন সময় নিম্নতল হইতে কর্ত্রী ডাকিয়া উঠিলেন—"কৈ রে, কোথায় গেলি তোরা? মহীতোষ এক্ষুনি চলে গেল?—কেন রে উমা?"

নবকুমারকে আগে করিয়া মহীতোষ একটু অপ্রতিভ ভাবে জড়সড় হইয়া নামিয়া আসিল। নবকুমার নিজের স্বভাবগত উল্লাসে মাকে জানাইয়া দিল—"আজ মহীদা দিদিকে খুব জব্দ করেছেন মা, আরও করতেন…"

"সত্যি নাকি?"—বলিয়া মা একটু হাসিলেন; আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মহীতোষ কিন্তু অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বলিল—"নাও শীগগির পড়ে নাও নবু, বোধ হয় ঝড় উঠবে।"

তাহার পর মাসিমার পানে চাহিয়া বলিল—"ওপরে উঠে তাই দেখলাম কিনা, ভাবলাম দেখি তো এত গুমোট করে কেন!"

৪

পাকে-প্রকারে মনের কথাটা বাড়িতে রটাইয়া দিল। বাড়িতে কথাটা লইয়া আলোচনা চলিতেই, একটু বাড়িয়া গেল। গৃহিণীর মেয়েটি খুব পছন্দ, তা ভিন্ন মায়ে ছেলের মনও বেশি দেখে, কর্তার কিন্তু সত্যই একটু লোভ ছিল, তাহার উপর ধূর্জটি ঘটকের রসান্‌ও একটু কাজ করিয়াছে।

কর্তা এবং গৃহিণীতে খানিকটা মনোমালিন্য চলিল। অবশেষে কর্তা কলিকালের দারাপুত্র সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হইয়া এই পর্যন্ত রাজী হইলেন যে, যদি কলিকাতার সম্বন্ধটা নষ্ট হইয়া যায় তো নিজের ছেলের সঙ্গেই বিবাহ দিবেন। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন—"ও সব ছলের কথা বুঝি না, সে হাবাতে বুড়ো না ম'লে তো সম্বন্ধ ভাঙবে না।"

মহীতোষ কথাটা শুনিল, শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিল।

যেদিন এই ধরনের বোঝাপড়া হইল তাহার দিন চারেক পরে মহীতোষ মাকে জানাইল—একে নূতন চাকরির খাটুনি, তায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারির অভ্যাস না থাকায় তাহার শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না, দিন কতক গিয়া কলিকাতার এক মেসে থাকিবে।

মেয়েদের কাছে এই রকম হঠাৎ বাড়ি ত্যাগের একটি মাত্রই অর্থ হয়—ছেলের অভিমান। গৃহিণী দুই সন্ধ্যা খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন, কর্তা নিজের মতটা নরম করিলেন। মহীতোষ একটু লজ্জায় পড়িল এবং সেইজন্য আরও বিশেষ করিয়া কলিকাতায় থাকিবার ব্যবস্থা করিল, বলিল—"কাজের একটু অব্যেস হয়ে গেলেই আবার চলে আসছি।"

এদিকে 'সভা' অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে। এই কয়েক দিনের মধ্যে গোটা সাতেক বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গোটা দুই তিন বেশ জোরালো মন্তব্য পাশ হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও দেশের অন্যান্য স্থানের প্রধান প্রধান সভাসমিতিতে সেগুলির কপি নিয়মিতরূপে পাঠানো হইয়াছে। একটা মন্তব্যে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর বিবাহে বরের বয়স বাইশ এবং বধূর বয়স পনের এইরূপ ধার্য হইয়া গিয়াছে। চক্রবর্তী মহাশয় আমরণ সভাপতি। সভাটিকে পুষ্পের সহিত তুলনা করা না গেলেও বাহির হইতেও ভ্রমরের মতই নূতন সভ্য আকৃষ্ট হইতেছে মন্দ নয়। খাতার মধ্যে সকলের শেষে নাম দেখা যাইতেছে মহীতোষ রায়ের।—বাহিরের লোক,

এখানে কাছেই একটা মেসে থাকিয়া একটা সওদাগরী আফিসে চাকরি করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সভাটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। অল্পদিন আসিলেও সে খুব উৎসাহী সভ্য বলিয়া ইহার মধ্যেই নাম কিনিয়াছে।—সে নাকি বাল্যবিবাহ রোধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায় না—দশের, বিশ্বমানবের এবং সমাজের হিতার্থে বিবাহ নামক জঞ্জালটাই উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প আঁটিয়াছে। চক্রববর্তী মহাশয়ের উপর অগাধ শ্রদ্ধা, সভায় দাঁড়াইয়া এক দিন বলিল—"এ ধর্মযুদ্ধে আমবা শ্রীকৃষ্ণকে সাবথি পেয়েছি—আর কিসের ভয়!—যুগ যুগ ধবে যে বিবাহ আমাদের ঋষিকল্পিত ব্রহ্মচর্যের মহাশক্ররূপে অশেষ অকল্যাণ সাধন কবে এসেছে, এস দেখি একবার একমন একপ্রাণ হয়ে তার উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হই…"

এই রকম গোছের আরও সব কথা।

ওদিকে কিছু দিন হইতে চক্রবর্তী মহাশয়ের মধ্যে আবার একটি পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে, আর সর্বদা খালি গায়ে আটহাতি ডুরেটি পরিয়া থাকেন না। বেশভূষায় সভাব সভাপতির মর্যাদানুরূপ কাপড-চোপড তো পরিয়া বসেনই, তাহা ভিন্ন অন্য সব সময়েও বেশ মিহি থান কাপড এবং আধুনিক ধরনের একটি শৌখিন ফতুয়া পরিয়া থাকিতেই দেখা যায়। কচিৎ এক এক দিন থানের জায়গায় কালোপেডে শান্তিপুরীরও আবির্ভাব হয়; কেহ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেয় তো অমনি তাডাতাডি বলিয়া উঠেন—"দেখেছ! আর বয়সও নেই, চোখের জোরও কমে এসেছে, কি পরতে কি পরে আসি, বুঝতেও পারি না।—চল্লিশ প্রায় হয়ে এল, আর কি বলতে চাও?…"

এইরূপ দৃষ্টিহীনতার সুযোগ পাইয়া এক এক দিন ফিন্‌ফিনে আদ্ধির পাঞ্জাবীও গায়ে উঠিয়া বসিয়া থাকে।—"গুছিয়ে সুছিয়ে রাখবার লোকও নেই, কোথাকার জিনিস কোথায় পডে থাকে, সংসারটা যেন ছারেখারে যাচ্ছে।"

এক একজন বলে—"সে তো তোমারই দোষ ঠাকুদ্দা, কোথায় একটি গোছালো দেখে টুকটুকে ঠানদিদি আনবে, তা নয়—"

কেহ কেহ উত্তর দেয়,—"আরে দাঁড়াও, হবু-ঠানদিদির তপস্যা শেষ হ'ক; এখনও আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করতে হবে—ঠাকুদ্দাকে লাভ করা চাড্ডিখানি কথা কি না।"

এই সব নাতিসম্পর্কীয়দের চক্রবর্তী মহাশয় হাসিয়া বলেন—"এখন তাঁরা কি আর ঠানদিদি হয়ে আসতে চাইবেন রে দাদা? যদি নাতবৌ হয়ে এসে কাউ হিসেবে তোমাদের ঠাকুদ্দার ঘরকন্না মেহেরবানি করে একটু করে দেন তো সেই ঢের!"

তাহা হইলেও সমিতির কয়েকজন অবিশ্বাসীব মধ্যে চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিবর্তন লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিয়াছে। তাহারা নাকি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, ভিতরে ভিতরে যখন বিবাহের কথা কোনখান হইতে আসিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাপড় আটহাতি ডুরে হইতে ক্রমে শান্তিপুরেয় দাঁড়ায় এবং উগ্রগন্ধ তামাক ও থেলো হুঁকাব জায়গাটা ক্রমে রবাবের নলওয়ালা গুড়গুড়িটা মাথায় ফৌজদাবী বালাখানার সৌরভ বহন করিয়া অধিকার করিয়া বসে। হঠাৎ মাথা-ব্যথাটা বাড়িয়া যায় এবং ফুলের তেলের গন্ধ উড়িতে থাকে, এমন কি মাঝে মাঝে কাঁচা-পাকা চুল ঠেলিয়া একটা লম্বা টেড়ি পর্যন্ত মাথার মাঝামাঝি রাস্তা করিয়া লয়,—কোন এক কবিরাজ বলিযাছে ইহাতে নাকি ব্রহ্মতল পযন্ত হাওয়া পহুঁছিবার বিশেষ সুবিধা। পরে যেমন যেমন বিবাহেব সম্ভাবনাটা কমিয়া আসে, এই সবও নাকি সেই অনুযায়ী তিরোহিত হইতে থাকে এবং অবশেষে আবার সেই সাবেক চাল আসিযা দাঁড়ায়। এ ব্যাপাব তাহারা আজ এই ঝাড়া পাঁচ বৎসর ধরিযা দেখিয়া আসিতেছে—ইহার মধ্যে ছয় ছয়টা বিবাহের সম্বন্ধ এল গেল। এ তো স্পষ্ট আবার সেই বেশাবর্তন।

বেশির ভাগই কিন্তু অটল গাম্ভীর্যের সহিত সভাব কাজে মাতিয়া গিয়াছিল—কথাটাকে মোটেই আমল দিল না, বলিল—"ওদের একটা কিছু না পাকালে আর চলচে না, নুইসেন্স্!"

মহীতোষও তাহাই বলিল, বরং দুইটা ইংরাজী গাল বেশি করিয়া দিল। কয়েক দিন পরে কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপন করিল—এই সভা নির্ধারিত করিতেছে যে, সমস্ত বিবাহে বর এবং বধূর বয়সের অনুপাতটা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে—অর্থাৎ পনেব এবং বাইশের মধ্যকার সাত বৎসরের প্রভেদটা সকল ক্ষেত্রেই অটুট থাকা চাই—যদি কোন বর পঞ্চাশ বৎসরে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে তাঁহার তেতাল্লিশ বৎসরের বধূ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

প্রস্তাবটি গুরুতর বিধায়, এবং সেদিন কথায় কথায়ময়াল সাপ কত বড় হইতে পারে সেই লইয়া প্রচণ্ড তর্ক হওয়ার পর, আর সময় ও উৎসাহ না থাকায়, সেটিকে পরের বৈঠকের জন্য তুলিয়া রাখা হইয়াছে।

চক্রবর্তী মহাশয় কয়েক জন উৎসাহীকে এক এক করিয়া বলিয়াছেন—"ও হে, তোমরা না দেখে-শুনে যত অজ্ঞাতকুলশীলদের এনে জোটাচ্ছ, একটু বুঝে চল।—কয়েক জন আবার তোমাদের উৎসাহকেও যে টেক্কা দিয়ে চলেছেন। কি জান রে দাদা?—মার চেয়ে যার দরদ বেশি…জানই তো সেই মেয়েলি কথাটা।"

এদিকে ঘটক মহাশয়কে বলিয়াছেন—"না ভায়া, কাজ নেই ওখানে; বেটা ঢুকে অবধি বাগড়া দিতে আরম্ভ করেছে, শুধু ওপরে ওপরেই যত ভক্তি। ও গ্রাম ছেড়ে যখন হঠাৎ এখানে এসে জুটল আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম। বলি হ্যাঁ হে, ঘটকালি করে তো চুলে পাক ধরালে,—তেতাল্লিশ বছরের কনের কথা শুনেছ এ পর্যন্ত? তুমি অন্যত্র দেখ, আর না হয় খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পার তো সে এক কথা। না হে না, একেবারে অসম্ভব, তুমি এ পাড়ার চ্যাংড়াদের চেন না। গেল বারে আমার বিয়ে রুকবে বলে শালারা ভলেণ্টিয়ারের দল পযন্ত খুলেছিল; শেষকালে কি কপাল ফাটিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে?"

টিকটিকির কাটা লেজের মতো লাফাইতে লাফাইতে ঘটক হুঙ্কার করিয়া বলিল—"কী। মাথা ফাটাবে? কোম্পানির রাজত্ব উঠে গেছে বটে? আপনি নেবে যান আসরে দাদা—এবারে ধুর্জটি বামনা রয়েছে মনে রাখবেন। নিয়ে আসুক বেটারা কত ভলেণ্টিয়ার নিয়ে আসবে, আমিও ভূ-ভারতের যত ঘটক-পুরুৎ একত্তোর করছি। আবার একটা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের ব্যাপার হয়ে যাক্—ইস্—অমনি!"

চক্রবর্তী মহাশয় তাহাকে অনেক কষ্টে ঠাণ্ডা করিয়া বলিলেন—"তা হলে নেহাৎ যখন বলছ—তবে দেখ দিন ছয় সাতের মধ্যে যদি ঠিক করতে পার।—মাগী যেন ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ করে। এদিকে সব ঠিক থাকবে, একদিন রাত্তিরে গিয়ে চুপি চুপি কাজ সেরে আসব; তুমি, পুরুৎ আর আমি। বিয়ের লগ্নের জন্যে অতটা ভেবো না; শুধু দেখো যেন বাড়ি থেকে যাত্রা করবার সময়টা ভাল থাকে।"

৫

বাল্য-বিবাহ-বোধিনী সভার জরুরি মীটিং বসিয়াছে। কয়েক দিন সভার কার্য ঠিকমত না হওয়ায় কতকগুলা প্রস্তাব জমিয়া উঠিয়াছে। তাহা ভিন্ন কতকগুলি আবশ্যকীয় নূতন প্রস্তাবও উত্থাপিত হইবে এরূপ নোটিস পাওয়া গিয়াছে, সভার বিজ্ঞাপনের নীচে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া লেখা ছিল; —'দয়া করিয়া কেহ যেন বাজে তর্ক তুলিয়া সভার অমূল্য সময় নষ্ট না করেন।'

সভাপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের সন্ধ্যা-আহ্নিক এখনও শেষ হয় নাই, সকলে তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক জন একখানা মাসিক পত্রের 'মন্দিরের পথে' নামক চিত্রের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। কেবলা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে—'আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি'—আর সতীনাথ চিৎ হইয়া বাম হস্তে সিগারেট টানিতে টানিতে ডান হাতে চৌকির উপর কাওয়ালী বাজাইয়া যাইতেছে। মহীতোষ ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চাহিতেছিল। চক্রবর্তী মহাশয়ের মেয়েটিকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল—বাবার কত দেরি; সে আসিয়া খবর দিল—"কাপড়চোপড় ছাড়ছেন, একটু সময় নেবে; আপনাদের শুরু করে দিতে বললেন।"

ফেলারাম মহীতোষের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"তা হলে গ্রীনরুমে ঢুকেছেন!"

সভার সেক্রেটারি টেবিলে দুইটি চাপড় দিয়া বলিল—"তাহলে আমাদের শুরু করে দেওয়াই ভাল; চক্রবর্তী মহাশয়ের এখনও একটু দেরি আছে। আজ 'এজেণ্ডা' একটু ভারী—সময় নেবে। মহীতোষবাবু ততক্ষণ সভাপতির আসন অলং—"

নেপালচন্দ্র কোণে একটা বাংলা দৈনিক পড়িতেছিল; কাগজটা রাখিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল,—"ওঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে একেবারে!"

সকলে বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিল। নেপাল বলিল—"নোয়াখালির ওপর দিয়ে একটা মস্ত বড় সাইক্লোন পাস করে গেছে—প্রায় সাতখানা গ্রাম উড়িয়ে নিয়ে গেছে!"

কেহ বলিল—"এ আর নতুন কথা কি?—ওখানে রোজ পাঁচটা করে ও রকম সাইক্লোন বইছে।" কেহ বলিল—"এ সব জেনে-শুনেও লোকে বাড়ি করে ওখানে?" কেহ বা দয়াপরবশ হইয়া বলিল—"একটা রিলিফ ফণ্ড

স্টার্ট করা উচিত।" গজানন পলিটিক্স লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করে, বলিল—"যদ্দিন ফয়েন গবর্ণমেণ্ট আছে—"

হারাধন সতীনাথের পানে চাহিয়া ছিল। সতীনাথ কিছু একটা না বলিলে সে প্রায় কোন বিষয়ে মত দেয় না, কারণ তাহার নিয়ম হইতেছে, সতীনাথ যাহা বলিবে ঠিক তাহার উন্টা অভিমত দিয়া আরম্ভ করা।

সতীনাথ বলিল—"বোধ হয় ছাপবার ভুল আছে—সাতখানা গ্রাম না হয়ে ঘর হলে বিশ্বাস করতে রাজি আছি।"

হারাধন বলিল—"সতীনাথবাবু বিশ্বাস করবেন না জানলে, বোধ হয় ঝড়টা একটু বুঝে-সুঝে কাজ করত; বেচারার মেহনতই সার হল!"

সতীনাথ বলিল—"না, তা কেন হারাধনবাবু? সব কথা নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারে এমন বর্ব্বরদের তো সমাজে অভাব নেই।"

একজন বলিল—"সাবাস!"

ঘরের এক দিকে বেঞ্চির উপর কয়েকজন বসিয়া ছিল, তাহারা আসিয়া চৌকির উপর ভিড় করিয়া বসিল।

নেপাল গলা চড়াইয়া বলিল—"সতে, বর্ব্বর বলে বসলি কাকে র‍্যা?—খুব কি সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হল? এই তো আমি বিশ্বাস করছি।—এর চেয়ে, ভদ্রলোক হয়ে কেউ অমন একটা গালাগাল দিয়ে বসতে পারে, এইটেই বিশ্বাস করা বেশি শক্ত বলে মনে হয়।"

ঘরটা সরগরম হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"এপোলজি চাওয়া উচিত।"

আড়াল হইতে অপর একজন বলিল—"ঘাড় ধরে এপোলজি চাওয়াও।"

গজানন বলিল—"বলবেই তো 'বর্ব্বর'; অতি-বিশ্বাসে দেশটা অধঃপাতে গেল।"

গিরিজা মোক্তারি পড়ে, সে আঙুলের পর্ব গুনিয়া বলিল—"তা হলে আর বর্ব্বর হতে বাকি রইল কে?—যে খবরটা পাঠিয়েছে সে বর্ব্বর, খবরের কাগজের এডিটর বর্ব্বর, চাকরির ভয়ে বেচারা প্রিণ্টার ছেপেছে,—সে বর্ব্বর—"

ফেলারাম বলিল—"চলুগ, চলুগ; খুব সেশন মোকদ্দমা চালাচ্ছিস গিরজে!"

একজন উৎসাহী নূতন মেম্বর আফসোস করিয়া করুণ স্বরে বলিল—"এই কি সভার বিশেষ অধিবেশনের চেহারা! কাজের কথার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই..." কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না।

সতীনাথ কখনও মেজাজ হারাইত না, সে খুব শান্তভাবে বলিল—"আচ্ছা, বর্বর যাঁকে বললাম তিনি তো চুপ করে মেনে নিলেন কথাটা; আর সবার এত মাথা-ব্যথা কেন?"—বলিয়া একবার চকিতে হারাধনের পানে চাহিল।

হারাধন এতক্ষণ মনে মনে প্রথম আক্রমণের একটা লাগসই উত্তর হাতড়াইতেছিল,—তাহা তো পাইলই না, তাহার উপর এই দ্বিতীয় চোট!—সে কথা কহিল না। চৌকির একদিকে নোয়াখালির রামেন্দ্র চন্দ্র বসিয়া ছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে মাঝখানে বসাইয়া বলিল—"বলুন রামেন্দ্র বাবু, আপনাদের তো দেশ, বলুন শপথ করে আপনাদের দেশে এ রকম ঝড় ওঠে কিনা। আজ হয়ে যাক্ একটা হেস্তনেস্ত।"—বলিয়া পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইতে লাগিল।

চক্রবর্তী মহাশয়ের সাত বছরের মেয়েটি দুয়ারে ঠেস্ দিয়া তামাসা দেখিতেছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ভিতরে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"ও বাবা, ছুটে এস, শুরু হয়ে গেছে—এইবার হাত গুটুচ্ছে।"

"যত সব লক্ষ্মীছাড়াদেব নিয়ে পড়েছি, বাড়িতে যেন ডাকাত-পড়া লাগিয়েছে। একবার শুভকার্যটা হয়ে গেলে আপদগুলোকে আর চৌকাঠ মাড়াতে দোব না। আবার দেখি, সে ব্যাটা কি এঁচে এসেছে। ঘটকটাকে বললাম ও মেয়ের কাজ নেই—তা—" নিজের মনে এই সব বলিতে বলিতে নিতান্ত বিরক্ত ভাবে বাহিরের দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া একেবারে প্রসন্ন মুখে চক্রবর্তী মহাশয় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"আজ আবার কি নিয়ে?"

ফেলারাম সংক্ষেপে বলিল—"নোয়াখালির ঝড়।"

"নাঃ, তোমাদের সব ছেলেমানুষি; এ রকম করে কি কাজ এগোয়? কোথায় নোয়াখালিতে তুচ্ছ একটা ঝড় উঠেছে—"

কেবলা বলিল—"নেহাৎ তুচ্ছ নয়, ঠাকুদ্দা। নোয়াখালি তো জনশূন্য হয়েইছে, সেখানকার রামেন্দ্রবাবু কলকাতায় এসে কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, একটা ঝাপটা এসে তাঁকেও একটা আছাড় দিয়েছে।"

নেপাল উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের সামনে আসিয়া বলিল—"এই তো চক্কোত্তী মশায়, আপনিই বলুন না—আপনার তো এই পঞ্চাশ ষাট বছর বয়েস হল, অনেক দেখেছেন, ঝড়ে গোটা সাতেক গ্রাম উড়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব?"

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "পঞ্চাশ হলে কত কি দেখব রে দাদা, কিন্তু তার তো এখনও দেরি আছে। না, তবুও যে দেখি নি একথা বলছি না—তবে..."

ঘরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। মেম্বরদের মধ্যে শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে কানাকানি চোখোচোখিব ধুম পড়িয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিয়া, চক্রবর্তী মহাশয় একটু থতমত খাইয়া ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন; এবং ফেলারাম যদিও 'ঠাকুদ্দার কিসের বয়েস' বলিয়া উৎসাহ দিবার চেষ্টা করিল, তিনি বিশেষ উৎসাহ পাইলেন বলিয়া বোধ হইল না। বলিলেন, "বয়েস হবে না কেন রে দাদা, হয়েছে, ঝড়ও অনেক দেখেছি,—তবে সে সব কথা সভায় কেন? আজকের এজেণ্ডা কি?...আমার আবার এক জায়গায় বরাৎ আছে রাত্তির আটটার সময়।"

সতীনাথ ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল—"তা হলে সাড়ে সাত তো প্রায় বাজে। নাও হে সেক্রেটারি, গত মীটিং-এর প্রোসিডিংস্-গুনো কনফারম্ করিয়ে নাও; তার পরে—"

ফেলারাম বলিল—"তাতে তো শুধু ময়াল সাপের লম্বাই আর সেই উড়েটার মটর-চাপা পড়া নিয়ে তর্ক হয়েছিল,—সে সব আর বাল্যবিবাহ-রোধিনীর খাতায় তুলে কি হবে? তার চেয়ে মহীতোষবাবু, আপনার কি সব প্রস্তাব আছে বলে ফেলুন।"

"সেই তেতাল্লিশ বছরের ক'নের ব্যাপারটা?—মহীতোষবাবু তোমাদের দ্বিতীয় মনু বলতে হবে"—বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় একটু কাষ্ঠহাসি হাসিবার চেষ্টা করিলেন। "তা বেশ, সব টপটপ করে সেরে দাও; আমি—হুঁ..."

চা আসিতে লাগিল। এটি চক্রবর্তী মহাশয়ের নূতন বন্দোবস্ত, ঘটকের পরামর্শে জারি হইয়াছে।

মহীতোষ কাপ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আগে উপেনবাবুর প্রস্তাবটা পাশ হয়ে যাক্ না; তাহলে আমার ও-প্রস্তাবটা না-ও দরকার হতে পারে"—বলিয়া উপেন্দ্রের পানে চাহিল।

উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিল, "যেহেতু বাঙ্গালা দেশে বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়, এই সভা ধার্য করিতেছে যে, যাঁহারা বিপত্নীক হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বিধবা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবেন না।"

যাহারা মহীতোষের জোটে ছিল তাহারা একবার চক্রবর্তী মহাশয়ের পানে আড়ে চাহিয়া লইল। চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"বাঃ, এ তো চমৎকার ব্যবস্থা। আমি বলি মহীতোষবাবুর সেই তেতাল্লিশ বৎসরের কনের প্রস্তাবটাও এর সঙ্গে মিলিয়ে দাও না, আর ছেড়ে কি হবে? লিখে দাও—কনে তেতাল্লিশ বৎসরের বিধবা হওয়া চাই।"

হারাধন বাংলা দৈনিকটা একমনে পড়িতেছিল; বলিয়া উঠিল—"সাতটা কেন, এই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে—'সতেরটা গ্রাম উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে' —আগের 'এক'টা সে রকম ভাল করে জাগে নি।...এই নিন—এইবার কি বলবেন বলুন"— বলিয়া কাগজটা সতীনাথের গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন—"আবার তো ঝড় উঠল, আমি তা হলে উঠি, অনেকটা যেতে হবে। তোমরা যা করবার ঠিক করে নাও।"

উপেন বলিল, "একটু বসুন, মহীতোষবাবু কি নেমন্তন্নর কথা বলছিলেন; তাতে আপনার মত বিশেষ দরকার। কৈ, মহীতোষবাবু?"

মহীতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, সভার পরের বৈঠক আগামী রবিবার আমাদের গ্রামে হয়। এইরূপ ভাবে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে মাঝে-মাঝে সভা করবার যে কত উপকারিতা তা আর আপনাদের বোধ হয় বোঝাতে হবে না। আমাদের গ্রামের সকলেই আমার মুখে সভার উদ্দেশ্য আর কার্যাবলীর কথা শুনে বড় আগ্রহ প্রকাশ করছেন; বৈঠকের জন্য বাড়ি পর্যন্ত আমি ঠিক করে এসেছি। আর, যেহেতু এটা সভার প্রথম বাইরে যাওয়া, আমি সমস্ত ভার বহন করছি। এখন সভাপতি মহাশয়ের আর আপনাদের দয়া করে মত দেওয়া।"

ঘরের অমন কড়া বিদ্যুতের আলো চক্রবর্তী মহাশয়ের চোখে ধাঁ করিয়া যেন ধোঁয়াটে হইয়া গেল। তিনি যেন অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,—"বাঃ চমৎকার আইডিয়া...ধন্যবাদ মহীতোষবাবু...চক্কত্তী মশায় তো আগে রাজি হবেন...থ্রী চীয়ার্স্ ফর্ মিস্টার মহীতোষ রায়।—"

মাথাটা আবার ঠিক হইলে চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, "আমায় তা হলে ছাড়ান্ দাও। আর কিছু নয় -তবে পরের বাড়ি গিয়ে হল্লা করা— বিদেশে..."

মহীতোষ বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "সে-সব কিছু করতে হবে না। আমার এক বিধবা মাসির বাড়ি। তিনটি প্রাণী তাঁরা—আমাদের বাড়ি

গিয়েই থাকবেন। বাড়িটাও গ্রামের একটু একটেরেই। পাড়ার ছেলেরা বড় উৎসাহ করে সাজাবার ভার নিয়েছে। বলে—"মহীদা, সাজাব এমন যে রায়চৌধুরীদের বিয়ে-বাড়ির জলুসও হার মানবে…"

চক্রবর্তী মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা বেশ, তবে আমায় নিয়ে এই বুড়ো বয়সে টানাটানি করা কেন—তোমরাই চালিয়ে চুলিয়ে নিও।"

ফেলারাম "কিসের বিয়ে…" বলিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া অর্ধেক পথেই থামিয়া গেল।

মহীতোষ বলিল—"হ্যাঁ, আর একটা কথা,—যদিও রবিবারই আপাতত ঠিক রইল, তা হলেও পাকাপাকি ভাবে সভার দিনটা দু'দিন পরে বলব। একটু আয়োজন টায়োজন করতে হবে তো।"

চক্রবর্তী মহাশয় ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন—"ওঃ, বড় দেরি হয়ে গেল।" বাহিরে আসিয়া হাঁকিয়া বলিলেন,—"ওরে দোরটোর সব বন্ধ করে যা, আমি একটু বাইরে চললাম।"

… … … …

চক্রবর্তী মহাশয়ের বরাৎ ছিল হেদোর ধারে,—একটা সুপুরি গাছ নির্দিষ্ট করা আছে, সেখানে ঘটক আসিবে; বাড়িতে আসা নিরাপদ নয় বলিয়া কয়েক দিন ধরিয়া এই রকম বন্দোবস্তই চলিতেছে।

ঘটক সব শুনিয়া বলিল—ইস, বেটা ভারি মতলববাজ তো! আচ্ছা থাক রবিবার, আমি বিয়ের দিন বদলে দিচ্ছি।"

"সেও হাতে রেখে বলেছে, রবিবার পাকাপাকি করে নি। তুমিও যেদিন বিয়ের দিন ঠিক করবে—সেও ঠিক সেইদিন মীটিঙের ছুতো করে সেখানে দলবল উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাজ পণ্ড করবে। তার চেয়ে আর হ্যাঙ্গামে কাজ নেই—আর সে কুচক্রী মাগীও যখন এর মধ্যে রয়েছে…বুঝতে পারছ না? আর বয়সও হল তো—চোল্…"

"ঐঃ, বয়েস বাড়িয়ে বলা তোমার কেবল একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে, দাদা। চল্লিশ আবার একটা বয়েস?—ও বয়সে সাহেবদের তো দুধের দাঁতও ভাঙে না।"

"কে জানে, তোমারও কেমন জিদ্ ধরে গেছে; যা ভাল বোঝ কর। তবে ওখানে অসম্ভব। সব বেটা যেন ভেতরে ভেতরে জেনে গিয়ে একটা মতলব আঁটছে বলে বোধ হল।"

"কেন, ব্রহ্মাণ্ডে আর মেয়ে নেই? ক' গণ্ডা চান আপনি?"—বলিয়া ঘটক একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিয়া বলিল—"বলতে সাহস করি নি দাদা, এই সেদিন গিয়ে লক্ষ্য করলাম—মেয়েটির অঙ্গে একটু দোষ ছিল।"

"কি রকম?"

"যাক সে কথা, ও না হয়েছে ভালই হয়েছে। ছোঁড়ার ব্যাপার দেখে মন স্থির ছিল না, কাজেই মাগীর জোচ্চুরিটা একটু চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। জাঁহাবাজ মাগী বটে! ধুর্জটি ঘটকের চোখেও ধুলো দিলে। এইবার মেয়ে দেখতে যাব যখন, দাদাকেও একবার দয়া করে যেতেই হবে—হেঁ—হেঁ—ছোট ভাইয়ের এইটুকু আবদার রাখতেই হবে।..."

বাদী

সন্ধ্যার পর বারান্দার কোণটিতে চুপচাপ করিয়া একটা ঈজিচেয়ারে বসিয়া আছি। একটি ঘনপল্লবিত জামরুল গাছের নীচে এইখানটায় অন্ধকার বেশ জমাট হইয়া নামে। আজকাল এই সময় মনটা তেমন ভাল থাকে না। সমস্ত দিন কলিকাতার রাস্তাঘাটে মৃত-বুভুক্ষিতের অসহ্য দৃশ্য; কোথাও একটু গল্প করিতে বসিলেই ওই আলোচনা, খবরের কাগজের পাতা খুলিলেই ওই কথা;—যতই দিনের অবসান হইতে থাকে মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর চলাফেরা করিবার উৎসাহ থাকে না, এইখানটিতে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। এই যে অন্ধকার গাঢ় হইয়া অভিশপ্ত পৃথিবীটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কাছেপিঠে কোথাও একটা প্রদীপের শিখা পর্যন্ত নাই যে, সে-অন্ধকারকে খণ্ডিত করিয়া সেই পৃথিবীর খানিকটা ব্যক্ত করিয়া ধরে—এইটি বেশ লাগে। ইচ্ছা করিয়া কিছু ভাবি না; অথবা আরও যথাযথভাবে বলিতে গেলে—কিছু না ভাবিবারই ইচ্ছা লইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু তবু আসিয়াই পড়ে ভাবনা—নানান রকম, বিশৃঙ্খল। কি অদ্ভুতভাবে মরা! মৃত্যুকে কি অদ্ভুত ব্যঙ্গ! যাহারা মারে তাহারাই আশ্বাসের কথা বলে, বাঁচাইবার অভিনয় করে, দানসত্র খোলে!...হইবে না?—কত বড় জাতির উত্তরাধিকারী!

ইহাদেরই পূর্বপুরুষরা তো বিশ্বমাতার মূর্তি কল্পনা করিয়াছিল—এক হাতে ছিন্নমুণ্ড, এক হাতে বরাভয়। আপনি চটিলেন? বলিতেছেন, ওটা তত্ত্বের দিক? হয়তো ঠিক; বুঝি না। আমি শুধু ভাবি, তত্ত্বটা কি কল ফলাইল; অথবা—আপনারই কথা ধরিয়া বলি—তত্ত্বই যদি তো সেটি এই বিষবৃক্ষের গোড়াতেই কুঠার হানিতে পারিল না কেন?

অন্তরের সঙ্গে বাহিরের অন্ধকারও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, একটি মাঝবয়সী লোক শ্রান্ত গতিতে আসিয়া বারান্দার নীচেটিতে বসিল। অন্ধকারে যতটা বুঝিলাম, মনে হইল, এতই শ্রান্ত যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ছেঁড়া ময়লা কাপড, গায়ে আধ-ফরসা একটা ছেঁড়া জামা ঝলঝল করিতেছে; অন্ধকারে মুখের যতটুকু দেখা গেল, মনে হইল, ক্ষৌরকার্যের সঙ্গে অনেকদিনই কোন সম্পর্ক নাই। লোকটার কোলে একটা বছর ছয়েকের রোগা মেয়ে, গায়ে একটা নূতন ছিটের পেনি—নিতান্ত হীন বলিয়া মনে হয় না, কোন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিয়া পাইয়া থাকিবে।

লোকটা মেয়েটাকে কোলে লইয়াই উবু হইয়া বসিল এবং বসিয়াই নিজের হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ডান হাতে কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলা খামচাইয়া ধরিয়া মাথাটা গুঁজ্‌ইয়া দিল।

লুকাইব না, মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইলাম। সমস্ত দিন তো এই দেখিয়াই কাটাইলাম; বাড়িতে প্রবেশ করিব, এই চর্চাই হইবে। এক মুঠা অন্ন মুখে তুলিতে যাইব, চারিদিক ইহাদেরই হাহাকারে বিষ হইয়া উঠিবে। মাঝখানের এই একটু অবসরের চেষ্টা, ইহার উপরও যদি ইহারা এমনভাবে সশরীরে আসিয়া হানা দেয় তো লোকে বাঁচে কি করিয়া? একটু নিশ্বাস ফেলিবারও সময় দিবে তো?

ঠিক কঠোর না হইলেও একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলাম,—"বাপু, একটু ক্ষ্যামা দাও দিকিন, লোকে একটু নিরিবিলি দেখে বসবে, তা···তুমি না হয় ওই সদরের দিকে যাও; যদি কিছু দিতে পারে···আর দেবেই বা কোথা থেকে বল মানুষে?···তবুও যাও, দেখ; আমায় একটু ছাড়ে।"

শুধু গোঁজড়ানো মুখে 'উফ্‌!' করিয়া একটা শব্দ হইল, নড়নচড়নের কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা আমার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল, মনে হইল, তাহার ঠোঁট দুইটি যেন একটু থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখ দুইটিও দুই বিন্দু জলে চকচক করিয়া উঠিল।

মা, অব্যাহতি নাই ; প্রশ্ন করিলাম,—“খাবি কিছু ?”

মেয়েটি কিছু বলিবার আগেই লোকটা মুখটা অল্প একটু আমার পানে ফিরাইয়া কতকটা রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল—“না, ওর খাবার কষ্ট থাকতে দিই নি বাবু, ওর যা কষ্ট তা—”

শেষ না করিয়াই মেয়েটাকে বুকে আরও চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তাহার মাথার উপর নিজের মুখটা চাপিয়া একটু ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—“তোকে আমি তো দোব না খাবার কষ্ট, বেটী ; দিই ? বল্ বল্—বল না, সোনা আমার, মানিক আমার ! খাবার কষ্টও দোব না, পরবার কষ্টও দোব না ; তার জন্যে আমায় ভিক্ষে করতে হয়, চুরি করতে হয়, গাঁটকাটা সাজতে হয়, সেও স্বীকার ; না খেয়ে তোকে মরতে দোব না। বল্ না বাবুকে, আমি নিজে সমস্ত দিন খেয়েছি কিছু ? খেয়েছি ? তোর মুখে তুলে দিই নি সবটুকু ? বল্ না বাবুকে ; আমি না দিলে তোকে দেবে কে ? আর আছে কে ?”

দুই হাতে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া আদর করিতে লাগিল—“মা আমার, সোনা আমার, হীরে আমার—”

দৃশ্যটা ক্রমেই মর্মন্তুদ হইয়া উঠিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষেরই একটা দিক্,—সবাই গিয়াছে, বাপ বুকে করিয়া লইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মুখের অন্ন তুলিয়া দিতেছে ; একাধারে মা, বাপ, ভাই, বোন—সব।

প্রশ্ন করিলাম—“তা হলে তুমি কিছু খাবে ? দেখি, দাঁড়াও, যদি কিছু পাই। আর বাপু, গেরস্থই বা করে কি বল ?”

উঠিতেই লোকটা কতকটা সেই ভাবে মাথা গুঁজিয়াই ডান হাতটা বাড়াইয়া আমার একটা পা চাপিয়া ধরিল ; প্রায় পড়োপড়ো হইয়া গিয়াছিল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া একটু সেই ভাবেই থাকিয়া বলিল—“না বাবু, আপনি বসুন ; আগে সবটা একটু শুনুন। খাব আর কোন্ মুখে ? প্রাণ রেখেই বা আর কি হবে ? রাখতুম, ভেবেছেন বাবু ? রেখেছি শুধু এইটের জন্যে। মা আমার, সোনা আমার, কি যে তোর নামটি বল্ তো ? শুনিয়ে দে তো বাবুকে একবার।”

মেয়েটিকে একটি চুম্বন করিয়া তাহার মুখের খুব কাছে মুখ রাখিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি কেমন বিহ্বল এবং হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে, হঠাৎ একটা

অপ্রত্যাশিত আর ভীতিজনক অবস্থায় পড়িলে শিশুরা যেমনটা হইয়া পড়ে। লোকটার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—"লক্ষ্মী"।

লোকটা আবার মেয়েটাকে চাপিয়া ধরিল, কয়েকটা উচ্ছ্বসিত চুম্বন দিয়া বলিল—"লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী, না হাতী…সে তো ওদের দেওয়া নাম, আমি কি নাম দিয়েছি তাই বল্ না।"

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"আবাগী।"

লোকটা আবার মুখটা গোঁজ্ডাইয়া সামনের কেশগুচ্ছটা খামচাইয়া ধরিল, তাহারই মধ্যে অল্প একটু মুখ ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—"রাখব না 'আবাগী' নাম বাবু? কম দুঃখে রেখেছি? যার বাপ…ওফ্!"

আবার মুখটা গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

মেয়েটি কেন এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, এতক্ষণে যেন কতকটা আন্দাজ হইল। প্রশ্ন করিলাম—"তোমার মেয়ে নয়?"

লোকটা একেবারেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, একটা কিসের আঘাতে কি যেন কে কাড়িয়া লইতেছে—এইভাবে একটা হঠাৎ ভয়ে নাড়া খাইয়া উঠিল; মেয়েটাকে আরও নিবিড় বন্ধনে বুকে চাপিয়া আরও গাঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—"অমন কথা বলবেন না বাবু, তা হলে আমি বাঁচব না…তুই আমার মেয়ে নয়? তুই আমায় ছেড়ে চলে যাবি? 'আবাগী' বলি বলে তুই রাগ করলি? হবি না আর আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, সোনা আমার, মানিক আমার, বল্ না বাবুকে, তুই কার মেয়ে?…"

একটু কেমন কেমন বোধ হইতেছে। শোকে, অভাবে লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এমন মর্মন্তুদ ঘটনাও তো হইতেছে আজকাল। ক্ষুধার চোটে বসিয়াও শরীর ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, যেন টলিয়া পড়িবে, তবু আহারের প্রবৃত্তি নাই, কথায় তেমন বাঁধুনি নাই,—সব হারাইয়া সব চেতনা এই শেষ সম্বলটুকুর উপর জড়ো হইয়া উঠিয়াছে—ভয়ে আতঙ্কে মস্তিষ্কের বিকৃতিতে…

"বল্ না, বল্ বাবুকে, নয় তুই আমার মেয়ে? বল্ না বাবুকে, কার মেয়ে তুই?"

সেই রকম বিহ্বল দৃষ্টিতেই চাহিয়া মেয়েটা যেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—"তোমার।"

"ওই শুনুন বাবু, আমারই আবাগী, আমারই সোনা। বলব না আবাগী, বাবু? এই হাহাকার, চতুর্দিকে লোক কিউয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, পড়ে মরে যাচ্ছে, বাড়িকে বাড়ি মরে সাফ হয়ে গেল, আর তুই বাপ হয়ে কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে—"

আবার রহস্যাবৃত হইয়া পড়িতেছে ; বাপ নয় তাহা হইলে।

"তোমার ভাইঝি নাকি?" বলিয়া প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, লোকটা একটু বিরতি দিয়াই যেন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—"গাল দিই সাধে বাবু? আরও দোব। একশ'বার দোব, ম'রে উরকুর উঠে যাচ্ছে চারিদিকে, আর তুই শালা কিনা মদ গিলে এই দুধের বাছাটাকে ফুটপাথের ওপর ফেলে রেখে·· হ্যাঁ বাবু, আপনি বোধ হয় পেত্যয় যাবেন না ফুটপাথের ওপরে, একপাল ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাদের মধ্যে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে, 'বাবা গো, ওগো বাবা গো!'···বুক ফেটে যায় বাবু, শুনলে···মদের দোকানের সামনে বাবু, মদের দোকানের সামনে! হাজার ন্যাকড়া-পরা হোক, না খেতে পেয়ে হাজার মর-মর হয়ে পড়ুক, তবু ভিখিরীদের কাচ্চাবাচ্চাগুনো ওর চেয়ে ঢের সুখী তাদের মা আছে, বাপ আছে···যার নেই তার নেই, আলাদা কথা ; কিন্তু এ আবাগীর যে থেকেও নেই বাবু! মদের দোকানের সামনে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে, কে হাতে একটা প্যাজের বড়া দিয়ে গেছে, হাতেই আছে, ওই এক বুলি 'বাবা গো, ওগো বাবা গো!' বললাম 'কোথায় তোর বাবা? মুখের পানে সে যে কি ফ্যালফ্যাল চাওয়া পাষাণও গলে যায় দেখলে। ওর তো মুখে রা নেই, একটা ভিখিরীর মেয়ে এঁটো খুঁটে খাচ্ছিল, বললে, 'বলছে, ওর বাপ ওই মদের দোকানটায় সেঁধেচে গো। বলনু, খা এসে, তা···'

"কি যে হল মনে বাবু!···ইচ্ছে করল, সে আঁটকুড়ির সন্তানের কাঁচা মাথাটা যদি—"

লোকটা একদমে অনেকগুলো কথা বলিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া একটু চুপ করিল, কপালের উপরের চুলগুলা খামচাইয়া অল্প অল্প ধুঁকিতে লাগিল।

বলিলাম, "ওর বাপ তোমার যেন কেউ হয় বলে—"

লোকটা ঝাঁকড়া চুলগুলা নাড়িয়া একটু উগ্রভাবেই আমার পানে ঘোলাটে চোখে চাহিয়া বলিল—"ওর বাপ নেই বাবু, দয়া করে তার নামটা আর করবেন না আমার সামনে। ওকে তো তাই বলনু, 'নেই তোর বাপ,

মরেছে, নইলে তোকে এক পহর থেকে এই ভিখিরীর দলে ফেলে রাখে? আর থাকলেই কি উবগার হবে তোর সে বাপ দিয়ে? সে শালা মরুক, মরুক, মরুক সে শালা!"—

মেয়েটা হঠাৎ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। লোকটার ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি মাথাটা বুকে চাপিয়া বসিয়া বসিয়া দোলা দিতে দিতে অসীম দরদভরে বলিতে লাগিল—"না না, আছে তোর বাপ—সোনা আমার, মানিক আমার, বাবা আছে রে—এই তো আমি রয়েছি, নয় আমি তোর বাপ? বলবি নি বাপ আমায়?"…

রহস্যটা বাড়িযাই যাইতেছে। মেয়েটি ভাইঝি সম্বন্ধের নয়, কেন না, তাহা হইলে উহার বাপকে 'শালা' বলিয়া গাল পাড়িত না; নাতনীজাতীয়ও নয়, তাহা হইলে আর বাপ হইতে যাইবে কি করিয়া? ভাবিবারও অবসর দিতেছে না। ইহা ঠিক যে, মেয়েটার বাপ লোকটার পরিচিত, খুবই সম্ভব প্রতিবেশী—কোন মাতাল প্রতিবেশী। দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও হইতে পারে। যে স্তরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে ভাই সম্পর্কের লোককে রাগ বা আক্রোশের মাথায় শালা বলা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু হউক নিম্নস্তরের, লোকটার প্রাণ আছে—নিজের পেটে অন্ন নাই, নিজেব মুখের গ্রাস মেয়েটির মুখে তুলিয়া দিয়াছে। মেয়েটার গায়ে যে নূতন জামাটা, রাস্তার ধার হইতে কেনা হইলেও টাকা দুয়েকের কম নয় এই বাজারে। নিজের গায়ে ন্যাকড়া, তবুও—

চিন্তার মধ্যেই আমি হঠাৎ যেন ধাক্কা খাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম, মেয়েটা সত্যই বদ্ধ এক পাগলের হাতে পড়ে নাই তো? গোড়ায় একটু লাগিয়াছিল খোঁকা, আবার সেটা কাটিয়া গিয়াছিল; এবার কিন্তু ধারণাটা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল। কথার কিছু বাঁধুনি নাই, বেশ বলিয়া যাইতেছে হঠাৎ মাঝখানে এক-একটা কথা অসংলগ্ন, বেখাপ্পা; বলার ভঙ্গীও সেই রকম, কতকটা স্পষ্ট, কতকটা অর্ধস্পষ্ট, কতকটা একেবারেই যেন জিবে জড়াইয়া যাইতেছে। হয়তো অতিরিক্ত দুর্বলতা; কিন্তু সেখানেও যে পাগলামিরই লক্ষণ—সমস্ত দিন খায় নাই, অথচ আহার্য দিতে গেলে পা জড়াইয়া বারণ করে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, আন্দাজটা ততই যেন পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। পাগলই; এখন যে ভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, এই

মেয়েটার উপর ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে ; ওকে বাঁচাইতে হইবে—শুধু বাঁচানো নয়, ভাল পরাইয়া, ভাল খাওয়াইয়া বাঁচানো। যে করিয়াই হউক একটা জামা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, সমস্ত দিনে আহায যেটুকু যোগাড় হইয়াছিল উহারই মুখে তুলিয়া দিয়াছে। এ ঝোঁকের কারণ অনেক রকমই হইতে পারে ; এ মহামারীর বাজারে তো অপ্রতুল নাই, হয়তো প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর নিজের সন্তানটিকেই হারাইয়াছে,—বস্ত্র নাই, অন্ন নাই, অসহায়ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে, জঠরের অগ্নি তাহারই চোখের নীচে তাহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পাগল কবিয়া দেওয়ার দৃশ্য নয় ?

যদি নিজের নাই হারাইয়া থাকে তো রাস্তার দুই ধারে প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের দৃশ্য কি যথেষ্ট নয় ?

মনে পড়িয়া গেল, আজ হাওড়ার পুলের সামনে একটি দৃশ্য—একটি ভদ্রলোক, প্রকৃতই শিক্ষিত ভদ্রলোক, ট্রামের প্যাভিলিয়নের নীচে দাঁড়াইয়া ভগবান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট, মন্ত্রী, পেয়াদা, হিটলার, রুজভেল্ট, চার্চিল, তোজো—একধার হইতে সকলকে গাল পাড়িয়া যাইতেছে—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, যখন যে ভাষায় জোর পাইতেছে। সোজা গালাগাল নয়, গালাগালের লেকচার, রীতিমত বাগ্মিতা। লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে, গলার কপালের শির ফুলাইয়া গালাগাল দিয়া যাইতেছে। দুইজন পুলিস লইয়া একটা সার্জেণ্ট ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকের চেহারাটা একেবারে বদলাইয়া গেল—রাগের ভাবটা আছে, তবে তাহার সঙ্গে গুরুগাম্ভীর্য। সার্জেণ্ট কিছু বলিবার পূর্বেই তর্জনী নির্দেশ করিয়া বলিল—"You are late, mind you !" (দেরি করে ফেলেছ, মনে থাকে যেন !) সঙ্গে সঙ্গেই বিচারকের ব্যাণ্ড অর্থাৎ গলাবন্ধনের মত করিয়া রুমালটা গলায় ঝুলাইয়া বিচারকেরই দৃপ্ত ভঙ্গীতে একজন মাড়োয়ারী দর্শকের পানে দেখাইয়া বলিল…"Swear him—the profiteer first ; I hold my court here" (আমি এখানে আদালত করছি, আগে এই মুনাফাখোর রাক্ষসকে শপথ করাও।)

ততক্ষণে পুলিস দুইটার সংবিৎ হইয়াছে, কিছু না বুঝিলেও বেটন তুলিয়া অগ্রসর হইল। সার্জেণ্ট বলিল—"মারো মৎ, পাগলা হ্যায়, ঘর চালান দেও।"

শুধু তো দেহের বিনাশ নয়, উৎকট অমানুষিক দুঃখে কত মস্তিষ্কও যে এ রকম বিকৃত হইয়া যাইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! এ শিক্ষিত নয়, বিচারেব কথা বোঝে না, আত্মলোপের বিকারে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বোঝা গেল!

কিন্তু একটা কথা,—পাগলেব হাতে এ রকম একটা কচি মেয়েকে তো ছাড়িযা দেওযা নিবাপদ নয়; এখন ঝোঁক ধরিয়াছে বাঁচাইবার, যে-কোন মুহূর্তেই কিন্তু সেটা যে আছাড মারিবার ঝোঁকে পরিণত হইয়া যাইতে পারে! রহস্যেব চিন্তা ছিল, বহস্যটা কাটিযা গিয়া একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিযা ভাবিতে লাগিলাম, শেষে ঠিক করিলাম, কোন প্রকারে মেয়েটিকে উদ্ধার করা যাক আপাতত, তাহার পর ভাবিযা চিন্তিয়া একটা ব্যবস্থা করা যাইবে; থানায় দাখিল করিয়াই দিই, বা অনাথ-আশ্রমেই ভর্তি করিয়া দিই, কিছু একটা ব্যবস্থা হইবেই।

বলিলাম—"তোমার মনটা যে কত দরাজ, কর্তা, যতই ভাবছি যেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভদ্দরলোকদের মধ্যেও এতটা দয়ামমতা চোখে পডে না আজকাল; কে কাকে দেখছে বল? বেশ বেশ, এই রকম আমরা যদি পরস্পবকে না দেখি তো বাঙালী জাতটা টেঁকবে কি করে এ দুর্দিনে? বাইবের লোকদের দরদ তো দেখতেই পাচ্ছি। বড আনন্দ হল; নিজে না খেয়ে, না প'রে— "

গোঁজডানো মুখ দিয়া 'উফ!' করিয়া একটা আওয়াজ হইল, মুঠাটা চুলের ঝুঁটিটাকে আরও একটু জোরে যেন খামচাইয়া ধরিল। মনে হইল, ওষুধ যেন লাগিতেছে।

বলিলাম—"ভগবান তোমার ভাল করবেন বাপু; নিশ্চয়ই করবেন, তাঁর কাছে তো আর ইতর-ভদ্র নেই। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, মেয়েটিকে তুমি এ রকম ভাবে কাঁহাতক নিয়ে ঘুরে বেডাবে ঘাডে করে? আমি বলি কি, আমার এখানে না হয় রেখে দাও, ছেলেমানুষ এক মুঠো খাবে, থাকবে, তোমার যখন খুশি এক-একবার করে দেখে যাবে। একটা কচি মেয়ে, চোখে পডল, আমাদেরও তো একটু দেখা উচিত।"

'উফ' করিয়া আবার একটা শব্দ, বেশি টানা, সঙ্গে সঙ্গে মাথার একটা ঝাঁকানি, যেন নিজের মাথাটাকেই নিজে একটা নাড়া দিল। আশা হইল,

প্রস্তাবটা উহার পক্ষে কষ্টকর হইলেও বোধ হয় রাজি হইবে। হঠাৎ খেয়াল হইল, এই সময় যদি পেটে কিছু পড়ে তো বোধ হয় মাথাটা একটু ঠাণ্ডাও হইতে পারে, উহারই মধ্যে একটু ভাবিয়া দেখিবার শক্তি আসিতে পারে। বলিলাম—"আর এক কাজ কর, তুমিও এক মুঠো কিছু খেয়ে নাও, বামুনের বাড়িতে এসে পড়েছ, খালি পেটে ফিবে যাবে? নিজের পেট কেটেও তো লোকেদের দিতে হচ্ছে যা হয় কিছু। তুমি একটা ভাল লোক, অভুক্ত গেলে—"

ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিলাম—"ওরে, এক মুঠো ভাত, একটু ডাল, আর যা হয়েছে একটু নিয়ে আয় তো একটা কিছুতে করে শীগগির; আর এক ঘটি জল।"

লোকটা কি রকম এক অদ্ভুতভাবে একমনে শুনিতেছিল, হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া জামরুল গাছের নীচে দুইটা নেবুর ঝাড়ে অন্ধকারটা যেখানে আরও গাঢ় হইয়া গিয়াছে সেই দিকটায় দুই-তিন পা আগাইয়া গেল—মেয়েটাকে ছাড়িয়াই। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটাকে বাঁ কোলে তুলিয়া লইল, যেন হঠাৎ বেহাত করিয়া ফেলিতেছিল, তাহার পর গটগট করিয়া ঝোপের দিকে চলিয়া গেল—মনে হইল পকেটে একটা ভারী গোছের কিছু ছিল, যেন বেশ ভাল করিয়া মুঠাইয়া ধরিয়াছে। যেদিকে ঘরের একটু কোণ পড়ে, তাহার ওদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিরতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইচ্ছা হইল, যাই পিছনে পিছনে, কিন্তু গা-টা ছমছম করিয়া উঠিল। পকেটে কি? ছুঁড়িয়া মারিবে না তো? আরও সাংঘাতিক কিছুও হইতে পারে—পাগলের কাণ্ড! বোধ হয় মিনিট দুই-তিন আমি একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াই বসিয়া রহিলাম। লোকটা যায় নাই, খড়খড় করিয়া একবার শব্দ হইল, তাহার পরই মেয়েটা 'ও বাবা গো' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছেলেটা আমার একটা লণ্ঠন হাতে ভাত লইয়া আসিতেই ছিল, বলিলাম,—'শীগগির এস, পা চালিয়ে।"

ছেলেটার হাত থেকে লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইব, দেখি ঘরের কোণে ঘুরিয়া লোকটা চলিয়া আসিতেছে, কোলে মেয়েটা, সেই রকম বিহ্বল স্তম্ভিত দৃষ্টি, বোধ হয় আরও বেশি।

পা দুইটা এবার আরও টলিতেছে, পকেটে ইট-পাটকেলও নয়, রিভলভারও নয়, লণ্ঠনের আলোয় নিজের উপরার্ধটা নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশ করিয়া একটি বোতল। মদের গন্ধেও হাওয়াটা হঠাৎ বোঝাই হইয়া গেছে।

বাঁ কোলে মেয়েটাকে ভাল করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝড়ে-টলানো তালগাছের মত খানিকটা টলিয়া লইয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর রক্তাভ চক্ষু দুইটা আমার মুখে ন্যস্ত করিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল—"ভদ্দল্লোক! আর আমরা হলুম ইতোর! কেয়া মেরা ভদ্দল্লোক রে! মদ টেনে নিজের পেটের মেয়েকে পথে বস্‌ন্তে রেখেছি—ভদ্দল্লোকের কাশে বিচার চাইতে এলুম—দু ঘা দে উত্তমমধ্যম করে, তা না, কুটুম-আদরে এককাঁশি ভাতের ব্যবস্থা—বড়া আমাব ভদ্দল্লোক!—ছোঃ ছোঃ!…চল্ বেটী—"

একটা ঝাঁকানি দিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরেও কিছু বলিবার আছে, তবে সেটা শুনিতে কি রকম হইবে জানি না।

দুঃখিত হই নাই মোটেই, বরং সেদিন যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, মনটা খুবই প্রফুল্ল ছিল। একটু আশ্চর্য, কিন্তু কথাটা সত্য। আজ কয়েক মাস ধরিয়া 'ফেন দাও মা'-র একঘেয়ে শব্দের মধ্যে একটা অভিনবত্ব অন্তত একটা লোকের ভিতর চোখে পড়িল, যাহার ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, নেশা করিবার মত মনের অবস্থা আছে, নেশা করিবার মত ফালতু পয়সাও আছে, মৃতেব গাদার মধ্য দিয়া যে নিজের খেয়াল লইয়া নিজের পথ ধরিয়া যাইতে পারিতেছে। অপানাদের খারাপ লাগিতেছে নিশ্চয়, জানি লাগিবেই। একটা মাতাল যে আমার মনে সে রাত্রে কতবড একটা স্বস্তি আনিয়া দিয়াছিল, আমার মনকে অষ্টপ্রহরব্যাপী একটা উৎকট চিন্তা হইতে কি অদ্ভুতভাবেই না কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি দিয়াছিল, সে কথা আমি কি করিয়া বুঝাইব আপনাদের?

বড়বাবু বলিলেন—"দেখ ক'টা বেজেছে, দেখ একবার চোখ তুলে।"

সেটা অফিসে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিয়াছে চঞ্চল ; তবু নেহাৎ বাধ্যতার জন্য একবার চোখের পাতা তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল —"হয়ে গেল একটু দেরি স্যার—আজও।"

বড়বাবু স্ক্রু-চেয়ারটায় একটা পাক দিয়া ঘুরিয়া বসিলেন, গলা আরও একটু তুলিয়া বলিলেন—"একটু-টা কত তা নিজের মুখেই একবার বল তো শুনি।"

চঞ্চল বাঁ হাতের মুঠাটা ডান হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"আজ মিনিট কুড়ি লেট হয়ে গেল স্যার…কি করি!"

"কিছু করতে হবে না, এমন কি কষ্ট করে আসতে পর্যন্ত হবে না কাল থেকে, আমরা অন্য লোকের ব্যবস্থা করছি। কেন, ওয়ার টেকনিশিয়ান, এ-আর-পি—নানা রকম তো ব্যবস্থা হয়েছে—আমাদের জ্বালানো কেন?…আপিসের কাজ তো এভাবে চলতে পারে না…"

চাকরির ভয়েই চঞ্চলকে একটু মুখ তুলিয়া চাহিতে হইল, কাতর ভাবেই বলিল—"স্যার, এক ঘণ্টা থেকে কুড়ি মিনিটে দাঁড় করিয়েছি—মানে…"

"চলবে না, চলবে না বলে দিচ্ছি, এই কুড়ি মিনিট মেটাতে তোমার আরও মাসখানেক লাগবে। ও-ভাবে অফিস করা চলে না। যাও, আমি কেশিয়ারবাবুকে স্লিপ দিচ্ছি, হিসেব চুকিয়ে দেবে। যাও, অনেক চান্স দিয়েছি তোমাকে, আর পারব না।"

চেয়ারে আর একটা মোচড় দিয়া ঘুরিয়া বসিলেন।

চঞ্চল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সামনের ফাইলে গোটা-কতক সই করিয়া বড়বাবু ঘাড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

"আর একটা চান্স দিন স্যার। একেবারে আধ ঘণ্টার ওপর সময় বাড়িয়ে দিলে তাও এনেছিলাম সামলে, কিন্তু ট্রামে চড়াই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আটখানা ট্রাম চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, ঝুলতে ঝুলতে চলেছে লোকে—একটু যে পা রাখব তার জায়গা নেই। তবু চেষ্টা করতাম আগে, আজ চোখের সামনে একটা লোক পা পিছলে কাপড়-জামা ছিঁড়ে কোন রকমে প্রাণটা নিয়ে সামলে উঠল। আর সাহস হল না। এদিকে এই অবস্থা, তার উপর আবার আজ-কাল মেয়ে-ছেলেদের ভিড় হয়েছে, যদি বা দু'চার জন লোক নামে তো আগে তাদের পথ ছেড়ে দেয় সবাই ; যেটুকু সময় থাকে তাতে জবরদস্তি উঠতে গেলে তাদের ঘাড়ে পড়তে হয়। এই কয়েই যাতে চড়তে পারার একটু চান্স আছে, সেগুলো যায় বেরিয়ে।"

বড়বাবু ঘুরিয়া বসিলেন, বলিলেন—"তা হলে যাও তুমি হেঁসেলে ঘোমটা দিয়ে ব'সগে, বৌমাই বেরিয়ে চাকরি করুন। আমায় বোকা বোঝাচ্ছ, আমি তো ওদিককার ট্রামেই রোজ আসি ; ভিড় নেই এমন নয়, তবে না ওঠবার মতন অবস্থা নয়। আর যে রকম অবস্থাই হ'ক, যখন উঠতেই হবে তখন উপায় কি ? তা নয়, মেয়েরা চড়ে আর তুমি হাঁ করে তামাসা দেখ, মোদ্দা কথা তো এই ? তা এইবার যাও, সমস্ত দিন তামাসা দেখ গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।"

এর পরে আর দাঁড়ানো যায় না, চঞ্চল মুখটি চুন করিয়া হলে ফিরিয়া আসিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। পাশেই লেজার-কীপার মহিমবাবুর ডেস্ক। বয়স্ক লোক, সবার দাদা, একটু আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ফলাফল ?"

চঞ্চল ঘাড়টা চেয়ারের পিঠে এলাইয়া দিয়া বলিল—"মানা করে দিলে কাল থেকে আসতে।"

"ওটা ওর কথার মাত্রা, চাকরি খাবে না, তবে হাঁ, খিঁচোবে এই রকম।"

"এ ভাবে করাই বা যায় চাকরি কি করে দাদা ? মান-ইজ্জৎ যেতে বসেছে কেন বলি, গেছেই—গেলই আজ থেকে।"

মহিম দাদা চকিত ভাবে ঘুরিয়া বসিলেন।

"গালমন্দ করলে ?"

"তারও বেহদ্দ।"

"মানে ?"

"বললে—তুমি ঘোমটা দিয়ে হেঁসেলে ঢোক গিয়ে, বৌ এসে চাকরি করুক …মেয়েছেলে টেনে কথা বলা দাদা…"

মহিম-দাদা আবার নিশ্চিন্ত ভাবে বসিলেন, লেজারের উপর কলমটা ধরিয়া বলিলেন—"বৌ নয়, বৌমা বলেছে।"

চঞ্চল একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি কি করে জানলেন ?… হ্যাঁ, তাই বললে—'বৌমা এসে চাকরি করুক'।"

"লক্ষণটা ভাল, মানে, তুমি এখানকার পরিবারভুক্ত হয়ে গেলে। ঐ বুলি ওর, আমরাও বাদ যাই না। বুড়োর কিন্তু গুণ আছে হে—বৌমা টেনে কথা বললে তো বুঝতে হবে নিশ্চিন্দি, তবে হ্যাঁ, তোমরা সব আধুনিক আধুনিকা, তোমাদের অপমানই মনে হবে।"

একটু হাসিয়া মাথাটা দুইবার দুলাইয়া লেজারে মনোনিবেশ করিলেন ; চঞ্চল চুপ করিয়া সেই ভাবে বসিয়া রহিল। মহিম-দাদার ব্যাখ্যানে মনটা

উহারই মধ্যে একটু হালকা হইয়াছে, খানিক পরে বলিল—"তা নয় হল,...বাপের বয়সী উনি বৌকে টেনে বলেন দুটো কথা, বলুন ; কিন্তু এই খিঁচুনি সহ্য করব কত দিন ? আর তর্কের' কায়দাটা দেখুন দাদা...বলে 'আমিও তো ঐদিক-কার ট্রামেই রোজ আসছি।' উনি ওঠেন সেই টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপোয় দাদা। বললেন, আমিও তো কালীঘাট ডিপোতেই উঠি। উঠি ঠিক কিন্তু কালীঘাট আর টালিগঞ্জ এক হল ? এক মন্দিরেই তো বাজী মাত করে রেখেছে। তার ওপর আপিস কলেজ, ডিপোতে ঢোকবার অনেক আগেই বোঝাই হয়ে যায়। কিন্তু কে এত আরগুমেণ্ট করে বলুন ?"

মহিম-দাদা কাজের মধ্যেই শুনিতেছিলেন, একটা টোটেল দেওয়া শেষ করিয়া বলিলেন—"আরগুমেণ্ট নিয়ে তো ওব মাথাব্যথা পড়ে নি, আসলে ওর ঐ কথাগুলি বলবার জন্যে ছিভ চুলকুচ্ছিল, দিব্যি সরস কথাগুলো তো ?...কি বললে, বৌমাকে চাকরি করতে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি ঘোমটা টেনে হেঁসেলে ঢোক গিয়ে ? একবার রসটা দেখ বুড়োর !"

পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা বাহির করিয়া মিটি মিটি হাসির সহিত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া ছিপিতে টোকা মারিতে লাগিলেন।

চঞ্চল বলিল—"তা মিছেও বলে নি দাদা। এক একবার সত্যিই মনে হয় মেয়ে হয়ে জন্মালে ছিল ভাল। বেশ কাটিয়ে যাচ্ছে। লেডি হল তো ট্রামও একটু খাতির করে দাঁড়ায়। লোকেরাও ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব খাতির করে উঠতে সাহায্য করে। বাঁধা সীট রয়েছে, এদিকে আমাদের হিস্সে কেটে আরও বাড়িয়েও দিয়েছে, তাতেও কুলোয় না। মাঝখান থেকে মারা পড়ি আমরা ; মানে, বহু জন্মের পুণ্যে যদি একটু জায়গা পেলেন, গুছিয়ে বসলেন, একটু পরেই ঘুরে দেখেন এক জন লেডি দাঁড়িয়ে...দিন সীটটি ছেড়ে। ওরাই চাকরি করুক দাদা..."

"তাই করবে, তাই করবে"...মাথা দুলাইয়া অল্প একটু হাসিতে হাসিতে মহিমদাদা আবার খাতায় মনোনিবেশ করিলেন। এক জায়গায় কলমের টিক দিয়া বলিলেন—"খাতাগুলো খুলে-ছড়িয়ে ব'স ভায়া, চাকরির দাঁও-প্যাঁচগুলো শেখ, নতুন মানুষ..."

চঞ্চল হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছে। মনটা একটু হালকা হওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটারই যেন রং বদলাইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। কেমন হয় ? ধর, বেটাছেলেরাই হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, আর মেয়েরা উমেদারি করিয়া চাকরি যোগাড় করিতেছে, ব্যবসায় চালাইতেছে, মানে যত কিছু হ্যাপা সব তাহাদের ঘাড়ে।

শোনা যায় বর্মায় কতকটা ঐ ধরনের ব্যাপার। বাঁচা যায় তাহা হইলে।

খাতাপত্রগুলা টেবিলে ছড়াইয়া একটা সামনে খুলিয়া ভাবিতে লাগিল। বোধ হয় হেঁসেলের নিশ্চিন্ত কোণে আশ্রয় পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। চিন্তার মোড় ফিরিল।

...বেশ খাতির ওদের, বেশ আছে। অত ভিড় ট্রামে, ওদের পক্ষে যেন খোলা মাঠ...'লেডি হ্যায়, জেনানা হ্যায়...ডেড স্টপ...এক দমসে বাঁধকে!...একটু দোর ছেড়ে আপনারা নেমে দাঁড়ান না মশাই, দেখছেন না, মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন?'

সত্যই বেশ আছে; এদের খাতিরের অর্ধেকটাও যদি পাওয়া যাইত তো বড়বাবুর এ গঞ্জনাটা আর...

চিন্তার মধ্যেই চঞ্চলের চোখ দুইটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মাথায় যেন একটা আইডিয়া আসিয়াছে...অতি ক্ষীণ একটা আলোকের রেখা। চঞ্চল ডেস্কে কনুই দিয়া একটা আঙুলের নখ দাঁতে খুঁটিতে খুঁটিতে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখ দুইটি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।...মুখে ধীরে ধীরে একটি হাসি পর্যন্ত ফুটিযা উঠিল। অন্যমনস্ক ভাবেই খাতায় একটা ঘুষি মারিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"ঠিক হয়েছে।" কাজের জন্য পাতা উল্টাইল।

মহিম-দাদা প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক হল ভায়া?"

"বৌকেই পাঠাব দাদা, না হয় তার প্রতিভূকে।"

২

আপিস থেকে ফিরিবার পথে চঞ্চল একবার নরেশের দোকান হইয়া চাঁদনিতে চলিয়া গেল এবং একটা বড় কাটা-কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হইয়া বলিল... "একটা বোরখা চাই।"

"মাপ?"

"মাপ আনা হয়নি; এই আমার গায়ের হলেই চলবে।"

দোকানী একটু বিস্মিত ভাবে চাহিতে, হাসিয়া বলিল—"না, আমি পরব না, যিনি পরবেন তিনি মাথায় প্রায় আমার সমান. একটু উনিশ-বিশে ক্ষতি হবে না, বোরখাই তো।"

দেখা গেল নেহাৎ "বোরখাই তো" বলিয়া অবহেলা করিবার জিনিস নয়, তাহারও আবার আন্দাজ আছে মাথাটি ঠিকভাবে গলা চাই, চোখের জালতি দুটি ঠিক জায়গায় আসিয়া পড়া চাই, এসবের সঙ্গে আবার দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ আছে।

বাছিয়া মিলাইয়া কিনিতে আরও কয়েকটা দোকান ঘুরিতে হইল, বাড়ি ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বোরখার মোড়কটা নিজের দেরাজে বন্ধ করিয়া চঞ্চল বিষণ্ণভাবে বাহিরের রকে আসিয়া বসিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমন করে বসলি যে, শরীর ভাল আছে তো?"

চঞ্চল মুখটা ভার করিয়াই বলিল—"শরীর না ভাল থাকলে এসব সইবে কে বল?"

স্ত্রী বরুণা আসিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বারান্দার দরজার পাশটিতে দাঁড়াইল। মা আগাইয়া আসিয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"ও কথা বললি কেন রে? এলিও আজ বড্ড দেরি করে…"

চঞ্চল কতকটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল "মা, তোমরা ঠাকুর-দেবতা আর মান না?"

"হঠাৎ এ কি কথা?…অবিশ্যি আমাদের ভক্তি তেমনি, দিনান্তেও একবার মনে পড়ে না তাঁদের কথা—তবুও হঠাৎ ও কথা জিগ্যেস করলি যে?"

"করলাম জিগ্যেস। চাকরিটা হল, তার পর একবার মানসিকটা দিতে গিয়েছিলে কালীঘাটে, তার পর যে ভুলে আর…"

একটু থামিয়াই বলিল—"ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে তো আর লুকোচুরি চলে না, তোমরাও ভুলেছ দেখে তিনিও ভুলেছেন, চাকরিটি হল, কিন্তু রাখা যাবে না…"

"সে কি রে!"—বলিয়া মা শিহরিয়া উঠিয়া মুখের পানে চাহিলেন।

চঞ্চল বলিল—"তাই এত করে করেও ট্রামে দেরি হয়ে যাচ্ছেই একটু, তাইতেই কাল থেকে আসতে বারণ করে দিলে। মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যে কেশিয়ারকে অর্ডার দেবে বলেছিল, সেটা আর দেয় নি, তাইতে মনে হচ্ছে কালকের দিনটা দেখবে, কিন্তু ট্রামের তো সেই অবস্থাই…"

মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নিজের মুখে বলা পাপ, তবু মার মন্দিরে যে একেবারে যাই নি এমন কথা তো নয়। তবু অপরাধ হয়ে গেছে, এক্ষুনি গিয়ে মার পুজো দিয়ে নাকে খৎ দিয়ে আসছি; মা যেমন হাত তুলে দিয়েছেন, বজায় রেখে দিন…"

চঞ্চল একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"তুমি একলা গেলে হবে?"

"তুইও যাবি বলছিস? সে তো আরও…"

"আমার কথা হচ্ছে না, আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস কত তা মা জানেন, গেলে উল্টো ফলই হবে। বলছিলাম…"

বারান্দার দোরের দিকে মুখটা একটু ঘুরাইল।

"ও, বৌমার কথা? তা চলুন, যাবেন বৈ কি।"

"তা হলে সতীও যাক, বোনই তো।"

নাম করিলে আর 'না' বলিতে সাহস হয় না, ঠিক হইল তিন জনেই গিয়া মা-কালীব দ্বাবস্থ হইবেন।

চঞ্চলকে জলযোগ করাইয়া একটু গা-ঢাকা হইবামাত্র তিন জনে বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিব কাছেই, মা থাকিলে আব কাহারও সঙ্গে যাওয়া দবকাব হয় না, তবু চঞ্চল ছোট ভাই চপলকে সঙ্গে কবিয়া দিল, বলিল—"একজন বেটাছেলে সঙ্গে থাকা ভাল, যা দিন কাল পড়েছে।"

মনে একটু খটকা তুলিয়া দিলে আজকাল আর প্রতিবাদ কবিতে সাহস হয় না, চপলও গেল।

সবাইকে সবাইয়া দিয়া চঞ্চল বাহিরেব দুয়াবে খিল আঁটিয়া নিজের ঘরে আসিয়া দেরাজটা খুলিল। তাহাব পব আরশিব সামনে দাঁড়াইয়া বোরখাটা পবিয়া ফেলিল। অদ্ভুত প্রতিচ্ছায়া! মুখে একটা হাসি ফুটিল, আরশিতে শুধু জাগিয়া রহিল একজোড়া বিস্মিত চোখ।

কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিবাব সময় নাই। চঞ্চল পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। বেশ বাধ-বাধ ঠেকিতেছে, চোখের জালতি দুইটা সবিয়া সরিয়া গিয়া দেখার অসুবিধা হইতেছে। মাথার অংশটা ঠিক করিয়া বসাইয়া লইয়া চঞ্চল উঠানে নামিল এবং এলোমেলো ভাবে চার পাঁচটা চক্র দিল। উঠান শেষ হইলে সমস্ত ঘরগুলা কয়েক বার ঘুবিয়া ছাতে যাইবার সিঁড়িতে উঠিল। ছাতে উঠিল না, তবে সিঁড়ি দিয়া কয়েকবার উঠা-নামা কবিল। আবার উঠান, আবার ঘর। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে যখন বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল তখন বেশ এক চোট প্র্যাকটিস্ করিয়া চঞ্চল বকে বসিয়া আছে। দুয়াব খুলিয়া দিল। এই ভাবে মহল্লা দিবার পব চঞ্চল বোবখাটা দেরাজে তুলিয়া রাখিল, তাহার পর রকে একটা চেয়ার টানিয়া ভাবিতে লাগিল।

৩

কালীঘাট ট্রামডিপোর পিছনটা নূতন বালিগঞ্জ এবং পুরাতন কালীঘাটের সঙ্গমস্থলে। জায়গাটার একটু বিশেষত্ব আছে—খানিকটা পড়তি জায়গা, খানিকটা নোংরা বসতি। কিছু এঁদো গলি, দুপাশে খোলার বাড়ি আছে, টিনের

ছাতের কাদা-লেপা বাড়িও আছে, আবার কোঠাবাড়িও বিরল নয়, তারই পাশে আবার নূতন ধাঁচের রাস্তা, দুদিকে নূতন ধরনের বাড়ি। তাহারও মাঝে মাঝে আবার খোলা, টিন, ছ্যাঁচা বেড়া।

একটা বেশ বড পার্কও আছে—সকাল-সন্ধ্যায গম-গম করিতে থাকে; তাহার পিছনেই জায়গাটা যেন মরা, বেশ খানিকটা জায়গা লইয়া মহীশূর নবাববংশের অনেকগুলি কবর। তার হাওযাটাই যেন ছাইয়া আছে জায়গাটিতে। একটু উত্তরে আবার গ্রীক চার্চ। বাসিন্দারা পাঁচ-মিশিলি, ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান, নব্য, পুরাতনী হরেক রকমের লোক, তাব পাশা-পাশি খুঁজিয়া দেখিলে বোধ হয় কিছু কিছু ক্রিশ্চানও পাওয়া যাইবে।

খুব সম্ভব এই জায়গাটা ভাঙিয়া গডিবার মুখেই লডাই শুরু হইয়া যায়। পুরাতন সহরতলী কলিকাতার একটা অংশ এখানে নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া আছে।

এই পাড়াতেই একই কানা গলির শেষ বাড়ি চঞ্চলদের, গলিব মাঝামাঝি আসিয়া তিন ঘর গৃহস্থ মুসলমান, গলির মুখে লোকমারা ব্যবসায় পযসা করিয়া একটি ভদ্রলোক অ্যামেরিক্যান প্যাটার্নের একটি বাড়ি তুলিয়াছে।

চঞ্চল ভাবিতে লাগিল। জায়গাটা এমন যে এখানকার রাস্তা দিয়া যদি বোরখা পরিয়া যাওয়া যায় তো বিশেষ কৌতূহল আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা নাই। আসলে গলির ঐ মুসলমান-পরিবারের স্ত্রীলোকদের বোরখা ব্যবহারের কথা থেকেই ওর মনে পড়িয়াছে বোরখার কথা। এ-পাড়ার পুবাতন বাসিন্দা হিসাবে তাঁহারা আসেনও চঞ্চলদের বাড়ি কখন কখন,—তবে ঐ বোরখা পরিয়া।

পথে একবার পড়িতে পারিলে আটকাইবে না। ওদিককারও ব্যাপারটা একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। আপিস হইতে বাহির হইয়া সোজা নরেশের দোকানে গিয়াছিল। নরেশ বাল্যবন্ধু বলিলেও চলে, তবে বয়সে অনেকটা বড়, এইটৃথ ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়া স্কুল ছাড়িয়া দেয়। কালীঘাটেই বাড়ি। স্ট্র্যাণ্ডরোড থেকে একটু ভিতরে গিয়া ব্যাফ্‌ল্‌ওয়াল ঢাকা একটা ঘুপচি গলির মধ্যে তাহার চায়ের দোকান। দোকানের ভেতরেও কয়েকটা অলিগলি আছে, নড়-বড়ে কাঠের সিঁড়ি লাগানো একটা কাঠের দেয়াল দেওয়া ঘরের মত আছে তাহার মধ্যে দিয়াও আবার ওদিকে যাওয়া যায়। স্থানটা একটু রহস্যময়। নরেশের এই দোকানে গিয়া বোরখাটা ছাড়িয়া চঞ্চল স্ট্র্যাণ্ড রোডে তাহার আপিসে গিয়া উঠিবে, বড় জোর আর মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। দায়ে পড়িয়া এ

সাহায্যটুকু চাহিলেও চঞ্চল এর বিপদের কথা বলিয়াছিল নরেশকে, এই যে একজন বোরখা পরা স্ত্রীলোককে, এক হিসাবে যুবতীকে, তাহার দোকানে প্রবেশ কবিতে দেখিবে আশপাশের লোকে, এতে দোকানের বদনামের ভয় আছে তো ?

নবেশ অল্প হাসির সহিত একটা চোখ টিপিয়া জিহ্বা আর তালুর যোগে টকাস করিয়া একটা আওয়াজ কবিয়া বলিযাছিল—"তুই নিজের চাকরি সামলা, সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না , বদনাম, ভয়, এসবেব ভাবনা যদি ভাবত তো নবেশ স্ট্র্যাণ্ড বোডের এলাকায় এ বকম দোকান হাঁকডাতে পারত না। তুই এসে বোবখাটি সোজা আমাব হাতে দিয়ে বেবিয়ে যাবি। হেঁয়ালি সামলাবার ভাব আমাব ওপব। আর এমন ছোটখাট হেঁযালি নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আবাব সেই ভাবে সেই রকম একটা শব্দ কবিয়া কযেক সেকেণ্ড ধরিয়া মাথা তুলাইয়াছিল। ভাল-মন্দ যাই হোক চঞ্চল আর ওদিকটা চাহিতেছে না, চাহিলে যখন চলিবেও না , নবেশেব উপব ছাডিযা দিয়া নিশ্চিন্ত আছে। চিন্তা হইতেছে এদিকটা লইয়া , বাডিব মধ্যে বোবখা পবিবেই বা কি করিয়া, দুয়ার খুলিয়া বাহিব হইবেই বা কি কবিয়া ? রাস্তায় একবার নামিয়া পডিতে পারিলে আটকাইবে না, কিন্তু নামাটাই হইতেছে সমস্যা। আর রাস্তায় নামিয়া বোরখাটা পরিতে গেলে তো চলিবে না। কানা গলি, লোক চলাচল অল্প, হয়তো একেবাবে যখন খালি, টপ করিয়া পরিয়া লইল, কেহ দেখিতেও পাইল না , কিন্তু দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনাও তো আছে। প্রতিবেশীদের জানলা ঘুলঘুলি আছে, হয়তো বা কেউ ঠিক তালের মাথায় দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।—এ কি, মিত্তিরদের চঞ্চল বোরখা পরে কেন !

ভাবিতে লাগিল চঞ্চল। ঐ সময়টা মা থাকেন পূজায়। চপলের দিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সে মাস্টারের নিকট পডিতে যায়। কিন্তু বৌ আর সতীর সে সময়টা কাজের ভয়ানক ভিড, সমস্ত বাডিটাতে চরখির মত ঘুরিতে থাকে, তাহাদের দৃষ্টি এডাইবার তো কোন উপায়ই নাই। অনেক রকম ভাবিল, কোন সমাধানই নাই।·· নাঃ, চলিবে না , মেয়েদের পছন্দ না হইলে পরদিন ফিরাইয়া দিবে এই বলিয়া আনিয়াছে বোরখাটা, কাল ফিরাইয়া দিয়া আসিবে।·· কোথা থেকে যে একটা আজগুবি খেয়াল উঠিল।

কড়া-নাডার শব্দ হইল। চঞ্চল ধীরে ধীরে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

৪

সমাধানটা শেষকালে আপনি-আপনিই হইয়া গেল, অবশ্য যে-ভাবে হইল তাহার গোড়াটা খুব আনন্দজনক নয়।

আহারের পর চঞ্চল একটা সিগারেট ধরাইয়া ছাতে গিয়া মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছে, ঐ চিন্তা, এমন সময় বধূ বরুণা ধীরে ধীরে উপরে আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। ডান হাতটা পেছনে, ভাবটা অতিমাত্র গম্ভীর। চঞ্চল কিছু প্রশ্ন করিবার আগেই বলিল—"আজ একটা নতুন জিনিস পেলাম।"

চঞ্চল রসিকতারই চেষ্টা করিল, বলিল—"মা-কালীর সদ্য সদ্য দয়া! জিনিসটা কি?"

বধূ হাতটা সামনে আনিয়া মুঠাটা খুলিয়া ধরিল, গোটানো-সোটানো বোরখাটা চঞ্চলের পায়ের সামনে লুটাইয়া পড়িল।

চঞ্চল বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তুমি এ কি করে পেলে?"

বধূ স্বর আরও সংযত করিয়া বলিল—"মা-কালীর সদ্য সদ্য দয়া; ট্রাঙ্কের চাবিটা পাচ্ছিলাম না, গরদের শাড়িটা তোমার দেরাজেই রাখতে গিয়ে..."

চঞ্চলের মাথায় ততক্ষণে একটা আইডিয়া আসিয়াছে—বধূ যখন দেখিয়াই ফেলিল। বলিল—"ভালই হল, যখন টের পেয়ে গেলেই..."

বধূ প্রশ্ন করিল—"কার?"

"আমার...মানে..."

"আমি 'মানে'টার কথাই জিগ্যেস করছি। এখন তোমার তো দেখতেই পাচ্ছি, খুব আদরযত্নে রেখেছও, আগে কার ছিল?"

মনে কোন কু না থাকিলে যাহা হয় এতক্ষণ তাহাই হইয়া আসিতেছিল, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই চঞ্চল সাধারণ ভাবে লইয়া আসিতেছিল; বধূর শেষ প্রশ্নটিতে তাহার চমক ভাঙিল, মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"আগে কার ছিল...? হঠাৎ এ প্রশ্ন যে?"

"হঠাৎ টের পেলাম আজ, এর আগে কি করে করতাম?"

চঞ্চল একটু চুপ করিল, তাহার পর ব্যাপারটাকে বোধ হয় তরল করিয়া ফেলিবার জন্যই বলিল—"এর আগে ছিল দোকানীর; আমি কিনেছি।"

"বেশ, তাই মেনে নিলাম।...কার জন্যে?"

ঘটনাচক্রে অবস্থাটা যেমন দাঁড়াইল, চঞ্চলের হাসিই ঠেলিয়া আসিতেছিল, তবু তর্কটা চালাইবার জন্য গম্ভীর ভাবেই বলিল—"নিজের জন্যে।"

"এত-বড় নিজেরটা কে সেই কথাই জিগ্যেস করছি।"

একটু বিরতি দিয়াই বলিল—"শীগগির বল, নৈলে আমি মার কাছে ঐটে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলব—চেঁচাব—ছাত থেকে লাফিয়ে মরব—বল—বল…"

হঠাৎ রাগটা বাড়িয়া গেছে, গলার আওয়াজও আর ততটা চাপা নাই, চঞ্চল উঠিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—"বলছি; কিন্তু তুমি রাগের মাথায় ঠিক উলটো কথা বলছ যে। না বললে চেঁচাবে, লাফাবে, মাকে বলবে বলছ, কিন্তু বললেই যে ঐ রকম করবার সম্ভাবনা বেশি আরও—যেমন সন্দেহ তোমার। তার কি হবে?

"বেশ, কিছু করব না, তুমি বল, আমাদের সব সয়…"

কণ্ঠস্বর শান্ত, এর মধ্যেই যেন ভিতরে ভিতরে অন্য-রকম সঙ্কল্প করিয়া লইয়াছে।

চঞ্চল বলিল—"ব'স তাহলে। ও-রকম উতলা হয়ে এসব কথা শোনা চলে না।"

বধূ ধীরে ধীরে বসিল, হাতটা চঞ্চলের হাতেই আছে। চঞ্চল বলিল—"শোনবার আগে একটা কথা বল,…আমি তো বানিয়েও বলতে পারি…"

"বানিয়ে বললে আমি টের পাব।"

"সত্যি কথা বললে?"

"তাও টের পাব।"

চঞ্চল সিগারেটে এক টান দিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—"ওটা মিছে গুমর তোমাদের।"

"কখনও নয়, বলে দেখ।"

"অনেকক্ষণ বলেছি।"

"কি?"

"নিজের জন্যে কিনেছি।"

বধূ স্থির দৃষ্টিতে একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—"নিজের জন্যে বোরখা কিনেছ? এমন সত্যি কথা যেন আর কাউকে বলতে যেও না।"

"তোমাকেও বলতাম না, অনেক রকম মিথ্যা ছিল ; দেখলাম বললে কাজ হবে।"

দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল একটু। চঞ্চলের বলিবার ভঙ্গিতে বধূ কতকটা শান্ত হইয়াছে, এখন যেন একটু বিমূঢ়, ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না।

চঞ্চল পিঠে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"করলে বিশ্বাস? অন্য দিক থেকেও জিগ্যেস করি—অবিশ্বাসটা গেল?"

"তুমি বোরখা নিয়ে কি করবে? থাম, থিয়েটার নয় তো?"

চঞ্চল আবার একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—"ঠিক থিয়েটার নয়, তবে অভিনয় বটে,—মেয়ে সেজে আপিসে যাব।"

বধূ বিস্ময়ের চোটে একটু পিছনে ঝুঁকিয়া গেল, একরাশ প্রশ্ন করিয়া বসিল "কি জ্বালা!—কেন?—তা কি করে যাবে এতটা পথ?—আপিসে ঢুকতে দেবে? আপিসের ওরাই কিনতে বললে নাকি? এ আবার কি নতুন ধরনের চাকরি বাপু!—"

চঞ্চল বধূর বিপর্যস্ত ভাবটা উপভোগ করিতেছিল, হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—"শোন, অনেক কথা যে জিগ্যেস করে ফেললে!"

ধীরে ধীরে সব বলিল। বাহির হইবার সময় সতীকে ওদিকে কাজে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাকে সঙ্গে আনিয়া সদর দরজাটি কি করিয়া সন্তর্পণে দিয়া দিতে হইবে, যদি কেহ বাহির হইতে দেখিয়া ফেলে, শেখেদের বাড়ির মেয়ে বলিয়া কি করিয়া কাটান দিতে হইবে, সে সব বিষয়েও সলাপরামর্শ হইল। তাহার মধ্যেই বধূ একবার ভীত ভাবে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁগা, আর যদি জড়িয়ে পড়ে যাও ভিড়ের মধ্যে!"

চঞ্চল অবস্থাটা একটু ভাবিল, বলিল—"তাহলে একদিক থেকে অন্তত অভিনয়টা সত্যিকেও ছাড়িয়ে যাবে ; মানে, মেয়েছেলের চেয়েও বেশি লজ্জায় পড়ে যেতে পারব। আর যে বেচারিরা মেয়েছেলে ভেবে তাড়াতাড়ি তুলতে আসবে..."

দু'জনেই চাপা-গলায় হাসিয়া উঠিল ; রাগে অভিমানে যে প্রসঙ্গটা আরম্ভ হইয়াছিল সেটা এই ভাবে শেষ করিয়া অনেক রাত্রে দু'জনে নীচে নামিল।

৫

পরদিন বেলা আন্দাজ সওয়া নয়টার সময় একটি বোরখা-পরা মূর্তি গ্রীকচার্চের পাশের সড়ক দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর শেডটির নীচে দাঁড়াইল। বোরখা থাকিলে আব বর্ণনার হাঙ্গাম থাকে না, সমস্ত শরীরের মধ্যে মূর্তির দেখা যাইতেছে দুটি পা, সেইটি মুসলমানী ফ্যাশানের একজোড়া চটিতে অর্ধেক ঢাকা।

ও খেয়ালটা চঞ্চলের একেবারেই হয় নাই, কেমন একটা ধারণা থাকিয়া গিয়াছিল একটা বোরখা হইলেই সব কিছু ঢাকা পড়িয়া যাইবে। বধূই জিজ্ঞাসা করিল—"আর, তোমার জুতো?"

সকালে গিয়া একজোড়া সস্তা ফুলকাটা চটি কিনিয়া আনিল। বধূ হাতে চারগাছা করিয়া চুড়ি এবং পায়ে একটু করিয়া মেহদির কথাও বলিয়াছিল, তবে সেটা ঠাট্টা করিয়া।

শেডের মধ্যেই এত ভিড় যে জায়গা পাওয়া মুশকিল, তবু চঞ্চল অল্প সময়ের মধ্যেই সামনে আসিয়া পড়িল। বেশি চেষ্টাও করিতে হইল না, মেয়েছেলে বিশেষ করিয়া বোরখা-পরিহিতা দেখিয়া সবাই উহারই মধ্যে একটু পথ করিয়া দিল। বয়স্থ দু-একজন একটু মন্তব্যও করিল—"কোথায় যাবে মা এর মধ্যে?··· ট্রামপর চটিয়েগা কৈসে?"

একটু আগাইয়া আসিলে দূরে মন্তব্য হইল—"সব উলটে গেল; আমাদের এঁরা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন তো ওরা পদা স্বদ্ধু নিয়ে বেরিয়ে এলো।"

একটা ট্রাম আসিল; বেশই ভিড, তবে এক একটা ট্রামে হঠাৎ যেমন হয়, উহারই মধ্যে একটু কম; তিন জন বাঙালীর মেয়ে অপেক্ষা করিতেছিল, টপটপ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পিছনে কয়েকজন পুরুষও উঠিল। খানিকটা জডতা খানিকটা ভয় মিশিয়া চঞ্চলের পা দুইটাকে যেন উঠিতে দিল না। তাহার উপর ত্রস্ত ভিড়ের এলামেলো একটু ধাক্কাও খাইল। আবার জুতার বাণ্ডিলটাকে সামলাইতেছে বোরখার মধ্যে।···ট্রামটা চলিয়া গেল।

বোরখা না থাকিলে উঠিতে পারিত, অনুতাপে চঞ্চলের যেন নিজের হাত কামড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, উল্টা অবস্থা দেখিয়া সে সত্যই মেয়েছেলের মতই ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বোরখাই কিন্তু উদ্ধার করিল। কয়েক জন লোকই তাহার এই ব্যর্থতা লক্ষ্য

করিয়াছে, পরের ট্রাম আসিতেই জন তিনেক ছোকরা একেবারে হৈ-চৈ লাগাইয়া দিল—"বান্‌কে—বেঁধে রাখ, লেডি হ্যায়—আপনি আসুন—আইয়ে আপ ইধার—একটু নেমে দাঁড়ান আপনারা—উঠতে দিন এঁকে, তার পব আবার উঠবেন মশাই—উনি দু'ঘণ্টা থেকে দাড়িয়ে রয়েছেন পর্দানশীন জেনানা—চলে আইয়ে আপ…"

এক জন একটু বশি কল্পনাপ্রবণ অথচ প্র্যাকটিক্যাল গোছের ছোকরা বলিল—"ওঁর স্বামী হাসপাতালে—এখন-তখন এইরকম অবস্থা…"

একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। উপবেও কয়েকজন সহানুভূতিপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। গাড়িটা ছাড়িতেই ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া এলার্ম ঘণ্টি দিয়া দাঁড করাইয়া দিল। ড্রাইভার গাল খাইল, কনডাক্টর দাবড়ানি খাইল। সেকেণ্ড ক্লাস থেকেও উৎসুক প্রশ্ন এবং সহানুভূতিসূচক কলরব উঠিল। যাহারা একটু জিদ করিয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ছিল বুকনির চোটে নামিতে যেন পথ পাইল না; দুইটি অগ্রণী ছোকরার পিছনে পিছনে চঞ্চল গিয়া ট্রামে উঠিল। যাহারা নামিয়াছিল, সবাই যে উঠিতে পারিল এমন নয়। অবশ্য তাহাদের জন্য আর কেহ এলার্ম দিল না। ট্রাম ছাড়িয়া দিল।

তাহার পর আর আটকাইল না। একে মহিলা তায় পর্দানশীন,, তাহার উপর আবার ইহার জন্যই এতটা হৈ-চৈ হইয়া গিয়াছে, সেই চাপে ভিড়ের মধ্যেও কি করিয়া যেন আপনি-আপনিই একটা রাস্তা হইয়া গেল।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুকনিও চলিতেছে; দু'একজন বৃদ্ধও আছে, পাণ্টা বুকনিও দিতেছে;—"পর্দার মধ্যে থাকলেও জ্বালা, বেরুলেও জ্বালা…বাড়ির অশান্তি থেকে পালি.য় পালিয়ে বেড়ানো যেত, এবার নাও বাইরে পর্যন্ত ঠেলে বেরুল।"

প্রায় সব আসনগুলাই মেয়ে দিয়া ভর্তি, বেটাছেলেদের মধ্যে যাহাদের নিজের নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, অপ্রসন্নভাবে রড ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিকে চঞ্চলকে যাহারা তুলিয়া দিয়াছিল তাহারা উৎসাহিত করিতেছে—"আপনি আরও এগিয়ে যান—আরও"

অন্য কয়েকজনও যোগ দিল—"আরও থোড়া বঢ় যাইয়ে মাঈ…একটু সরে দাঁড়ান না মশাই, দেখছেন…"

চঞ্চল গিয়া একটি বেঞ্চের পিছনে দাঁড়াইল। একটি যুবা আর একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ ধারের দিকটায় একেবারে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে; মনে হয় যেন চরম বিরক্তিতে।

আবার টিপ্পনী, বক্রোক্তির ছুট আরম্ভ হইল। "আপনারা দুজনে সীট ছুটো ছেড়ে দিন না মশাই, দেখছেন পেছনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। পাছে দেখতে পান, ফিরেও চাইছেন না, ও মশাই!…এ জাত আবার স্বরাজ চায়! এখনও দুশো বছর!—"

যুবক বোধ হয় সত্যই অন্যমনস্ক ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না। টিপ্পনীকারেরা আরও খানিকটা চেষ্টা করিল; তাহার পর নিরস্ত হইল। বৃদ্ধ বলিয়াও আবার কেহ কেহ ভাবিল, কালা। কেহ কেহ ভাবিল জানিয়া শুনিয়া কালা সাজিয়াছে, স্পষ্টভাষায় বলিলও, তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় শেষে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর পরামর্শ দেওয়া আরম্ভ হইল—"আপ উহা বৈঠ যাইয়ে, বুড়া আদমি হ্যায়—আপনার বাপের বয়সী লোক, বসে যান না পাশে, কেন কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন? আপ উনকা লেড়কি মাফিক…"

পরামর্শ এড়াইবার জন্যই চঞ্চল একবার আগাইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

কী যে আরাম! কত দিন যে ট্রামে এভাবে বসিতে পায় নাই। নূতন গাড়ি, একটু গা দোলে না, গদি নয় তো যেন মনে হয় ফুলের ওপর বসিয়া আছে। এত যে ভিড়, প্রত্যেক স্টপেজেই ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি, বচসা, তাহার মধ্যেই এত নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত থাকায় যে কি আনন্দ! ট্রামের গতিটাও যে উপভোগ করিবার জিনিস সেটা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল—সন্ সন্ করিয়া চলিয়াছে—সার্কুলার রোড ছাড়াইয়া চৌরঙ্গীতে পড়িয়া গতি আরও বাড়াইয়া দিল—বাঁ দিকে চার্চ, তার বাগান, পাশে পুকুর, তার পরেই গড়ের মাঠ সবুজ—চলতি ট্রামের মধ্যে থেকে কতদিন এ সৌন্দর্য দেখে নাই! ভাল করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতে পারিতেছে না, বুড়ো হ'ক, তবু একটা পুরুষমানুষই পাশে তো? তবু ঘাড় হেঁট করিয়া আড় চোখে জালতির মধ্যে দিয়া ঝাপসা ঝাপসা যাহা দেখিতেছে তাহাতেই যেন চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে। আবার এত আরামের মধ্যে পথ বাহিয়া আজ ঠিক সময়ে আপিসে পৌঁছিবে! বড়বাবুকে আর ডাকিয়া আপ্যায়িত করিতে হইবে না—"বাপু হে, আপিসে এভাবে চলবে না, কাল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ট্রামে ওঠা দেখো।"

…বোরখাটাকে যেন বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে চঞ্চলের।

অত যে বুকে জড়াইয়া ধরিবার জিনিস নয় সেটা কিছুক্ষণ পরেই টের পাইল। আপিসে পৌঁছিবার ঘণ্টাখানেক পরে পিয়ন আসিয়া খবর দিল বড়বাবু তলব

করিয়াছেন। আজ হাজরির দিক দিয়া গলদ নাই, তবু বড়বাবুরই ডাক, চঞ্চল কুণ্ঠিত চরণে গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইল।

একটা ফাইল পড়িতেছিলেন, একবার চোখে তুলিয়া দেখিয়া লইয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। শেষ করিয়া পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন—"আজ আসবার সময় ট্রামে আমার পাশটিতে একটি বোরখাপরা মেয়ে এসে বসল—"

চঞ্চলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুতের শকে কাঁপাইয়া দিল, বড়বাবুর মুখ হইতে আর চোখ ফিরাইবার ক্ষমতা রহিল না। বড়বাবু খুব সহজ স্বরে বলিলেন—"খানিকটা গালমন্দও খাওয়ালে,—উঠলাম না কিনা আমি। আমাদের তো আর অত শিভ্যালরির বয়স নেই।—তার পর এই—।" ফাইলের গাদা থেকে তুলিয়া আপিসের ছাপমারা একটা লম্বা লেফাফা চঞ্চলের হাতে দিলেন। চঞ্চলের মনে হইল পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে। চাকরির অবস্থা খারাপ দেখিয়া কাল পকেটে করিয়া নিজের সার্টিফিকেটগুলা আপিসে লইয়া আসিয়াছিল, কয়েকখানা করিয়া কপি টাইপ করিয়া লইবার জন্য, আবার দরখাস্ত শুরু করিতে হইবে তো! কপি করিয়া আপিসের একটি লম্বা খামে পুরিয়া কোটের পকেটে রাখিয়াছিল। তাহার পর থেকেই বোরখার স্বপ্ন। খামটা যে পকেটে থাকিয়াই গিয়াছিল সে খেয়ালও হয় নাই, এমন কি আপিসে আসিয়াও খেয়াল হয় নাই যে সেটা অন্তর্হিত হইয়াছে।

বড়বাবু বলিতে লাগিলেন—"আমার আগেই উঠল মেয়েটি, মনে হল যেন তার বোরখার মধ্যে থেকেই পড়ল, তার পর খামে নিজের আপিসের নাম দেখে মনে হল আমার পকেট থেকেই পড়েছে বুঝি, তুলে নিলাম। যাক, বেশি সময় নেই আমার, ব্যাপার কি বলে ফেল দিকিন বাপু চটপট। অবিশ্যি, বোরখার মধ্যে যে সত্যি একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, আর এত জিনিস থাকতে ঘুরতে ঘুরতে তোমার সার্টিফিকেটগুলোই তাঁর হাতে গিয়ে পড়ল, এটা বিশ্বাস করতে বেশ একটু বাধে—আর, তা যদি না হয় তো—"

বড়বাবু পাকা ভ্রূ-দুটি তুলিয়া প্রশ্নের ভঙ্গিতে কয়েকবার মাথা দুলাইলেন। লজ্জায়, ভয়ে, কুণ্ঠায় চঞ্চলের তখন সঙ্কট অবস্থা, মরিয়া হইয়াই বলিল—"স্যার, আর লজ্জা দেবেন না, দয়া করে প্রকাশও করবেন না কথাটা, আমি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি—আজই রেজিগনেশনটা দিয়ে যাব স্যার।"

... ...

আফিস বন্ধ হইবার কিছুক্ষণ আগে অর্ডার বুকে বড়বাবুর একটি নোটিশ বাহির হইল—For those who come long distances half an hour's delay in attendance may be condoned till conditions improve. (অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত, যাহারা বেশি দূর হইতে আসে তাহাদের আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব মার্জনা করা যাইতে পারে।)

কাব্য

প্রায় মাসাবধি কাঁচা খাইয়া, পোড়া খাইয়া, অর্ধভুক্ত থাকিয়া, কোন কোন দিন বা একেবারে অভুক্ত থাকিয়া অনেক কষ্টে একটি পাচক-ঠাকুর যোগাড় হইল। নিজের হাত-দুখানির দিকে চাহিবার যুবসং হইল একটু, চোখ ফাটিয়া জল আসে, পোড়া পেটের গোলামি করিতে কাটিয়া, হাজিয়া, পুড়িয়া একসা হইয়া গেছে, কুটনা কোটা, ফেন গালা, ডাল সাঁতলানো, সবকিছু ঐ দুটির উপর দিয়াই তো গেল।

যাই হ'ক, লোকটি পাওয়া গেছে ভাল। প্রথমত, এখানকার লোক নয়। মাস-ছয়েক এখানে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় লোক রাখিবার আর প্রবৃত্তি নাই, যেমন অলস, তেমনি অকর্মণ্য, আর বাড়ি যদি নিকটে হইল তো আমার এক মাসের ভাঁড়ার পনের দিনে নিঃশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিবে, শুধু চালডালই নয়, তেল, নুন, হলুদ, তেজপাতা কিছুই বাদ পড়িবে না। সমস্ত দোষ চাপাইবে ইঁদুরের উপর। যদি বলি, 'ইঁদুরের তেল নুন তেজপাতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ?' উত্তর হইবে, 'আমি পূবের লোক, এখানকার ইঁদুরকে চিনি না।'

দ্বিতীয় সুবিধা এই দেখিলাম, লোকটির বয়স হইয়াছে, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর হইবে। আশা করা গেল শখটখের বালাই থাকিবে না, আমার সাবান, মাজন, মাথার তেল অনেকটা নিরাপদ থাকিবে। তৃতীয় পাচক যে রাখিয়াছিলাম, পরে শুনিলাম, সে রাত্রে আমার সিল্কের পাঞ্জাবী আর পম্প্-শু-জোড়া পর্যন্ত নিজের দখলে রাখিত। এ লোকটা সাদাসিধে, দাড়িগোঁফ মাথার চুল সব ক্ষুর দিয়া কামানো, এদিকে বুকপিঠ কালো কালো কোঁকড়া চুলে ভরা; অর্থাৎ চুলের যে

বিভাগ লইয়া শৌখিনি করা চলিত তাহার গোড়া মারিয়া দিয়াছে, যে বিভাগ শৌখিনতার পরিপন্থী সেটাকে রাখিয়াছে জিয়াইয়া।

আর একটা কথা, লোকটার বাড়ি বলিল ছাতনার কাছে একটা গ্রামে। ছাতনা চণ্ডীদাসকে লইয়া টানাটানি করে। সত্যমিথ্যা যাই হ'ক, লোকগুলার মনে একটা ছাপ আছেই। কবির দেশের লোক, কেমন একটা শ্রদ্ধা হইল; বিশ্বাস হইল অসময়ে দাগা দিবে না; জিনিসটা মূলে তো একই, প্রেয়সীর দিকে গেলে বলি প্রেম, মনিবের দিকে গেলে বলি প্রভুভক্তি।

এর উপর একবেলা পরীক্ষায় বুঝিলাম, রাঁধেও খাসা।

২

বর্ষাকাল। এদিকে কটা দিন অসহ্য গুমট গিয়াছে, তাহার উপর স্বপাকের পালা; গুমট, আগুনের তাত, তাহার উপরে আবার উদরেও হুতাশনের প্রদাহ, কি করিয়া যেন কাটিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। যাক, এবার বিধি প্রসন্ন। সকালেই গোপীনাথকে পাওয়া গেল না। বেশ রাঁধিয়াছিল, রাত্রে আরও ভাল,—দেখিয়া-শুনিয়া লইবার সময় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চিন্ততা, তাহার সঙ্গে পেট পুরিয়া ভাল আহার, গুমটের ভাবটা আর বুঝিতেই দেয় নাই। পরের দিনটি আরও চমৎকার। সকালে উঠিয়া দেখি কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেছে, কোনওখানে এতটুকু ফাঁক নাই। তবুও কিন্তু বিরাম নাই, মেঘের এক-একখানা পাতলা স্তর খুব লঘুগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে উড়িয়া চলিয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, মনে হইতেছে, আয়োজনে কোথাও যদি একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়া থাকে সেটুকু সারিয়া লইয়া একেবারে পূর্ণ উদ্যমে বৃষ্টি ঢালিবে,—মেঘমহলে তাহারই এই অতিব্যস্ততা। এতটুকু আওয়াজ পর্যন্ত নাই, ধীরসঞ্চারে সমস্ত আকাশপথ ব্যাপিয়া সারারাত ধরিয়া এতবড় আয়োজনটা হইয়াছে। রাত্রে এক আকাশ নক্ষত্র দেখিয়া শুইতে গিয়াছিলাম, সকালে চোখ খুলিয়াই মনে হইল, একটা জাদু হইয়াছে,—কোথায় ছিলাম, রাতারাতি কে আমায় অন্য কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আমার বাসাটি ঠিক কাঁসাই নদীর ধারে। নদী, তাহার পরেই একটা বাঁধ, তাহার পরেই আমার বাসা। মাটকোঠা, তবে একটু নূতন ধরনের; ঘরের সামনে-পিছনে ওরই মধ্যে একফালি করিয়া বারান্দা-গোছের আছে। এটা দেখিতেছি এখানকার স্টাইল।...এদিকে শুকো গেছে, কিন্তু ছোটনাগপুরের পাহাড়ে নিশ্চয়

বর্ষা নামিয়াছে ; গৈরিক রঙের বেগচঞ্চল জলে কাঁসাই নদী টলটল করিতেছে। নদীর ওপার থেকেই ঢেউখেলানো, জমি,—নামিয়া উঠিয়া নামিয়া উঠিয়া কতদূর চলিয়া গেছে—একেবারে বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিক্‌রেখা ঘেঁষিয়া কালো মেঘের নীচে তরঙ্গায়িত ঘননীলের রেখা—ময়ূরভঞ্জের পর্বতশ্রেণী।

বহুদিন পরে একটি মুক্ত আলস্যে আমার মনটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেদিন আবার আমার সাবরেজেস্টারি আপিসের ছুটি, তাহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিনটি দেখা দিয়াছে ; একটি ক্যাম্বিসের চেয়ার বাহির করিলাম, তাহার উপর শরীরটা এলাইয়া দিয়া সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম।...আগের দিনটি গোপীনাথকে আনিয়া দিয়াছিল, সেদিন আমি যেন নিজেকে নিজের কাছে ফিরিয়া পাইলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, অবিরাম রান্নাঘরের চিন্তা আমার মধ্যেকার যে মানুষটিকে দেশছাড়া করিয়াছিল, মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে একটা অপরিসীম ব্যকুলতা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এমন কি মনে হইল, সদ্য-সদ্যই কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া যাই।

গোপীনাথ চা লইয়া আসিল। আমার মন তখন এতটা তরল অবস্থায় যে ইচ্ছা হইল গোপীনাথের সঙ্গেও এই দিক-প্রসারিত সৌন্দর্য লইয়া দুটো কথা কই। এইসব নির্বান্ধব দেশে যে-লোকটিকেই একটু কাছে পাওয়া যায় তাহার কাছেই যেন মনটাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করিয়া এইরকম দিনগুলিতে। কিন্তু এর মুখের পানে চাহিয়া আর উৎসাহ রহিল না। মুখের প্রতি রেখাটি কঠিন, দৃষ্টি একেবারে ভাবলেশহীন, আর মাথার মাঝখান থেকে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডলটাই রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকা। চাকরি লইবার সময় একটু দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, "আমরা সাতপুরুষ ধরে রাঁধা করছি, বাবুমশয়, ঈতে হটব নাই বটে।"

তবু চণ্ডীদাসের দেশের লোক, লোভ সম্বরণ করা গেল না, বলিলাম, "মেঘের অবস্থা দেখেছ গোপীনাথ ? কি মনে হয় ?"

গোপীনাথ তাহার মাছের মত ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি মনে হয়—একটা কথা বটে।...আজ খিচুড়ি চাপাই, বাবুমশয়, দেবতা ঢালবে আজ্ঞে।"

এর পরে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না।

গোপীনাথ কিন্তু আমার মনের তন্ত্রীটাকে বর্ষার সুরে যেন আরও ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। বিশ্বের যত বিরহিণী তাহাদের জন্য আমার মনটা আরও বেশী করিয়া আতুর হইয়া উঠিল। মনে হইল, জীবনের এই ট্রাজেডি,—বর্ষা আসে,

নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তার বেদনা জাগে, কিন্তু সে বেদনার প্রতিবেদন জাগে না কোনখানেই।...বিশ্বের যত পুরুষ সবাইকেই যেন আমার গোপীনাথ বলিয়া মনে হইল, কর্মব্যস্ত, বিরস, এমন বর্ষার দিনেও তাহার মনকে দ্রব করিতে পারে না। পুরুষের বিরহ লইয়া যত কাব্য সব আমার কাছে নিরর্থক অলীক বলিয়া মনে হইল। পুরুষের বিরহব্যথা বলিয়া কোনও অনুভূতি হয় না, খুব বেশি হয় তো একটা সাময়িক অভাববোধ, সাময়িক আর নিতান্তই শারীরিক।...আমি যেন স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলাম দেশ দেশ জুড়িয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বেদনার প্রলেপের মত এই সুনিবিড় মেঘাবরণ, তাহারই ছায়ায় যত অন্তঃপুরের বাতায়নে যত প্রোষিত-ভর্তৃকার ব্যাকুল নয়ন ;—এই আকাশের মতই স্তিমিত, সজল। অথচ যাহাদের জন্য ব্যাকুলতা সেই পুরুষেরা কিন্তু সবাই নির্বিকার, তাহাদের অনবসর পরুষ জীবনে বর্ষা যদি নিতান্ত কোনও সুখস্মৃতির আলোড়ন তোলেই তো সে খিচুড়ির, তাহার বেশি ভাবিবার ক্ষমতাই নাই পুরুষের।

আমার মনে হইল মেঘদূতের যক্ষও আষাঢের প্রথম দিনে প্রিয়ার হাতের খিচুড়ির কথাই ভাবিয়াছিল, সেই দুঃখ আর লজ্জার কথাটা চাপা দিতেই কবিবরের এত আড়ম্বর।

দুপুরের আগেই বৃষ্টি নামিল।

খিচুড়িই রাঁধিয়াছিল গোপীনাথ, আমার কাছে কোন উত্তর না পাওয়ায় নিজের কেরামতি দেখাইবার জন্য বোধহয় বেশি মনোযোগ দিয়াই রাঁধিয়াছিল। বেশ পরিতৃপ্তিতে আহার করিয়া আমি বারান্দায় আসিয়া বসিলাম।

এখানে বর্ষার রূপই অন্যরকম। আমাদের ওদিকে ঘন গাছপালার জন্য এ-রূপটি খুলিতে পায় না, প্রতি পদেই বাধা পাইয়া বর্ষা যেন একটু বিকৃত হইয়া পড়ে। ধারাপাতও খুব প্রবল, একটি হালকা হাওয়ায় অল্প একটু তির্যক্ রেখায় নামিয়া আসিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মনে হয় যেন ধারাগুলির আদি অন্ত সমস্তটাই দেখা যায়। ক্রমে শীকরবৃদ্ধির জন্য চারিদিক অল্প অল্প করিয়া ঝাপসা হইয়া আসিল, ক্রমে বেশি,—দূরে ময়ূরভঞ্জ পাহাড়ের নীল রেখা মুছিয়া গেল, তাহার পর আরও কাছের ঢেউ-খেলানো জমি, তার পর কাঁসাইয়ের ওপারের তটরেখাও। কতক্ষণ গেল, কাঁসাইয়ের জল আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একসময় হাওয়াও উঠিল মাতিয়া, শুকোর সময় যেমন ধূলিরাশি লইয়া মাতামাতি করে ঠিক তেমনিভাবেই কুয়াশার মত জলের কণা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। একটুর মধ্যেই সমস্ত কাঁসাই নদীটাও দৃষ্টিপথ থেকে মুছিয়া গেল।

আমার মন থেকেও মুছিয়া গেল আর সবকিছুই, জাগিয়া রহিল শুধু এই বিক্ষুব্ধ বর্ষা আর যত বিরহিণীব হৃদযের এমনই বিক্ষুব্ধ বিরহ-বেদনা। কখন কাগজকলম আনিয়াছি, কখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সাডও হয় নাই। ...সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিল।

৩

যখন অকালসন্ধ্যার ছায়ায় চারিদিক মলিন হইয়া আসিয়াছে, একটি বিপর্যস্ত ছাতাব মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে ললিতবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম।

ললিতবাবু এখানকার স্কুলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক। থানা, সাবরেজেস্টারি আব স্কুল লইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র কলোনিটিব মধ্যে এই একটি লোকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হইয়াছে—শুধু অন্তরঙ্গতা বলিলে সবটা বলা হয না, আমরা এত নিগূঢ়ভাবে পরস্পরকে পাইয়াছি যে পরস্পরের ভরসাতেই এখানে টিকিয়া আছি বলা চলে।

প্রকৃত রসিক আর দরদী লোক। এদিকে আমার সমবয়সী; যখনকার কথা হইতেছে তখন তাঁহারও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, কাজেই আমাদের আলাপ-আলোচনা বা ভাবের আদানপ্রদানের মধ্যে কোন অন্তরালের প্রয়োজন ছিল না।

পুলকিত হইলেও একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজই চলে এলেন যে!"

হিন্দু-মুসলমানের পর্ব এবং আরও দু-একটা কি মিশাইয়া উঁহাদের স্কুলের সপ্তাহখানেকের ছুটি যাইতেছে; ললিতবাবু বাড়ি গিয়াছিলেন, ছুটি শেষ হয় নাই অথচ ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ললিতবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "টুইশন আছে যে, মাস্টারের জীবন..."

হাতে পাইয়াও এমন বর্ষার দিনে যে নীরস উদরসংস্থানের জন্য ছাড়িয়া আসিতে হইল এর সমস্ত বেদনা ঐ কয়টি কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল; আমি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কথা বাহির হইল না। তাহার পর অবশ্য দু-একটা হালকা রহস্যালাপ হইল, কিন্তু প্রথম আলাপের ঐ বেদনাটুকুই আমাদের সব আলাপ-আলোচনার মূল সুর হইয়া রহিল সেদিন।

হইবার কথাও তো—বর্ষা আমার মনে ঐ সুর তুলিয়াছিল, ললিতবাবুও ঐ সুরেরই বেদনা বাড়ি থেকে বহন করিয়া আনিয়াছেন, সম্ভব কি ও সুরকে আসরছাড়া করা ?

অন্য একটি ক্যাম্বিসের চেয়ারে ললিতবাবুও শরীর এলাইয়া দিলেন। প্রথমটা একটু আলাপের চেষ্টা চলিল, নিতান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর, এই যে দুজনেই একভাবে অভিভূত হইয়া গেছি এটাকে যেন কতকটা চাপা দিবার জন্যই। তাহার পর মৌন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল ; তাহার পর অন্তর যখন কাসাই নদীর মতই কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, আমরা দুজনেই একেবারে মুখর হইয়া উঠিলাম। অন্য একটু কারণও ছিল, অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগৎটা লুপ্ত হইয়া গেল আমাদের কাছে, জাগিয়া রহিল শুধু হাওয়ার শন্‌শনানির সঙ্গে বর্ষণের শব্দ আর ভেকের কলবব মিলিয়া এক বিচিত্র ঐকতান।

আপিসের পিয়নটাই চাকরের কাজ করে, আলো দিয়া গেল। ললিতবাবু বলিলেন, "নাঃ, এমন রাত্রিটাকে 'সেলিব্রেট' করতেই হবে শৈলেনবাবু, নৈলে আপসোস থেকে যাবে ; আপনার কবিতার বইগুলো বের করুন, রবিবাবুর আর যার যার আছে। এসরাজটাও বাঁধুন।"

আমাদের রীতিমত কাব্যে পাইয়া বসিল। গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, ললিতবাবু এখানেই আহার করিবেন।

৪

কিন্তু এটা আমার বর্ষার গুণকীর্তন নয়, কাব্যের বিড়ম্বনার ইতিহাস। সেই সিক্ত বর্ষারাত্রে কাব্যের হাতে অমন নিরবশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম এইবার সেইটুকুই বলিয়া শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ পড়া হইল, কবিবরের বর্ষার কবিতাগুলি আমার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে। ললিতবাবুর সুকণ্ঠ—যেমন গানে তেমনি আবৃত্তিতেও, বর্ষার মন্দ্রের সঙ্গে ছন্দ আর ধ্বনি মিলাইয়া একটি একটি করিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিয়া চলিলেন, আমি চক্ষু বুজিয়া নিজের সমস্ত সত্তাকে সেই দ্বৈত সঙ্গীতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিলাম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া অন্য কবিদেরও বাছা বাছা কবিতা পড়া হইল। ...বাহিরে অন্ধকারের রন্ধ্র-রন্ধ্র সিক্ত করিয়া অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের শব্দ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে, যত বিরহিণীর হাহাকার সঞ্চিত করিয়া

লইয়া দিকে দিকে দিতেছে ছড়াইয়া। অন্য কবিদের শেষ করিয়া আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়া আসিলাম।

এ পর্যন্ত বোধ হয় তেমন ক্ষতি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ শেষ করিয়া বৈষ্ণব কবিদের লইয়া পড়িয়াছি, কয়েকটি পড়া শেষ হইয়াছে, ললিতবাবুর আবৃত্তির মধ্যে গীতের আমেজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় গোপীনাথ আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আয়োজন করা হবেক, আজ্ঞে ?"

আমরা আলো-জ্বালার পরই ঘরে আসিয়া বসিয়াছি; মনে হইল যেন গোপীনাথ খানিকক্ষণ থেকেঁ বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ হয় আমাদের পড়ায় বাধা দিবে কিনা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তাহার পর যখন দেখিল বৈষ্ণব কবিদের পালা আরম্ভ হইয়া একটু একটু সুরের রেশ জাগিয়া উঠিতেছে, বেশি বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া আর অপেক্ষা করিল না, নোটিসটা দিয়া দেওয়াই ঠিক করিল। অবশ্য এটা আমার আন্দাজ। আমি ললিতবাবুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি বলেন, দেবে ?"

বেশ একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। ললিতবাবু আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। একটু আগেই তাঁহাকে গোপীনাথের খিচুড়ি-রসিকতার গল্প করিয়াছি; ওর হাসিতে যেন এইটুকুই স্পষ্ট হইল, 'আপনিও শেষে গোপীনাথ হইয়া গেলেন ?'

গোপীনাথকে বলিলাম, "আমাদের এখন দেরি হবে, তুমি ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘুমোতেও পার নিশ্চিন্দি হয়ে, ডেকে নোব'খন।"

গোপীনাথ প্রশ্ন করিল, "দোরটা ভেজিয়ে দেওয়া করব আজ্ঞে? জলের ছিটে আসছে বটে।"

বলিলাম, "তা বরং দাও।"

গোপীনাথ চলিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "এবার আপনার এসরাজটা নামান।"

সুরে-মূর্ছনায় কাব্য এবার সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; ললিতবাবু শুরু করিলেন, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর—"

পুরাতন গীত, অতিগীত হওয়ার জন্য বোধ হয় আরও পুরাতন; কিন্তু মনে হইল যুগ যুগ অতিক্রম করিয়া এ সেই প্রথম দিনটিতে চলিয়া গেছে যেদিন কবি নিজে রচনা করিয়া, মনের সমস্ত দরদটুকু নিংড়াইয়া নিজের কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন। ললিতবাবুর গলাও কোনদিন এত মর্মন্তুদ হইয়া ওঠে নাই, মনে হইল

রজনীর সমস্ত বিরহব্যথা দেখিতে দেখিতে গুটিকতক শব্দের মধ্যে মূর্তি ধরিয়া উঠিল।

বোধ হয় এতেও ততটা ক্ষতি ছিল না। ললিতবাবু এর পর ভাটিয়ালি ধরিলেন একটা। গানের আগে, কতকটা মনের আবেগে একটু ভূমিকাও করিলেন, বলিলেন, "শৈলেনবাবু, আমাব এক-একবার মনে হয় ভাটিয়ালিই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ;—সঙ্গীতই বলুন বা কাব্যই বলুন ; ও যেন নদীর তীরের আপনি-বেড়ে-ওঠা লতাটি ; আপনার কি মনে হযে ?"

সত্যই, গান যেন একেবারে মুক্ত বুকের ব্যথা হইয়া মাঠের ভাষায়, মাটির ভাষায় নিতান্ত সহজ লীলায় জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারে ঢাকা চাবিদিককার এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে, এমন কি আমার এই মাটকোঠাটুকুর সঙ্গে ছন্দে স্বরে যেন মিলিয়া গেছে। এ জায়গার প্রাণের সঙ্গে এমন করিয়া মেশানো আর অন্য কিছুই যেন হইতে পাবিত না।…'বন্ধু গো, তুমি কাজেব জন্যে খেযা পেরিয়ে পারে গেলে, সন্ধ্যে হয়ে এল ; একটা নদী মাঝে থেকেই আমাকে পাগল করে দিয়েছিল, এখন আর-একটা নদী মাঝখানে এসে গেলে—এই বর্ষা , কি করি আমি বন্ধু, কোথায় যাই ?…'

এত স্পষ্ট, সহজ কান্না আর হয় না। মানুষের সেই আদিম কান্না, ভাষার আডম্বর যাহাকে আবিল করিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেই আদিম নিরাভরণ ব্যথার স্থর কুটির থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সবার বুকেই যাহা এক থাকিয়া গেছে, আর অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। যাহাকে চিনিয়া লইতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

বর্ষার সঙ্গীতে বিনাইয়া বিনাইযা, সমস্ত দিনের সঞ্চিত আবেগ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া গাহিয়া চলিলেন ললিতবাবু। যখন শেষ হইল রাত্রি প্রায় বারোটা।

গোপীনাথকে জাগাইতে বেগ পাইতে হইল না। জোরে দু'একটা হাঁক দিতেই দুয়াব খুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ; চোখ দুইটা লাল হইয়া গেছে। খাবার দিতে নামিয়া গেলে ললিতবাবু বলিলেন, "বেচারার প্রতি অত্যাচার হয়ে গেল একটু, ঘুমিয়ে পডেছিল, আজই অতটা পথ হেঁটে এসেছে।"

আহারের সময় ললিতবাবু গোপীনাথের রান্নার অজস্র প্রশংসা করিলেন, বলিলেন, "দেরিতে পেলেন, কিন্তু ভাল লোক পেয়েছেন শৈলেনবাবু, ছাড়বেন না।"

বলিলাম "আর খিচুড়ি যা রাঁধে। কাল সকালে এখানেই খাবেন ললিতবাবু, যেমন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ধরবে না, খিচুড়ি খাবার দিনই থাকবে।"

৫

সকালবেলা, একবকম ভোরেই, নিজেকেই ছাতা মাথায় দিয়া ললিতবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ এ দুযোগে!—নেমন্তন্নেব কথা মনে কবিয়ে দিতে এলেন নাকি মশাই? বামুন যে সেটা মনে নেই?"

বলিলাম, "না, নেমন্তন্ন নিতে এলাম। ওদিকে আজ অষ্টরম্ভা।"

ললিতবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "মানে?"

বলিলাম, "গোপীনাথ উধাও। কাল আমরা কাব্য করেছি আর ও বেটা বারান্দায় বসে বউয়ের কথা ভেবে ভেবে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। নেহাৎ যেগুলো সাহিত্যিক কবিতা সেগুলোতে ততটা ক্ষতি হয় নি নিশ্চয়,—কাল করেছে আপনার ভাটিয়ালিতে।∴সকালে খোঁজ করতে পিয়নটা বললে—এই রকম ব্যাপার, ক্রমাগতই নাকি চোখ মুছেছে আর বলেছে বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে।…পালাবেই যে, পিয়নটা অতটা আন্দাজ করতে পারে নি। বউটা নাকি আবার দোজপক্ষের…"

ললিতবাবু বিস্মিতভাবেই বলিলেন, "তবে যে বললেন, নেহাৎ বেরসিক কাটখোট্টা-গোছের।"

দুঃখে হাসিয়া বলিলাম, "খুঁচিয়ে রস বের করেই যে বিপদ ডেকে আনা গেল মশাই। নইলে ও-বেটার সাতপুরুষেও বিরহ কাকে বলে জানে না। ভাটিয়ালিতেও আতঙ্ক ধরিয়ে দিলে। আপনারটাও পালায় নি তো? এখানে এসে আর গানটান গেয়েছিলেন?"

ললিতবাবু বলিলেন, "আমারটা বুড়ো।"

বলিলাম, "তবু গানটান একটু সমঝে-বুঝে গাইবেন, মশাই, বর্ষার এ-কটা দিন,—কখন কি অঘটন ঘটে বসে বলা যায় না; দেশটা একটু বেয়াড়া-গোছের যেন।"

লোকেরা কলিকাতার ট্রাম-বাসের অবস্থা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছে ; লড়াইয়ের হিড়িকে, ভিড়ে, তাড়াহুড়ায় মানুষের মনের অবস্থা কি রকম দাঁড়াইতেছে তাহারও নমুনা দেখিতেছি, তবু বোধ হয় এই কাহিনীটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, ইহার পর তো একেবারেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

একত্রিশ নম্বর বাস, শ্যামবাজার হইতে দমদম স্টেশন হইয়া গৌরীপুর যায়। দমদমে রেলগাড়িতে আমার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাহার-পর সেই গাড়িতেই তাঁহার সঙ্গে কাঁচড়াপাড়া যাইবার কথা। যে বাসটি ছাড়িবার মুখে তাহাতে জায়গা পাইলাম না, পিছনেরটিতে আসিয়া বসিলাম।—ইহাতেও গুটিকয়েক যাত্রী জুটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোক। দুই জন দুই-সীটওলা একটি স্ত্রীলোকদের বেঞ্চ দখল করিয়া বসিয়াছে। তৃতীয়টি একটি আন্দাজ তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে, একটি ঝকমকে শাড়ি পরা, বুকের উপর পর্যন্ত ঘোমটা-টানা, পাশের দিকের লম্বা জেনানা সীটটাতে বসিয়া আছে, পাশেই একটি প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের যুবক ;—সন্দেহ থাকে না, তাহার স্বামীই। নিম্নশ্রেণীর বলিয়াই মনে হইল ; যুবকের রঙটা অত্যধিক কালো, গাল রগ বসা, সস্তা পরিচ্ছদে রঙের বেশ একটু আতিশয্য আছে। স্ত্রী সম্বন্ধে বেশ একটু ঈর্ষার ভাব আছে যুবকের,—একে তো লম্বা ঘোমটা টানাইয়াছে, যা আজকাল একেবারেই অচল, তাহার উপর কেহ নজর দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য মাঝে মাঝে চঞ্চল ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে আর হাতের তেলো দিয়া গোঁফ-জোড়া উপর দিকে তুলিয়া তুলিয়া দিতেছে। হালকা, আছাঁটা একজোড়া গোঁফও আছে।...বয়স কম হ'ক, কিন্তু লোকটা মনের দিক দিয়া ও আবার এদিক দিয়াও কতকটা সেকেলে। নূতন বিবাহ বলিয়াই মনে হয়, সম্ভবত জোড়ের পর এই প্রথম বৌকে বাড়ি লইয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে এ বাসটাও আগেকার মতই ভর্তি হইয়া গেল এবং যখন স্টার্ট দিল তখন অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য ভিতরে রীতিমত বচসা আরম্ভ হইয়া গেছে। সব শেষে যে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল কোনরকমে ডান পায়ের গোটা-তিনেক আঙুল পা-দানিতে আটকাইয়া একেবারে নীচের লোকটিকে একটু জায়গার জন্য মিনতি করিতে করিতে একটু অগ্রসর হইল, তাহার পর নামিয়া গালাগালির সঙ্গে তাহাকে ঘুষি দেখাইতে দেখাইতে পিছনকার বাসে গিয়া উঠিল।

তাহার পর আরও লোক উঠিল ; লোক দেখিলেই ড্রাইভার গতিবেগ কমাইয়া দিতেছে, কনডাক্টর তাহাকে বাঁ-হাতে ধরিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া বলিতেছে—

"ঠিক হ্যায়।" আবার বাসের গতিবেগ বাড়িয়া যাইতেছে। লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, আগন্তুকের সঙ্গে বচসা করিতেছে। কনডাক্টরকেও কড়া কড়া শুনাইতেছে, কিন্তু ফল হইতেছে না। এই করিয়া করিয়া বারাকপুর রোডের খানিকটা আসিয়া একটা মস্ত বাধা উপস্থিত হইল: কতগুলি মিলিটারি লরি রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, বাসটাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইল। লম্বা গাড়ির শ্রেণী, প্রায় মিনিট দশেক বিলম্ব হইয়া গেল।

এর পরেই বাসের নীতি একেবারে বদলাইয়া গেল। বিলম্বের জন্য মিনিট-পিছু মোটা জরিমানা দিতে হয়, নূতন যাত্রী তো লইলই না, কয়েকজন নামিবার জন্য কয়েক জায়গায় চেচামেচি করিল, কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া কনডাক্টর একেবারে দমদম ফ্যাক্টরির সামনে লইয়া গিয়া বাসটা দাঁড করাইল। যাহাদের গন্তব্য ছাড়াইয়া আসিয়াছিল তাহারা একচোট খুব হল্লা করিল, ড্রাইভার-কনডাক্টরের নাম জিজ্ঞাসা করিল, বাসের নম্বর লইল, তাহার পর দুইজনের মধ্যে কাহাকেও কিছুমাত্র বিচলিত করিতে না পারিয়া একে একে চলিয়া গেল। অনেক লোক নামিল এখানে, বোধ হয় তাহার চেয়ে বেশি আবার উঠিল; এই সবের দরুন গোলমালটা একটু থিতাইলে, হঠাৎ নজরটা ফ্যাক্টরির ওদিকে গিয়া পড়িল।—

একটা বোধ হয় দুর্ঘটনা হইয়াছে। রাস্তার একটু ধার ঘেঁষিয়া অনেকগুলা লোক জটলা করিতেছে, মাঝখানে একটা ঘোড়ার গাড়ি। পরক্ষণেই দেখি একটি মেয়ের হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে একটি বেঁটেসেঁটে গোছের মাঝবয়সী লেকে ভিড ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে,—মাথায় টাক, মোটা একজেড়া গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মেয়েটির পরনে একখানি ভাল শাড়ি, এদিকে একগলা ঘোমটা টানা, পায়ে নূতন জুতা; টানিয়া আনার জন্য, অনভ্যাসের জন্য এবং ঘোমটার জন্য কতকটা ল্যাংচাইতে ল্যাংচাইতে লোকটির অনুসরণ করিতেছে। পিছনেই একটা ছোঁডার মাথায় একটা মাঝারি সাইজের নূতন ট্রাঙ্ক। ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ধরিয়া আছেন মাত্র—তা অবশ্য বেশ কষিয়াই—এর অতিরিক্ত আর তাহার দিকে খেয়াল নাই, মনে হইতেছে যদি পড়িয়া যায় তো সেই অবস্থাতেই হিঁচডাইতে হিঁচড়াইতে লইয়া আসিবেন, এদিকে অন্য হাতটা তুলিয়া বাসটার দিকে চাহিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছেন—"বান্‌কে! বান্‌কে! বান্‌কে ড্রাইভার! লেডিজ!"

আসিয়াই প্রথমে মেয়েটিকে পা-দানিতে তুলিয়া দিলেন। কাহার ঘাড়ে

তুলিতেছেন, জায়গা আছে কিনা, পথ আছে কিনা, কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। মেয়েটি জড়সড় হইয়া কোন রকমে আটকাইয়া গেলেই তাহাকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া ট্রাঙ্ক-সুদ্ধ ছোঁড়াটাকে টানিতে টানিতে সামনের দিকে লইয়া গেলেন। কনডাক্টর একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল—"এক রুপেয়া মাসুল লাগেগা!"

"আট আনা"—বলিয়া নিজেই দোরের হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ছোঁড়াটার মাথা সুদ্ধ সাঁদ করাইয়া ট্রাঙ্কটা ড্রাইভারের পাশে রাখিয়া দিলেন। একটু দর-কষাকষি করিয়া বারো আনায় রফা হইল।

অবস্থা দেখিয়া ওই ভিড়েও কয়েকজন নামিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েটিকে পথ করিয়া দিয়াছিল। একটু ভিতরে আসিতে আমরাই কয়েকজন মিলিয়া তাহাকে মেয়েদের বেঞ্চে বসাইয়া দিলাম। জায়গা ছিল না, তবে সেই যে যুবকটি তাহার কনের পাশে বসিয়াছিল, তাহাকেই উঠাইয়া জায়গা করা হইল। প্রথমে রাজিই হয় না, মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর নিতান্ত নাচার হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের তেলো দিয়া গোঁফ দুইটি উপরে তুলিয়া দিতে লাগিল!

কনডাক্টর বলিল—"ঠিক হ্যায়!" বাস ছাড়িয়া দিল।

এমন সময় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অবশ্য কেহ পথ করিয়া দিল না, তবুও ঠেলিয়া ঠিক উঠিয়া আসিলেন, মাঝপথ থেকেই চেঁচাইয়া বলিলেন—"কোথায়? আমি যে তুলে দিয়ে গেলুম?"

আমিই সামনে ছিলাম, বলিলাম—"ঐ বসেছে; তুলে তো দিলেন, কিন্তু উঠতে পারল কি দেখলেন না তো—"

"দেখবার সময় আছে মশাই? ওদিকে আবার ট্রাঙ্ক, তার পর আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়েই ছোট্ শ্যামনগর। কোন দিকে ঘুরে দেখবার জো আছে দ্বিতীয়-বারটি? কি যুগটা পড়েছে দেখছেন না?"

বলিলাম—"তবুও, একটা ছেলেমানুষ মেয়ে—এই ভিড়…অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল নাকি?"

ভদ্রলোকের গতিবিধি খুব সন্ত্রস্ত আর কথাবার্তা খুব দ্রুত; চারিদিকেই যেন বেসামাল হইয়া যাইতেছে, সবই যেন তাড়াহুড়া করিয়া কোনরকমে সারিয়া লইতে হইবে, ভাবটা এই রকম। বলিলেন—"ওকে অ্যাক্সিডেণ্ট বলে না, যমের মুখ থেকে ফিরে আসা মশাই। ওই সেই মিলিটারি লরি—দেখছেন তো কি কাণ্ডটা করছে রোজ?—ঠিক গুছিয়ে ধাক্কাটি দিতে পারলে না, একখানি চাকা ছুঁয়ে গেল, নৈলে

আর এখানে দেখতে পেতেন না—ছুঁয়ে যাওয়াতেই কি অবস্থাটি করে গেছে এক-বার নেবে দেখে আসুন না—বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আজকাল কি আর মেয়েছেলে নিয়ে বেরোয় মশায়? আবার না বেরিয়েই বা উপায় কি বলুন?—উটি ছেলের বৌ।...এখন বিয়েটা না করলেই পারতিস—লড়াইয়ের চাকরি, একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—আমি সেই কথাই বলেছিলাম মশাই, তা ভেতরের কথা কি জানেন?"

মেয়েটি পাশেই ঘোমটা টানিয়া বসিয়া, মাথাটা একটু নীচু হইয়া গেল। ভদ্রলোকেব সে দিকে লক্ষ্য নাই, গ্রাহ্যও নাই; বলিয়া চলিলেন—"ভেতরের কথা হচ্ছে সেখানে চিঠি পাওয়া চাই· ·"

মেয়েটি মাথাটি একেবারে নীচু করিয়া যেন গুটাইয়া গেল। ভদ্রলোক কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমার পানে চাহিয়াই বলিলেন—"আশ্চর্য হচ্ছেন? বিশ্বাস করছেন না? অবিশ্যি আমাকে কি আর বলেছে? হাজার মিলিটারি মেজাজ হ'ক, বাপই তো?—বলেছে—মানে লিখে পাঠিয়েছে তার ভাজকে—সেখানে আর সব বন্ধুবান্ধবদের চিঠি আসে, ঘটা করে পড়ে সবাই মিলে..."

আমি কেন আশ্চর্য হইয়াছি, ভদ্রলোকের বোধ হয় এতক্ষণ পরে হুঁশ হইল। একেবারে ও প্রসঙ্গটা ছাড়িয়া দিলেন। বুঝিলাম সেই ধরনের লোক যাহারা যাহা ভাবে ভিতরের ব্যস্ত অন্যমনস্ক ভাবের জন্য তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলে। ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত থাকিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরেই আবার আরম্ভ করিয়া দিলেন—"বেশ, বে করবি তো ছুটি নিয়ে আয়, দেখ, পছন্দ কর—আজকাল তো ঐ সব হয়েছে—আমারা তো ওল্ড্ ফুলের দলে—তা ছুটি পেলেন মাত্র পাঁচটি দিনের—আরে মশাই, তোমার বিয়ে, সেজন্যে তারা তো লড়াই বন্ধ করতে পারে না..."

বাস লেট হইয়া গেছে,—আগেকার মতই কয়েকটা স্টপ বাদ দিয়া লোকেদের চেঁচামেচি, গালাগালি, হুমকির মধ্যে এক জায়গায় গিয়া নির্বিকারভাবে দাঁড়াইল। কিছু লোক নামিল।—"আগে হোইয়ে বড়বাবু—সামনে বহুত জায়গা আছে"—বলিতে বলিতে কনডাক্টর,—যত নামিল তাহার চেয়ে বেশি লোক ঠেলিয়া উঠাইল। ড্রাইভার দেরির জন্য জোর তাগাদা আর বকাবকি লাগাইয়াছে, ভদ্রলোকও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দেখুন কাণ্ড বেটাদের! আমার বাড়ি পৌঁছে আবার পরের গাড়িতে শ্যামনগর দৌড়তে হবে মশাই..."

গল্পটা আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় রাস্তায় একটা হৈ-চৈ উঠিল।

একটা লোক চেঁচাইতে চেঁচাইতে দুই হাতে একটা ট্রাঙ্ক ধরিয়া একটু কুঁজো হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আমি জানলার মধ্যে দিয়া দেখিয়া ভদ্রলোককে বলিলাম—"আপনার ট্রাঙ্কটা মনে হচ্ছে যেন ?"

"তা হবে, আশ্চর্য হবার কি আছে ?"—বলিয়া ভদ্রলোক একটু ঝুঁকিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। বাস দাঁড়াইয়াছে, লোকটি—"বদলি হো গিয়া ; বদল হয়ে গেছে !" বলিতে বলিতে সামনের দিকে লইয়া গেল। কনডাক্টর দোরটা খুলিয়া দিল, তাহার নিদেশ মত অন্য একটা ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া দিল, নির্লিপ্ত ভাবে—"ঠিক হ্যায় !" বলিয়া পা-দানে উঠিয়া পড়িল, আবার বাস ছাড়িয়া দিল।

আশ্চর্যের কথা, ভদ্রলোক একটা কিছুও বলিলেন না, ঝুঁকিয়া সমস্ত ব্যাপারটি পূর্বাপর দেখিয়া লইয়া বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ববৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আমিই বলিলাম—"ঠেলে ঠুলে একটু এগিয়ে যান মশাই, যা ভিড়, গোলমাল, নিজের জিনিসের ওপর একটু নজর রাখা দরকার, এখুনি তো গেছল !"

ভদ্রলোক একটু ব্যঙ্গের স্বরে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন—"তার পর ? না হয় এগুলাম, তার পর ? আমি ট্রাঙ্ক আগলাচ্ছি আর ইটিকে যদি কেউ ওমনি গোলমাল করে হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে যায় ? যা অবস্থা পড়েছে, অসম্ভব ?… সময়টাই যে এই রকম পড়েছে মশাই, লোকের মাথার ঠিক আছে, না, লোকে ভেবে-চিন্তে থিতিয়ে-জিরিয়ে কোন কাজ করতে পারছে ? যেত ট্রাঙ্কটা যেত, যায় যাবে, গুন্‌তিতে ঠিক থাকত তো ?—একটা নিয়ে সোনামুখ করে বাড়ি উঠতুম, তা ভিন্ন করছি কি বলুন না। আর গুন্‌তিতেও যদি নাই ঠিক থাকত, মারামারি করতুম ? মকদ্দমা করতুম ? বলুন ?"

ওদিকেও নানারকম বচসা চলিতেছে—তাহারই মধ্যে কনডাক্টর নির্লিপ্ত ভাবে টিকিট বেচার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যমত নূতন জায়গা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কালো যুবকটিকে অনুনয় করিয়া বলিল—"আপনি দু'পা এগিয়ে যান বড়বাবু দয়া কোরে, বহুত জায়গা আছে।"

খালি আছে সামনে অল্প একটু, যুবক একবার ঘাড় ফিরাইয়া বধূটির পানে চাহিল, কনডাক্টর তাহাকে আলগা ভাবে একটু ঠেলিয়াই বলিল—"লেডিজদের জন্যে ভাবনা কোরবেন না বড়বাবু ; কোই আর বসবে না…"

বাসের ঝাঁকানির সঙ্গে ঠেলা খাইয়া যুবক খালি জায়গাটায় গিয়া পড়িল, হাতের তেলো দিয়া গোঁফ জোড়াটা তুলিয়া দিতে দিতে আর একবার ফিরিয়া চাহিল ; ক'টা ঝোঁকে বেশ খানিকটা আগাইয়া গেছে।

আমার নজরটা একটু ঐদিকে গিয়াছিল, ভদ্রলোক উত্তরের জন্যে তাগাদা দিলেন—"বলুন না, মারামারি করতুম ? মকদ্দমা করতুম ?"

পাশেই একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, বলিলেন—"মারামারি মকদ্দমার কথা নয় ; নিজের জিনিসের ওপর নজর রাখলে…"

"ঐ তো দেখে-শুনে নিজের জিনিস নামালে মশাই, হয়ে গেল পরের, ঘাড়ে করে আবার ছোট !…বলুন ?"

কোণঠাসা করিয়া নিজেই আবার সুরাহা করিলেন বলিলেন,—"তা নয়, এই রকমই হবে, হচ্ছে,—সময়টা চলেছে কি রকম দেখতে হবে তো ? কারুর কি মাথার ঠিক আছে ? এখন গুনতি-মাফিক ঘরে কোনরকমে তুলতে পারেন তো বাহবা ; কি তুললুম, কেমন করে তুললুম তা কি আর ভেবে দেখবার অবসর আছে মানুষের ?…আর সব বাদ দিন, চালটা যে ঘরে তুলছেন—কিউ, আর, এস, টি—একেবারে জেড্ পর্যন্ত লাইন করে দাঁড়িয়ে,—দিব্যি করে বলবেন যে সেটা চালই ?"

দ্বিতীয়বার কোণটাসা হইয়া বৃদ্ধ মুখটা ঘুরাইয়া লইতে লইতে বলিলেন—"ভাল কথা বললুম—নিজের মালের ওপর একটু নজর রাখতে, তা…"

ভদ্রলোক আবার আমায় সাক্ষী মানিয়া আরম্ভ করিলেন—"কি মশাই ? চাল বলে ডাহা কাঁকর ঘরে তুলছি তো ? আঁতে পর্যন্ত সেই জিনিস চালান হচ্ছে তো ? ওই ধরে থাকতে হবে, সময়টা যে ওই যাচ্ছে।…বাড়িতে গিয়ে গিন্নিকে দু'টি জিনিস গছিয়ে দিতে হবে—'এই তোমার ট্রাঙ্ক, এই তোমার বৌ' ;—এখন ঢাকনার মধ্যে কার কি আছে…"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া লইলেও এদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, মাথাটা ঘুরাইয়া গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন—"তা হলে ঘোমটার মধ্যে কার বৌ আছে, সে দায়িত্বও…"

ভদ্রলোক চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"নেই-ই তো মশাই। কোন্ জিনিসটা কায়দা-মাফিক হতে পাচ্ছে যে দায়িত্ব থাকবে ?…"

বৃদ্ধ আবার মুখ ফিরাইয়া লওয়ায় পুনরায় আমাকেই সাক্ষী মানিলেন, তবে বেশ আর একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন ; ঘোমটার মধ্যে মেয়েটি গুটাইয়া

কোথায় ঠাঁই লইবে যেন বুঝিতে পারিতেছে না। বলিতে লাগিলেন—"না হলে ছেলের এই বে করবার সময় হল ? চিঠির জন্যে কাউকে বে করতে শুনেছেন ?··· তার পর এক বাড়িতে একদিনে তিনটে বে মশাই—ইয়েস, থ্রি! —দুটি জামাই মিলিটারি!···একটির ভোর চারটেয় ট্রেন—মিলিটারি স্পেশ্যাল, ঝাঁসি! বাসরঘরের বালাই নেই, বিয়ের পরে কুশুণ্ডিঙের মন্তর আওড়াতে আওড়াতে ছোট ইস্টিশান!···বলুন, পদ্ধতি মত কাজ হয় এতে ? কে জানে মশাই কার কনে কার ঘাড়ে পড়ল এই ডামাডোলের মধ্যে ?···আমারই কেস ধরুন না—জোড়ের পর বৌ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, ছেলেরই নিয়ে যাবার কথা তো ?—না, ছোট্ বুড়ো তুই। বলুন পদ্ধতি মত হল কাজটা ? তাও আমারই কি সময় আছে মশাই ? একলা মানুষ উদয়াস্ত কোথায় চাল, কোথায় ডাল, কোথায় তেল, কোথায় কাপড় এই ধাক্কায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওরই মধ্যে আবার বৌ আনবার হিড়িক থাকলে মাথার ঠিক থাকে ; বলুন ? চারটের সময় পৌচেছি, ছ'টার সময় তারা মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বের করে দিলে। তাড়াহুড়োর মধ্যে গোলমালে তিনটে কনের কোনটেকে ছাড়লে তারাই বা কি বুঝবে, আমিই বা কি জানব ?"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"সেটুকুও জ্ঞান নেই ? অথচ মেয়ের বিয়ে দিলেন ?"

ভদ্রলোক আরও চটিয়া উঠিলেন—"আর, কোন্ শ্বশুরবাড়ি থেকে কার শ্বশুর এল ভাল করে কি সন্ধান নেবার ফুরসৎ পেলে তারা ? সব শুনেও আপনি বোকা বনছেন!"

বৃদ্ধ মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া শুধু হাত দুইটা ভদ্রলোকের দিকে মুক্ত করিয়া বলিলেন—"এমন বিবাহের ব্যাপারে শুধু আপনিই থাকতে পারেন মশাই।"

—হাত দুইটা সরাইয়া লইয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাল করিয়া ওদিকে ঘুরিয়া বসিলেন। ভদ্রলোক আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"পারিই তো, আলবাৎ পারি, একশ' বার পারি, সময়টা কি যাচ্ছে দেখতে হবে না ?—আমার কথা হচ্ছে—একটা হলেই হল। বাড়িতে একটা বৌ এল, একটা ট্রাঙ্ক এল, ব্যস।···আরে যা হওয়া উচিত তা হচ্ছে কোথায়। যা চাই তা পাচ্ছি কোথায় ? ছেলে বৌ আনবে, বাপ ঘাড়ে করে নিয়ে আসছে ; করলাম ঘোড়ার গাড়ি, যাচ্ছি বাসে। বেশ গুছিয়ে মারতে পারলে না ধাক্কা লরিটা, নৈলে তাই বা কে যেত মশাই ? শ্বশুর-বৌয়ে এতক্ষণ বৈতুরণী সাঁতরাচ্ছি।···তার জায়গায় কোনও একটা ট্রাঙ্ক আর কোনও একটা···"

হঠাৎ কি ভাবিয়া, একবার কুঁজো হইয়া বাহিরে চাহিয়া, একেবারে হৈ-চৈ লাগাইয়া দিলেন—"বানো, বানো, বান্‌কে, লেডিজ হ্যায় ; কনডাক্টর, বানো··· মশাই, ঘন্টি দিন, এলার্ম ! পেরিয়ে গেল যে আমার নামবার জায়গা···আমায় যে আবাব শ্যামনগর যেতে হবে—দেখ, কোন মতেই দাঁড়াবে না !···"

চেঁচামেচির মধ্যেই বাসটা গতিবেগ কমাইয়া দমদম স্টেশনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা বড জাযগা ; নামায় ওঠায়, হাঁকডাকে, বচসায় একটা বেশ বড রকম গোলমালের সৃষ্টি হইল ; সন্ধ্যা হইয়া গেছে বলিয়া জটলাটা আরও জটিল হইযা উঠিল। ড্রাইভাব কনডাক্টবকে জানাইল এখনও পাঁচ মিনিট লেট, তাডাতাডি করিতে নিজেও এত কযেকটা হর্ন দিয়া হুডাহুডিটা আরও বাডাইয়া দিল।

নামিতে নামিতেও আমাব খানিকটা দেরি হইয়া গেল। যখন নামিলাম তখন বাস স্টার্ট দিয়াছে।

স্টেশনের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াছি, হঠাৎ বাসের মধ্যে থেকে একটা হৈ-চৈ উঠিল। ঘুরিযা দেখি সেই কালো যুবকটি জানালা দিয়া, এতখানি গলা বাডাইয়া হাত নাডিয়া নাডিয়া প্রাণপণে চিৎকাব কবিতেছে—"ও মশাই··· আমাব বৌ !—আমার বৌ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন !—ও মশাই !"

ঘুরিয়া দাঁডাইলাম। দেখি একটা ছোঁডার মাথায় ট্রাঙ্ক দিয়া একটি ঘোমটা-টানা মেয়ের হাত ধরিয়া ভদ্রলোক হন হন করিয়া খানিকটা দূরে উল্টা দিকে চলিয়াছেন। বাসে আরও চেঁচামেচি পডিল, বাসটার গতিও একটু মন্দ হইল, ভদ্রলোকের যেন কানে গেল এতক্ষণে আওয়াজটা। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমালের মধ্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পরে একবার মেয়েটির পানে চাহিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন যেন।

কিন্তু সে দু'এক সেকেণ্ড মাত্র, তাহার পরই মেয়েটির হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে পূর্ববৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কনডাক্টর হাঁকিল—"ঠিক হ্যায় !" বাসটা আবার গতিবেগ বাডাইল, চেঁচামেচিটা আরও বাড়িয়া উঠিল।

এই পর্যন্তই দেখিয়াছিলাম। পুলের উপর আমার ট্রেনটা আসিয়া পড়িতে স্টেশন পানে ছুটিতে হইল। শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহাও জানি না, ভদ্রলোক জানার পরও সেই বৌটিকেই টানিতে অগ্রসর হইলেন কেন তাহাও বুঝিতে পারি না।

শ্যামনগরে যাওয়াটা এতই দরকারী ছিল, না, ওঁর সেই তর্ক—যা অবস্থা আর সময় পড়িয়াছে, যে-কোন একটা ট্রাঙ্ক আর যে-কোন একটা বৌ বাড়িতে যে-কোন উপায়ে পৌছাইয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত ?

আমার প্রথম গল্প

আমার লেখার ইতিহাসের একেবারে গোড়ার অধ্যায় বড়ই করুণ,—এই জন্যে যে, আমার প্রথম গল্পটি মারা যায়। খুবই দুঃখের বিষয় নিশ্চয়, কিন্তু সেটি বেঁচে থাকলে ইতিহাসটি আরও করুণ হয়ে উঠত, কেননা আমায় নিজেকে মারা পড়তে হত। আপনারা একটু থতমত খেয়ে গেছেন দেখছি। তাহলে কথাটা খুলে বলতে হল—

বলতে গিয়েও দ্বিতীয় বিপদ আপনারা মনে করবেন তেলের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। কিন্তু উপায় নেই। তেলে জলে কখনও মেশে না, কিন্তু তবুও একথা মানতেই হয় যে অন্তত একটি তেল আমাদের সাহিত্যরূপ জলের সঙ্গে নিতান্ত নিগূঢ়ভাবেই মিশে আছে। সেটি কুন্তলীন। একে বাদ দিলে যে শরৎচন্দ্রেরও খানিকটা বাদ দিতে হয় সে সংবাদটা অনেকের বোধ হয় জানা আছে।

ওঁরা তখন প্রত্যেক বছর ছোট গল্পের জন্যে পুরস্কার দিতেন। গল্পগুলি বেশ ঝকঝকে তকতকে একখানি বইয়ের আকারে বেরুত, দাম থাকত কিনা আমার ঠিক মনে পড়েছে না, তবে বইখানার বেশ প্রচার ছিল। ঐ বইখানিতে একটু জায়গা পাবার লোভ প্রবল হয়ে উঠল। লোভের মূলগত ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ টাকার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল কি যশের দিকে, তা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। অনেক দিনের কথা তো ? তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাশে পড়ি। তবে বেশি সম্ভব যশ। ঐ একটা সময়, যখন অপযশের ভয় থাকে না বলে যশের ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়েই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এখন এক কলম লিখতে হলে সমঝে বুঝে এগুতে হয় ; পাঠক আছেন, পাঠিকা আছেন ; পাঠক যা চান, পাঠিকা তাতে নাক সিঁটকোন, আবার এক বয়সের পাঠক পাঠিকা যা পেলে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, অন্য বয়সের পাঠক পাঠিকার সামনে সেইটেই এগিয়ে দিলে হাত পা ছুঁড়ে অভিসম্পাত দেন। আবার সবার ওপরে আছেন সমালোচক।

অবশ্য এক শ্রেণীর সমালোচকের ভাবনা তখনও যে না ছিল এমন নয়, অর্থাৎ যারা বাছাই করবে। তবে তাদের কাল্পনিক মূর্তি ছিল অন্য ধরনের। হয় গল্পটা নেবে, না হয় ফেরত দেবে, চুকে গেল তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ। যতটা মনে পড়ছে এখন—সেই কাল্পনিক মূর্তিকে এখনকার সমালোচকের পাশে দাঁড় করিয়ে যতটা বুঝতে পারছি, তাতে তাদের তেমন ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হত না নিশ্চয়। তার পর যদি একবার হাত গলে বেরিয়ে যেতে পারলাম তো আর পায় কে! এই ছিল মনের ভাবটা।

যাই হ'ক, টাকার লোভেই হ'ক বা যশের লোভেই হ'ক, অথবা সাহিত্যিক প্রেরণা বলে যে গালভরা কথাটা আজকাল শুনি, তাই হ'ক কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। ব্যাপারটি খুব গোপনীয়, প্রথমত, গল্পলেখা ইস্কুলের পড়া করা নয়, দ্বিতীয়ত, গল্পের মধ্যে নায়িকা বলে একটি মেয়েকে আমদানি করতে হয়, যিনি আমার নয়নের মণি হলেও বাবা কাকা প্রভৃতির যে চক্ষুশূল হবেন এ জ্ঞানটা টনটনেই ছিল। অবশ্য নায়িকা, অর্থাৎ যাকে ভালবাসা চলে এই রকম বয়স আর শ্রীছাঁদের মেয়ে না হলেও যে গল্প হয় সেটা তখনও কিছু কিছু জানতুম, আর এখন ভাল রকমই জানি—এখন বোধ হয় আমার লেখায় বেশিরভাগ এড়িয়েই চলি; কিন্তু তখন বয়স যে অন্যরকম; এঁরই অ্যাপীল ছিল সব চেয়ে বেশি।

এত বেশি ছিল যে এই ধরনের মেয়ে খাড়া করে নিজেই নায়ক হয়ে দাঁড়ালাম, তার পর চলল ভাঙাগড়া, অর্থাৎ প্লটের মারপ্যাচ! ব্যাপারটা সবিস্তারে আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে পারব না এখন, ক্ষমা করবেন। না পারবার কারণ, অনেক দিনের কথা, তার ওপর নিজেকে নায়ক করতে আমার মানসী নায়িকার সঙ্গে এমন আকণ্ঠ প্রেমে পড়ে গেলাম যে একটা ছোট গল্পের সাইজ হিসাবে ব্যাপারটা অতিরিক্ত জটিল হয়ে উঠল। খাতাটি বেশ মনে আছে। এক্সারসাইজ বুক নয়। সেটা ত চুরিরই ব্যাপার। আন্দাজ তিন ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি একটা লম্বাটে বাঁধানো নোট-বুক, আকার-প্রকারে অনেকটা অটোগ্রাফ খাতার মত। হাসি, অশ্রু, মান-অভিমানে সেটা একেবারে উপচে পড়ল। আবার, একবার যা লিখেছি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি, কেটেছি, নতুন করে লিখেছি, দু'এক জায়গায় বোধ হয় আবার কেটে নতুন করে লিখেছি; নিজেই নায়ক, আবার নিজের হাতেই কলম, বুঝতেই পারেন পূর্ণ স্বরাজ একেবারে—সে যা প্যাঁচালো জিনিস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাকে এতদিন পর্যন্ত স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখতে পারে এ রকম উগ্র স্মার্ত এ পর্যন্ত তো চোখে পড়ল না।

হাসিও পায়, চমৎকার সময় এই সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসে পড়বার বয়সটা। গল্প যে শেষ করব, একটা কিছু ঘটে নায়ক নায়িকা ক্ষান্ত হবে তবে তো? ধরুন যেমন—বিচ্ছেদ হয়ে গেল, আর আশা নেই; বিবাহ হয়ে গেল, আর দরকার নেই; কিংবা দুজনের মধ্যে একজন অথবা দুজনেই আত্মহত্যা করলে—আর বালাই-ই নেই; এক্ষেত্রে লেখক নিজে নায়ক হওয়ায় দাঁড়াল এই রকম যে, কয়েকবার বিচ্ছেদের পরেও আশা আর গেল না; বিবাহের পরও রস জমাবার জন্যেই কিছু বাকি রয়ে গেল, আর নায়ক নায়িকা পেলে অখণ্ড পরমায়ু; ঠিক মনে পড়ছে না, হয় বিষ খেতেই চাইলে না, না হয় খেয়েও শিবের মতন নীলকণ্ঠ হয়ে বেঁচে রইল।

ফল এই হল—যদি অন্য কাউকে নায়ক করতাম তো গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ হত, এ নায়িকাকে একবার ছেড়ে আবার তখুনি ফিরিয়ে এনে, তাও বার বার এইরকম করে, গল্পটা যখন শেষ হল তখন তাকে ডাকে পাঠানোর শেষ দিন একেবারে শিয়রে এসে গেছে। এইবার একটু চাঁচাছোলা করতে হবে। তার পর কপি করা। সমস্তটাই তো অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে করতে হবে। তার ওপর ছোট ভাইদের অপদৃষ্টি আছে, তারা যেন আঁচ পেয়েছে, আমি ভেতরে ভেতরে কি একটা করছি—বেয়াড়ারকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সবাই; রীতিমত নার্ভস হয়ে উঠলাম। এদিকে পড়াতেও ক্ষতি হতে লাগল, স্কুলে বেঞ্চে দাঁড়ানোটা, নিদেন পক্ষে মাস্টারের ধমক টিটকিরি খাওয়াটা একটা রোজকার ব্যাপার হয়ে পড়ল। ততদিন শুধু ঐ কথাই ভেবে ভেবে আর লিখে লিখে নিজেকে এমন পাকাপোক্তভাবে একজন নায়ক করে তুলেছি, যে এইসব ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি অপমান বোধ করতে লাগলাম, চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে যার ভালবাসায় মুগ্ধ, যাকে পাবার জন্যে প্রাণপাত করতে বসেছে, সে ইংরেজ কবে কার্নাটিক দখল করেছিল, কিংবা একটা বিশেষ জায়গায় shall বসবে কি will বসবে বলতে না পারার জন্যে ক্লাসের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে সবার হাস্যাস্পদ হচ্ছে এ কি ভাবতে পারা যায়?

যাই হ'ক, এই সব বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আর এক চোট নিয়ে পড়লাম গল্পটাকে। একটা উৎসাহও লেগে রইল—তরী প্রায় ডাঙায় ভিড়িয়েছি তো। কিন্তু মাজাঘসা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তে হল। জানা ছিল ভালবাসার দেবতা অন্ধ, এখন দেখলাম, তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এমন সব কাণ্ড করে বসে আছি যে সত্যিই যে চোখ চেয়ে দেখে তার

সে রকম করবার কথা নয়। অন্ধভাবে শুধু উচ্ছ্বাস আর হা-হুতাশের মধ্যে দিয়ে কলম চালিয়ে গেছি, সে যে কোথায় চলেছে একেবারেই হুঁশ করি নি, ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে সাদা বাংলায় যাকে গল্প বলে তা তো হয়ই নি, অধিকন্তু পাতায় পাতায় অসঙ্গতি,—আর এখন যে জিনিসটাকে গল্পের situation বা ঘটনাসংস্থান বলে বুঝি তার মধ্যে এত আশ্চর্যভাবে অসম্ভব কাণ্ড সব ঢুকিয়েছি যে নিজেকেই শিউরে শিউরে উঠতে হল। লেখার ঝোঁকে, অনুভূতির তীব্রতায় হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞানশূন্য হয়ে যা করেছি, এখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে ছেঁটে-কেটে ফেলতে হল।... আপনাদের মধ্যে যাঁরা লেখক তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে লেখার চেয়ে লেখা বাদ দেওয়াটা কত শক্ত। প্রথমত মায়া বলে একটা জিনিস আছে। কারুর কারুর ছটা আঙুল হয়, দেখে থাকবেন, একটা অসঙ্গতি তো? কিন্তু ছেঁটে ফেলতে পারে কি? পারে না যে তার কারণ শুধু অপারেশনের ভয় নয়, একটা মায়াও হয়, আহা শরীর থেকে বেরিয়ে এক প্রান্তে একটু আশ্রয় নিয়েছে, শরীরের রক্তমাংস দিয়ে পুষ্ট করেছি, থাকই না। একটা ফালতু আঙুল বৈ তো কিছু না! মনের থেকেও যা একটা ঝোঁকে বেরিয়েছে, দরদ দিয়ে যাকে এক সময়ে পুষ্ট করেছি তার সম্বন্ধেও এইরকমই একটা মায়া আসে। মনে হয় যে নিড়ানি দিয়ে গাছটা পুঁতেছিলাম তাই যেন এখন তার গোড়ায় বসাচ্ছি। এ একটা দিক; তা ভিন্ন লেখা কাটলে যে দাগটা হয় সে দাগে নতুন লেখা মিলিয়ে বসানোও বড় দুষ্কর হয়ে ওঠে। আর একবার গাছের তুলনা দিয়ে বলি, খুব পাকা মালী না হলে এই grafting অর্থাৎ কলম বাঁধায় সুবিধা করতে পারে না।

গল্পের কথায় ফিরে আসা যাক। তালগোল যা পাকিয়ে গিয়েছিল, তাকে কেটে-ছেঁটে সোজা করে আনা তো দুষ্কর হয়ে উঠলই, যদি বা ক'দিন গলদ্‌ঘর্ম হয়ে একটা কিছু দাঁড় করানো গেল তো—তাকে সেই অজস্র কাটাকুটির "হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা"-থেকে উদ্ধার করা একরকম অসম্ভবই হয়ে উঠল।

এদিকে গল্প পাঠাবার শেষ দিন ঘাড়ে এসে পড়ল। এখন সেই থার্ড ক্লাসের সাহিত্যলিপ্সু ছেলেটিকে অনেক পোড় খাওয়া সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে এই সব কথা বলছি, তখন তো তা ছিল না। শত বাধা, সব নৈরাশ্য কাটিয়ে মনে হচ্ছে এইবার সাহিত্যিকের মুকুট উঠল মাথায়। আর কটা দিনই বা? একদিন সবাই দেখবে অমুক স্কুলের অমুক ক্লাসের অমুক নামের ছাত্র গল্প লেখা নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে। একেবারে পুরস্কার! শুধু যে বইয়ে একটা গল্প বেরুল তাই-ই নয়, সে তো রামা-শ্যামা অনেকেরই বেরুচ্ছে। আশ্চর্যে সবাই হাঁ করে থাকবে!

সুখের বিষয়, কাউকে হাঁ করতে হয় নি, দিন কতক পরে যখন নির্বাচিত গল্পের বই বেরুল, অমুক স্কুলের অমুক নামের ছেলেকেই উল্টে হাঁ করে থাকতে হল—তার গল্পের নামগন্ধও নেই কোথাও!

সুখের বিষয় কেন বললাম? গল্পটা বেরুলে যাঁরা প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে হাঁ করে থাকত তাদের পাশে একেবারে অন্যরকম দৃষ্টি নিয়ে যে বাবা কাকাও এসে দাঁড়াতেন এটা একেবারে খেয়ালই হয় নি। বলা বাহুল্য নায়কের পাঠ করতে গিয়ে ক্লাসের পরীক্ষাটা বেজুত হয়ে গেল, ওঁরা দুজনে যেন সন্দিগ্ধই হয়ে পড়েছিলেন যে আমি ক'দিন ধরে ভেতরে ভেতরে একটা কিছু মতলব নিয়ে রয়েছি। আমার হাড় ক'খানার সৌভাগ্য যে সে মতলব যে কত গভীর, আমি যে কী তলে তলে জল খাচ্ছিলাম, সেটা আর জানবার সুযোগ হল না ওঁদের।

আপনারা কি দুঃখিত হলেন যে আমার প্রথম গল্পটির কোন নিশানাই রইল না পৃথিবীতে? কিন্তু গল্পটি প্রকাশিত হলে আমারই যে কোন নিশানা রাখতেন না বাবা আর কাকা মিলে, সেইটিই কি সুখের কথা হত?

... ...

এটি আমার গল্পের গল্প, সুতরাং উপসংহার হিসাবে শেষ দুটো কথা বললে মন্দ হয় না।

গল্পটা পাঠাতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। না-বেরুনোটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভাল হয়েছে সব খতিয়ে দেখতে গেলে, কিন্তু তবু তো একটা নৈরাশ্যই? তার পাশে পাশে ভগবান্ বরাবরের জন্যে একটু সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছেন। সেটা এই যে ঐ দেরি হওয়ার জন্যে কর্তারা গল্পটা আর খুলে দেখেন নি নিশ্চয়। অর্থাৎ হলেও হতে পারতাম মস্ত বড একটা কিছু এই বিশ্বাসটুকু রয়েই গেল! আর একটা কথা, কাল্পনিক হ'ক আর যাই হ'ক—সেই যে উঠতি বয়সে একবার কষে ভালবেসে নিয়েছিলাম—আর জীবনে ওদিকে তাকাবার দরকারই হয় নি।

শ্রীমান্ রমেন রায়, বি কম্

আবার সেই বকুলতলাটিতে দুই জনের দেখা হইল। সুপ্রিয়া প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ দেখা করতে বলেছ যে—তাও আবার চিঠি লিখে?"

রমেন বলিল—"হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল।"

চমৎকার জ্যোৎস্না, এখানে ওখানে দু'একটা বকুল ফুল নিঃসাড়ে ঝরিয়া পড়িতেছে—যেন সেই জ্যোৎস্না ছানিয়াই। সুপ্রিয়া একটু নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর একবার মুখটা তুলিয়া বলিল—"আর এখন হঠাৎ কিছু মনে পড়লে তা মনেই চেপে রাখতে হবে, নয় কি?"

উত্তর চাহিয়া প্রশ্ন নয়, তবু একবার মুখের পানে যেন উত্তরের জন্যেই চাহিয়া, তখনই ঘুরিয়া পা বাড়াইল।

২

আর একটু গোড়া থেকে না বলিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে না, তবে সংক্ষেপেই বলিব।

রমেনের বয়স যখন পনর-ষোল বৎসর, ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, সেই সময় সুপ্রিয়ার পিতা এই শহরে বদলি হইয়া আসেন। এই বাসার পূর্বের বাসিন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় কয়েক দিনের মধ্যেই দুইটি পরিবারের হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল। সুপ্রিয়া তখন মাইনর স্কুলের ছাত্রী, দুই দিকে বেণী দোলাইয়া স্কুলে যায়। সতের আঠার বৎসর পর্যন্ত দুই দিকে বেণী দোলাইবার রেওয়াজটা এখন হইয়াছে, তখন দশ বৎসর না যাইতে যাইতেই দুইটা বেণীকে একটিতে মিলাইয়া লইত।

পরিচয়ের প্রায় মাসখানেক পরের কথা, এক দিন কি একটা পড়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সুপ্রিয়ার জননী বলিলেন—"তুই তোর রমেনদার কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেই পারিস। আমার বিদ্যে আর কতদূর? তা ভিন্ন ভুলেও যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে সব।...বরং তাই যা।"

সুপ্রিয়ার পিতা পাশের ঘরেই ছিলেন, কথাটা কানে গেল। সুপ্রিয়া চলিয়া গেলে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজেই পড়াবে বললে—একটু অন্যমনস্ক থাকবে—তাই মাস্টার রাখলাম না; তাহলে একজন দেখব?"

"কি দরকার?"

"তবে যে ও-বাড়ির রমেনের কাছে পাঠালে?"

স্ত্রী চক্ষু নত করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর চক্ষু তুলিয়া একটু

লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"না হয় গেলই এক-আধ বার ?"

তাহার পরেই আরও স্পষ্ট করিয়া দিলেন—"না, আমার ছেলেটিকে বড পছন্দ হয়েছে, ভেতরে ভেতরে খবরও নিয়েছি। কোন বাধা নেই…"

স্বামীও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ওর পাস দেবার বছর এটা…বইয়ের দিকেই মন থাকা ভাল।"

"তুমি যে এদিকে বল তোমার স্কলারশিপ পাওয়ার জন্যে দায়ী কতকটা আমিই ?"

নিজেদের জীবনে ঠিক এই ধরনেরই একটা রোমান্স আছে, সেটাকে অস্বীকাব করা গেল না। "যেমন বোঝ"— বলিযা ঈষৎ হাসিয়া স্বামী চলিযা গেলেন।

এদের রোমান্স অবশ্য অনেক পরে আরম্ভ হইল। তাও দু'পক্ষের তাহাতে কতটা অংশ অন্তত সুপ্রিয়ার তাহাতে সন্দেহ আছে। মায়ের ধাত অনুযায়ী সুপ্রিয়া গোড়া থেকেই একটু ভাবপ্রবণ, আর এই প্রবণতাটুকু ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিল। তবে রমেনকে ঠিক বোঝা যায় না, ও যেন কাজটাকেই জীবনে বেশি করিয়া লইয়াছে। বেশ টক টক করিয়া একে একে পাস দিয়া গেল, প্রত্যেক বারেই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে। এই পাস দেওয়ার পাশেই যে জীবনে আর একটা ব্যাপার হইতেছে, আর একটি জীবন যে এই জীবনে ধীরে ধীরে মিশিয়া আসিতেছে —কখনও উচ্ছ্বসিত লহরীতে, কখনও বা নীরব স্রোতমাত্রেই, সেদিকে তাহার যেন লক্ষ্যই নাই। সুপ্রিয়া কিছু বুঝিতে পারে না, এক এক সময় আসে ক্লান্তি, এই কর্মপ্রবণ উদাসীনের সামনে আর কত করিয়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ধরিবে ? …কিছু যে না পায় এমন নয়, সেইটুকুকেই পাথেয় করিয়া সে আগাইয়া চলে। আর না আগাইয়া উপায়ও ত নাই—ভালবাসার ধর্মই যে এই,—ওদিকে থাকিবে ঔদাসীন্য, এদিকে থাকিবে নিরাশার ক্লান্তি, তাহার পর এই ক্লান্তিই যোগাইবে চলার শক্তি। এমন অনিয়মের রাজ্য ত আর নাই !

আর যেমন এইমাত্র বলিয়াছি—নিতান্তই যে পায় নাই এমনও তো নয়, তা সে যত অল্পই হ'ক। সেই অল্পই আবার একটা সান্ত্বনার সংশয় যোগাইয়াছে মনে —হয়তো পুরুষকে এর বেশি করিয়া পাওয়া যায় না, হয়তো অন্তরে আছে অসীম ভালবাসা, শুধু যেটুকু পাইল তাহার বেশি প্রকাশ করিবারই ক্ষমতা নাই পুরুষের। …এই বকুলতলাতেই কতদিনের কথা মনে পড়ে ; যেবারে আই-এ পরীক্ষা দিল রমেনসেবারকার কথা : গ্রীষ্মের ছুটিতে আসিল না, পড়ার ক্ষতি হইবে। পূজার ছুটিও অনেকদিন কাটাইয়া আসিল। সুপ্রিয়া অভিমান করিয়াই দেখা করিতে

গেল না।—একটা দিন বুঝি সত্যই যায় কাটিয়া এমন সময় প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি রমেন নিজে আসিয়া উপস্থিত।

সুপ্রিয়ার জননীকে প্রণাম করিয়া রকে বসিয়া গল্প করিতেছে—এখনও ছবিটি যেন লাগিয়া আছে সুপ্রিয়ার চোখে—গল্প করিতেছে, কিন্তু সে শুধু ঠোঁট দুইটির সাহায্যে—মন একেবারে অন্য কোথায়—দৃষ্টি চঞ্চল, চোখ দুইটি যেন কিসের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—প্রশ্নে-উত্তরে যেমন গোলমাল, বেশ পাওয়া যায় কান দুইটিও অন্যত্র—ঘরের মধ্য হইতে জানলার ফাঁকে সুপ্রিয়া দেখিতেছে —সে কি এতই বোকা, এত মোটা লক্ষণগুলাও বোঝে না?

এক সময়, যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে, অথচ নিতান্ত একটা সাদা প্রশ্ন করার মত করিয়া রমেন প্রশ্ন করিল,—"ইয়ে—সুপাকে দেখছি না যে?"

মা একটু মুখ ফিরাইলেন, অল্প একটু হাসিলেন কি?—বলিলেন, "মাথা ধরেছে বলে সে একটু আগে বিছানায় গিয়ে শুল।"

আবার একটু গল্প চলিল, যেন সুপ্রিয়ার আলোচনা একেবারে বেশিক্ষণ করিলে ভিতরের কিছু একটা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয় আছে। জানালার ছিদ্রপথে সুপ্রিয়া আরও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—সংবাদটুকুর পরিণাম কি হয় জানিতে হইবে তো?…মায়ের সঙ্গে রমেনেব গল্প আরও এলোমেলো হইয়া উঠিয়াছে।…মা এত ধরিতে পারেন এই সব ব্যাপার! মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে একটু যে হাসির ভাব জাগিয়া উঠিতেছে তাহার সঙ্গে মূল গল্পের কোন সংস্রব আছে নাকি?…সুপ্রিয়ার তো মনে হয় না।

তাহার পর রমেনের দ্বিতীয় বার হঠাৎ মনে পড়ার পালা আসিল; বলিল—"তা মাথাব্যথা করেছে বলে সুপা বিছানায় শুতে গেল কেন—এই অবেলায়?"

মা বলিলেন—"তাই তো গেল।"

"না, শোওয়াটা ঠিক নয় তো। এই তো আমারও মাথাটা ধরেছিল—বেশ করেই ধরেছিল। ভাবলাম রাত জেগে এসেছি, তাই বুঝি। সমস্ত দুপুরটা বিছানায় পড়ে ঘুমোলাম। নাঃ, বয়ে গেছে মাথা ছাড়তে। 'দুত্তোর' বলে তেড়েফুঁড়ে উঠে বেশ এক চক্কর দিয়ে এলাম: আর যেন সে মাথাই নয়!"

—অল্প হাসিয়া হাতটা একটু ঘুরাইয়া দিল।

মা বলিলেন—"আমি তো বারণই করলাম শুতে এই অবেলায়; দেখ না বলে, যদি শোনে।

রমেন যেন কোন ঘরটা সুপ্রিয়ার তাহা জানে না এই ভাবে একেবারে উল্টা

দিকে চাহিয়া ডাকিল—“সুপা !···কোথায় সে ?”

যে মা এত বেশি বোঝেন তাঁহার সামনে রমেন বোকার মত লুকোচুরি করিতে যাক, সুপ্রিয়া পারিল না ; মুখ চোখ যে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে তাহাব জন্য অল্প একটু সময় লইল, তাহার পর উঠিয়া গট গট করিয়া বাহিরে আসিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল ; যতটা পারিল সহজ কণ্ঠেই বলিল—“মাথা ধরতে যাবে কেন ? মাও অমনি বিশ্বাস করে বসলেন।”

দুজনেই বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন, মা প্রশ্ন করিলেন—“তবে ?”

“ঠিক করেছিলাম আমি আগে যাব না দেখা করতে।”

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কি রকম গেল। তাহার পরই মা প্রশ্ন করিলেন—“বাঃ, এত দিন পরে এল রমেন, তোর উচিত নয় গিয়ে প্রণাম করা ?” এইবার একটু হাসি ফুটিল সুপ্রিয়ার মুখে, বলিল—“সেই কোটই তো ধরে আমিও বসে ছিলাম —ওঁর উচিত নয় আগে এসে তোমায় প্রণাম করা ?”

একটি হাসির মধ্যে মানের পালা শেষ হইল। এর পর এক সময় দুইটা রগ একটু টিপিয়া ধরিয়া বলা বেশ সহজ হইল—সত্যই একটু মাথা ধরিয়াছে, চা জলখাবারের পর যথাসময়ে মুক্ত হাওয়ার দোহাই দিয়া বকুলতলাটিতে গিয়া বসিতেও তেমন আর সঙ্কোচ বোধ হইল না।

৩

সেটাও ছিল জ্যোৎস্নাপক্ষ। সামনের পুকুরটাকে একটা দীঘিই বলিতে হয়। ছোট শহরের প্রায় সবটা ওপারেই, এপারে শুধু রমেনদের বাড়িটি আর শুধু এই গুটিতিনেক কোয়ার্টার্স। তাহার মধ্যে একটিতে থাকে একটি ক্রিশ্চান পরিবার। এদিকে ঘাট নাই, জল থেকে একটু দূরে একটা শানের চবুতরা আছে ; একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়া উহারা দুই জনে তাহার উপর গিয়া বসিল। ধীরে ধীরে চাঁদ স্পষ্ট হইয়া আসিল, সামনের দূরের ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর রুপালি রেখা ফুটিল ; বেশি কথা হইল না, রমেন নিজের কলেজের কথা বলিল দু'একটা, সুপ্রিয়ার স্কুল সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করিল, এক সময় বলিল সে ঠিক করিয়াছে বি-এ না পড়িয়া বি-কম পড়িবে—আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই নজর দেওয়া ভাল ; তাহার পর একবার প্রশ্ন করিল—“জ্যোৎস্না নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগে ?”

সুপ্রিয়া উত্তর করিল—"ভালই তো লাগে। কেন বল তো?"

কি একটা আশা করিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল।

রমেন নির্লিপ্ত ভাবে পা দুলাইয়া বলিল—"শতকরা ৯৯.৫ ভাগ মেয়ের জ্যোৎস্নাই ভাল লাগে—স্ট্যাটিস্‌টিক্স।" তাহার পর যতক্ষণ না উঠিল, দুজনে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

পর দিন আবার দুজনে আসিয়া এক সময় বকুলতলাটিতে বসিল। আরও পরিষ্কার জ্যোৎস্না, হাওয়াটা একটু জোর। সাধারণ ভাবে সৌন্দর্য লইয়াই আলোচনাটা উঠিল প্রথমে, সে একটু ব্যাক্তিগতও হইয়া উঠিল ক্রমে, সুপ্রিয়ার কয়েক বার যেন মনে হইল রমেন চারিদিককার এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়াই তাহাকে মন্থর দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। তাহার পর যখন সুপ্রিয়ার মনটা আরও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, একটা কিছু আশা করিতেছে, রমেন হঠাৎ বি-কমের চর্চা আরম্ভ করিল। এবং তাহার পর সেদিন সেই কথাই চলিল—অর্থনীতি ব্যাপারটা মোটামুটি কি—একটা কাপড়ের কল করিতে ন্যূনকল্পে কত খরচ হইতে পারে, ন্যূনপক্ষে কত মূলধন লইয়া আরম্ভ করিলে চলে···ইনসিওরেন্স অর্থাৎ জীবন-বীমা জিনিসটা স্থূলত কি—দেশে এখন জীবন-বীমা কোম্পানির বেশি দরকার কি কাপড়ের কলের। মনের কয়েকটা গোপনীয় কথাও বলিল—এক একবার মনে হয় ঢাকেশ্বরীর মত একটা কলের মালিক হইতে পারিত তো বেশ হইত, আবার মনে হয় অল্প মূলধনে তো সে হইবার উপায় নাই, তাহার চেয়ে ছোট করিয়া একটা বীমা কোম্পানি শুরু করাই ভাল, ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে 'হিন্দুস্থান'-এর মত একটা ব্যাপার শেষ পর্যন্ত দাড করানো যায়···

উঠিবার সময় বলিল—"আবার কখনও কখনও মনে হয় বি-কম্‌টা নিয়ে এসে এই দীঘিটা ঠিকে নিয়ে মাছ ছেড়ে চালানি ব্যবসা লাগাই, কতকটা কো-অপারেটিভ মেথডে; তার পর আরও একটা বড় দীঘি, ক্রমে আরও—তুমি কি বল?"

সুপ্রিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিতে উঠিতে জ্যোৎস্নাপ্লুত সরসীর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"মন্দ কি? মাছের ব্যবসার চেয়ে আর বড় কি আছে?"

রাত্রিবেলা শুধু ভাবিয়া কাটাইল—পুরুষ কি? রমেন কি? তাহার জীবনের সত্য কি শুধু স্ট্যাটিস্‌টিক্স, কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানি, আর দীঘির মাছ? না, সেই মদির স্বপ্নও আছে—বকুলতলার কয়েকটি অলস দৃষ্টিতে যাহার আভাস ছিল

—মায়ের সঙ্গে গল্প করার সময় যাহা তাহাকে মাঝে মাঝে আনমনা করিয়া তুলিয়াছিল ?

উত্তর পায় না নিজের কাছে। তবে ব্যাকুল আবেগে এই ইঙ্গিতগুলিকেই বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরে।

বকুলতলার দুইটা দিনের এই ইতিহাস, আরও যাহা তাহা এই ধরনেরই কম-বেশি করিয়া।

৪

তাহার পর আসিল জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

পাস দিয়া শিরায় শিরায় বি-কমের নেশায় উন্মাদনা লইয়া রমেন বাহির হইয়া গেল। কত কি যে করে, কত জায়গায় যে যায়, কত বাজারেরই যে অভিজ্ঞতা জড়ো করে! দু'মাসে চারমাসে দু'চার দিনের জন্য যখন আসে বাড়ি, নিজের মনের উন্মাদনা সুপ্রিয়ার মনেও ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করে। আবার যেন ঘূর্ণির পাকেই কোথায় মিলাইয়া যায়।

এই সময় একদিন সুপ্রিয়ার একটি ভাল সম্বন্ধ আসিল। পাত্র কাছেই এক জায়গার জমিদার, বেশ ভাল জমিদারি, বছরে লাখের কাছাকাছি আয়। পাত্র এদিকে শিক্ষিত, সুপুরুষ আরও সব দিক দিয়াই ভাল। বয়সটা একটু বেশি, বত্রিশ-তেত্রিশ। তা এদিকে সুপ্রিয়ারও ত প্রায় একুশ হইতে চলিল।

বাপ-মায়ের মধ্যে কাহার মন প্রথমে ঝুঁকিল বলা শক্ত, হয়তো দু'জনেরই একসঙ্গে। সংসার সংসারই তো ?—কবেকার রোমান্সের গেটোকতক দাগ স্রোতের মুখে ধুইয়া গিয়া কতটুকুই-বা আর বাকি থাকে ? তবুও একটু দো-মনা ভাব রহিলই জাগিয়া।

সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হইল। ওর তখন দারুণ অভিমান ; বলিল—"তোমরা যা করবে তাই তো ভাল।"

সুপ্রিয়ার জননী গোপনে একবার রমেনকেও পত্র দিলেন,—তুমি বিবাহ করিবে কিনা এ প্রশ্ন নয়,—'পাত্রটি এই রকম, এত বাঞ্ছনীয়, তোমার কি মত ?'

উত্তর আসিল উচ্ছ্বাসিত, 'খুবই desirable party, যেন কোনমতে হাত-ছাড়া না হয়।'

রমেনের খাওয়া-পরার ভাষাও আজকাল ব্যবসায়িক শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ।

চিঠিটা যখন এতই অনুকূল, স্বামীকে দেখাইতে আর বাধা রহিল না। একদিন ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেল।

এটা মাস-আষ্টেক পূর্বের কথা। বেশ আছে সুপ্রিয়া, কেনই বা থাকিবে না? দু-তিনবার রমেনের সঙ্গে দেখাও হইয়াছে। তাহার পর বকুলতলায় এই প্রথম সাক্ষাৎ, রমেনের আহ্বানে।

কেন যে আসিল সুপ্রিয়া বলা কঠিন। কৌতূহল? না, এক একবার যে অনেক নীচের ক্লাসের পুরানো পড়ার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহাই?

... ...

ঘুরিয়া বাসার দিকে পা বাড়াইতেই রমেন একটু আবেগময় কণ্ঠেই বলিল—"যেও না সুপা, তোমায় বেশিক্ষণ দাঁড় করাব না।"

অনেক দিনের ভুলিয়া যাওয়া পুরানো পড়া কি এতই মিষ্ট! সুপ্রিয়ার পা দুইটিই যেন অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল—"মাকে লেখা তোমার চিঠি আমি দেখেছি, তার পরে কি বলবার আছে আর তোমার?"

অভিমানের ব্যঙ্গ ধরিতে পারে, এ সূক্ষ্মতা রমেনের কোন কালেই বোধ হয় ছিল না, বেশ নির্বিকার ভাবেই বলিল—"কেন, ট্রানজাক্‌শনটা খারাপ হয়েছে? তুমি সুখী নও?"

"কেন হব না সুখী?"

কয়েক সেকেণ্ডের মৌনতা, তার পর রমেন বলিল—"একটা কথা তোমায় আজ বলব, আশা করি রাখবে, জীবনের একটা শেষ অনুরোধ..."

সুপ্রিয়া নীরবে মাথা নীচু করিয়া রহিল। কি মনে হইতেছে তাহার! সবই যেন ভুলাইয়া দেয় এ কি মাদকতা এই গোটাকতক কথায়?

রমেন বলিয়া চলিল—"এই আমাদের শেষ দেখা, অন্তত এভাবে। নিতান্ত দরকারী আমার জীবনের পক্ষে কথাটা—তাই তোমায় ডাকলাম। আর সে দরকার তোমার দ্বারাই পূরণ হতে পারে, কেন না আমার জীবনের যা আশা আকাঙ্ক্ষা সে তোমার কাছেই জানিয়েছি, তুমি যতটা আমায় জান, বোঝ..."

সুপ্রিয়া ব্যঙ্গ, অভিমান সব ভুলিয়াছে, আর যেন নিজেকে সংযত করিতে পারিতেছে না, বলিল—"বল।"

স্বর যেন একটু কাঁপিয়া গেছে।

আবেগে আশায় রমেনেরও স্বর গেছে কাঁপিয়া, তাহার মধ্যেই একদমে সবটা বলিয়া গেল:

"একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি খুলছি স্বপা, অনেক জপিয়ে টপিয়ে একটা পার্টনার যোগাড় হয়েছে, কিন্তু বেশি টাকা বের করতে চাইছে না। তুমি তোমার স্বামী মিস্টার লাহিড়ীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি একটু এদিকে ঝোঁকাতে পার, একটু —তার পর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক হয়ে গেলে আমিই খাতাপত্র দেখিয়ে তাঁকে ঠিক করে নি। লক্ষ্মীটি, চেষ্টা কর স্বপ্না…মিস্টার লাহিড়ী আমাদের এদিককার ভাষায় যাকে বলে মেডেন সয়েল (maiden soil), সোনা ফলে যাবে। উপকার করা তো হবেই, তা ভিন্ন পিয়োর বিজিনেস হিসেবেই দেখ না —জমিদারি সিসটেম অচল, টাকা আর এ রকম ভাবে আটকে রাখলে চলবে? ইনভেস্ট করে দিন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যদি শতকরা দু'শো টাকা না ফিরে আসে বছর দুয়েকের মধ্যেই…আর উনি টাকা বের করছেন জানলে, সে বেটা কেঁয়ে, মানে, আমার অন্য পার্টনারও যদি ডবল টাকা না ঢালে তো…"

মাতিয়া উঠিয়াছে। পাকা ক্যানভাসারের মত বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের মুঠিটা ঠুকিতে যাইবে এমন সময় বেশ একটি প্রমাণ সাইজের মাছ কাছেই দীঘির বুকে লাফাইয়া উঠিল। বাক্যস্রোত একটু বন্ধ রাখিয়া রমেন সেই দিকে খানিকক্ষণ স্থির গাণিতিক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় রাজ্যের সব দীঘি ইজারা লইয়া মাছের কো-অপারেটিভ ব্যবসার কথাটাও মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

হিসাব

বাড়ির ভিতরে পা দিতেই নরেশ আচার্যির কানে গেল—"কালীতারা বল—"

বিস্মিতভাবে ভাঁড়ার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল বারান্দায় একটা খাঁচায় একটি টিয়াপাখি টাঙানো। গৃহস্থ মানুষ, পাঁচটা ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, নয়দিন পরে বাড়ি ঢুকিতেই এই নূতন উপদ্রবের সাক্ষাতে আচার্যি স্ত্রী মহামায়াকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—"টিয়ে কিনলে কবে—কত দিয়ে?"

কিরিবেশকি. বলিল—"কিনতে যাব কেন? দিব্যি কার পড়া পাখিটি নোনা

উত্তর আসল, কামিখ্যেকে দিয়ে ধরিয়ে নিলুম, খাঁচাটা ভাড়াটে বৌ-এর

ছাড়া না হয়।থ এনেছি।"

রমেনের ল?"

"এই তো বুঝি দিন পাঁচেক হল।"

"খাচ্ছে কি?"

প্রশ্নে গূঢ় সঙ্কেতটি বুঝিতে স্ত্রীর বাকি রহিল না, বলিল—"খাবে আর কি, এইটুকু তো পেট। চার পয়সার ছোলা কিনেছিলাম, এই আজ ফুরিয়েছে—পাঁচ দিনের দিন।…চমৎকার বলে কিন্তু।"

আচার্যি ওটাকে সোজা হিসেবেই ধরিয়া রহিল,—একটা অসহায় জীব, পুরোনো আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, আহারের রুচিটা তো এখন কমই। তাহা হইলে চার দিনে চার পয়সা, ত্রিশ দিনে ত্রিশ পয়সা—বত্রিশ পয়সাই ধরিতে হয়, কেননা বারোটা মাসই তো ত্রিশ দিনে শেষ হইতেছে না। মাসে আট আনা, বছরে ছয় টাকা, কম করিয়া বারোটা বছরও যদি বাঁচে তো ছ' বারোং বাহাত্তর…

হাত পা ধুইল না, হিসাবটা মনে মনে সারিয়া লইয়া মহামায়ার কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও গিয়া খাঁচার দরজাটা খুলিয়া ধরিল। এই নব পরিস্থিতিতে পাখিটা ঘাবড়াইয়া গিয়া বেশি করিয়া বুলি আওড়াতেই থাকিলে, উল্টা দিক দিয়া একটা খোঁচা দিয়া বলিল—"মাগ্যি গণ্ডার সময়, বসে বসে 'কালী তারা' বুলি আওড়ে খাওয়ার দিন গেছে; যা, বেরোঃ!"

এটা মূল কাহিনী নয়, প্রায় পনের বৎসর পূর্বের একটা ঘটনা বলিলাম। এ থেকে বোঝা যাইবে আচার্যি লোকটা কি রকম এবং কি সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।—

মহামায়ার মাসির টাকা আছে। গেরস্ত ঘরের বিধবা, কত আর থাকিবে—দশ হাজারও নয়, বিশ হাজারও নয়, তবে হাজার তিন চারের মধ্যে একটা কিছু আছে। বোনপো, ভাইপো, বোনঝি, ভাইঝি,—যাহারা আছে এতদিন গা করে নাই। কারণ বুড়ি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিল।

ছোঁড়াটা হঠাৎ সেদিন মারা যাইতে সবার টনক নড়িয়াছে। সবাই তাড়াতাড়ি গিয়া জ্ঞাতি-ভাইয়ের শোকে খুব একচোটা চোখের জল খরচ করিয়া আসিল; এখন একটা টানাটানি পড়িয়া গেছে—"পিসি আবার এখানে এসো, তো, মাসি আমার এখানে এসো…"

একলা বুড়ো মানুষ, একটা আশ্রয় তো চাই, মাসি ভাবিয়া দেখিতেছে। এই সময় একদিন মহামায়া স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িল। বলিল—"সবাই টানাটানি

করছে, কিন্তু মাসির ইচ্ছেটা এখানেই এসে থাকেন।" বাঁ-হাতে হুঁকা লইয়া আচার্যি কি একটা রোকড় তৈয়ার করিতেছিল, বুড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাহাদের অবস্থাটাই সব চেয়ে ভাল, একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে আড়ে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন?"

মহামায়া বলিল—"কেন আবার? আমাকেই ছেলেবেলা থেকে সবচেয়ে ভালবাসতেন—'মায়া' বলতে অজ্ঞান হতেন…"

স্থির দৃষ্টিতে একটু আড়ে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। আসল কথা হইতেছে দুজনেই জানে সবচেয়ে দরকারী কথাটা কি, আর দুজনেই চাহিতেছে ও-ই প্রথমে মুখ দিয়া বাহির করুক সেটা। একটু বোধ হয় লুকাচুরি চলিয়াছে। অবশেষে আচার্যিই পরিষ্কার করিয়া দিল, একটু দ্রুত হুঁকা টানিয়া বলিল—"কি সময়টা যাচ্ছে দেখছ? এ সময় একটা মানুষের ভার নেওয়া…"

আচার্যির পাঁজিতে চিরকালই শনি রাজা, রাহু মন্ত্রী, সব প্রস্তাবের মুখেই ঐ প্রশ্ন করিয়া আরম্ভ করে; মহামায়া বলিল—"বলতে নেই, কিন্তু মালক্ষ্মীর দয়ায় যার গোলায় ধান আছে তার তেমন আর ইয়ে কি? আর…"

একটু আটকাইয়া গেল পরের কথাটা, হাজার হ'ক বোনঝিই তো। আচার্যি আর কয়েকবার ঘন ঘন তামাক টানিয়া লইয়া বলিল—"আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলে?"

স্ত্রী বলিল—"বলতে যাওয়া-যাওয়ি আর কি?—গেরস্তকে আবার সব দিক ভেবেচিন্তে দেখতে হয় তো? কিছু আছে মাসির হাতে। তা সেটা অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠে সেইটিই কি ভাল?"

বেশ পরিষ্কার ভাবে মন-জানাজানি হইতে আর কিছু আটকাইল না। আচার্যি প্রশ্ন করিল—"কত—তা খোঁজ নিয়েছিলে?—গেলে তো মাসি মাসি করে নাপিয়ে। মাসি তোমার, আমার তো মাস্-শাশুড়িই—পষ্ট কথাটাই কেন না বলি?"

"তা নিলুম বৈকি খোঁজ, গেরস্তর আবার সব দিকই দেখতে হবে তো! তবে মাসিকে তো আর বলা যায় না—'তোমার সিন্দুকটি খোল তো একবার দেখি' …ইশেরায়-ইঙ্গিতে এর-ওর কাছ থেকে একটা আন্দাজ করে নেওয়া। তা ভিন্ন মায়ের-বোন মাসি, কিছু কিছু জানতামও তো ভেতরের কথা·· দশবিশ হাজার কোথায় পাবে, তবে হ্যাঁ, নগদে, গয়না-গাঁটিতে হাজার তিনেকের ওপর হবে। বাড়িটি অবিশ্যি নিজের নয়, বাড়ি তো করবার অবসর পেলেন না মেসোমশাই…"

আচার্যি রোকড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—"কত বয়স হল?"

"তা মাসির বয়স হল বৈকি, মার চেয়ে মাত্র তো দু'বছরের ছোট। মা গেল পৌষে মারা গেলেন তেষট্টি বছরে ; তাহলে দেখনা কত হল ?...ঐ একটি আছেন, তাও আর ক'দিনই বা বাঁচবেন !"

—মহামায়া চোখের কোণ মুছিল।

আচার্যি মনে মনে হিসাব করিয়া লইয়া স্ত্রীর সহিত সহমত হইতে পারিল না। রোকড়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল, তবে মুখের একটা দিক খুব বেশি রকম কুঞ্চিত হইয়া গেল। প্রশ্ন করিল—"বালাই, বাঁচবেন নাই বা কেন ? কোন অসুখ-বিসুখ আছে নাকি তেমন ?"

অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অতি সূক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর দিকে চাহিল।

উত্তরটাও খুব শক্ত, শাঁকের করাতের মত দু'দিকেই কাটিবার সম্ভাবনা আছে, মহামায়াকে একটু চুপ করিয়া থাকিতে হইল, তাহার পর আমতা আমতা করিয়া বলিল—"না, বালাই ষাট, অসুখ-বিসুখ থাকতে তেমন যাবে কেন ? নিরোগা শরীর আমার মাসির।...তবে আমার কি সে-রকম অদেষ্ট হবে যে মাসি টেঁকবেন আমার কপালে বেশিদিন ? নিরোগা শরীরকেই যে আবার বেশি ভয়, ভাল গাছটাই যে আগে মট করে যায় ভেঙে..."

আবার চোখে অঞ্চল দিল।

একটু চুপচাপ গেল, লুকাচুরির ভাবটা আবার আসিয়া পড়িয়াছে একটু।

তামাকে বলসঞ্চয় করিয়া আচার্যি বলিল—"না, তা মারা যাবেন কেন ? নিরোগা মানুষ বলছ—ভালই তো। কেউ রোগে ভুগুক এটা কি চায় লোকে, না, চাইতে আছে ? আমি জিগ্যেস করছিলাম এইজন্যে—শরীরে রোগ থাকলে, সর্বদা একটা ভয় লেগে থাকে তো ?—মানুষটা খেতে পাচ্ছে না, যা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না, কখন কি হয় একটা ভয় লেগে থাকে না ? সেই কথাই...

মহামায়া বলিল—"কিন্তু মাসির যে আমার না খাওয়ার মধ্যেই গো। বেরতোতে বেরতোতেই কেটে যায়। একাদশী, আমাবস্তে, পূর্ণিমে, এর ওপর আবার চারটে মঙ্গলবার আছে।...কার কল্যেণেই বা আর করা ? কিন্তু সে কথা আর তাঁকে কে বোঝাচ্ছে বল ? বলতে কি কম করেছি আমরা ? তা, বলেন—তোরা তো রয়েছিস, তোদের কল্যেণেই করব এবার থেকে ..."

শোনার মধ্যেই আচার্যি একবার চমকিয়া উঠিল, যাহা খোঁজা যায় হঠাৎ সেটা

পাইয়া বসিলে যেমন হয় ভাবটা। বলিল—"ব্রততে-ব্রততেই বুঝি কেটে যায় সারা মাস?"

"তবে আর বলছি কি? ক'টা দিনই বা আর হাঁড়ি চড়ে? ওদিকে ঐ গেল, তার ওপর আজ লক্ষ্মী পুজো, তো কাল শেতল ষষ্ঠী, পরশু মনসা পুজো—অদ্দেকটা মাস তো এই করেই কেটে যায়। বলছিলেন না এবার?—খাওয়া-দাওয়ার পাট তো একরকম উঠিয়েই দিয়েছি, মায়া তবু কী মার্কণ্ডের পরমায়ু যে গতরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে, কত যে আর সইতে হবে..."

আচার্ষির তামাক টানা খুব দ্রুত হইয়া উঠিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়াছে; এক সময় মুখটা সরইয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা, তুমি যাও, একটু ভেবে দেখি, হুট করে একজনের দায়িত্ব ঘাড়ে করা তো সোজা কথা নয়। তায় বুড়ো মানুষ, তার ওপর আবার সম্পর্কে কুটুম।... দেখি ভেবে, তুমি একটু তামাক সেজে দিয়ে যাও তো।"

আচার্ষি চালের বাতা হইতে পাঁজিটা পাড়িয়া পূরা এক ছিলিম তামাকের সাহায্যে, সপ্তাহের নয়, মাসের নয়, একটি পুরা বছরের হিসাব করিয়া লইল। তাহার মনটা যেন জুড়াইয়া আসিল—কী চমৎকার ব্যবস্থাই করা শাস্ত্রের! ব্রতয় ব্রতয় ছয়লাপ, নাও না, কত করিবে।

হিসাব করিয়া দেখিল মাস-শাশুড়ির যেমন মতি-গতি, বছরে ছটা মাসও হাঁড়ি চড়াইতে হয় কি না হয়! তাও একবেলা করিয়া, বিধবা মানুষ, রাত্রে তো যা হোক দু'টো ফল, একটু দুধ। এর উপর—আবার অসুখ-বিসুখও আছে—মানুষের শরীরই তো? মাস-শাশুড়ির শরীর আবার শোকে জরজর...আহা, কত কষ্ট যে আমাদের হিন্দু বিধবার!

হিসাবটা টাকা আনা পয়সায় খতাইয়া লইল। বাদ-সাদ দিয়া দিনে গড়ে যদি আনা ছয়েক করিয়াই ধরা যায় তো মাসে এগারো টাকা চার আনা: চুলোয় যাক, ওটা না হয় সোজাসুজি বারো টাকাই হইল। বছরে এইরকম ছ'টি মাস, না হয় সাতটাই, বাকি তো উপোস। তাহা হইলে সাত-বারো চুরাশি। শোকে জরজর শরীর, পাঁচটি বছরের বেশি নয়; তবু আচার্য ওটাকে সাত বছর করিয়া লইল—আহা, বাঁচুন না, কে মানা করিতেছে? পাঁচশো অষ্টআশি—চুলোয় যাক—ছ'শোই হইল সোজাসুজি। চারিখানা কাপড় আছে বছরে, কাছাকাছি এক আধটা তীর্থও ঘুরাইয়া আনিতে হয় মাঝে মাঝে। আচার্য ওটাকে সোজাসুজি

সাতশতই করিয়া লইল এবং আরও একটু ঔদার্য দেখাইয়া একেবারে আটশতে শেষ করিল। তাহা হইলে মাসির পিছনে খরচ শেষ পর্যন্ত আটশত টাকা।

এইবার জমার দিক। যেমন অদৃষ্ট, চার হাজার বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আচার্য ওঠাকে কম করিয়াই ধরিল—সাড়ে তিন হাজার ; হয় চার হাজার, বাকি পাঁচশো তো উহারই রহিল। তাহা হইলে ৩৫০০৲—৮০০৲, সাতবছরে নগদ সাতাশ-শো টাকা। আর টাকাটা তো সুদে খাটিতে থাকিবে, বসিয়া থাকিবে না তো।

আচার্যি হুঁকা রাখিয়া দিয়া খুব ভক্তিসহকারে একটি চিঠি মুসাবিদা করিল :

প্রণামাবহবনিবেদনঞ্চাগে!

আপনার নিদারুণ বিপৎপাতে পূর্বেই সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার ভাগিনেয়ীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ইদানীং তন্মুখাৎ আপনকার নিদারুণ অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া সেবক নিরতিশয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছে। এক্ষণে সেবকের ইচ্ছা, আপনি এই বৃদ্ধাবস্থায় আপনার ভাগিনেয়ী ও সেবকের সেবা গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশেষ কাল ব্যতীত করেন! এই মর্মে বক্তব্য এই যে আপনকার আদেশ পাইলেই স্বয়ং যাইয়া বা উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া এই মোকামে আপনার চরণধূলিপাতের ব্যবস্থা করি। যাবৎ আপনকার আদেশ না পাইতেছি তাবৎ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিব। পরিশেষে বক্তব্য আপনকার উপযুক্ত সেবার উপযোগী সামর্থ্য ভগবান আমাদের না দিলেও সাধ্যমত ত্রুটি কোনক্রমেই হইতে দিব না।

আপনকার শ্রীচরণাশীর্বাদে এ বাটীর সমস্ত কুশল। আমাদের অসংখ্য কোটি প্রণাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত সেবকাধম
শ্রীনরেশচন্দ্র আচার্য দেবশর্মণঃ।

সাতটা দিন আচার্যিকে নিরতিশয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতে হইল, তাহার পর মাসশাশুড়ি পায়ের ধূলি দিলেন।

দিনটা পূর্ণিমা ছিল। কি একটা ধাক্কায় আচার্যিকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল, বেলা আন্দাজ দুইটার সময় ফিরিল।

মাসশাশুড়িকে দক্ষিণের ভাল ঘরটি দেওয়া হইয়াছে। একরকম ধূলাপায়েই

আচার্যি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে গেল ; আসিয়াছেন দয়া করিয়া, মর্যাদা অনুযায়ী কিছু শিষ্ট বচন বলিতে হয় তো ?

স্ত্রীকে দুয়ারের কাছে দাঁড় করাইয়া নিজে একটু আড়ালে থাকিয়া আচার্যি বলিল—"বলো উনি যে পায়ের ধূলো দেবেন আমাব বাড়িতে—এত সৌভাগ্য যে আমার হবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি আমি। আমাদের আর কি ক্ষমতা, নেহাৎ ভালবাসেন বলে আপন জেনে দয়া করে এসেছেন। ক্ষমতা নেই, তবে মাথায় স্থান ওঁর, মাথায় করে রাখব এইটে যেন জানেন। মেসোমশাই আমাদেব কাঁদিয়ে গেলেন, তার পর যেটিকে সম্বল করে নিয়েছিলেন, সেটিকেও নিয়ে নিলেন ভগবান, কিন্তু সে তো আর মানুষের হাত নয়, কি করবেন ? এখন আমাদের মুখ চেয়ে, নাতি-নাতনিদের মুখ চেয়ে, ভগবানের নাম করুন আর জপ-তপ নিয়ে থাকুন, তাই তো শেষ পর্যন্ত মানুষের সম্বল…"

আরও অনেক কথা, শেষ করিয়া বলিল—"এইবার বল প্রণাম করতে আসছি, কখনও শ্রীচরণ দেখবার সৌভাগ্যই হয় নি এর আগে, ভাবলুম, না, আগে পায়ের ধূলো নিয়ে তবে অন্যকথা !"

মহামায়া দুয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে গিয়াই আচার্যির চক্ষুস্থির। যেমন উর্ধ্বে, তেমনি বহরে, মাসি যেন আধখানা ঘর জোড়া করিয়া আধঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর তেমনি স্বাস্থ্য ; বয়স যাহাই হ'ক, আঁটো শরীরে স্বাস্থ্য যেন টলটল করিতেছে। একি সাত বৎসরে বিনাশ হইবার শরীর !

খুব কষ্টে নিজের মনকে গুছাইয়া আচার্যি প্রণাম করিবার জন্য নত হইল।

তখন মাসির আড়ালে ওদিকটা নজরে পড়িতে আর যেন উঠিবারও ক্ষমতা রহিল না আচার্যির।—

একটি বড় থালায় দিস্তা খানেক পরোটা, তদুপযুক্ত একটা ডালনা, দুইটা ভাজা। দুইটি মাঝামাঝি সাইজের জামবাটি, একটিতে ঘন ছোলার ডাল, একটিতে খুব ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া সেরখানেক দুধ। মাসির পূর্ণিমার ব্রতর আয়োজন !! এর ওপর একটি রেকাবিতে আর কি আছে ভাল করিয়া দেখিবার আগেই মনে পড়িল—অনেকক্ষণ পড়িয়া আছে, প্রণামের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া যাইতেছে।

পা ধোওয়াও হইল না, সাজা হুঁকাটা হাতে লইয়া আচার্যি কতদিনের রুগীর মত মন্থর গতিতে বাহিরের আতা-তলাটায় গিয়া বসিল।…নিতান্ত কম করিয়া

ধরিলেও মাসির খোরাক মাসে ত্রিশটি করিয়া মুদ্রা। বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি। তাহার ওদিকে হিসাব করিতে আর সাহসই হয় না—সে যা এক সংখ্যা দাঁড়াইবে! আর ঐ কি শোকে জরজর, কুল্যে সাত বছর বাঁচিবার শরীর? দশ বছরের কমে একটু টস্‌কাইবার লক্ষণ নাই, তার পর অন্তত আরও পাঁচটা বছর তো বটেই…

যতই ভাবিতেছে, আচার্যির হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, নিজের হাতে খাল কাটিয়া তো কুমির ঢোকাইল,—এখন উপায়?

পাউডার বনাম ধূলা

১

এ এক অসহ্য কাণ্ড হইয়াছে, ভুলু আর পারে না; বিছানা থেকে নামিয়া মানুষে কোথায় একটু চলাফিরা করিবে তা নয়, একেবারে গা মোছা, পাটকরা জামা পরা, পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ানোর ঘটা; তাহার পরই সোনা ছেলে হইয়া এক বাটি দুধ খাও, তাহার পরেই ঝিয়ের কোল আর পেরাম্বুলেটার ঠেলাগাড়ি! একেই তো সমস্ত বাড়িটাতে একটু ধূলো কি একটু কাদার খোঁজ নাই, যদি কোনরকমে ঝিকে ফাঁকি দিয়া কি মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া বাগানের দিকে গিয়া একটু সংগ্রহ হইল তো বাড়িতে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে; আবার ধোওয়া, আবার মোছা, আবার জামা বদলানো, যেন কতই অন্যায় না করিয়াছে খোকা। অথচ চারিদিকেই তো আরও সবাই রহিয়াছে,—কাহারই বা এত দুর্দশা? সামনের বাড়িতে কাতুদিদির মার খোকা, কখনও জামা-ইজের পরা, কখনও শুধু জামা, কখনও শুধু ইজের, কখনও আবার কিছু নেই—কী যে হয় মনে ভুলুর ওকে দেখিলে! আর ভুলুর কুকুর তো মিছিমিছি, কালো কাপড়ের; কাতুদিদির মার খোকা একেবারে সত্যিকারের কুকুর লইয়া খেলা করে, লাঠি লইয়া পড়ায়, বালিস করিয়া ঘাড়ে শোয়, ঘোড়া করিয়া পিঠে চড়ে! সেদিন যখন ঘোড়াটা ওকে দুম্ করিয়া ফেলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল, ভুলু আহ্লাদে আপনি-আপনিই হাততালি দিয়া উঠিয়াছিল, জ্যান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে সত্যি সত্যি পড়া খুব মজার নয়? বেশ মনে পড়ে ভুলুর—ওর একবার মনে হইয়াছিল—ও যদি কাতুদিদির মার খোকা হইত আর কাতুদিদির মার খোকা যদি ওর মার ভুলু হইতে তো কি মজাটাই যে হইত!

বেশ, চুল যদি আঁচড়াইতেই হইবে, পাউডার যদি মাখিতেই হইবে তো তাও তো ভুলু নিজেই পারে। পাশের বাড়িতে ওদের খুকু পারে আর ভুলু পারিবে না কেন? খুকু তো ভুলুর চেয়ে অনেক ছোট, দিদিকে এখনও ডিডি বলে। সেদিন মা যখন ভুলুকে লইয়া পালঙে শুইল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল, ভুলু একটু মাথা তুলিয়া জানালা দিয়া দেখিল—খুকু ওর মার এতবড় চিরুনি লইয়া নিজের চুল নিজে আঁচড়াইতেছে, তাহার পর কাজল পরিল, কত পাউডার মাখিল—এক মুখ পাউডার, মা ভুলুকে যা মাখাইয়া দেয় তাহার চেয়ে ঢের বেশি। সব মায়েই দুষ্টু, খুকুর মা আসিয়া সব কাড়িয়া লইয়া খুকুকে মারিল। তা বেশ তো, ভুলুর মাও না হয় মারুক না ভুলুকে; কিন্তু চিরুনি, পাউডারের বাক্স অত উঁচুতে না রাখিয়া খুকুর মায়ের মতন আরশির নিচে টানা বাক্সয় রাখিয়া দিক না।···ভুলুর মা যেন আরও দুষ্টু!

খুকুর মা মারে বড্ড খুকুকে, তবু কিন্তু ভুলু যদি খুকুর মায়ের খোকা হইত আর খুকু যদি ভুলুর মায়ের খুকু হইতে তো কী ভাল যে হইত ভুলু ভাবিয়াই কূল পায় না।

যতক্ষণ দুপুর বেলা হয়, ওবাড়িতে খুকুর মাও ঘুমায়, এবাড়িতে ভুলুর মাও ঘুমায়। ওবাড়িতে খুকু রোজ কত নূতন নূতন জিনিস আনিয়া কত নূতন নূতন খেলা করে, আর ভুলু বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া জানালার মধ্যে দিয়া দেখে, মনে হয় কাতুদিদির মার খোকা না হইতে পারুক, পাশের বাড়ির খুকুও যদি হইতে পারিত ভুলু, তো আর কিছু দুঃখ থাকিত না।

বিকাল বেলা আবার সেই গা মোছা, চুল আঁচড়ানো, পাউডার মাখা; আবার ঝি, আবার এক বাটি দুধ খাইয়া সেই পেরাম্বুলেটার।···সেদিন ঝিয়ের মেয়ে কোঁচড়ে করিয়া মকাই ভাজা খাইতেছিল, কি সুন্দর জিনিস! কি সুন্দর গন্ধ! মুঠোর সবগুলাও শেষ করে নাই ভুলু, বাড়িতে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ঝিয়ের কাছে তাহার মেয়েটা মার খাইল, মায়ের কাছে ভুলুর শুধু মার খাইতে বাকি রহিল। হাতের মকাই কাড়িয়া ভুলুকে ধমকাইয়া সে কী কাণ্ড! সন্ধ্যা পর্যন্ত ভুলুর কান্না থামে নাই।

এক এক সময় মনে হয়, মা খুব ভাল; চুমা খাইয়া, বুকে চাপিয়া কত আদর করে, সত্যই মনে হয় মা তাহাকে খুব ভালবাসে। তবুও এমন কেন? কী ভাল লাগে ভুলুর একেবারেই কেন বুঝিতে পারে না মা? ঝিতো বেশ বোঝে, সে তো বেশ দুধের বাটির বদলে তার মেয়েকে কোঁচড় ভরিয়া মকাই ভাজা দেয়!

মুখ বুজিয়া সব সহিয়া যায় ভুলু, কি আর করিবে ?—বাবা, মা, ঝি সবাই যে তাহার চেয়ে অনেক বড। ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যখন ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড হইয়া উঠিবে তখন সব করিবে, খালি গায়ের উপর শুধু একটা গামছা ফেলিয়া গাছে উঠিবে, জলে নামিবে, আব কোথায় কোথায় চলিয়া গিয়া কত কি যে করিবে তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারে না খোকা। অনেক দূরের আরও পরে যে 'কত কি'র দেশ আছে—দিনে মার কাছে যার গল্প শোনে ভুলু, রাত্তিরে ঘুম-বুডি যেখানে লইয়া যায়, একেবারে সেইখানে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বডই হইয়া উঠিতেছে না। রোজ সকালে আরশির সামনে গিয়া দাঁড়ায় ভুলু, আশা করে এক আরশি না হ'ক, অন্তত আধ আরশি বড হইয়া গেছে, দেখে ঠিক তেমনিটিই আছে ; মনটা যে কি হইয়া যায় ভুলুর !

২

ভুলুব স্বপ্নেব দেশ শুধু মায়ের গল্পে বা ঘুম-বুডির কাছেই নাই, আরও একটা আছে তাহাদের বাগানটার পেছনেই। বাগানের খুব উঁচু দেয়ালের জন্য দেখিতে পায় না ভুলু, কিন্তু মাঝে মাঝে সেখান থেকে কত রকম গলায় কত রকম হাসি, চেঁচামেচি, কত রকম নূতন নূতন কথা যখন ভাসিয়া আসে, ভুলু বেশ বোঝে ওখানে যা খুশি লইয়া যা খুশি খেলা করিবার একটা দেশ আছে, ওখানে ছেলেরা মেয়েরা জামা পরে না, পাউডার মাখে না, পেরাম্বুলেটারে চডে না ; তাদের কাতুদিদির মায়ের খোকার চেয়েও মুক্তি, পাশের বাডির খুকুর চেয়েও নিজের হাতে যা খুশি মাখিবার স্থযোগ।... একেবারে বাগানের পাশেই বলিয়া ভুলুর মনটা এক একবার বড্ড কেমন করিয়া উঠে। দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, খল-খল, খিল-খিল করিয়া সেই অনেক রকম গলায় অনেক রকম হাসি উঠিল ; চুমুক দেওয়া বন্ধ করিয়া দাঁতে বাটি কামড়াইয়া ভুলু দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে। এক একদিন দুপুরে সামনের সাদা রোদ্দুর যখন যেন চুপ করিয়া কি ভাবিতে থাকে, ভুলু ঘুমন্ত মায়ের পাশে বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া পাশের বাডির খুকুর নিজের হাতে কাজল-পরা দেখে, দেয়ালের ওদিকে হঠাৎ সেই রকম কত গলায় কত রকমের শব্দ ওঠে—হাসি, চেঁচামেচি, যা খুশি তাই—শব্দ বাড়িয়া ওঠে—ওদের মায়ের বকুনিতে আরও বাড়িয়া ওঠে—শুধু বাডা নয়, শব্দগুলা চারিদিকে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। বেশ বোঝে ভুলু—শুধুই যা খুশি তাই চেঁচামেচি নয়, কতরকম ছেলে কত্তোকন্ধ করিয়া খেলা করে এই চমৎকার দুপুর রোদ্দুরে—যত খুশি ছুটিয়া যেখানে খুশি শুইয়া

বসিয়া, যা খুশি তাই মাখিয়া।…খুকুর অত চমৎকার কাজল-পরা দেখা ছাড়িয়া ভুলু দেওয়ালের দিকে চায় ; কী যে মনে হয় ভুলুর, পায়ে যেন সুড়সুড়ি লাগে—ইচ্ছা হয় যাই ছুটিয়া—ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবার আর দেরি সয় না।·· ভুলু জানে, তবু দোরের দিকে চায়—একেবারে উঁচুতে লোহার ছিটকিনি দিয়া যেখানে দোরটা বন্ধ করা সেইখানটিতে গিয়া চোখ পড়ে…

ভুলু যে বাহিরে না যায় এমন নয়। রোজ সকালে বিকালে ঝি পেরাম্বুলেটারে করিয়া তাহাকে মা-গঙ্গার ধারের কালো রাস্তা দিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। একটু ভাল লাগে ভুলুর—শুধু বাড়ির চেয়ে ভাল, তার বেশি আর ভাল লাগে না। একই রকম গাছ দেখে ভুলু, একই রকম মা-গঙ্গা, একই রকম রাস্তা ; সকালে যখন যায় দাড়িওয়ালা বুড়ো সেপাই নাহিয়া, লোহার খাঁচায় রাঙা ঠোঁটের পাখি লইয়া—"সীত্তারাম কহো, সীত্তারাম কহো" বলিতে বলিতে ভুলুর পেরাম্বুলেটারের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, ভুলুর খানিকটা ভাল লাগে আর খানিকটা কেমন কেমন লাগে ঠিক বুঝিতে পারে না, শুধু ফিরিয়া দেখে পাখিটা কোন মতেই 'সীত্তারাম' বলিতেছে না। ভুলুর আশ্চয বোধ হয়,—খাঁচা কি পাখিদের পেরাম্বুলেটার ?

এর পর থেকেই ভুলুর দেওয়ালের বাইরের সেই জায়গাটার কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে। এক একদিন ঝিকে বলে, এদিকে রোজ যেখানে যায় সেখানে না গিয়া মাটির রাস্তা দিয়া ওদিক পানে চলুক না, বেশ হইবে ; কাহারা সব অত খেলা করে ভুলু দেখিবে, পেরাম্বুলেটার থেকে নামিবে না, কিচ্ছু না। ঝি গালে হাত দিয়া হাঁ করিয়া চায়, বলে—"ছি, ছি, ওদিকে কেউ যায় ? যত ছোটলোকদের বাড়ি, মা শুনলে কি বলবে ?"

ভুলু বলে সে মাকে কখনও বলিবে না। শুধু কাহারা খেলা করিতেছে দেখিবে।

ঝি আরও হাঁ করিয়া পেরাম্বুলেটার দাঁড় করায়, বলে—"ছি ছি খোকা, নোংরা ছেলেরা খেলা করে, ধুলো মাখা ন্যাংটো, তাদের কাছে যেতে আছে নাকি ? দুষ্টু তারা সব।"

আবার পেরাম্বুলেটার চালাইয়া যায়। প্রথমে ভুলুর কষ্ট হয়, দুষ্ট ছেলেরাই যে ভাল এটা কেউ বোঝে না কেন ? তাহার পর রাগ হয়, ঠিক করে এবার ঝি যখন কিছু বলিবে, সে কোনমতেই কথা কহিবে না। সেপাইয়ের পাখির মতন ঠোঁট দুইটা বন্ধ করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিবে।

তাহার পর একদিন ভুলু তাহার খেলার রাজ্যের পথ আপনিই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

সেদিন মা ভুলুব বাবাকে বলিল—"ডাক্তার বাবুর বৌ এসেছে, ভাবছি বিকালে গিয়ে দেখা করে আসব।" বাবা বলিল—"যাও।" পেরাম্বুলেটারে না গিয়ে ভুলু মায়ের সঙ্গে নতুন কাকিমার বাড়ি গেল।

ওদিকে আর কখনও যায় নাই ভুলু! বেড়াইতে যেমন সামনের ফটক দিয়া যায় এ তেমন নয়। বাগানের পাশের দিকের দরজা দিয়া উহারা বাহির হইয়া অন্য রাস্তায় পড়িল, তাহার পর বাগানের অন্যদিকের দেয়ালের পাশ দিয়া চলিল। দেয়ালটা শেষ হইয়া যেখানে আবার ওদিকে ঘুরিয়া গেছে—সেখানে আসিতেই একপাল কালো কালো ছেলে-মেয়ে সামনের একটি সরু রাস্তা দিয়া হাসিতে হাসিতে, চেঁচামেচি করিতে করিতে এ ওর গায়ে পড়িতে পড়িতে একটু আসিয়াই আবাব সেইভাবেই ছুটিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাদের দেখা গেল না। কাহারও হাতে হলদে ফুল সুদ্ধ গাছের ডাল, কাহারও হাতে ছড়ি, কাহারও হাতে আরও কি, ঐটুকু সময়ে ভাল করিয়া দেখা গেল না। ভুলুর যে কি মনে হইল, ইচ্ছা হইল ঝিয়ের কোল থেকে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই তো হয় না, তাহার উপর আবার মা রহিয়াছে। বাড়ি থেকে যেমন শোনে সেই রকম হাসি-হল্লা শুনিতে শুনিতে ওরা নতুন কাকিমাদের বাড়ি চলিয়া গেল।

খোকার মনে আছে সে-রাত্রে ঘুমের বুড়ি ওকে সেই বাগানের পেছনের খেলার রাজ্যেই লইয়া গিয়াছিল,—কত যে খেলা, কত যে চেঁচামেচি, কত যে হাসি-হল্লা! ভুলু এমনটা আর কখনও দেখে নাই, সে নিজেও কি কম খেলিল—কম ধূলাটা মাখিল!

পরদিন দেয়ালের ওধারে আধার যখন সেই শব্দ উঠিল, ভুলুর মনটা অন্য দিনের চেয়েও ছটফট করিতে লাগিল, মনে হইল রাত্তিরের যত চেনাশোনা ছেলেমেয়ে সবাই তাহার জন্যও যেন ওদিকে হাঁকাহাঁকি লাগাইয়া দিয়াছে।... জামা জুতা পরিয়া, পাউডার মাখিয়া যখন ভুলু পেরাম্বুলেটারে উঠিল, কান্নায় তাহার গলাটা বুজিয়া আসিয়াছে।

সে-রাত্তিরেও আবার ঘুমের বুড়ি আসিয়া নতুন-চেনা পথে তাহাকে বাগানের ওদিকে খেলার রাজ্যে লইয়া গেল।

তাহার পরদিন মা না ঘুমাইয়া কাকিমাদের বাড়ি গেল দুপুরবেলা। ভুলু রহিল

ঝিয়ের কাছে। ঝি যখন ঘুমাইয়া পড়িল, ভুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া বাগানের ওপাশের দরজা দিয়া ওদিককার রাস্তায় পড়িল। ওদিকে সেই দুপুরে খেলার চেঁচামেচি, ভুলু রাস্তায় নামিয়া একটু অগ্রসর হইল। কেমন একটু একটু ভয় করিতেছে; রাস্তাটাকেই ভয়,—মনে হইতেছে রাস্তাটা যদি না থাকিত, একেবারেই ওখানে গিয়া পড়া যাইত তো বেশ হইত। তবুও একটু অগ্রসর হইল ভুলু; আর খানিকটা গেলেই ঐ খেলার রাজ্যের সরু রাস্তাটা···কিন্তু ভুলুর আর সাহসে কুলাইল না। আস্তে আস্তে ফিরিয়া লক্ষ্মী ছেলের মতন ঝিয়ের পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

৩

পরের দিনের কথা ভুলু জীবনে কখনও ভুলিবে না।

সন্ধ্যায় একটু পরে অনেক দূরে কোথায় একসঙ্গে অনেক বাজনা বাজিয়া ওঠার শব্দ হইল। ঝি বলিল—বাজারের মাড়োয়ারীর বাড়িতে বিয়ে আছে, স্টেশন থেকে আলো-বাত্তি করিয়া বর আসিতেছে; তাড়াতাড়ি ভুলুকে কোলে লইয়া, ভুলুর দাদার হাত ধরিয়া ঝি গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারে ফটকটায় গিয়া দাঁড়াইল। বাত্তির আওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া গেল, আর একটু পরেই কালো রাস্তার চারিদিকে আলোয় আলোয় ছড়াছড়ি। তাহার পরই বরের দল আসিয়া পড়িল—পা পর্যন্ত রাঙা জামা-পরা, হাতে সাদা সাদা চকচকে লাঠি লইয়া কত লোক; রাঙা জামা পরা ঘোড়া, রাঙা জামা পরা হাতি; তার পর দু'টি সাদা ঘোড়ায় টানা প্রকাণ্ড একটা পেরাম্বুলেটার, তার ওপর জমজমে ঝকমকে পোশাক পরা বর, চোখে কাজল, মুখে সিঁদুর, চন্দন—কত কি মাখানো, মাথায় টকটকে ঝকমকে পাগড়ি; তার সঙ্গে আরও সবাই—অতটা নয়, তবু খুব সাজগোজ। বরের মাথার ওপর সোনার ছাতা, পেছনে একটা লোক ধরিয়া আছে।···ভুলুর একবার মনে হইল—বৌ কোথায়? কিন্তু তখনই বরের পেরাম্বুলেটার আগাইয়া গিয়া আবার আসিল সাজগোজ পরা ঘোড়া, হাতি, পতাকা হাতে রাঙা জামা পরা ছেলের দল, তার সঙ্গে সঙ্গে মটোর, ঘোড়ার গাড়ি, টমটম, কত রকম জামা কাপড় পরা কত রকম লোক সে-সবের মধ্যে।··· এর সঙ্গে সঙ্গে কত রকম যে আলো, কী সব বাত্তি; এত বড় হইয়াছে ভুলু কিন্তু কখনও যদি দেখিয়াছে! কনের কথা আর মনেই রহিল না।

এর ওপর আবার মাঝে মাঝে কত রকম বাজি পোড়ানো!

শুধু তাই নয়, বোধ হয় এ-সবের চেয়েও বা ভাল লাগিল, অন্তত যা ভুলুর পা দু'টাতে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, তা আশেপাশে পেছনে—সমস্ত বরের দল ঘিরিয়া ছেলেদের নাচ, খেলা, চেঁচামেচি, যা খুশি তাই করা; কাহারও হাতে একটা ফুলের ডাল, কাহারও হাতে অন্য কিছু; আমোদের চোটে এক একজন রাস্তার ওপরই লুটাইয়া পড়িয়া আবার ছুটিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

এত বড় আশ্চর্য কাণ্ড ভুলুর জীবনে আর কখনও হয় নাই। ওর মনে হইল যেন মায়ের মুখে শোনা সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে যাওয়া রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্পের সঙ্গে ভুলুদের বাগানের ওদিকের খেলার রাজ্যটা কি করিয়া মিশিয়া গেছে।—এত বড় অসম্ভব ব্যাপার ভুলু যেন ঠিক বুঝিতে পারে না। ঠিক মনে হয়, বাজনা-বাদ্যি লইয়া বরের দল যত দূরে যায়, খেলার রাজ্যের কালো ছেলেদের চেঁচামেচি যত আরও কম শোনা যায়, ভুলু ভাবে এইবার বুঝি তাহার ঘুমটা যাইবে ভাঙিয়া, দেখিবে বিছানায় মায়ের কাছে শুইয়া আছে, এইবার বুঝি মা ডাকিবে—"ঝি, খোকার ইজের-জামা নিয়ে আয় তো।" তাহার পর চিরুনি, পাউডারের কৌটা লইয়া বসিয়া যাইবে।...খোকা বেশ স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে রাতে ঘুমের বুড়ির দেশেও কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল; এত অদ্ভুত যে ঘুম ভাঙার পর আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িল না ভুলুর। শুধু যেন কোথায় যাওয়ার, কি করিবার জন্য মনটা সমস্ত দিন কেমন করিতে লাগিল। সে রাতেও আবার ঐ সব কাণ্ড, পরের দিন সমস্ত সকালটাও সেই মন কেমন-কেমন করা। নতুন কাকিমাকে ভুলুর মায়ের বড় ভাল লাগিয়াছে, সেদিন দুপুরে আবার ভুলুকে ঝিয়ের কাছে রাখিয়া গল্প করিতে গেল।

৪

ভুলুদের বাগানের পেছনে, দেয়ালের ঠিক পরেই একটা বস্তি। মাঝখানে দু'টা আম আর একটা হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছের নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাশে একটা ছোট ডোবা। এই জায়গাটাকে তিন দিকে ঘেরিয়া কতকগুলা বাড়ি। এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই আম-সোঁদালের তলায় চৌপর দিন জমা হইয়া ওদিকে ভুলুর মাথায় খেলার রাজ্যের স্বপ্ন রচনা করে।

দু'দিন থেকে ওদের মস্ত বড একটা উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। তাহার অনুপ্রেরণাটা পাওয়া মাড়োয়ারীদের বিবাহের জলুস থেকে। এরাই ছুটিয়া, গড়াইয়া, হাসিয়া, হল্লা করিয়া সমস্ত উৎসবটাকে সেদিন শরীরে মনে মাখিয়া লইয়াছিল। আজ ওদের নিজেদেরই এক বিবাহের জলুস বাহির হইবে।

সব রকম যোগাড হইয়াছে।

ঘোড়া-ঘুড়ি মিলাইয়া ছযটা থাকিবে—তাহার মধ্যে তিনটা ছাগলী, দুইটা খাশি, একটা বোকা-পাঁঠা। তাদের শিঙে কলকে ফুল আটকাইয়া, পিঠে ছেঁড়া কলাপাতার মখমলের ঝালর বাঁধিয়া সাজাইবার চেষ্টায় একদল মাতিয়া আছে। কত রকম পাতাসুদ্ধ ডালের কত রকম পতাকা! আলোয়-আলোয় তো ছয়লাপ হইয়া গেছে—হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছটার প্রায় অর্ধেকটা উজাড হইয়া গেছে। বাজনাবাদ্যির ঢালোয়া ব্যবস্থা,—গোটা-দশেক পেঁপেডাঁটার বিলাতি শানাই, কলাপাতার ডাঁটার পটপটি করিয়া ঝাঁঝর করতাল হইয়াছে। একটা একদিক-ছেঁড়া আসল ঢোলও যোগাড হইয়াছে। বাজনার মহলায় সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। সবচেয়ে ভাল পাওয়া গেছে হাতিটা,—কাছেই ডোমপাড়া, একটা শুওর ছিটকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ডোবায় চোবাইয়া পরিষ্কার করিয়া এখন তাহার গায়ে মাথায় হাতির মতন প্রসাধন হইতেছে। কী শুঁড! কী হাতির মতন ছোট ল্যাজ! কী কালো কালো লোমে ভরা হাতির মতন ঢলঢলে শরীর! এত সত্যিকার কাছাকাছি কোনটাই হয় নাই। হুল্লোড় পড়িয়া গেছে তাহাকে লইয়া।

এদিকে একদল বর-কনে সাজানো লইয়া পডিয়াছে। কাছেই ফুলপাতা দিয়া সাজানো বর-কনের গাড়ি,—রাস্তার ময়লা-ফেলা একটা একচাকার টিনের গাড়ি—,কাছের ডোমপাড়া থেকেই সংগ্রহ হইয়াছে। ছাগলকে রাজি করা গেল না, তাই দুইটা ওরই মধ্যে একটু ফরসা গোছের ছেলেকে সাদা ঘোড়া করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যথারীতি পা ঠুকিতেছে আর লাগাম চিবাইতেছে। গাড়ির পেছনে একটা পাকা পেঁপে-পাতার ছাতা লইয়া একটি ছেলে মোতায়েন হইয়া আছে।

এমন সময় হঠাৎ একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আরে খোকাবাবু! খোকাবাবু! খোকাবাবু এসেছে!"

দেখা গেল সরু রাস্তাটা যেখান আসিয়া ফাঁকা জায়গাটায় পড়িয়াছে সেখানে

বাগানের ওদিককার বাঙালী বাবুর ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া ; খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধূলা, ইজেরের উপর একটা পরিষ্কার নীল জামা। খোকাবাবু মুখে চারিটা আঙুল পুরিয়া উৎসব-আয়োজনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিবাহ মিছিলের এমন অভিজাত দর্শক পাইয়া একটা শোরগোল পড়িয়া গেল। প্রায় সমস্ত দলটা চেঁচামিচি করিতে করিতে আসিয়া খোকার সামনে জড়ো হইল।

খোকা এতক্ষণ আর একটু আড়াল থেকে সব দেখিতেছিল—কী অপূর্ব জায়গা কী যা-খুশির ব্যাপার। যত খুশি ফুল-ফুটানো গাছ ; যেদিকে খুশি মুখ-ফেবানো বাড়ি-ঘর, যেমন খুশি সেই রকম ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোনটার মাথায় বাঙ্গা-খোলা, কোনটার মাথায় ভাঙা-খোলা, কোনটার খড়ের চাল, কোনটার খডেব মধ্যে দিয়া বাঁশবাতা বাহির হইয়া আসিয়াছে ; কেহ যেন কিছু বলিবার নাই, শাসন করিবার নাই।·· ডোবায় হাঁসের পাল, নামিতেছে, উঠিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, ডুব দিতেছে। আর এই খেলার সরঞ্জাম! কত ছেলে,—ন্যাংটো, কোমরে শুধু ঘুনসি, কাহারও কোমবে ছোট্ট একফালি কাপড়, কাহারও ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, কাহারও শুধু গায়ে একটা বড জামা—ওই রকম মেয়েরাও।···শূওর, পিঠে পাতার ঝালর দেওয়া ছাগল, শিঙে ফুল! আর কত রকম বাজনা! ··ভুলুর যেন আবার সেই বিয়ের দিনের মতন মনে হইতেছে—এখনই মায়ের কোলের কাছে জাগিয়া উঠিবে যেন···

নিঃসাড়ে কখন আগাইয়া রাস্তার মুখটিতে আসিতে ছেলেমেয়েরা "খোকা বাবু! খোকা বাবু!" করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।···

ভুলু যেন কি-রকম হইয়া গেছে ; লজ্জা, একটু বোধ হয় ভয়, আর তার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকখানি আনন্দ। প্রথমটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্নে, মন্তব্যে, প্রশংসায়, আদরের মিষ্টি কথায়, সবার ওপর ওদের আহ্লাদের ছোঁয়াচ লাগিয়া ভুলুর মনটাও যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা যেন হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল।

"খোকাবাবু, তামাসা দেখতে এসেছ?"

ভুলু মাথা নাড়িল।

একটু গুজগুজ চাপা খুশির হাসির পর—

"খোকাবাবু, খেলবে আমাদের সঙ্গে?"

ভুলু এবার কথা কহিয়াই বলিল—"খেলব।"

বিয়ের দিন রাস্তায় যেমন ফুলঝুরির বাজি হইয়াছিল, যেন সেই রকম গোছের একটা কাণ্ড হইল,—"খোকাবাবু খেলবে! খোকাবাবু খেলবে!" শব্দে সমস্ত জায়গাটা ভরিয়া গেল, তাহার সঙ্গে হাসি, হাততালি; কত ছেলে ডিগবাজিই খাইয়া গেল,—আহ্লাদে সে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।···খোকাকে সঙ্গে করিয়াই সবাই উঠানের মাঝখানে লইয়া গেল। বুঝাইয়া দিল কোন্‌টে হাতি, কোন্‌টে ঘোড়া, কোন্‌টে আলো, কোন্‌টে বাঁশি; তাহার পর আসল জায়গায় লইয়া আসিল—যেখানে বর-কনেকে সাজানো হইতেছে।

খোকার বয়সী বর, একটু ছোট কনে।

গায়ে যত খুশি ধূলা, তাহার উপর সাজানো হইতেছে কত টিপ, কত ফুল, কত কি! কনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ধূলোয় মাখা রাঙা রাঙা চুল, কোমরে একটা ছোট্ট ময়লা কাপড়, একেবারে নূতন লোক দেখিয়া একটু জড়োসড়ো হইয়া গেছে।

বোধ হয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করার জন্য সবার সাহস বাড়িয়া গেছে। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"খোকাবাবু, তুমি বিয়ে করবে?"

জিনিসটা এমন লোভনীয়, তিন বছরের ছেলেরও রাজি হইতে আটকায় না, আশী বছরের বুড়োরও রাজি হইতে আটকায় না, ভুলু বিনা বিচারেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"করব।"

এর পরে যে আহ্লাদের ফুলঝুরি ছুটিল, তাহার কাছে আগেরটা যেন কিছুই নয়।···দিকে দিকে কত ছেলে ছুটিয়া গেল, কত ফুল আসিল, কত কি আসিল, এত সুন্দর আর সব দিক দিয়া এত উপযুক্ত বর পাইয়া মৌলিক বরকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করিয়া ভুলুবাবুকে তাহার স্থানে বসানো হইল; প্রসাধন আরম্ভ হইয়া গেল।

গঙ্গার লালচে মাটি দিয়া মুখময় চন্দনের ফোঁটা, যেটুকু জায়গা বাকি রহিল পুঁইশাকের পাকা ফলের বেগুনে রং দিয়া কত রকম রেখাচিত্র, পায়ে পুঁইয়ের রসের আলতা, আরও কত রকম দাগ। কামিজের পকেটে ফুল, কলারের চারিদিকে ফুল; মাথায় খুব বেশি ফুলওয়ালা একটা সোঁদালের ছোট ডাল বাঁধিয়া মাথার টোপর হইল; টোপর, মুকুট, পাগড়ি যা বলিবার অভিরুচি হয়। ভাল বর পাইয়া কনেকে আরও ভাল করিয়া সাজানো হইল, শরীরের যেটুকু খালি ছিল পুঁইয়ের রস আর গঙ্গার লাল মাটিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে মিছিলও সাজিয়া উঠিল,—সব আগে বাজনা, তাহার পর আলো, তাহার পর ঘোড়া, তাহার পর হাতি, তাহার পর বরের গাড়ি। বরের গাড়ির পেছনে আবার ঘোড়া, আবার পতাকা, আবার বাজনা, আবার আলো।

কনেকে তুলিয়া ঠেলাগাড়ির একদিকে বসানো হইল। ভুলুর আহ্লাদে যে মনটা কি হইতেছে! পেরাম্বুলেটারে চড়িয়া চিরকালটা কাটিল, কখনও সে এমন পেরাম্বুলেটারে চড়িতে পাইবে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

. ...

বাজনা আরম্ভ হইয়া গেল। সমস্ত মিছিলটায় যাত্রা স্বরুব একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল।

বরকে হাতের দোলায় করিয়া কয়েকজন বড গোছের ছেলে উঠাইয়া গাড়ির কাছে লইয়া গেছে, এইবার গাড়িতে তুলিবে, এমন সময় একটা উৎকট চীৎকারে সবাই একেবারে জডভরতের মতন হইযা দাঁডাইয়া পডিল, দেখিল সরু রাস্তার মুখে ছোট একটি দল লইয়া অফিসের কোটপ্যাণ্টে স্বয়ং বরকর্তা! মুখের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না ছেলের বিবাহের এমন চমৎকার যোগাযোগে এতটুকুও খুশির ভাব আছে। অবস্থাটা বুঝিবার আগেই একটা মেযেছেলে একেবারে পাগলের মতন হইয়া এদিক পানে ছুটিল—মুখে—"খোকাবাবু! ভুলুবাবু! সর্বনাশ! তুমি এখানে?—আর আমরা সমস্ত শহর এক করে ফেললাম·· কী ডাকাতে ছেলে রে বাবা!···" ভুলুর বাবা অবশ্য তখনই চলিয়া গেলেন কিন্তু এদিকে এক মুহূর্তেই সব ওলটপালট হইয়া গেল। কোথায় যে কে গেল,—হাতি, ঘোড়া, আলো, বাজনা, ছেলে, মেয়ে, এক মুহূর্তেই যেন সব মিলাইয়া গেল।

প্রতি রাতের ঘুমের বুড়ির দেশের মতন এমন একটা ওলটপালট যে, গলায় অত কান্না ঠেলিয়া আসিলেও ভুলু কাঁদিতে পারিল না, একটু হাত পাও ছুঁড়িতে পারিল না। নীচে থেকে কুডাইয়া বুকে চাপিয়া কত কি বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঝি যখন সরু রাস্তার মুখে, তখন ভুলু একবার ঘুরিয়া দেখিল সেই ফাঁকা খেলাররাজ্যে টিনের পেরাম্বুলেটার বসিয়া কনে শুধু হাত আছডাইয়া দারুণ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। রাগে, আরও একটা কিসে, কান্নায় মতনই একটা আওয়াজ করিয়া ভুলু ঝিয়ের কোলে হঠাৎ ছটফট করিয়া উঠিল।

মায়ের গল্পের রাজপুত্র সাতমহলের রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে চলে··· তাহারই কথা কি ভুলুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল?

ভাড়া

১

কাজটা বোধ হয় অন্যায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাঠ-রসিকতার জ্বালায় মনের অবস্থা তখন এমন দাঁড়াইয়াছিল, ও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। এখনও যে খুব অনুতপ্ত আমি একথাও ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না।

বরযাত্রীর দল, কলিকাতা হইতে লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ যাইতেছে। একে বরযাত্রী, তায় কলিকাতার, তাহার উপর আবার যাইতেছে বেহারে—সকলেরই যথাসম্ভব স্মার্ট আর রসিক হইবার চেষ্টা! কিন্তু সুবিধা হইতেছে না। শেষে লুপ এক্সপ্রেসটা যখন কোন্নগর পার হইল তখন একজন বলিল—"না, এ জমছে না, সেরামপুরে গাড়ি থামলে ববদা খুড়োকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বরের গাড়ি থেকে—বাঃ, ওঁরা বরও নেবেন আবার বরদাও নেবেন!"

গাড়িটা প্রায় ওরাই বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে, সমর্থনের একটা তুমুল কলরব উঠিল—"খুড়োকে চাই!·· খুড়োকে চাই!···আমাদের খুড়োকে চাই! ···বাঃ, বর বরদা দুই নেবে, মাংনা নাকি?···"

অযথাই কলরবের সঙ্গে একটা হাসি উঠিল, একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া "খুড়ো হে!—এসো হে—আধ আচবে শোস হে।"·· বলিয়া যাত্রার জুড়িব মত হাত খেলাইয়া তান ধরিয়া দিল, একজন উঠিয়া তাহার টুঁটিটা ধরিয়া নাড়া দিয়া গানের গিটকিরি তৈয়ার করিয়া চলিল; হাসির আর একটা তোড় উঠিল।

এদের সঙ্গে আমায় বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে হইবে, অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, যাই হ'ক, একটু আশান্বিত হইলাম, যাহার নাম উচ্চারণেই এতটা উল্লাস তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল লইয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়িটা সেরামপুরে থামিতে প্রায় অর্ধেক লোক হৈ-হৈ করিতে করিতে নামিয়া গেল, বরের গাড়িতে হাসি-হল্লার মধ্যেই একটা টানাটানি পড়িয়া গেল—ওরাও ছাড়িবে না, এরাও নিরস্ত হইবে না—তাহার পর "থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ খুড়ো!···লং লিভ খুড়ো!···খুড়ো জিন্দাবাদ!"—বলিতে বলিতে সমস্ত প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া একটি লোককে মাঝে করিয়া সবাই এ-কামরায় আসিয়া উঠিল, গাড়িটা ছাড়িয়া দিল।

লোকটা বেঁটেসেঁটে গোলগাল, মাথায় টাক, তাহার নীচে বাবরি; মোটা এক জোড়া গোঁফ বাটারফ্লাই করিয়া ছাঁটা; সর্বসাকুল্যে চেহারাটায় একটু হাসির উদ্রেক করে, তাহার উপর মুখটা আর চোখ দুইটা এমনভাবে একটু কুঞ্চিত যে, মনে হয় যেন এখনই ভয়ানক একটা হাসির কথা বলিবে বা হাসির কিছু একটা করিবে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হইবে।

গাড়ির মধ্যে আসিয়াই লোকটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, চোখ-মুখ আরও কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল ; অত যে গোলমাল এক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া সবাই মস্ত বড় কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, দু'একটা চাপা হাসির খুক-খুক শব্দ হইল, একটু থাকিয়া একজন বলিল,—"কি খুড়ো ?—তুমি যে একেবারে স্ট্যাচু মেরে আলোর দিকে চেয়ে রইলে !"

খুড়ো বিমূঢ়ভাবে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"একি ! আমার গান পাচ্ছে কেন এত !"

চাপা হাসির সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল, একজন বলিল,—"তা গান পাচ্ছে তো গাও না বাবা, সেই জন্যেই তো তোমায় পাকড়াও করে আনা…"

খুড়ো বাঁ হাতে কানটা ঢাকিয়া ডান হাতটা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিয়া একেবারে সপ্তমে তান ধরিল—"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী, কেন বা তোমার এ-হেন বে-এ-এ-শ !"

প্রচণ্ড হাসির চোটে মনে হইল যেন ছাতটা ভাঙিয়া পড়িবে, সেই সঙ্গে নানা-রকম বুলি—"থ্রি চিয়ার্স ফর খুড়ো…এন্‌কোর খুড়ো, এন্‌কোর !…এন্‌কোর।"

তোড়টা একটু থামিলে দু'একজন হাসিতে হাসিতেই বলিল—"আর গান খুঁজে পেলে না বাবা ?… বাসর ঘরে এই গানই গেয়েছিলে নাকি খুড়ো ? এ যে বরযাত্রী গো…"

খুড়ো হাত দু'টো চিতাইয়া নিরীহভাবে বলিল—"বরযাত্রী কি শ্মশানযাত্রী কি করে বুঝব বাপধনেরা ? একেবারে যে নিঝুমের পালা চলেছিল…"

সবার হাসির মধ্যেই এদিকে চাহিয়া হঠাৎ আমায় সাক্ষী মানিল—"কি মশাই, একেবারে শ্মশান করে রাখে নি ?"

আমার পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, ভাবিয়াছিলাম যে রকম জুলুম করিয়া আনা, বোধ হয় একজন প্রকৃত হাস্যরসিকে সঙ্গ পাওয়া যাইবে, এ একেবারে চড়কতলার সং। উত্তর দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় চুপ করিয়া ছিলাম, খুড়ো ভয় এবং দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিল—"কি মশাই, একটু সমর্থন করুন, একা পড়ে যাচ্ছি যে,—করে রাখে নি শ্মশান ?"

একটু খুক-খুক করিয়া শব্দ হইল, বোধ হয় একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে এ ভাবে কোণঠাসা হইতে দেখিয়া। আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, এতক্ষণ তত্তটা বুঝতে পারি নি, এখন শেয়ালডাকার শব্দে আর সন্দেহ নেই বটে।"

খুক-খুক শব্দটা আরও কয়েক কণ্ঠে চারাইয়া পড়িল, খুড়ো একটু যেন অপ্রস্তুত

হইয়া পড়িল ; কিন্তু একেবারে দু'কান কাটা, তখনই সামলাইয়া লইল ;—আমার দিক থেকে ফিরিয়া বলিল—"শুনলে তো ? একবার একটা বিড়ি কি সিগারেট ছাড় দিকিন, শেয়ালের গলা ভেঙে গেছে, একবার শানিয়ে নিতে হবে—"

—বলিয়া মুখটা উঁচু করিয়া হাত দুটো বাড়াইয়া ধরিল এবং গলাটা চাপিয়া ভাঙা গলার মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"হুয়া কাক্কা—বিড়ি! হুয়া কাক্কা—সিগারেট!"

আবার একটা প্রচণ্ড হাসিব তোড় উঠিল এবং আমার পরাভবে কয়েকটা তির্যক দৃষ্টি আমার উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় কোন কারণে সিগনেল না পাওয়ায় গাড়িটা আসিয়া শেওড়াফুলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল।

২

একজন চাষাভুষা গোছেব লোক হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাদেব গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা ধবিল এবং ঘাড়টা প্লাটফর্মের দিকে ঘুরাইয়া হাঁকিল—"ইদিকে—ও ঘোষের পো! ও বদন! ও বেচারাম!...ইদিকে!"

গাড়ির পিছন দিক থেকে একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠে উত্তব হইল—"এরা কইচে এ-গাড়ি লয়, উঠনি তুমি.."

লোকটা পা-দানে একটা পা তুলিয়া দিয়াছিল, টানিয়া লইয়া একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইযা প্রশ্ন করিল,—"কাবা—কারা কইচে গো?"

সিগনেল পাইয়া গাড়িটা হুইসেল দিল।

খুড়ো টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল, দবজাব দিকে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"না হে মোড়লেব পো, এই গাড়ি, উঠে পড, উঠে পড, গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে..."

ঝাঁ করিয়া দবজাটা খুলিয়া লোকটাকে একরকম টানিয়া তুলিয়াই দরজা দিয়া গলাটা বাড়াইয়া দিয়া হাঁকিল—"এই গাড়িই গো ঘোষের পো বোসের পো, বদনচন্দ্র, বেচারাম—উঠে পড তোমরাও..."

গাড়িটা ছাড়িয়া দিল এবং যে হাসি বোধ হয় এইটুকুর জন্যই আটকানো ছিল সেটা একেবারে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোকটি কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গেছে, গদি আঁটা গাড়ি, তাহার উপর যাত্রী সব একেবারে সেরা কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোক—গায়ে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

খুড়ো একজনকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—"বাঃ, কী আমার মামার বাড়ির আবদার রে, মোড়লের পো দাঁড়িয়ে—আর উনি নবাব খাঞ্জাখাঁর মত গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন।..."

লহরে লহরে হাসি চলিতেছে। নিজের কোমরে বাঁধা সিল্কের চাদরটা তাড়াতাড়ি থিয়েটারী ঢঙে খুলিয়া জায়গাটা ঝাড়িয়া বলিল—"এই ব'স কর্তা, কোথায় যাওয়া হবেন কর্তার ?"

ঝুঁকিয়া দুই হাঁটুতে ভর দিয়া গভীর বিনয়ের অভিনয় করিতে হাসিটা আর একটা তোড়ে ভাঙিয়া পড়িল।

গাড়ি বেশ জোর দিয়াছে। আমি বিস্ময়ে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেছি। ভাঁড়ামি অনেক দেখিয়াছি, গা-জুরি ফুর্তি জমাইবার চেষ্টায় বরযাত্রীদের মধ্যে সেটা যে আরও কিরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহারও অভিজ্ঞতাও কম নয় আমার, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার কখনও চাক্ষুষ করি নাই। একেবারে থ হইয়া গেছি। উচিত ছিল তখনই চেন টানিয়া দিয়া স্টেশনের লোক ডাকিয়া সত্য সত্য এব একটা বিহিত করা, কিন্তু যখন চৈতন্য হইল তখন গাড়ি অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে।

কোথায় যাইবে শুনিবার জন্য আমিও কৌতূহলী হইয়া সামনে ঝুঁকিয়া বসিলাম, খুড়োর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—"আমি যাব বাবু সাঁইতেড়ে, মানকুণ্ডুর টিকিস আমার, সেখানে নেমে রেল পেইরে তার পর হাঁটাপথে চালদাডাঙা হয়ে বড় রাস্তায়..."

খুড়ো গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া খুব একটা হাসির কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ও ব্বাবা মানকুণ্ডুতে নেমে, রেল পেইরে, চালদাডাঙা হয়ে তার পর বড় রাস্তা! তার চেয়ে এক কাজ কর কত্তা—সাহেবগঞ্জে নেমে মোটরে করে একেবারে বিয়েবাড়িতে খ্যাটের আসনে—লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, রাবড়ি মালাই।..."

ডান হাতটা ভূরিভোজনের ইঙ্গিতে মুখ এবং একটা কাল্পনিক পাত্রের মাঝে ওঠানামা করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার মধ্যে আবার হাসির একটা হর্‌রা উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানারকম মন্তব্য "হাঁ, সাহেবগঞ্জেই চল কত্তা...নিয়ে চল খুড়ো...কত্তাকে ছাড়া হবে না...চল হে কত্তা...রাবড়ি-মালাইয়ের দেশ ঘুরে আসবে।..."

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, সামনে হেলিয়া বলিলাম..."মশাই,

মাফ করবেন, এটা আপনাদের কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে জিগ্যেস করতে পারি কি ?"

হাসি-হল্লা সব একেবারে চুপ হইয়া গেল, খুড়োও একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর তাহার মুখটা খুব অল্প হাসির আভাসে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত জোড় করিয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া আমারই মত করিয়া বলিল,—"মশাই, মাফ করবেন,—রসিকতার ধরনটা বললে আপনি বুঝতে পারবেন কি ?"

খুক-খুক করিয়া চারিদিকে আবার চাপা হাসির শব্দ উঠিল। আমি উত্তর করিলাম,—"বলুনই না, চেষ্টা করে দেখি।"

"শৃগা-আ-আ-আ-ল রসিকতা!"

উচ্চ উৎকট হাস্যে সবাই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল ; খুড়ো আমার দিক থেকে মুখটা ফিরাইয়া দলের দিকে ঘুরিয়া হুয়া-ক্কাক্কা, হুয়া-ক্কা-ক্কা করিয়া হাসির সঙ্গে শিয়ালের ডাক মিশাইয়া এমন একটা অদ্ভুত আর বিকট রব করিতে লাগিল যে হাসিটা আর থামার অবসর পাইল না অনেকক্ষণ ধরিয়া।

অবশেষে খানিকটা প্রশমিত হইলে আমি বলিলাম—"কিন্তু রসিকতার পরিণামটা কি ভেবে দেখেছেন ?"

খুড়ো আমার দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"সাহেবগঞ্জে আসনে বসে লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা..."

আবার হাসির তোড় নামিল, আমার রাগটা তখন বেশ বাড়িয়া গেল, হাসির উপরে গলাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "অতদূর পর্যন্ত এগুবার দরকার হবে না ; চন্দননগরেই তার ব্যবস্থা করছি, একেবারে রাজ-অতিথি হয়ে লুচি পোলাও ওড়াবেন।—আপনারা একটা নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোককে জবরদস্তি ভুল গাড়িতে তুলে..."

সবার হাসির মধ্যে খুড়ো গলাটা ওদের মধ্যে বাড়াইয়া ভয়ের অভিনয়ের সহিত চাপা গলায় বলিল—"উকিল।"

আবার হাসিটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি আপাতত আর বাক্যব্যয় নিরর্থক দেখিয়া নিজের জায়গাটিতে ঠেস দিয়া বসিলাম। এটা পরক্ষোভাবে আমার হার-স্বীকার বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহারা আরও ভাল করিয়া লোকটাকে লইয়া পড়িল। খুড়ো দুইটা সীটের পর বসিয়াছিল, লোকটার পাশে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিল—"সরো দিকিন তোমরা, কত্তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাই

...তা তোমায় অত ভাবতে হবে না কত্তা, প্যাসেঞ্জারে সব মাটি মাড়াচ্ছে মাড়াতে আসতে, একেবারে শ্যাওড়াফুলি থেকে চন্দননগরে, সঙ্গে-সঙ্গে কত্তার জন্যে ব্যাণ্ডেলের দিক থেকে ডাউন প্যাসেঞ্জার, তাইতে চড়ে টুপ করে এসে মানকুণ্ডুতে নেমে পড়া ; সেই ভাল, না, সেই ধিকুতে-ধিকুতে-ধিকুতে...”

লোকটা একেবারে অকূলে পড়িয়াছিল, একটা উপায় হওয়ায় খুড়োর শেষের দিকে খোঁড়ার চলনের নকল করিয়া বলিবার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়াই ফেলিল, বলিল—“বাবুরা যখন রয়েছেন...”

“কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !” বলিয়া খুড়ো খানিকটা লাফাইয়া উঠিল ; হাসির সঙ্গে ধূয়াটা সমস্ত গাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল—“কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !”

আমি মুখটা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া লইলাম ; শৃগাল-রসিকতার মধ্যে গাড়িটা মাঝের স্টেশনগুলা ছাড়াইয়া চন্দননগরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৩

চন্দননগরে একজন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে লইয়া দরজার সামনে আসিতে সকলে হৈ-চৈ করিয়া তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল, অবশ্য খুড়োই অগ্রণী। ভদ্রলোক খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে অস্ফুট স্বরে বোধ হয় কিছু একটা অভদ্র রসিকতা করিতে কাছাকাছির সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল ; যাহারা শুনিতে পাইল না কৌতূহলী হইয়া উঠিল, একটু কানাঘুষা হইল, তাহার পর সেই চাপা হাসিটা গাড়িময় চারাইয়া পড়িল। গা ঘিন-ঘিন করিতেছে, ইচ্ছা হইল নামিয়া যাই, কিন্তু সব গাড়িতেই অসহ্য ভিড়, জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, গাড়ি থামিবেও অল্প, নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে সেই লোকটা নামিয়া গেছে, বোধ হয় পুল পার হইয়া গিয়া থাকিবে। খুড়ো গলাটা বাড়াইয়া ডাকিল—“ও কত্তা ! ও মোড়লের পো !”

তাহার পর হঠাৎ গলাটা নামাইয়া বলিল—“আরে উকিল করেছিলি, ফি নিয়ে আয় বেটা—লাউ ডাঁটা কুমড়ো ডাঁটা যা হয়...”

আর একজন বলিল—“বেটা খুব ফাঁকি দিলে খুড়ো।”

আমি প্ল্যাটফর্মের উল্টা দিকে বসিয়া আছি, তবুও সব শুনিতে পাইতেছি,

কেননা সেইভাবেই বলা। খুড়ো ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া—আড়-চোখে তাহার পানে চাহিয়া খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"না, একেবারে ফাঁকি দেয় নি ; তা কি পারে ? বাপ রে, উকিল মানুষ !"

"কি দিয়েছে ?—কি দিয়েছে খুড়ো ?"—বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে আরও গম্ভীর হইয়া দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"কেন, অষ্টরম্ভা !"

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তির্যকভাবে আবার অনেকগুলি চক্ষু আমার উপর আসিয়া পড়িল।

এমন সময় খুড়ো হৈ-হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"এসেছে ! এসেছে ! ঐ দেখ ; তোদের খুড়োর কথা মিথ্যে ভেবেছিস ? বাবা, এই মুখে শাপ দিলে আগে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত—বেশিদিনের কথা নয়, এই মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে, দ্বাপরযুগে।...এইখানে ! এইখানে ! নিযে এস হে।"

চন্দননগরে প্ল্যাটফর্মে কলার কাঁদি বিক্রয় হয়—খুড়োর "অষ্টরম্ভা" বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যই কলা পৌছতে দেখিয়া আবার একটা তুমুল হাসির ঢেউ উঠিল, সেই সঙ্গে একটা চিৎকার—"এসেছে অষ্টরম্ভা ! অষ্টরম্ভা !"

ঠিক এই সময় একটা মোটাসোটা গোছের লোক বোধহয় ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগেই গাড়িটাতে উঠিয়া পড়িল। ওদিকে স্টার্টার দিয়াছে, ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইল।

কাঁদি লইয়া লোকটা সামনে আসিল।

"কত দাম ?"

"এজ্ঞে, তিন টাকা।"

"অত হবে না, দু'টাকায় রফা কর।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

"এজ্ঞে, আর চারগণ্ডা পয়সা দেন।"

"আচ্ছা দাও, দাও।"

খুড়ো কাঁদিটা লইয়া লইল। তাহার পর পকেট থেকে একটা ব্যাগ বাহির করিয়া বেশ ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল—"ওরে আমার ব্যাগ থেকে বের করে দে না কেউ...দে না রে কেউ।" দু' একজন চেষ্টা করিল, কিন্তু বজ্র-আঁটুনিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ছাড়িয়া দিল, গাড়ি ততক্ষণে বেগ দিয়াছে : লোকটা কাৎরাইতে কাৎরাইতে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার

পর গোটা কতক বাছা বাছা গালাগালি ছাড়িতে ছাড়িতে পিছাইয়া গেল। খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

একজন ছোকরা একটু সাধুতার ভান করিয়া রাগ-রাগ ভাবে বলিল—"না খুড়ো, এ ভারি অন্যায় হল, এ রকম প্র্যাকটিক্যাল জোক,…"

খুড়ো এক হাতে কাঁদিসুদ্ধ তাহার দিকে ত্বরিতে ঘুরিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"অন্যায়! অন্যায় কোন্‌খানটা?—বুঝিয়ে দাও আমায়।" সবাই বড় কিছু একটা শুনিবার আশায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

ছোকরা বলিল—"অন্যায় নয়? জিনিস নিয়ে দাম না দেওয়া…"

"দাম তো দিয়েছি! বাঃ!"

"দিয়েছ? কৈ?"

"অষ্টরম্ভার দাম অষ্টরম্ভা, তা আবার দেখতে পাবে নাকি?

অনেকক্ষণের প্রত্যাশার পর হাসির রুদ্ধ বেগটা ছাড়া পাইয়া গাড়িটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। টীকা-টিপ্পনী-বচনে নরক যেন আবার গুলজার হইয়া উঠিল।

নিরর্থকই বলা, তবুও গায়ের জ্বালায় আর চুপ কবিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার গলাটা বেশ উঁচাইয়া ওদের খুড়োকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলাম—"মশাই, আপনারা মানুষ?"

সবার হাসি বন্ধ হইয়া গেল, শুধু গোটা কতক খুক-খুক শব্দ রহিল জাগিয়া। খুড়ো আবার খুব গম্ভীরভাবে আমার মুখের ওপর চোখ রাখিয়া বলিল—"আজ্ঞে না তো!"

"তা তো দেখছি, তবে কী আপনারা—তাই ঠিক করতে পারছি না।"

"আমরা?—আজ্ঞে, আমরা ছিলাম শেয়াল, এখন হয়েছি হনুমান।"

—সঙ্গে সঙ্গেই মচ করিয়া একটা কলা ভাঙিয়া না ছাড়াইয়াই মুখে পুরিয়া দিয়া এবং গাল ফুলাইয়া কাঁদিটা কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। এবার আর-সবার হাসিতেও শেয়াল আর হনুমানের ডাক রহিল মেশানো,—সত্যই হার মানিয়া আমি আবার নিজের সীটে এলাইয়া পড়িলাম।

৪

কাঁদিটা বেশ প্রমাণ সাইজের, তায় প্রায় আগাগোড়াই পাকা, হনুমৎ-পর্ব শেষ হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিল ; হুল্লোড যাহা হইল তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কিষ্কিন্ধ্যার একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি।

শেষ হইলে খুড়োর নবাগতের দিকে দৃষ্টি গেল,—ফাঁকতালে যেটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

চাষাভুষা মানুষ, তবে মনে হয় যেন সচ্ছল অবস্থার। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সমস্ত শরীরে কোঁকড়ানো চুল, মুখে বড় বড় গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কানেও লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা ফতুয়া, তাহার আগাগোড়া খোলা, হাতে একটা দড়ি দিয়া বাঁধা ছাতা। নিশ্চয় থার্ড ক্লাসের টিকেট, উঠিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া দোরের কাছটিতে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিয়া আছে, কতকটা অপ্রস্তুত এবং যেন একটু ভীতও।

কলা খাওয়া শেষ হইলে খুড়োর নজর পড়িল, কিংবা বোধ হয় আগেই পড়িয়াছিল এবং ইতিকর্তব্য তখনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছে এইভাবে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে, তুমি ?"

আবার হাসি আরম্ভ হইয়া গেল, কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিল—"চেনা নাকি খুড়ো ?"

খুড়ো এক পা আগাইয়া গিয়া বলিল—"চেনা নয়।—কী বলছিস তোরা ! —সখা জাম্ববান যে ;"

শরীরে কেশের বাহুল্যের জন্য বলা, সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটিও একটু অপ্রতিভ হইয়াছে এবং বোধ হয় ভুলটা ভাঙিবার জন্যই কতকটা খোসামোদের ঢঙে একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমার নাম বিদয় মালাকার, বাড়ি বাসুলি, বংশবাটীর সন্নিকটে।"

খুড়ো আস্তে আস্তে যাত্রার ঢঙে আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া লোকটির দুই বাহু ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"ওঠ সখা, এ প্রবঞ্চনা কেন ? —বহুদিন পরে দেখা হলেও কি ভুল করতে পারি, আমি ? বল বল আমাদের প্রভুর কি সংবাদ, ওঠ তুমি, এ রকম করে বসে কেন সখা ?"

তার পর ঘাড ফিরাইয়া কয়েকজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখা নল, সখা নীল, সখা গয়, সখা গবাক্ষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও আমি জাম্ববান সখাকে উপবিষ্ট করাই।"

"এই যে আসুন, আসুন,"—বলিয়া হাসির মধ্যে চারজন দাঁড়াইল।

লোকটি খুব অপ্রতিভ হইয়া গিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"আমায় কেন? আমায় ছাড়ান দেন্, আমি গরিব চাষাভুষো মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বসবার যুগ্যি নয়…" কিন্তু কোন ফল হইল না, যত আপত্তি ততই বেশি হৈ-চৈ-এর মধ্যে তাহাকে তুলিয়া উপরে বসাইয়া দিল খুড়ো, নিজেও পাশে বসিল। নানারকম ভাঁড়ামি লাগাইয়া দিল। লোকটির বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একেবারে হেলো চাষা নয়, সম্ভ্রমজ্ঞান আছে, প্রথমটা হাসিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিল, তাহারা রাগিয়া গেল। তাহাতে ভাঁড়ামি, আর সেই সঙ্গে হাসির মাত্রা আরও গেল বাড়িয়া, খুড়ো একটু তফাতে ছিল একেবারে গায়ে এলাইয়া পড়িয়া বলিল—"একি সখা, এত বিরূপ কেন? আহ্! সখাব গা কি মোলায়েম, যেন তুলোর বস্তায় শুয়ে আছি, সখা আমার ইণ্টার ক্লাসকে ফাস্ট ক্লাস করে দিয়েছেন। এমন না হলে আর সখা! আহ্!"

লোকটা রাগিয়া একটু সরিয়া বসিতে খুড়ো সরিয়া গিয়া আরও চাপিয়া বসিল। ফল নাই জানিয়াও আমি নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আবার বলিলাম—"মশাই, আপনাদের কি একটা সীমাজ্ঞানও নেই? দূরে দূরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—একেবারে গাযে পড়ে…একটা বয়স্থ লোক…"

খুড়ো আমার দিকে চাহিলও না,—ঘাডটা ঘুরাইয়া লোকটির একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যাত্রার ঢং-এ বলিল—"সখা কি দেহরক্ষীকেও সঙ্গে করে এনেছ?"

প্রবল তোড়ে আবার একটা হাসি উঠিল। অনেকে এবারে সোজাসুজিই আমার পানে ফিরিয়া চাহিল।

একজনকে স্বপক্ষে পাইয়াই বোধ হয় লোকটি আরও চটিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, খুড়ো দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—"একি সখা! তা কি হয়?" তাহার পর হাত দুইটা ধরিয়াই একটু ঘুরিয়া পিঠ দিয়া চাপিয়া বলিল—"অমন উলট গাও কেন বাবা? গাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছি, না হয় তোমাকেও ভাড়া দেব—এমন নরম ঠেস দেওয়ার গদি আমি ছাড়ব না…আহ্ তোমরা একটু ধরে থেক গো সখাকে, কেউ একটা সিগরেট ছাড় দিকিন।"

ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া গেছে। লোকটি নিরুপায় হইয়া বসিয়া ছিল, বলিল—"এবার আমায় ছেড়ে দিন, নামব।"

"মাঃরি প্রাণ!"—বলিয়া খুড়ো সোজা হইয়া বসিল, নূতন হাসির হররার মধ্যে বলিল—"আমি গুছিয়ে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেটটি ধরাব ভাবছি, আর তুমি বেরসিকের মতন নেবে যাবে? মাইরি!"

প্লাটফর্মে ঢুকিয়াছে গাড়ি। লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন না মশাই, মিথ্যা কইব কেন?"

খুড়ো হাতে টিকিট লইয়া পড়িতে পড়িতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইবার মত হইয়া পড়িল, অতি ক্ষীণ অভিনয়ের স্বরে বলিল, "অ্যাঁ! সত্যই সখা জাম্ববান চললেন! অ্যাঁ!—"

লোকটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া একরাশ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। তাহাতে আরও একটা প্রবলতর হাসি উঠিল মাত্র। থামিলে খুড়ো বলিল—"একটু চটে না গেলে জমে না। তা হঠাৎ নেমে গেল যে বেটা ঠিক জমে ওঠবার মুখটিতে—"

আমার পানে একটা আড়ে কটাক্ষ করিল; তাহার পর উঠিতে উঠিতে বলিল—"আমি এবার যাই ও গাড়িতে—তোরা থাক লক্ষ্মীটি হয়ে! বখামি না করে বরং কিছু তত্ত্বকথা শোন, পরকালে কাজ দেবে।"

আর একবার আমার দিকে কটাক্ষ হানিল। একটা তুমুল কলরব উঠিল, কয়েকজন ধরিয়াও ফেলিল—"না খুড়ো, তুমি গেলে চলবে না, তুমি গেলে আমরা অনাথা হব খুড়ো।...একি বাবা, নিজেও শেষকালে উল্টো গাওনা ধরলে!—দর বাড়াচ্ছ কেন খুড়ো?..."

খুড়ো হাসিয়া বলিল—"না রে, আমার কাছে সব—টাকাকড়ি, টিকিট বিলকুল বুড়ো আমার কাছে রেখে দিয়েছে, এমন কি ওদের সেকেণ্ড ক্লাসের পাঁচখানা পর্যন্ত।"

পকেটে ব্যাগটা বাজাইয়া দিল।

সবাই আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—"ব্যাগ কি তোমার আমরা কেড়ে নিচ্ছি?...সে হবে না খুড়ো...এই তো পাশের গাড়িতে রয়েছে বাপ।"

খুড়ো যেন জ্বালাতন হইয়া পড়িবার ভান করিয়া হাসিয়া বলিল—"তোরা বুঝছিস না, বুড়ো ওদিকে হেদুচ্ছে;—ও গাড়িতেও এক মেড়োকে নিয়ে দিব্যি জমিয়ে আনছিলাম, তোরা মাঝখানেই গিয়ে...।"

কলরবটা বাড়িয়া উঠিল—"তুমি ঠিক দর বাড়াচ্ছ খুড়ো…আমরা সত্যাগ্রহ করব।…"

আমি ভাবিয়াছিলাম বরকর্তাকে গিয়া বলিব ; সেও এই দলের দেখিয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় নিতান্ত হন্তদন্ত হইয়া একটি লোক দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরিয়া ব্যস্ত মিনতির স্বরে বলিল—"বাবুরা একটু জায়গা দিন, আমি দাঁড়িয়েই থাকব।'

আমি অপরিসীম বিস্ময়ে তাহাব মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।…লোকটার কপালে তিলক, নাকে একটি রসকলি, গলায় তুলসীর কণ্ঠি ; নীচে বোধ হয় একটা পিরান আছে, তাহাব উপর একটা মোটা মটকার চাদর জড়ানো, পায়ে কট্‌কী চটি।…

দরজার কাছে যে দাঁড়াইয়া ছিল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কি খুড়ো ?…"

খুড়ো ভিতরের দিকে ছিল, চোখ টিপিয়া ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিল, তাহার পর চাপা গলায় বলিল—"আরে আসতে দে বেটা,—বোষ্টম বাবাজি না হলে চটিয়ে সুখ !…"

"আসুন বাবাজি ! আসুন, আসুন ! কি সৌভাগ্য আমাদের আজ ! আসুন-আসুন !"—বলিতে বলিতে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল।

আমি একটি নিঃশ্বাস মোচন করিলাম এবং এতক্ষণ পরে আমার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। হুইসিল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

লোকটি উঠিয়া একবার অবোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া গাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, খুড়ো তাহার হাত দুইটা ধরিয়া গভীর মিনতির স্বরে বলিল—"ওকি প্রভু, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি করে বসব ?—আসুন, আধ আঁচরে বসুন…"

লোকটি আরও অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল—"না বাবুরা, আপনাদের সাথে কি আমি বসতে পারি ? আমার টিকিসও থাট কেলাসের…"

খুড়ো সবার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ওগো, তোমরা সবাই শোন, প্রভুর আমার থাট্ কেলাসের টিকিস্ !—থাট্ কেলাস ! থাট্ কেলাস !…"

কলরবের মধ্যে একজন গলা উঁচাইয়া বলিল—"আমাদের সব টিকিট প্রভুকে সমর্পণ করলাম, উনি আসুন।"

একটা নারকীয় কলরব উঠিল—"হ্যাঁ, আসুন!...প্রভুর ভাবনা কি?—পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস, কুড়িখানা ইণ্টার ক্লাস টিকিস্ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করছি!...আমরা বেঁচে থাকতে প্রভুকে কে কি বলবে?..."

খুড়োও জোর দিল, আরও দু'একজন সাহায্য করিল, টানিয়া ঠেলিয়া লোকটিকে একটা কোণে, সবচেয়ে ভাল জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। খুড়ো একেবারে পাশটিতে বসিল।

আবার সেই ব্যাপার চলিল। আগেকার লোকটির মত না হ'ক, তবুও বেশ গোলগাল চেহারা লোকটির; খুড়ো বাহু কাঁধ টিপিয়া টিপিয়া বলিল—আহ্, কি নরম!—মালপো সাঁটিয়ে সাঁটিয়ে প্রভুর আমার সমস্ত শরীরখানি মালপো হয়ে উঠেছে! কোথায় আশ্রমটি প্রভুর? গিয়ে দিন কতক থাকতে হবে।"

"আমাদেরও সঙ্গে নিও খুড়ো...মালপো আর মালসাভোগ!"

লোকটা কিন্তু চটার ধার দিয়াও যাইতেছে না, অমন করিয়া ঠেলিয়া আনার মধ্যেও নয়, টীকাটিপ্পনীর মধ্যেও নয়। সেই মৃদু হাসি আর অপ্রতিভ দৃষ্টি লইয়া সত্যই বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে বসিয়া আছে। বলিল—"মালপো মালসাভোগ কোথায় পাব বাবুরা? গরিব গেরস্ত মানুষ—আমি আশ্রমই বা কোথায় পাব—মালপোই বা কোথায় পাব?..."

খুড়ো হঠাৎ সরিয়া বসিল, বেঞ্চের উপর পা দুইটা তুলিয়া লোকটির গায়ে পিঠ দিয়া কীর্তনের ঢঙে গাহিয়া উঠিল—"ওগো এই সেই আশ্রম পেয়েছি! এই সে আমার শ্যামের কুঞ্জ—এই সে আশ্রম পেয়েছি...আমি নডব না গো...আমায় একটু তোরা গুড়ুক দে গো—আমি নডব না গো!..."

নারকীয় উল্লাসের মত তিন চারজন সিগারেট আর দেশলাই বাড়াইয়া ধরিল। খুড়ো একটা ধরাইয়া, ধুঁয়া ছাডিতে ছাডিতে আঁখর জুড়িয়া জুড়িয়া গাহিতে লাগিল—"হও যদি নিঠুর প্রিও, তোমার কুঞ্জের ভাড়া নিও; আমি নড়ব না গো...তুমি কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে নিও...আমি না ছোডব এ মিলন কুঞ্জো—ও-ও-ও!..."

লোকটি কোণ-ঠাসা হইয়াই ছিল; যতটা পারিল আরও গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল। খুড়ো পিঠ দিয়া আরও চাপিয়া ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্তন গাহিতে লাগিল। কোন রকমে চটাইবার চেষ্টা; বুঝিতে পারিতেছে ভাঁড়ামিতে একঘেয়েমি আসিয়া পডিতেছে, না চটাইলে হাসির খোরাক যোগানো দুষ্কর হইয়া উঠিবে। দু'একবার আমার পানেও চাহিল, বেশ বুঝিতেছি অভাবে যদি আমিই চটি তো

এবার আমায় লইয়া পডিতে ওর বাধিবে না। আমাব আর সে সুযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, চুপটি করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া দেখিতে লাগিলাম।

গাডিব দৌডটা এবার বড, ব্যাণ্ডেল ছাডিয়া একেবারে বর্ধমানে থামিবে। মিলন হইল, মাথুর হইল, খুডো কখনও সাজিল রাধা, কখনও সাজিল বৃন্দা, শ্রীকৃষ্ণের নাক টিপিয়া, দাডি ধবিয়া অত্যাচাবেব চূডান্ত কবিল। শেষে "তোর পীত ধডা কেডে লব··!" বলিয়া তান ধবিয়া মটকাব চাদরের খানিকটা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জডাইয়া লইল। স্টেশনের পব স্টেশন ছাডাইয়া গাডি ছুটিয়া চলিয়াছে! এদিকে হুল্লোডেব এতটুকু বিবতি নাই। লোকটা কিন্তু চটিল না, সেই একভাবে, অসীম ধৈযে গুটাইয়া বসিয়া রহিল. মাঝে মাঝে শুধু একটা মিনতি, একটা বিনয়—"আমাকে নিয়ে কেন?—আমি আপনাদের পায়েব ধূলোব যুগ্যিও নয, গরিব বোষ্টম··"

আমি দৃষ্টি যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম কবিয়া লইয়া নিজের কোণটিতে বসিয়া দেখিয়া যাইতেছি। হ্যাঁ ধৈর্য বলিতে হয় তো এই একেই!

সেবামপুর থেকে বর্ধমান—হাসি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, এব পরে বোধ হয় চাদরটা একেবাবে টানিয়া বাহিবে ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য রসিকতা খুডোর হাতে ছিল না, কিন্তু সেটুকু বাকি বহিয়া গেল। বর্ধমান আসিয়া গেল, এবং বাবাজি অনুনয়-বিনয়েব সঙ্গে চাদবটা ছাডাইয়া লইয়া নিজেব গায়ে জডাইয়া উঠিয়া দাঁডাইল, এইখানে নামিয়া তাহাকে কাটোয়ার গাডিতে চডিতে হইবে। একটা খুব হৈ হৈ হইল আবাব—খুডো চিৎকাব করিয়া ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিল, অন্য সবাই মিনতি করিয়া জোব কবিয়া বাবাজিকে ধরিয়া রাখিবার অভিনয় করিল, তাহারই ভিতর একই ধরনেব হাসি লইয়া বিনয়বচন আওডাইতে আওডাইতে লোকটা নামিয়া প্ল্যাটফর্মের ভিডের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আমি আমার সুটকেসটা লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছিলাম, ধরিলাম গিয়া একেবারে বাহিরে, যেখানে ঘোডার গাডিগুলা দাঁডায়। বলিলাম—"তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে, একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

লোকটা এরই মধ্যে বেশভূষা অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছে, থতমত খাইয়া একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আমায় বলছেন? কেন?" বলিলাম—"সেটা এখানে বললে ভাল হবে কি?"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিল, বলিল—"বাঃ, কেন মশাই? আপনাকে তো

চিনি না।" কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি সদর রাস্তায় একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন আধ-অন্ধকার জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম; নির্জন, অথচ ডাকিলেই লোক জোটানো যায়।

বলিলাম—"তুমি আমায় চেন না, কিন্তু আমি চিনি,—এর আগে তোমায় দেখি ধানবাদে, একটি সোনার ঘড়িসুদ্ধ রেলওয়ে পুলিস তোমায় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তিন বছর আগেকার কথা·· "

লোকটা আবার উল্টা চাপ দিবার চেষ্টা করিল—"বাঃ, তুমি ভদ্দরলোক সেজে রাহাজানি করবার মতলবে আছ—ভয় দেখিয়ে?—বাঃ, এক্ষুনি আমি লোক জড় করব…"

বলিলাম—"তা করবে না, ভয় নিজেরই আছে তোমার। তোমার পকেটে কুড়িখানা ইণ্টার ক্লাস পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট আর বাহাত্তরটি নগদ টাকা-সুদ্ধ একটা ব্যাগ আছে; যাদের ব্যাগ, তাদের গাড়ি এখনও ছাড়ে নি—ডাকবে লোক? তাহলে আর আমায় কষ্ট করে চেঁচাতে হয় না।

লোকটা হাঁ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—"ভয় নেই; আজ বলছি না, তবে ব্যাগটি বের কর। আজ হজমটা আর করতে পারবে না, বাজে মেহনৎ হল। নাও চট্‌-পট্‌; আমায় সত্যিই কাটোয়া লাইনে যেতে হবে।"

ব্যাগটা বাহির করিল। তাহার পর মুখের পানে একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আধা-আধি…আসুন…যখন ভাই বেরাদারির মধ্যেই…"

ব্যাগটা লইয়া দশ টাকার একটি নোট হাতে দিয়া বলিলাম—"এটা তোমার ভাড়া, বাকিটা আর একজনকে পাঠাতে হবে। পিঠে ঠেস দেওয়ার জন্যে বলছিল না ভাড়া দেবে? তা এই তোমার ভাড়া, যাও এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতন…"

বাহাত্তর টাকার কথাটা ভাঁওতা আমার, গুনিয়া দেখিলাম বোধ হয় রাহাখরচ ইত্যাদি বাবদ তেত্রিশ টাকা তেরো পয়সা রহিয়াছে। পরদিন মনিঅর্ডার করিয়া বাকি টাকাটা হৃদয়নাথ মালাকারের কাছে পাঠাইয়া দিলাম—গ্রাম বাসুলি, পোস্ট অফিস বংশবাটী, জেলা হুগলি।

তবু এখনও গায়ের জ্বালা মেটে নাই; অনুতাপ হওয়া তো পরের কথা।

কুইট্ ইণ্ডিয়া

ও-টি-আর'এর একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিতেছে গোরক্ষপুরের দিক থেকে। ভিড যথেষ্ট আছে, তবে প্রথম শ্রেণীর কামরাটা একেবারে খালি, মাত্র আমি আছি আর একটি ইংরেজ যুবতী ; ইংরেজ বলিয়াই যুবতী বলিলাম, বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ হইবে। গোটা-দুই স্টেশন একত্রে আসার পর তিনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া উঠিলেন।

অনেকগুলি কারণ ছিল ; প্রথমত অন্য সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়ত আমি সামরিক পোশাক পরিহিত, সুতরাং অতটা অপাঙ্‌ক্তেয় নই, তৃতীয়ত, যাহা কথাবার্তায় টের পাইলাম, তিনি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এদেশটা সম্বন্ধে কৌতূহলও টাটকা আর এখনও কৃষ্ণবিদ্বেষটা উগ্র হইতে পায় নাই। নাম বলিলেন মিস্ ফ্লোরা গ্রেস্। ছাপরার কাছাকাছি একটা জায়গায় কে একজন মিস্টার ট্রেভার কিছু জমিদারি এবং কৃষিসম্পত্তি লইয়া আছেন, তাহারই সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন। মিস গ্রেস্ নিজে মাস কয়েক হইল দেরাদুনের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় একটি ইংরেজ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা লইয়া আসিয়াছেন। মিস্টার ট্রেভার সম্প্রতি সেখানে শৈলবিহারে গিয়াছিলেন, আলাপ হয়, নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ কোর্টশিপ চলিতেছে। আন্দাজের কথাটা আমিই বলিলাম, তবে অত স্পষ্ট করিয়া নয়। একটু হাসিয়া বলিলাম—"মিস্টার ট্রেভারের সৌভাগ্যে তাঁকে অভিনন্দিত করছি যে, এই নিদারুণ গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

মিস্ গ্রেসের হাসিতে একটু লজ্জা জড়াইয়া পড়িল, বলিলেন,—"কিন্তু আমি তাঁর সৌভাগ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারছি না মিস্টার মুখার্জি—যদি সৌভাগ্যই হয় সেটা,—উঃ, কী অসহ্য গরম—নরক একেবারে!"

সত্যই অসহ্য গরম। জুন মাস, তায় সময়টাও দুপুরের কাছাকাছি ; পাখা চলিতেছে—কে যেন অদৃশ্য আগুন লইয়া দেয়ালীর আঁজি-বাঁজি খেলিতেছে। বলিলাম—"কিন্তু মিস্টার ট্রেভারেরই তো এই সময় শৈলনিবাসে থাকা উচিত ছিল, তা না করে আপনাকে সুদ্ধ এই অগ্নি-পরীক্ষায় টানলেন যে?"

মিস্ গ্রেসের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, জানালার দিকে ফিরাইয়া লইয়া নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিছু বেফাঁস হইয়া গেছে নাকি? অথচ আসলে যেখানে ঠাট্টা করিলাম সেখানে তো বিরক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ইঁহারা বেশ সময়মত ঠাট্টাগুলা যেমন প্রীতিভরেই গ্রহণ করেন, সেইভাবেই গ্রহণ করিলেন। কিছু বলিয়া সামলাইতে

যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় মিস্ গ্রেস্ মুখটা আবার ফিরাইয়া আনিলেন। রাগ নয়—কপট রোষের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"শুনুন মিস্টার মুখার্জি, সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, এর জন্যে দায়ী আপনারাই।"

একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি করে তা জানতে পারি কি?"

"সব দিক দিয়েই, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পাববেন। আমবা আপনাদের যা শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা দিয়েছি, তার বদলে আপনারা আমাদের শান্তি হবণ করতে বসেছেন। বেশি দিনের কথা নয় যে আপনাদের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে,—এই কিঞ্চিদধিক শ' দেডেক বৎসর—একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা ছিল এই দেশের—যুদ্ধবিগ্রহে দেশ ছিন্নভিন্ন, প্রতিটি রাজদরবার চক্রান্তের কেন্দ্র, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে, যা বা আছে দিনে ব্যবহারের জন্যও নিরাপদ নয়, যানবাহন সেই আদম ঈভের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনারা যে জগতের সর্বপুরাতন জাতিদের অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে-অবস্থায় আপনারা ছিলেন, তখন তাতে আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিযার আদিম জাতিদের চেয়ে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। এর জায়গায় আমরা কি দিয়েছি একবার ভেবে দেখুন মিস্টার মুখার্জি—শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমত দরবারে দরবারে চক্রান্ত আর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের নিরসন করেছি। রাস্তাঘাট এখন সুগম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, যানবাহনে আপনারা বোধ হয় পৃথিবীর সভ্যতম জাতির সমকক্ষ—সভ্যতা আর কৃষ্টির দিক দিয়েও দেখুন—আমাদের প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট আপনাদের কবি, বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত অর্জন কবে নিয়ে এসে আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। অল্পাধিক দেড শতাব্দীর ব্যবধানের ভারতবর্ষের এই দুটি রূপ, অথচ আজ আপনারা এইভাবে তোয়ের হয়ে নিয়ে আমাদের উল্টে বলছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া!' আমার রূঢ়তাটা মাপ করবেন মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমি একটা কথা জিগ্যেস করি—অকৃতজ্ঞতা কি এর চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে?"

দেখিলাম সংযমের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও মিস্ গ্রেস্ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেশ একটু ফাঁপরে পডিলাম—স্ত্রীলোক, তায় গাডির মধ্যে নিঃসঙ্গ, ওঁর বাঁধা গতের মত তর্কগুলার উত্তর দিতে তো পারিলাম না, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়া লইয়া যে সাংঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে সেটাও দূর করিতে কেমন যেন একটা দুরূহ সঙ্কোচ বোধ হইল। ঠাণ্ডা করিবার জন্যই বলিলাম—"একটা জাত স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মিস্ গ্রেস্—তাদের দোষ ত্রুটি

বা আতিশয্যগুলো আপনাদের মত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিত নয় কি?"

মনটা বোধ হয় একটু ভিজিয়া থাকিবে, কেননা মিস্ গ্রেস্ আরম্ভ করিলেন একটু নরম সুরেই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—হয়তো একটু বেশিই, বলিলেন—"তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলেও এটা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভাল মনে করি মিস্টার মুখার্জি যে, আপনারা একটা ধুয়ো তুলেছেন বলেই যে আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা আপনারা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। আপনাদের গলার জোর থাকতে পারে কিন্তু তর্কের মধ্যে কোন জোরই নেই। আর আমাদের জাত যদি কোন জিনিসকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত থাকে তো তা তর্কের সারবত্তা, কণ্ঠের শক্তি নয়। কণ্ঠশক্তি নিয়োগ করার মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিস্টার মুখার্জি, ভয় দেখানো; যে জাত নিজের শক্তি আর অধ্যবসায়ের গুণে অর্ধেক পৃথিবীতে তার উপনিবেশ স্থাপন করলে সে কি এতই ভয়প্রবণ যে আপনাদের গলাবাজিতেই তাদের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যাবে?"

একটু না টুকিয়া পারিলাম না, তবে যতটা সম্ভব রমণীশ্রুতির উপযোগী করিয়াই বলিলাম—"মাপ করবেন মিস্ গ্রেস্—পৃথিবীতে আপনাদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য, জাতি হিসাবে সবচেয়ে বড় বিধানদাতা (Lawgiver) বলে আপনাদের একটা খ্যাতিও আছে—তাই জিগ্যেস করছি, অধিকার জিনিসটা এল আপনাদের কোথা থেকে? আপনি বিদুষী,—অধিকারের মূলে যা যা থাকে তা তো নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়…"

উল্টা ফল হইল, মিস্ গ্রেস্ এক রকম অসংযত হইয়াই উঠিলেন, মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিল; ওষ্ঠাধরও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, যে তর্কের সারবত্তার ওপর এত শ্রদ্ধা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া বলিলেন—"দেখুন মিস্টার মুখার্জি, অধিকার সম্বন্ধে পাঠ আমাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে না, সে জ্ঞান আমাদের যথেষ্টই আছে এবং আমাদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা ভাল রকমই জানি। তাহলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলি—মিস্টার ট্রেভার আর আমার মধ্যে বাগ্দান হয়ে গেছে। কংগ্রেসের গভর্ণমেণ্ট ফিরে আসায় আবার 'কুইট ইণ্ডিয়া' রব ওঠায় এবং আপনি যে ঐ অধিকারের কথা বললেন, সে প্রশ্ন নিয়েও চারদিকে গুলতান ওঠায় তাঁকে তাড়াতাড়ি এই অগ্নিকুণ্ডে নিজের জমিদারিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আশা

ছিল যুক্তির জয় হবে, তা তাঁর যে কখানি চিঠি পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতেই এই খবর যে, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে উঠছে। শেষে আমি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এই চলেছি। কেন তা আন্দাজ করতে পারেন ?"

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বেশ বিপর্যস্তই হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"আজ্ঞে না, কৈ আন্দাজ করতে পারছি না তো কিছু।"

অর্থাৎ এবার ভালমন্দ কিছুই বলিলাম না, যদি এভাবেই উত্তাপটা কমে। কিছু না। মিস্ গ্রেস্ এবার দৃষ্টিতে খানিকটা শাসনের ভাব মিশাইয়া বলিলেন —"ইংরেজ রমণী হিসাবে আমি তাঁর বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমার মনের একটা সঙ্কল্প নিয়ে—যদি তিনি ভয়ে বা অন্য কোন কারণে এদের অন্যায় আবদাবে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ান তো তাঁকে আরও একটি জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে…"

মিস্ গ্রেস্ আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"অর্থাৎ আমার ; আমি যাচ্ছি, হয় আমাদেব এনগেজমেণ্ট দৃঢ় করে আসব, নয় একেবারেই চিরতরে ভেঙে দিয়ে আসব। ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। আপনাদের অধিকার আমাদের চেয়ে যে বেশি, তা সাব্যস্ত করতে হলে আমরা খুব বিশ্বাসজনক প্রমাণ চাই মিস্টার মুখার্জি, যদি মনে করেন, মুখে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বললেন, আর আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে…"

এমন সময় গাড়িটা একটা স্টেশনে আসিয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কামরায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গাড়ির দুই পাশে দোর-জানালা দিয়া দুইটা যাত্রিদল পিল পিল করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল—কেহ নিজের শক্তিতে উঠিল, কাহাকেও ভিতর থেকে টানিয়া তুলিল, কাহাকেও বাহির হইতে ঠেলিয়া তুলিল ; নানা রকমের ছোটবড় জিনিসপত্র আসিয়া যেখানে সেখানে পড়িতে লাগিল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমন যে খালি কামরাটা তাহাতে তিল ফেলিবার ঠাঁই অবশিষ্ট রহিল না। ছোট স্টেশন, ইতিমধ্যে ট্রেনটা হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল এবং গোলমাল যে হইতেছিল, সেটাকে ছাপাইয়া ভিতর এবং বাহির থেকে একটি চিৎকার উঠিল —"বর ওঠে নি—বর ওঠে নি !…বর ছেড়ে গেছে !…"

কয়েকজন দুইধার থেকে এলার্ম চেন টানিয়া ধরিল এবং গাড়িটা ভাল করিয়া থামিবার পূর্বে দুই দিকের জানালা গলিয়া দুইটি বর দুই দিক হইতে হাতে-হাতে, পাঁজায়-পাঁজায় গাড়ির মাঝখানে আসিয়া পড়িল। গাড়ি আবার ছাড়িতে যেটুকু

বিলম্ব হইল তাহাতে সবাই আরও কতকগুলা লোককে গাদিয়া গাদিয়া দুই দিক হইতে চালান করিয়া দিল।

মিস্ গ্রেস্ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছেন ; খানিকটা যে ভীতও, সেটা বেশ বোঝা যায়। অত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে একেবারে রা নাই। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিয়া যাইতেছেন। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে কোণের জায়গাটিতে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়াছি এবং মাঝখানে আমাদের দুইজনের স্যুটকেস রাখিয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। এতক্ষণ ভিতরের ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাড়িটা একটু অগ্রসর হইলে একবার বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মিস্টার মুখার্জি, একবার বাইরে চেয়ে দেখুন! এ কি! এমন দৃশ্য তো জীবনে দেখি নি!..."

গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অভিনব বটেই। গাড়ির পা-দানে আগে থাকিতেই বেশ কিছুটা লোক ছিলই—অগোগোড়া—এখন সেখানেও রীতিমত ভিড়, তাহার উপর যা সমস্ত দৃশ্যটাকে আরও দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভিড়ের গায়ে বিলম্বমান নানা রকম বাজনা—ঢাক, জায়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, কর্নেট আরও সব জটিল বিলাতি বাজনা ; ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, সানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে!—

আমাদের গাড়ির দুই দিকে একেবারে দুই-তিনখানা গাড়ি পর্যন্ত। ওদিকেও নিশ্চয় এই অবস্থা। আর এই সমস্তর উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভরা দুপুরের রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভিতরের হাওয়াই আগুনের হল্কা।

মিস্ গ্রেস্ সেই রকম বিমূঢ় দৃষ্টিতেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিছু ঠাহর করতে পারছেন?—যেন মিলিটারি ব্যাণ্ডের মত দেখাচ্ছে, মতলবখানা কি ওদের?"

বেশ বোঝা যায়, আগস্ট বিদ্রোহের আতঙ্কের সুর রহিয়াছে কণ্ঠে। বলিলাম —"না অন্য ব্যাপার কিছু নয় মিস্ গ্রেস্, এ আমাদের দেশের একটা সাধারণ ব্যাপার—বিবাহ হতে চলেছে। এর সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি থাকাটা আমাদের একটা রেওয়াজ ; আপনি সবে এদেশে এসেছেন, তাই আপনার নতুন ঠেকছে ; দেখবেন মিস্টার ট্রেভার এতে বেশ অভ্যস্ত।"

মিস্ গ্রেস্ স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন যেন কথা যোগাইতেছে না, শেষে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"এমন অসাধারণ

একটা ব্যাপার এখানকার সাধারণ রেওয়াজের মধ্যে মিস্টার মুখার্জি ? বলেন কি আপনি ? এদের প্রাণশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি !—"

আশ্চর্য হইবার তখনও অনেক কিছুই বাকি ছিল এবং এর পর যাহা দেখিলেন, তাহাতে মিস্ গ্রেস্ একরকম বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিস্ গ্রেসের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাই যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় আমাকেও নিরুত্তরই থাকিতে হইত।

নবাগতদের মধ্যে জায়গা লইযা খুব একচোট কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ছাপরা জেলা, কেউ হটিবার পাত্র নয়, বচসা প্রচণ্ডতর হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তাহাব পর ওরই মধ্যে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সবাই একরকম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কতকটা ব্যবস্থাও হইল—ওদিককাব বেঞ্চে ও-দলের মাতব্বরেরা ববকে লইয়া গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিল ; এদিককার বেঞ্চেও সেই ব্যবস্থা হইল, বাকি সবাই দাঁড়াইয়া রহিল বা মালপত্রের উপর গাদাগাদি করিয়া বসিয়া রহিল, ওরই মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বজায় রাখিয়া চলিল।

আমার পাশেই যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিতরকার খবর যোগাড় হইল। বরপক্ষীয়েরা একই জায়গার লোক, পরস্পরেব জ্ঞাতি, জাতিতে রাজপুত। স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে সিমরি গ্রামেব জমিদার ; একদল নামিবে ছাপরা, একদল সোনপুর। ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রবীণ ভদ্রলোকটি ওদিককার বরের পিতা। নাম বাবু গুলজার সিং। ভয়ঙ্কর রাশভারী আর ফরিয়াদী লোক। এদিককার কর্তা বরের বড ভাই, এই বেঞ্চের যিনি শেষদিকে বসিযা আছেন—মাথায় বাববি, গোঁফ অত বড নয়, তবে একটা রাজপুতী ঢং আছে, অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।

উভয় পক্ষের মধ্যে তিনপুরুষ ধরিয়া বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে।

বলিলাম—"এ রকম ফরিয়াদী আর খাপ্পা মেজাজের লোক একদিনেই বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন, বৈরিভাবও বলছেন বনেদী, উঠলেনও এক কামরায়, এতে হাঙ্গাম বাধবে না তো ?"

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া নির্বিকারকণ্ঠে বলিলেন—"সেটা জগদম্বার ওপর নির্ভর করছে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গোটাকতক শির ধড থেকে নামবে, আপনি আমি কি রুখতে পারব বাবুজি ? রাজপুতের বিয়ে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন

কেন? প্রায় তো লেগেছিল, জগদম্বার ইচ্ছেয় থেমে গেল তাইতো? তাঁরই মর্জি হলে আবার বেধে যেতে কতক্ষণ? দুই কর্তার মুখের ভাবটা একটু লক্ষ্য করুন না!"

সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইজনেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। ওরই মধ্যে ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকবার পরস্পরের দিকে দেখিলেন, বার দুয়েক বোধ হয় চোখোচোখিও হইয়া গেল, তাহাতে মুখ দুইটা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল—ভিতরে খুব উগ্ররকম কোন চিন্তাধারা চলিতেছে।

মেমসাহেব নিথর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বাহিরে অমন জলন্ত হাওয়া তবু মুখটা এক একবার একটু বাড়াইয়া দৃশ্যটা না দেখিয়া লইয়া যেন পারিতেছেন না। ভীষণতার যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সেটা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছু বলিতেছেন না কিন্তু—নিশ্চয় পারিতেছেন না বলিতে।

অবশ্য গাড়ির মধ্যে উভয় পক্ষ মিলিয়া একটা হৈ হল্লা চলিয়াছে। তবে সেটা মিশিয়া যাইতেছে না, এদিকে-ওদিকে পার্থক্যটা মোটামুটি বাহিরে বজায় আছে। মিশিয়া গেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় আবার বচসা সুরু হইয়া গেলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের দিকে হঠাৎ কোথায় একটা রামশিঙার আওয়াজ উঠিল। মিস্ গ্রেস্ একরকম চমকাইয়া মুখটা বাড়াইয়া তখনই টানিয়া লইলেন, চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেছে। কিছু একটা প্রশ্ন করিতেন কিন্তু আরও রুদ্ধবাক হইয়া গিয়া যেন পারিতেছেন না। ওঁর কথাটা নিজের হইতেই আমার মনে পড়িয়া গেল—'Mr Mukherjee, I am surprised at their stamina!'

এর পরেই লক্ষণীয় ছিল দুই বরকর্তার মুখের ভাব। ঘটনাটা আমাদের দিকের, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে কেহ রামশিঙায় ফুঁ দিতে পারে এটা বাবু বলবন্ত সিংএর রাজপুতী কল্পনারও অতীত নিশ্চয়, তিনি একবার ঝুঁকিয়া চাহিয়া লইয়া গোঁফে একটু তা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহার ব্যঙ্গদৃষ্টির খানিকটা তির্যক রেখায় বাবু গুলজার সিংএর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বোধহয় এই রকমএকটা কিছুপ্রত্যাশাই করিয়াছিলেন, ঘাড়ফিরাইতেএকটুচোখোচোখিও হইয়া গেল দুই জনের। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র গুম্ফ আর গালপাট্টার নীচে তাঁহার সুগৌর মুখমণ্ডল একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা দুই দিকের সবাই লক্ষ্য করিল এবং হঠাৎ সমস্ত গাড়িটাতে থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। বাবু গুলজার সিং মুখটা খানিকক্ষণ বাহিরের দিকেই করিয়া রাখিলেন—রাগে

ফুলিতেছেন। মেমসাহেব নিশ্চয় অতটা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, রামশিঙার বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া আছেন। আমি কিন্তু দুই রাজার লড়াইয়ে উলুখড়ের নসিবের কথা চিন্তা করিয়া ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বিশেষ করিয়া এই বিদেশিনীর জন্য। বাইরের লোক হিসাবে প্রয়োজন হইলে আমার এর মধ্যে পড়িয়া দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা কবিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় বাবু গুলজার সিং গর্জন করিয়া উঠিলেন—"তেওয়ারী!"

—এই প্রথম তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, শুনিবার জিনিস বটে!

ডাকটা সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দরজার কাছে—"গরিব পরবর!" বলিয়া একটা প্রত্যুত্তর হইল এবং একটি লোক ভিড় ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল—যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে, মাথায় গোলাপী রঙের বিরাট শাফা, হাতে পেতলে বাঁধানো লাঠি, পাশে ঘুন্টি দেওয়া পাঞ্জাবীর ওপর সোনাব তাগার একটা মালা।

এ তরফের হুকুমেব প্রত্যাশায সবাই বাবু বলবন্ত সিংএর মুখের দিকে চাহিয়াছে।

শ্রাদ্ধটা কিন্তু ওদিক গড়াইল না, সবাই একটু বেশি প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। বাবু গুলজার সিং সেই রকম জলদগম্ভীব স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এটা বিয়ে হতে যাচ্ছে, না শ্মশানযাত্রা?"

কথাটার তাৎপর্য তেমম বুঝিতে না পারিয়া তেওয়ারী শুধু আর একটা কুর্ণিশ করিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও এক পর্দা চড়া সুবে প্রশ্ন হইল—"বাজনদারেরা যদি ছেড়েই গেল তো আমাদেব আসবার কি দরকাব ছিল—আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি কি আমায় শ্মশানযাত্রা করাচ্ছ তোমরা?…বল, কথা কইছ না কেন?‥"

তেওয়ারী একবার পিছনে সবাইয়ের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং সে ও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বাজনদারেরা তো এসেছে হুজুব চারটে দল…তাদের আগে চড়িয়ে আমরা তবে উঠেছি…সে কি কথা হুজুর, তাদের না চড়িয়ে আমরা উঠতে পারি কখনও!"

"এসেছে যে তার প্রমাণ কি? বাজনা কোথায়?"

সবাই চুপ করিয়া রহিল, এ অবস্থার মধ্যেও যে বাজনার প্রত্যাশা করে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যায় যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। শেষে মোসাহেব-গোছের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"হুজুর, তারা সব এক হাতে

হ্যাণ্ডেল ধরে কোন রকমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাজাবার একটু কোনও উপায় থাকলে তারা ছাড়ত না, সে পাত্রই নয় তারা…"

এই সময় রামশিঙায় আর একটা আওয়াজ উঠিল এবং ওদিকে বাবু বলবন্ত সিং নিজের কয়েকজন লোকের উপরই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া গোঁফে একটু চাড়া দিলেন।

বাবু গুলজার সিং মোসাহেবের কথায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"এর পরের স্টেশনেই সবাই নেমে যাবে, ফিরে যেতে হবে! তোমরা ভেবেছ গুলজার সিং মরেছে, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা বাবা!"

এর পরে আর কিছু বলিলেন না। ভিড়ের ও-অংশে সেই রকম থমথমে ভাবটা লাগিয়া রহিল, শুধু তেওয়ারীকে লইয়া কয়েকজন মাতব্বর একত্র হইয়া কি একটা পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। গাড়ির বেগ কমিয়া আসিল, গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা স্টেশন আসিতেছে।

গাড়ি থামিলে তেওয়ারী নামিয়া গেল। ছোট স্টেশন, মিনিট দুয়েক থামিল গাড়িটা, চলিতে আরম্ভ করিলে তেওয়ারী আসিয়া আবার উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এদিকে পানে অনির্দিষ্ট ভাবে এমন একটা কটাক্ষ হানিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায়—'এইবার চলে এস।' তাহার পর রামশিঙাটি বাজিয়া উঠিতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ওদিকে চারটে দলের যত রকম যন্ত্র থাকিতে পারে—করনেট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, সানাই, রামশিঙা—সেই অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিস্ গ্রেসের চোখ দুইটা বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"এযে পুরোদস্তুর সঙ্গীত, মিস্টার মুখার্জি! (This is full-fledged music, Mr. Mukherjee!)"

অবশ্য ঠিক সঙ্গীত বলিতে যা বোঝায় তাহার কিছুই নয়—তবে কোন যন্ত্রই বোধ হয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবগুলা যেন একটা প্রলয়-তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বাবু বলবন্ত সিংএর মুখ দেখিলাম একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। বাবু গুলজার সিং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ফরসী!"

চিলমচি অপেক্ষাই করিতেছিল, তাওয়াদার চিলিম আর গড়গড়ার ব্যবস্থায় মোতায়েন হইয়া গেল।

সমস্ত পথ একটানা ঐ ব্যাপার চলিল। বাবু বলবন্ত সিং একবারও গাড়ির দিকে মুখ ফিরাইলেন না। ক্রোধে, অপমানে, আক্রোশে জলন্ত আকাশের দিকে

একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া গেল, স্টেশন আসিল, গাড়ির শব্দ রহিত থাকায় বাজনার ঝঞ্ঝা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একবার গাড়ির ওদিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়িটা মিনিট দুই-তিন থামিল, বাজনা ওদিকে আরও ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিল, তাহার পর গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী এক লাফে আবার গাড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল, তেওয়ারীর সেই বিজয়-দৃষ্টিকে সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিয়া বেশ ঘটা করিয়া মনিবকে একটা কুর্ণিশ করিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকের আগে-পিছনের কয়েকটা গাড়ির পা-দান থেকেও বিশ-পঁচিশটা বাদ্যের সেই উৎকট ঝন্‌ঝনা।...বোধ হয় সম্বন্ধে আটকায় বলিয়া বাবু বলবন্ত সিং আর 'ফরসী'র ফরমাসটা করিলেন না, তবে গোঁফে চাড়া দেওয়ায় যতটা সম্ভব বিশিষ্টতাফুটাইবার চেষ্টা করিলেন এবং নিজের সান্ত্রীর দিকে এমন একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন যাহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা মোটা বকশিস তাহার কপালে নাচিতেছে।

বাবু গুলজার সিংএর মুখটা আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া অনেকটা পথ অতিক্রম করিলেন, তাহার পর আবার মেঘমন্দ্রস্বর উঠিল —"তেওয়ারী!"

তেওয়ারী ভিড় চিরিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন গুঙা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে যোগাড় করেছ তোমারা? জবাব দাও, চুপ করে কেন।" সবাই আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, এমন কি ও-দলের লোকেরা পর্যন্ত।

অর্থটা বোধ হয় ধরিতে না পারায় তেওয়ারী একটু ব্যাকুলভাবে একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল, শেষে সেই মোসাহেব ভদ্রলোক আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর! বাজনা তো গুঙা নয় আমাদের।"

কর্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঢাকঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।"

সকলের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

মিস্ গ্রেস্ আমায় প্রশ্ন করিলেন—"আবার কি চায় ভদ্রলোক?"

বলিলাম—"বাজনায় ঢাকের অভাব ওকে পীড়া দিচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব মিস্টার মুখার্জি?"

সবাই এক হাতে—তাও আবার ডান হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানালার ফ্রেম ধরিয়া আছে, অন্য হাতে বাঁশী শিঙে ধরিয়া পরিত্রাহি ফুঁ দিয়া যাইতেছে—যো-সো করিয়া দু'একটা আঙুলেই কোন রকমে এক আধটা চাবি টিপিয়া, কিন্তু ঢাক সামলাইবে কি করিয়া ?...উত্তর আর কি দিব ? বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

এবার স্টেশনটা খুব কাছে, অল্পের মধ্যে গাড়ির গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল। থামিলে দুই সাগ্রীতে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গাড়ি হইতে তড়াং তড়াং করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমায এর পরের স্টেশনেই নামিতে হইবে ; বেশি দূরেও নয় সেটা। গোছগাছ করিতেছি এমন সময় মিস্ গ্রেস্ যেন দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন ! মিস্টাব মুখার্জি, এদিকে দেখুন !! ও মাই গড !!"

একটা গাঁটরি মুক্ত করিতেছিলাম, যতক্ষণে মুখ বাহির করিয়া দেখিব ততক্ষণে গাড়িও ছাড়িয়া দিযাছে, সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গেছে। এবার একেবারে স-ঢাক !

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া একেবাবে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার ! এদিকে আমাদের গাড়ি আর আমাদের পেছনের দুইটা গাড়ির ছাত বোঝাই হইয়া গেছে। ঢাকী সানাইয়ে কর্ণেটী রামশিঙেওয়ালা কেহ বাদ নাই। লোকের উপর বাজনার চাপে ছাত যেন ভাঙিয়া পড়িবে। গাড়ির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, বাজনা ততই হইয়া উঠিতে লাগিল উগ্রতর। গাড়ির মধ্যের উত্তাপই বোধ হয় তখন একশ পনের যোল ডিগ্রী ; বাহিরে টিনের ছাতের উপর কত তাহা অনুমান করাও শক্ত...

একবার বেশ খানিকটা বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া না-দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এদিকে তিনটা ছাত আর ওদিকে তিনটা, দু'দিকের এই ছয়টা ছাতে দুইটা দল পরস্পরের দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গলা ফুলাইয়া কপালের শির ফুলাইয়া কাসিয়া ঘামিয়া যেন সঙ্গীতের গোলা দাগাদাগি করিতেছে ; আগুনের হল্কার মত হাওয়াটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আবার নিজেকে টানিয়া লইলাম।...দেখি বাবু বলবন্ত সিং গোঁফে তা দিতেছেন, বাবু গুলজার সিং শান্ত মর্যাদায় ফরসী সেবন করিতেছেন।

পরের স্টেশনে নামিলাম ; কুলি নাই, তবে বরযাত্রীর লোকেরাই তৎপরতা করিয়া জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া দিলেন। কুলির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছি, মিস্ গ্রেস্ও ধীরে ধীরে স্যুটকেসটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন।

বলিলাম—"আপনার তো এখানে নামবার কথা নয়?"

বাজনার লড়াই বিপুল বিক্রমে চলিতেছে, মিস্ গ্রেস্ অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিলেন, উত্তরে বলিলেন—"আমার এর পরের স্টেশন মিস্টার মুখার্জি; এইখানেই অপেক্ষা করব, মিস্টার ট্রেভারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি 'কার'টা পাঠিয়ে দেবেন।…নিশ্চয় রাস্তা আছে?"

বলিলাম—"রাস্তা তো আছে, কিন্তু…"

মিস্ গ্রেস্ আবার ওই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আর জানেন মিস্টার মুখার্জি?—আমার সঙ্কল্পটাও বদলে ফেলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম?"

"মিস্টার ট্রেভারকে এদেশ ছাড়তে আমি বাধ্য করব, আর যদি না ছাড়েন তো…"

গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গীত আরও ক্ষিপ্ত, ওদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবেই কথাগুলা এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মিস্টার ট্রেভারকে কেন যে এ দেশ ছাড়িতে বাধ্য করিবেন—অধিকারজ্ঞান হঠাৎ কেন এত শিথিল হইল, সে বিষয়ে আর কিছুই টের পাওয়া গেল না।

মুনাফা

রাত প্রায় একটায় মোকামাঘাটে আসিয়া নামিলাম।

স্টেশনটা গঙ্গার ধারেই; টানা একটা বারান্দা, তাহার পরেই তীরভূমি ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে। নূতন বর্ষার গঙ্গা অনেকখানি উঠিয়া আসিয়াছে, ওয়েটিংরুম হইতে কাকজ্যোৎস্নায় গৈরিকধারার বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

ছোট ঘরটি লোকে একরকম ঠাসা, কি উপায় করিব ভাবিতেছি এমন সময় আপ্ ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল এবং গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই ঘরটি একেবারে খালি হইয়া গেল। রহিল মাত্র এক মাড়োয়ারী শেঠজি। খুব চাপাচাপির মধ্যে ছিল, ভিড় হালকা

হওয়ায় মনের স্ফূর্তিতে একটু অভ্যর্থনাই করিয়া লইল আমায়—"আসেন বঙ্গালীবাবু, ই জগহ্‌টা বেশ হাওয়াদার আছে।...উ সবাই বকতিয়ারপুরের বোরযাত্রী ছিল ; সব গঙ্গামাইকি কৃপা।"

দরজাটির মুখে বিছানা করিয়া শুইয়াছিল, আমিও পাশটিতে গিয়া আমার হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া লইলাম। ভদ্রলোক একটু আলাপপ্রবণ, বিছানাটা আর একটু সরাইয়া আনিযা কথাবার্তা জমাইয়া আনিয়াছে, এমন সময় এই আপ ট্রেনের একজন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেশ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া মনে হইল : আয়েসপুষ্ট বিরাট বপু, ফিনফিনে একটি গলার-পাশে-ঘুন্টি-দেওয়া পাঞ্জাবী, তাহার ভিতরে একছড়া সরু সোনার চেন চিক চিক করিতেছে, হাতে রিস্ট-ব্যাণ্ড-দেওয়া শৌখিন ঘড়ি, রুপায় বাঁধানো একটি শৌখিন ছড়ি ; এদিকে হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, জলপানের জন্য একটি রুপার ঝারি, শরীরের অনুপাতে একটি মোরাদাবাদী ধাতুর টিফিন কেরিয়ার, —মোট কথা, চমৎকার একটা সচ্ছলতার আবহাওয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন ভদ্রলোক। নিশ্চয় রিজার্ভ-করা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থে আরামে ঘুমাইতেছিলেন, চোখে ঘুমের জড়িমা লাগিয়া আছে।

সঙ্গে একটি চাকর। বেশ তৎপর। প্রথমেই আসিয়া ওয়েটিংরুমের আরাম-কেদারাটা গঙ্গার দিকের বারান্দায় বাহির করিয়া দিল, ভদ্রলোক গিয়া তাহাতে গা এলাইয়া দিলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকাগর্জন আরম্ভ হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া মোটঘাটগুলা অল্পসময়ের মধ্যেই গুছাইয়া হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া ফেলিল, দোরের আংটায়, জানালার গরাদে, দেয়ালে-গাঁথা আলনায় দড়ি বাঁধিয়া একটি পরিস্কার নেটের মশারি খাটাইয়া দিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া বার দুই তিন গলাখাঁকার দিয়া খবর দিল—"তৈয়ার বা।"

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিয়া শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, চাকরটা বেশ ভাল করিয়া মশারিটা চারিদিকে গুঁজিয়া দিল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়া গেল।

সব লইয়া মিনিট পাঁচেকও লাগিল না ; যেন আলাদিনের প্রদীপের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়া গেল।

এদিকে শেষ হইলে চাকরটা জিনিসপত্রগুলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া আমাদের দুইজনের দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া সেগুলার উপর একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিল।

শেঠজি উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"যাও, তুম্ বেফিকির শো রহো, কোই ডর্ নেহি।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলাম—কেন, সে তো নিজেও শুইয়া থাকিতে পারে—এত দামী জিনিসপত্র রহিয়াছে ঘবেব মধ্যে। উত্তরটা শেঠজিই দিল, আমার অজ্ঞতায় জিভটা কাটিয়া চোখ দুইটা একটু বড বড করিয়া বলিল—"আরে রাম কহিয়ে বাবুজি, চাকর আর মনিব একটি ঘরে শোবে!—হাজাব কল্-যুগ হোক।"

চাকরটাকে বলিলেন—"যাও তুম্, কোই ডর নেহি।"

সে চলিযা গেলে শেঠজি নিদ্রিতেব পানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিযা বহিল, তাহার পর আমাব দিকে মুখ ফিবাইয়া বলিল—"আবাম বোলবেন তো এইকে বলুন বঙ্গালীবাবু, জিন্দগিকে কেমোন ভোগ কবছে, ট্রেনে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে যত্তো আরামের ব্যবোস্থা। আব আমাদেব কাঁহা দু পয়সা মুনাফা, ছোট লোটা কম্বল নিয়ে—না খাবার ঠিকানা, না শোবার ঠিকানা।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"মুনাফাব পেছনে ছোটাটাই তো আদত জিন্দগী শেঠজি, ঘুমিয়ে কাটানো—সে তো তার উল্টো বরং।"

কথাটা মনের মতন হওয়ায় শেঠজিব মুখে হাসি ফুটিল, মনটা দ্রব হইল, এবং সেই তরলতার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ধর্মভাব আসিয়া পডিল, একটু করুণ সুরে বলিল—"লেকিন, কী হোবে বাবু মুনাফা হাঁসিল করে?—সঙ্গে লিয়ে যেতে পারব ওখানে?"

—আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

বলিলাম—"কি জানেন শেঠজি, এইটে হচ্ছে শুরু, এই মুনাফার হিসাব করতে করতেই ওখানে নিয়ে যাবার যুগ্যি মুনাফার হিসেব আসে; ঠিক নয় কি?"

শেঠজি একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, বলিল—"যা বোলছেন বঙ্গালীবাবু তাতে কোন ভুল না আছে, লেকিন ঐখানের কথা আমাদের সব সময় অস্মরণ থাকে না, দুনিয়ার মুনাফা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকি আমরা। তুলসীদাস কি বলছেন…"

তুলসীদাসের পরে আসিলেন কবীর, কবীরের পর সুরদাস, শেঠজি দোঁহাচৌপাইয়ের অনর্গল স্রোত বহাইয়া চলিল।

এদিকে অসম্ভব রকম মশা, অতগুলা মানুষের জায়গায় কুল্যে দুইজন, হন্যে হইয়া আক্রমণ লাগাইয়াছে, শেঠজির দিকে কান রাখিয়া তাহাদের তাড়া দিতে দিতে কখন্ ক্লান্তিবশেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, একটা শান্টিং ইঞ্জিনের হুইসিলে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। রাত্রি খুব গভীর, গাড়ি স্টিমার কিছু নাই, স্টেশনের একদিকটা একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু সেই ভদ্রলোকের তৃপ্ত নাসিকাগর্জন ; বাহিরের বারান্দা থেকে আর একটি ক্ষীণতর গর্জন দরজার পথে ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাঁহার চাকরের।

হাওযাটা নরম হইয়া গিয়া মশার উপদ্রব আরও বাড়িয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য একটা পাৎলা উড়ানি ঢাকা দিয়া শুইয়াছিলাম, আরও একটু যুৎ করিয়া টানিয়া লইব এমন সময় হঠাৎ পাশের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেলাম।

আগেই বলিযাছি আমার পাশেই শেঠজির বিছানা, দরজা-পথে হাওয়াটুকুর জন্য চাকরটা তাহার মনিবের বিছানাটি শেঠজির পাশেই করিয়া দিয়াছে, অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ব্যবধান রাখিয়া।...শেঠজি কনুইয়ে ভর দিয়া আধ-শোওয়া হইয়া ওদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে, এবং সবচেয়ে যা বড় আশ্চর্য, ভদ্রলোকের মশারির খানিকটা তুলিয়া ধরিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত ভিতরে কি নিরীক্ষণ করিতেছে।...ঘুমের ঘোরে এমন অদ্ভুত দৃশ্যে আমার তো মাথা গুলাইয়া গেল! ব্যাপারখানা কি?—ছিঁচকে চোর নাকি? সন্দেহ যখন মনে প্রবেশ করিল, ওর কথাবার্তা চালচলন সব কিছুই সেটাকে পুষ্ট করিয়া তুলিল—আমার কাছে বিছানাটা টানিয়া আনা, চাকরটাকে অত ভরসা দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া, তার পর এই ধর্ম লইয়া বিটলেমি।—প্রথমটা মনে হইল হাতটা চাপিয়া ভদ্রলোককে ডাকিয়া তুলি। তাহার পর ঠিক করিলাম, না, আর একটু দেখাই যাক, যদি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই হয় তো একেবারে বামাল-সুদ্ধ ধরা যাইবে। চাদরটা আস্তে আস্তে মাথা পর্যন্ত টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

অদ্ভুত কাণ্ড! শেঠজি মশারিটা নামাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে উঠিয়া এদিকে প্ল্যাটফর্ম আর ওদিকে গঙ্গার ধারের বারান্দাটা একবার দেখিয়া আসিল, তাহাও কেমন যেন সন্দেহজনক ভাবে, ঘরের মধ্যে থেকেই গলা বাড়াইয়া। আমার আগাগোড়া ঢাকা, তাহারই উপর হইতে বেশ ভাল করিয়া আমায় দেখিয়া, তাহার পর আবার মশারিটা তুলিয়া ধরিল, এবার একটু বেশি উঁচু করিয়া। অনেকক্ষণ রহিলাও একভাবে এবার, ঘুমন্ত লোকটির দিকে এমন ভাবে মাথা জল্প

ঝুঁকাইয়া আছে, বেশ বোঝা যায় তীব্র উৎসুক দৃষ্টির একটুও নড়চড় নাই। আমার মাথা গুলাইয়া যাইতেছে ; এদিকটা এমন নিস্তব্ধ, মনে একটা ভয়ও ঠেলিয়া উঠিতেছে—খুনটুন করিবে না তো—নাকে ক্লোরোফর্ম চাপিয়া ধরিতেও তো পারে—দলবদ্ধ নয় তো ?—হয়তো সঙ্গীরা বাহিরে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছে…

আর একবাব ঐভাবে উঠিয়া দেখিয়া শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইয়া মশারিটা তুলিয়া ধরিতেই, আমি আর এদিকে ওদিক না ভাবিয়া পিছন হইতে দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলাম, মুখটা ফিরাইতেই প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি ? তুমি তখন থেকে ভদ্রলোকের মশারি তুলে কি মতলব হাঁসিল করবার…"

শেঠজি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, আমি যে ঘাপটি মারিয়া সব লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলাম যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছে না, তাহার পরে জিভ কাটিয়া, চাপা গলায় বলিল—"আরে ছিঃ, বঙ্গালীবাবু, রাম বলো, কি বোলছেন আপনি ! আমার মোতিহারীতে তিনটা গোলা, কোলকাত্তায়, কানপুরে মস্তো কারবার—আরে ছিঃ—হাত ছাডিয়ে দিন বাবুজি…"

হাত ছাড়িলাম না, বলিলাম—"কলকাতা-কানপুর-মোতিহারীর খবর জানবার উপায় নেই—কিন্তু চোখের সামনে তখন থেকে যা দেখছি…চাকরকে সরিয়ে দিলে—তার পর ভদ্রলোকের সোনার চেনের দিকে…"

শেঠজি ঘুরিয়া মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই ডান হাতটা আমার মুখের ওপর চাপিয়া ধরিল ; মুখে নিতান্তই একটা ব্যাকুলতার ভাব, বলিল—"আরে ছিঃ বাবুজি, অমন কোথাটি বোলবেন না, গঙ্গাজীর কিনারা আছে। সরিয়ে আসেন, শুনেন, ভোদ্দোরলোক এখুনি জেগে পড়বে, প্রেমসে ঘুমোচ্ছে।

অস্বীকার করিব না, বলিবার ভাবে আমি আবার একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেছি, হাত দুইটা ছাড়িয়া দিলাম, দুইজনে আসিয়া আমার বিছানায় বসিলাম।

শেঠজি অসীম করুণার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গঙ্গামাইয়ের কিনারা আছে, একবারটি বাহিরের দিকে নজর দিয়া দেখেন আপনি…"

বলিলাম—"তাই বা কিছুই করুন না এখানে, কোন দোষ লাগবে না ?"

"আরে ছি ছি বাবুজি, ওমোন কথা বোলবেন না, গঙ্গাজির কিনারা আছে, পুণ্য্‌কা অ্‌স্থান, তাই কুছু পর্‌লোকের জন্য হাঁসিল করে নিচ্ছিলো।"

এত বিমূঢ় হইয়া গেছি যে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

শেঠজি বলিয়া চলিল, চোখে মুখে সেইরূপ অপরিসীম কারুণ্য—

"দেখেন বাবুজি মচ্ছরদের ওবোস্থা!—আপনারা বঙ্গালীরা মোশা বোলেন—এক ঘর মানুষের লেহু খাচ্ছিল গঙ্গামাইকি কৃপাসে—বডকা ভোজ—তার পর হম্‌ দুজোনটি রয়ে গেলো—আহা-হা-হা! জরাসা ভাবুন!—তার পর আপনি ভি চদ্দব ঢাকা দিয়ে দিলেন—একলা আমি রোগা হাড্ডিসার মানুষ—ভাবুন বাবুজি বেচারিদেব ওবোস্থাটা! রাজার হাল থেকে কাঙালী বোনে গেল…গঙ্গাজির কিনারা, পুণ্য্‌কা অ্‌স্থান একটু পুণ্য হাঁসিল করে নিচ্ছিলো মশাবিটি তুলে ধরে—উ জমিদাববাবুর ওতো বোডো লাস, দু'ছটাক লেহু এলেই বা কি গেলেই বা কি—থোরা ঠিক হিসাবসে ভাবিয়ে দেখেন বাবুজি, আমি মশারিটি তুলে একটু পর্‌লোকের মুনাফা হাঁসিল কোরে নিচ্ছিলো, ব্যস্‌।"

ছোটবৌমা

একটা দরকারী কাজে দোতলায় শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া কনক দেখিল পর্দার পিছনে দুয়ারটা ভেজানো। তবুও প্রবেশ করিত, কাজটা বিশেষ দরকারী, কিন্তু কানে গেল শ্বশুর-শাশুড়ির কি কথাবার্তা হইতেছে, আওয়াজ শুনিযা মনে হইল যেন গোপনীয়। একবার ভাবিল, নামিয়া যাই—তাহাই তো উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ি গুরুজন; তাহার পর দেখিল সে ধরনের কথাবার্তা কিছু নয়, শ্বশুর খুব জোর দিয়া বলিতেছেন—"ওগো না, সে হতে পারে না, তার সামনে পরীক্ষা, সামান্য একটা অন্নপ্রাশনের ব্যাপারে তাকে আসতে বলা চলে না। সে তো আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছেই।"

শাশুড়ির গলাটা আর একটু চাপা, বলিলেন—"তবে ছোটবৌমাকেও না আনালে চলত।"

"ছোটবৌমার তো পরীক্ষা নেই।"

"যা বোঝ না তা নিয়ে কথা ব'লো না, খালি বই মুখস্থ কবেছ আর পরীক্ষা দিয়েছ, কিসে কি যে হয় তা তো জান না।"

"খুব জানি, খুব জানি। তুমি যাও এখন, প্রতুলের আসা হবে না।·· পরীক্ষাব কথা বলছ, যাবা দেয তাবা ওব দাম বোঝে, অত কথা কি, বৌমাকেই জিগ্যেস ক'রো, একটা হ'ক আধখানা হ'ক পাস দিয়েছেন, পবীক্ষাব মর্যাদা·· "

"তাঁকে জিগ্যেস করতে যাব—ও বৌমা, ডেকে আনব নাকি প্রতুলকে ?· পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তো এই বুদ্ধি হয়েছে তোমাব !"

"জিগ্যেস করবার আবাব রকম-ফেব আছে, তাবও শিক্ষা চাই···শিখেছ তো শুধু যমপুকুর ব্রত আব আড়ি-পাতা·· "

কনক জিভ কামড়াইল, এমন কিছু হাতি-ঘোড়া না হ'ক, তবুও তো মিডল ইংলিশ পাস সে,—ভাল হইতেছে কি আড়ি-পাতাটা ?

পা কিন্তু উঠিল না, যেন কামড়াইয়া বসিয়া গেছে।

শাশুড়ি বলিলেন—"কি কবে জিগ্যেস কবতে হয় না-হয বাৎলেই দাও, পাস করা বুদ্ধির দৌড়টা দেখি একবার।·· মবিঃ।"

"কেন যখন পাঁচ জনে বসে আছ, খোকাব অন্নপ্রাশনের কথাটা তুললে, তাব পর প্রতুলেব পরীক্ষা, তাকে আসতে লিখতে পারা গেল না, এ কথাটাও একটু দুঃখ করে বললে, তার পব কোন দিকে চাইবাব ভান করে একবার ছোটবৌমাব মুখের ভাবটা দেখে নিলে—এই তো জিগ্যেস কবা হয়ে গেল, কথা কয়েই যে জিগ্যেস কবতে হবে তার মানেটা কি ?"

"জ্বালিও না বাপু, মুখেব ভাব বোঝবার জন্যে অত কাণ্ড করবার তোমাদেরই দরকার হয়, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি কিনা। মুখের ভাবটা যেন এমনিই দেখতে পাচ্ছে না লোকে !···বেশ, ধর তোমার বুদ্ধি খাটাবার পর যদি দেখা গেল, শুনেই মুখটি এতটুকু হয়ে গেল, তখন ?·· দেবে তো লিখে আসতে ?"

সুন্দব চালটি চালিয়াছেন শাশুড়ি, কনক মনে মনে পাসের চেয়ে যমপুকুর ব্রত-করা বুদ্ধিবই প্রশংসা করিল, কি উত্তরটা হয় এবার শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। শ্বশুর বেশ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আমার তো বিশ্বাস—মুখটি এতটুকু হয়ে যাবে বলে যা ভয় করছ তা হবে না, সে রকম অবুঝ মেয়েই নয়, নিজের পুত্রবধূ, চিনি না আর ?"

"ধর যদি হয় ?"

শ্বশুর আবার চুপ করিয়া গেলেন। শাশুড়ির বুদ্ধিতে কনকের এত আনন্দ হইতেছে! ও যেন দেখিতে পাইতেছে শ্বশুর বোকা বনিয়া শাশুড়ির মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন।...তাহার পর শ্বশুর বলিলেন—"যদি হয়?...যদি হয় মনে কর তো তারও উপায় আছে; ও-রকম ভাবে না জিগ্যেস করে বরং বল—খুব দুঃখু করেই বল—প্রতুলকে লিখলাম আসতে—আজ চিঠি এসেছে—সামনে পরীক্ষা, কোন মতেই আসতে পারবে না..."

শাশুড়ি চুপ করিয়া গেছেন, কনকও একেবারে স্তম্ভিত—মানুষটির পেটে পেটে এই রকম জিলিপির প্যাঁচ!

একটু থামিয়া শ্বশুর আবার বলিয়া চলিলেন—"বরং একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে আরও দুঃখ করতে পার—আজকালকার ছেলের শুধু 'পাস-পাস' বাই হয়েছে—প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন, তুই আসতে না পারায় আমাদের যে কী কষ্ট হল সেটা একবার ভেবে দেখলি নি?—আর তুইও তো কাকা—প্রথম ভাইপো তোর!...বৌমার সামনে এই রকম করে বিনিয়ে বিনিয়ে বললেই তিনি মনে করবেন'খন প্রতুলই আসতে চাইলে না।"

শাশুড়ি চুপ করিয়া গেছেন; কনক যেন স্পষ্ট দেখিতেছে শাশুড়ি বোকা বনিয়া শ্বশুরের মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন।

কিন্তু এর উত্তরটা তো খুব সোজা, চিঠিতে কিংবা যখনই প্রতুলের সঙ্গে দেখা হইবে ওঁদের বৌমার, তখনই যে কথাটা ফাঁস হইয়া যাবে। ছেলে-বৌএর সামনে মিথ্যাবাদী হওয়াটা কি এতই গৌরবের কথা?—এই সোজা প্রশ্নটুকু আর মাথায় আসিতেছে না শাশুড়ির?—অথচ এত বড় একটা সংসারের গিন্নি। এর ভেতরে শ্বশুরের যে কী মস্ত বড় চাল রহিয়াছে সেটাও বুঝিবার ক্ষমতা নাই?—ছেলে-বৌএর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে শাশুড়িই হইলেন, শ্বশুর অনেক পাস দেওয়া চালাক লোক, দিব্যি আড়ালেই রহিয়া গেছেন—কেহ তো তাঁহার কাছে কথাটা ভজাইতে যাইবে না? পুরুষরা যে কত চালাক, এত দিন একসঙ্গে ঘর করিয়াও সে হদিস পাইলেন না শাশুড়ি। কী গো!...সত্যিই নেহাৎ যম-পুকুর করা বুদ্ধি!

শাশুড়ি যতই হাঁদার মত চুপ করিয়া আছেন, উত্তরগুলা ততই যেন কনকের পেটে গজ-গজ করিতেছে, কনকের যেন ছটফটানি ধরাইয়া দিতেছে। কথাবার্তা নাই, সেইজন্য আড়ি-পাতিতেও ভয় হইতেছে,—যদি হঠাৎ দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসেন শাশুড়ি!

শ্বশুরই প্রশ্ন করিলেন—"কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?"

শাশুড়ি চুপ করিয়াই আছেন। কনক আবার দম বন্ধ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—যাক, রাগ করিয়াছেন শাশুড়ি, এও মন্দ নয়, বরং আরও ভাল, অবুঝ মানুষদের কাছে রাগই ঠিক অস্ত্র।

শ্বশুর আবার প্রশ্ন করিলেন—"বলি মুখ ঘুরিয়ে রইলে যে—কথাগুলো মনে ধরল না?"

কোন উত্তর নাই। তীব্র উৎকণ্ঠায় কনক দাঁতে ডান হাতের একটা নখ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়াছে, যেন তাহার শক্তিতে শাশুড়ির মনে শক্তিসঞ্চার হইবে।

শ্বশুর আর একবার তাগাদা দিলেন—"বলি, ধরল না মনে কথাগুলো?"

"বড মনে ধরবার কথা, তাই ধরবে মনে!"

—উত্তর না দিলেও ছিল ভাল আরও খানিকক্ষণ, তা যাক, ঝাঁজ আছে কথাগুলায়; কনক সেই ভাবেই কান পাতিয়া রহিল।

শ্বশুর বলিলেন—"তার মানে?"

"তার যা মানে তা বোঝবার ক্ষ্যামতা নেই তোমাদের। আমাদের লেখাতে আসতে চাইলে না শুনলে কি ফল হবে জান?—একটু তলিয়ে দেখবার মতন বুদ্ধি আছে?"

শ্বশুর একটু চুপ করিয়া যেন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর হার মানিয়া বলিলেন—"না, পারলাম না; আমাদের একটু মোটা বুদ্ধি।"

"তা সত্যিই মোটা বুদ্ধি, গুমোরটাই সম্বল,—ঐ কথা যদি শোনেন তো বৌমা নিজে তাকে লিখবেন না ভেবেছ? এই জন্যেই বলছিলাম—

শ্বশুর একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নিজে লিখবেন! জানাজানি হয়ে যাবার ভয় নেই?"

শাশুড়ি বিরক্ত ভাবে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"কি গেরো গা! এমন মনিষ্যির পাল্লায়ও পড়ে মানুষে!—ছেলে এসে কি তোমার কানে-কানে বলতে যাবে চিঠির কথা যে জানাজানি হবার…"

পা টিপিয়া টিপিয়া তাডাতাডি নামিতে নামিতে সিঁডির মোড পর্যন্ত কনক এইটুকুই শুনিল, তাহার পর দুয়ার খোলার শব্দ হইল।

২

সমস্ত দিন মুখটা এত শুকাইয়া রহিল কনকের যে লুকাইয়া-লুকাইয়া কাটাইতে হইল ; বিশেষ করিয়া, আড়ি-পাতিতে গিয়া শাশুড়ির মুখের ভাব বুঝিবার যে-রকম ক্ষমতার কথা শুনিল। তবু কয়েক বার নজরে পড়িয়া যাইতে যে না হইল এমন নয়, মাথার ব্যথা বলিয়া কাটাইয়া দিল, তাহাতে শাশুড়ি এখন যাহাই বুঝুন না কেন, উপায় কি ?

পরের দিন সত্যই মাথাটা একটু ধরিল, একটা মস্ত বড় আশা-ভঙ্গ তো ?—বাপের বাড়ি থাকিতে প্রতুল অনেক দিন যায় নাই, এই একটা উপলক্ষে শ্বশুর-বাড়ি যদি এত দিন পরে আসিল, শ্বশুর অমনি তাঁহার ছেলের পরীক্ষার জন্য দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলেন ! জগতে তাঁহার ছেলেই এক পরীক্ষা দেয়, আর তো কেহ দেয় না ! এমন জানিলে কনক বাপের বাড়িই মাথাব্যথার নাম করিয়া পড়িয়া থাকিত।

মাথাটা ছাড়িল সন্ধ্যার পর। মনটা প্রফুল্ল হইয়াছে একটু, কনক খানিকটা এ-ঘর সে-ঘর করিয়া কাটাইল। কাজের বাড়ি, একটু-আধটু আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, হাসিয়া, গল্প করিয়া কিছু কিছু কাজও করিল। তাহার পর, মনে স্ফূর্তির হঠাৎ একটা স্রোত নামিলে যেমন হয়, যে-শ্বশুরের উপর রাগ আর অভিমান তাঁহারই জন্য মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। এদিকে যাহাই হ'ক, বড় স্নেহশীল মানুষ—বিশেষ করিয়া কনককে বড় ভালবাসেন। কনকের এখানে থাকিলে ওঁর পরিচর্যাতেই কাটে বেশিক্ষণ—ঘরটি পরিষ্কার করা, জামা-কাপড় গোছানো, জল গড়াইয়া দেওয়া, তামাকটি সাজিয়া দেওয়া—এইসব।

কাল দুপুরে ওঁর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া ঐ যে ব্যাপারটুকু হইল তার পর হইতেই সব ওলট-পালট হইয়া গেছে—প্রথমটা মাথা-ধরার ভানই করিতে হইল, তাহার পর আজ সমস্ত দিন তো সত্যই গেল মাথা লইয়া।

শ্বশুরের জন্য মনটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল কনকের। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে নাই ; এই কিছুক্ষণ হইল চাকরটাকে লইয়া বাজারে গেলেন, যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন কনকের মাথাটা কি রকম আছে ; কনক একটু মিথ্যা করিয়াই বলিল—আছে ভাল।

মনে হইল ততক্ষণ না-হয় ঘরটা গুছাইয়া রাখি, কাল সকালে আসা হইয়াছে, এখন পর্যন্ত হাত দেওয়া হয় নাই। উপরে শোবার ঘরটায় গিয়া দেখিল;

গোছানোই আছে। তবু আর একবার পরিষ্কার করিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া, আলনায় জামা-কাপড়গুলো ঝাড়িয়া সমস্ত ঘরটা আরও একটু ভাল করিয়া ঝকঝকে তকতকে করিয়া দিল। বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল না, কেন না মনে সেবার যতটা স্পৃহা সে-অনুযায়ী সুযোগ তো পাওয়া গেল না। তখন অফিস-ঘরের কথা মনে পড়িল। ওটা একটু বাহিরের দিকে, তাহা ভিন্ন শ্বশুরের সঙ্গে যাহারা দেখা করিতে আসে, ওই ঘরেই বসে বলিয়া ওটা চাকরের হেপাজতেই থাকে। তবে থাকে একটু নোংরা, বিশেষ করিয়া টেবিলটা ; চাকরেরই হাত তো ? সুযোগ পাইলে কনকও মাঝে মাঝে একটু গোছগাছ করিয়া দিয়া আসে।

এখন শ্বশুর নাই, ঘরটা খালি থাকিবে, কনক নামিয়া গেল।

আজ প্রায় দুমাস পরে ঘরটায় প্রবেশ করিতেছে। দেখিলে কান্না পায়। শ্বশুর সদাশিব মানুষ, তাহা ভিন্ন চাকরে কি করিল না করিল দেখিবার ফুরসৎও থাকে না। ঘরটার কি দুর্দশা হইয়া আছে! কয়েক জায়গায় ঝুল, পাশের দু'একটা জানালায় মাকড়শারও জাল পড়িয়াছে, কোণের দিকের চেয়ার আব কৌচগুলা যেন কতদিন ঝাড়নের সংস্রবে আসে নাই। ওদিকে টেবিল এক ডাঁই হইয়া রহিয়াছে, মেঝের ম্যাটিংটার দিকে চাওয়া যায় না। কোথায় যে আরম্ভ করিবে যেন ভাবিয়াই পাইল না কনক, এ আবর্জনা তো এক কথায় যাইবার নয়। তাহার পর স্থির করিল, এখন টেবিলটা গুছাইয়া ফেলা যাক, সকালে আসিয়া ঘরটার গতি করিবে, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় না দিলে চলিবে না, তা ভিন্ন এক জনের কর্মও নয়।

বাহিরের দিকের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিল, কেহ যদি শ্বশুরের খোঁজে আসে ; তাহার পর বই কাগজের গাদাগুলো ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া এক দিকে জড়ো করিতেছে, হঠাৎ কতকগুলো আলগা কাগজের মধ্যে হইতে একটা চিঠি চোখে পড়িল। পরের চিঠি পড়িতে নাই, সচরাচর পড়েও না কনক, তবে শ্বশুরের হাতের লেখা দেখিয়া কেমন একটা কৌতূহল হইল ; মুড়িয়া রাখিয়াছিল, মিনিটখানেক হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করিয়া আবার ভাঁজটা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। লেখা আছে—

কল্যাণবরেষু—

বাবাজীবন, আগামী ২৫শে শ্রাবণ, বুধবার, দাদুর অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য করিয়াছি। ওর এই প্রথম কাজ, সাধ্যমত তোমরা সকলে উপস্থিত থাক আমার এইরূপ ইচ্ছা ; অবশ্য যেখানে উপায় নাই সেখানে আর কি হইবে। নৈহাটি

থেকে তটিনী আসিয়াছে, এই সঙ্গে বিমলকেও বৌমাকে লইয়া আসিতে লিখিলাম; আর সবাইকেও পত্র দিলাম। ছোটবৌমা পরশু আসিবেন, বেহাই-এর পত্র এইমাত্র পাইলাম। বেশি ছুটি লওয়া ক্ষতিজনক মনে কর তো অন্তত দিন দু'একের জন্য অতি অবশ্যই আসিবে। আসিবার সময় কিছু আনারস লইয়া আসিও চাটনির জন্য, এখানে পাওয়া যাইতেছে না।

অত্রস্থ সব কুশল জানিবে। আমার শুভাশিস গ্রহণ করিবে। ইতি ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৩

অমরেশ দেবশর্মণঃ

চিঠিটা পড়িয়া একটু অভিমানই হইল কনকের ;—দাদুর প্রথম কাজ, সবাই আসুক, সবাই আমোদ-আহ্লাদ করুক, শুধু এক জনের আসিয়া কাজ নাই, সে পরীক্ষা লইয়া মাথা কুটুক! বাপ হইয়া যে মানুষে কি করিয়া এতটা আক্কেল খোওয়াইতে পারে, কনকের মাথায় আসিতেছে না। অন্যকনস্কভাবে রাখিয়া দিতে যাইতেছিল চিঠিটা, তাহার পর নীচের তারিখটার পানে আর একবার নজর পড়িয়া গেল। ১৮ই শ্রাবণ; আজ হইল ২১শে, তাহা হইলে ১৮, ১৯, ২০, ২১—চার দিন আগেকার চিঠি।

কনেকের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—এ কি রকম হইল? চার দিন আগেকার চিঠি এখনও পড়িয়া আছে, তাহা হইলে বড়ঠাকুরকে চিঠি পাঠানোই হয় নাই—না কি? মনটা খুশি হইল কি দুঃখিত হইল ঠিকমত বুঝিতে পারিল না—একটা এমন আহ্লাদের কাজে একজনকে না আসিতে দিবার দিকেই যাঁদের সমস্ত মনটা ঝুঁকিয়া আছে তাঁদের এ ভুল হওয়াই ভাল। তাহার পর কিন্তু দুঃখই হইল মনে, আহা, মেজ বড়ঠাকুর আসিতে পারিবেন না! তাঁহার দোষটা বা কি? হয়তো সময়ে আসিলে এই যে একটা অন্যায় হইতেছে তাহারও প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, অন্তত একটা দিনের জন্যও প্রতুলের আসা হইত। আর আনারসও আসিল না···আনারসের চাটনি···মুখটি সজল হইয়া আসিয়াছে, একটি ঢোঁক গিলিয়া আবার ভাবিতে লাগিল কনক।

—ভুলের কথাটা শ্বশুরকে একবার বলা দরকার নয় কি?···কিন্তু তাহা হইলে চিঠি খুলিয়া পড়ার কথাটাও যে আপনি-আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ—বিশেষ করিয়া শ্বশুরের চক্ষে; কি করা যায়? চিন্তাটা যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

তাহার পর ওদিকে বাধা পাইয়া চিন্তাটা হঠাৎ অন্য এক পথ ধরিল। কনকের বুকটা সজোরে ধক ধক করিতে লাগিল, দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে চিঠিটার পানে চাহিয়া রহিল।...যদি তাহাই করা যায় কেমন হয়?

—চিঠিটা কনক ধীর মনে আরও বার-দুয়েক পড়িয়া গেল; না, কোনখানেই এমন কিছু নাই যাহাতে মনে হয় মেজ বড়ঠাকুরকেই লেখা হইতেছে এ চিঠি—এমন সাধারণ ভাবে লেখা যে শ্বশুরের যে কোন বাবাজীবনের নিকটেই পাঠানো চলে। যদি মেজর নিকট না গিয়া ছোটর নিকটেই যায় তো ক্ষতিটা কি?

কনকের বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে, ভ্রূ দু'টি হইয়া উঠিয়াছে আরও কুঞ্চিত।

—দোষটাই বা কি এমন? মেজ বড়ঠাকুরের কাছে চিঠিটা পৌঁছিল না—এই তো? তা...

চিন্তা আবার অনুকূল হইয়া উঠিল, একটা আলোক-রেখা পাওয়া গেছে: মেজ বড়ঠাকুরের কাছে চিঠি যে যায় নাই তাহার মানে কি?—এ চিঠিটা পড়িয়া আছে বলিয়া অন্য চিঠি যে যায় নাই এমন তো প্রমাণ হয় না...বেশ, না হয় যায় নাই-ই, মেজদিদি আছেন, হপ্তায় দু'খানা করিয়া চিঠি-ই লেখা চাই তাঁহার মেজ বড়ঠাকুরকে,—অন্নপ্রাশনের কথা লিখিতে ছাড়িয়াছেন না কি?...না হয় খুব খারাপের দিকটাই ধরা যাক—ধর বাবার চিঠি না পাওয়ায় মেজ বড়ঠাকুরের অভিমান হইল; আসিতে চাহিলেন না, কিন্তু সেটাও তো মেজদিদি ওঁর চিঠিতে জানিতে পারিবেন—এই আজ-কালের মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের কানে পৌঁছিবে কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি যাইবে—বেশি দেরি হয়, টেলিগ্রাম—তার চেয়েও বেশি দেরি হয়, জরুরী টেলিগ্রাম...

নাঃ ক্ষতিও নাই, দোষও নাই।

কনক টেবিল-দেরাজের মধ্য হইতে একটা খাম বাহির করিল। প্রতুলের নাম লিখিল, তাহার মুখটি চুন হইয়া গেল; কনকের হাতের লেখা যে চেনা প্রতুলের।—প্রতুল বলে, পৃথিবীতে এত চেনা আর কিছুই নাই তাহার।

আবার চিন্তা, তাহার'পর ও-খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কনক আর একটা খাম বাহির করিয়া তাহার লেখার ছাঁদ থেকে যতটা সম্ভব দূর এবং শ্বশুরের ছাঁদের যতটা সম্ভব নিকট করিয়া নাম ঠিকানা আবার লিখিল।...এই বেশ হইল, অত ভাবিলে চলেও না; তাহা ভিন্ন প্রতুলের এখন পরীক্ষার ভাবনাতেই মাথা

ঘুরিতেছে—খামে কাহার হাতের ছাঁদ তাই দেখিবার যেন কত ফুরসৎ! আসল চিঠিটা যে বাবার ঐটুকু জানিতে পারিলেই যথেষ্ট।

তাহা হইলে এ-ঘরে আর নয়। কনক যে এ-ঘরে আসিয়াছে কেহ জানিতে পর্যন্ত পারে নাই এখন পর্যন্ত, উপর হইতে নামিয়া বাহিরে বাহিরেই চলিয়া আসিয়াছে, দেখিয়াছে এক মেজ জায়ের ছোট ছেলে—সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কনক যেটুকু গোছগাছ করিয়াছিল আবার আগেকার মত বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিল, তাহার পর দোরের শিকলটা চড়াইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুকটা সেই রকম ধড়াস ধড়াস করিতেছে, পা দুইটা একটু একটু কাঁপিতেছে। এখন বাকি রহিল শুধু চিঠিটা পোস্ট করা। টিকিট জুটিল না, তা সে এমন কিছু একটা বাধা নয়, বরং শুনিয়াছে বেয়ারিং চিঠি যায়ও ভাল, হারায়ও না।

এ-বাড়িতে চিঠি ফেলিবার সুবিধা খুব, নিজেদের যে নারিকেল গাছটা ঠিক গেটের বাহিরে রাস্তার দিকে হেলিয়া উঠিয়া গেছে তাহারই গায়ে তার দিয়া চিঠির বাক্সটা টাঙানো। লোভ হয় টুপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসি; গলিতে লোক-জন নাই এখন, এদিকটা অন্ধকারও হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাওয়ার চিন্তাতেই পা দুইটা আরও কাঁপিতে লাগিল—বৌ-মানুষ, দু'পাও তো রাস্তায় নামিতে হইবে; ওরে বাবা!—সে হয় না; মরিয়া গেলেও নয়।...এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।

যেমন আসিয়াছিল, বাহিরে-বাহিরেই দোতলায় উঠিয়া অপর দিক দিয়া নামিয়া যাইবে, পা বাড়াইয়াছে, একটু ওদিকে সদর দরজার সামনে যে দেওয়াল তাহার ভিতর হইতে সইএর বাড়ির ঝি বাহির হইয়া আসিল। কনক ডাকিল —"কে গো, সৌরভী না কি?"

সৌরভী কাছে আসিল, প্রশ্ন করিল—"তুমি এখানে ছোট বৌদি?"

"এই বাবার ঘরটা এক ডাঁই হয়েছিল, একটু গোছাচ্ছিলাম...তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

"কি?"

"এই চিঠিটা সৌরভী—ফেলে দিয়ে যা।"

একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়াই ফেলিল; চিঠিটা দিতে গিয়া হাতটা একটু টানিয়া লইয়া বলিল—"কিন্তু কাকেও বলতে পারবি নি—তা যদি বলিস তো থাক্ বাপু...সইকেও বলতে পারবি নি, আমার দিব্যি রইল।"

সৌরভী হাসিতে হাসিতে হাতটা বাড়াইয়া বলিল—"দেও, দেও, অত যদি হালকা হত সৌরভী তো কোন গিন্নীর চিঠিই কোন কত্তার কাছে পৌছুত না।··· এই ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করা! তাই তো বলি ছোটবৌদি এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন!···দেও।"

চিঠিটা লইয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল—"জবাব এলে কিন্তু আমার বকশিশ চাই, তাতে ফাঁকি দিউনি যেন।"

"তুই কালই নিয়ে যাস তোর বকশিশ, ধার রাখি না"—হাসিতে হাসিতে কথাটা বলিয়া কনক একটু অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সৌরভী চিঠিটা ছাড়িয়া দিলে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল।

৩

অর্ধেক সিঁড়িও ওঠে নাই, একটা কথা মনে পড়িয়া কনকের সমস্ত শরীরটা যেন হিম হইয়া গেল,—প্রতুল আসিবাব সঙ্গে সঙ্গেই যে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহার কি ব্যবস্থা হইল? শ্বশুরশাশুড়ি যাহার সঙ্গেই আগে দেখা হ'ক আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিবেন; শ্বশুর যা মানুষ, হয়তো রাগিয়াই যাইবেন, তখন যে চিঠির কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়িবে, কাছে থাকিলে চিঠিটা বাহির করিয়াই সামনে ধরিবে যে প্রতুল। এ কি হইল? উপায় এখন?

ছাতে খোলা হাওয়ায় একটু পায়চারি করিতে করিতে প্রথম আতঙ্কের ভাবটা কাটিয়া গিয়া একটু সাহসও ফিরিয়া আসিল, মাথাটা পরিষ্কার হইয়া একটু বুদ্ধিও খুলিল,—অত ভাবিবার কি আছে? গেছে তো শ্বশুরেরই চিঠি—কি করিয়া গেছে লোকে কেমন করিয়া টের পাইবে? মিছে ভাবা, মিছে ভয় কনকের যেন একটা বাতিক দাঁড়াইয়াছে!

সব দুশ্চিন্তা কাটিয়া গিয়া প্রতুল যে আসিবে এর আনন্দটুকু কনকের সমস্ত মনটিতে বেশ চারাইয়া পড়িয়াছে। আরও একটু পায়চারি করিল, ঝিরঝিরে দক্ষিণে হাওয়াটা আরও মিষ্টি লাগিতেছে যেন। ওদিকে নীচের বাড়িতে কে প্রশ্ন করিল—"ছোটবৌমাকে দেখছি না যে?"

বৌ মানুষ, এত দূর থেকে উত্তর দেওয়া যায় না, কনক ওদিক দিয়া নামিতে যাইবে, শ্বশুর উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—"এই যে বৌমা, ছোটবৌমা এখানে। কি করছিলে মা একা একা?"

কনক বলিল—"আপনার শোবার ঘরটা একটু পরিষ্কার করছিলাম বাবা।"

"এস, মায়ে বেটায় একটু গল্প করিগে ; তোমার বাপের বাড়ির কথাও জিগ্যেস করা হয় নি। মাথাটা ছেড়েছে তোমার ?"

দু'জনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

কনক একটু অন্যমনস্ক হইয়া একটা কথা ভাবিতেছিল, প্রবেশ করিয়া টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, কণ্ঠটাকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আছেন ভাল বাবা সবাই ; হ্যাঁ, মাথাটা ছেড়েছে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, অন্নপ্রাশনে আসবাব জন্যে মেজ বডঠাকুর আর সেজ বডঠাকুরকে আসতে লিখেছেন বাবা ?"

"হ্যাঁ মা, লিখেছি, কেন বল তো ?"

"না, তাই জিগ্যেস করছি, কেউ এলেন না এখনও, কাজের বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ভাবছিলাম—ভুলে যান নি তো লিখতে বাবা..."

"না ভুলি নি, তবে একটু ভুল হয়েছিল বটে বিকাশের চিঠি নিয়ে।"

কনক প্রবল কৌতূহলটা চাপিবার চেষ্টা করিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বাবা ?"

"বিকাশকে একখানা চিঠি লিখে কোথায় যে ফেললাম—চিঠিগুলো পোস্ট করতে গিয়ে দেখি তার খানা নেই, তখন আর একখানা লিখে পোস্ট করে দিলাম—আর একটু হলে ছেড়ে গিয়েছিল আর কি—অনেকগুলো চিঠি একসঙ্গে—মাথার ঠিক থাকে না আর...বাবা তো তোমার বুড়োও হতে চলল মা..."

তাহার পর হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইল—এত প্রশ্নের অর্থটা কি ? মুখটা একটু কেমন হইয়া গেল যেন, কথাটা বলিতে বাধিল, তবুও স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন—"ইয়ে—তোমার গে—সবাইকেই আসতে বলা হয়েছে, শুধু বলা হয় নি প্রতুলকে—তোমার গিয়ে ভাবলাম..."

বউটি বড় আদরের, অনেক কথা নিঃসঙ্কোচেই বলে। কনক শ্বশুরের মুখের কথা এক রকম কাড়িয়া লইয়াই বলিল—"তা সে ভালই করেছেন বাবা। সামনে পরীক্ষা, হুট করে চলে আসা...আর অন্নপ্রাশন এমন কি ব্যাপার বলুন না—খোকা বেঁচে থাক, আসবার ঢের সময় আছে...আমার তো এই মত..."

একটি প্রসন্ন হাসিতে শ্বশুরের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জামা-জুতো ছাড়িতে ছাড়িতে অনেক কথা হইল এর পর—বেশির ভাগই পড়াশুনা, পাস করা, উন্নতি করা—তাহার জন্য সংযম, তপস্যা—এই সব লইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কনক

নীচে আসিবার সময় শ্বশুর বলিলেন—"তোমার শাশুড়িকে একবার ডেকে দেবে বৌমা।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কনকেব মনটা একটি আনন্দের আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠিতে লাগিল,—শাশুড়িকে ডাকিতে বলা কেন সে জানে,—এইবাব প্রশংসায় শ্বশুর পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবেন—"তুমি ঐ বললে তো ?—আর বৌমাব কথা শোন—'বেশ করেছেন বাবা আসতে বলেন নি, পাসের পড়া সহজ নয় তো—খোকা বেঁচে থাক, আসবার ঢেব সময় হবে'···সে কথায় কি বাঁধুনি মায়ের আমার···আমি নিজে পছন্দ কবে বৌ কবেছি, এমন নাকি !·· "

—আজ সব কথাই থাকিবে বন্ধ, চলিবে শুধু ছোটবৌমার গুনগান।

বিশ্বাস

১

নিজের দেশের মন্ত্রীকেও কি অবিশ্বাস করিতে হইবে ?

কেন হইবে না ?··মন্ত্রণা কথাটার মধ্যেই তো মিথার আভাস রহিয়াছে—গুপ্তি, কূটনীতি এ সবই তো মিথ্যা, মন্ত্রীর এক নাসারন্ধ্রে তো মিথ্যার হাওয়াই প্রবহমাণ, তা না হইলে রাজ্য চলে কি করিয়া ?

পরেশ সেটা অস্বীকার করে না, কিন্তু এর পরেও তার তর্ক আছে—বলে—সে ত বহিঃ-শক্তিব সঙ্গে সংঘর্ষে। নিজের প্রজা বলিয়া যাহাদের মানিয়া লইলাম তাহার সম্বন্ধেও বঞ্চনার মন্ত্রণা কেন ? সেখানে তো নিছক বিশ্বাসেরই সম্বন্ধ।

—আসল কথা, এই যুগে চলা-ফেরা করিলেও পরেশের মাথাটা আছে সেই যুগে যাহাতে বিশ্বাস জিনিসটা ছিল সত্য। হাত পা মাথা একসঙ্গে করিয়া জীবন-ধাবণ না করিবার যে ট্র্যাজেডি পরেশের জীবনে সেই ট্র্যাজেডিই ঘটিল। রহমানের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথাই খাটে।

ওরা দুজনে প্রতিবেশী, এই কলিকাতারই একটি পল্লীতে। এর আগে শুধু প্রতিবেশী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে গভীর অন্যায় করা হইত ওদের প্রতি ; ওদের

মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব—খাঁটি, সোনার মতই খাঁটি ; এখন পরেশও আছে, হয়তো রহমানও আছে, নাই শুধু মাঝখানের সেই খাঁটি সোনাটুকু।

কে অপহরণ করিল সেটুকু ?

একটা ছোট পার্কের ধারে বাড়ি এদের দুজনের। জায়গাটুকুর বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বসতিটা হিন্দু আর মুসলমানের মিশ্র বসতি। দাঙ্গায় দাঙ্গায় এই দুইটা সম্প্রদায় এত আলাদা হইয়া গেছে যে এদের একসঙ্গে দেখিলে একটু কেমন যেন নূতন লাগে, তাই কথাটা বলা, নয়তো ওদের উভয়ের দেশ, ওরা একসঙ্গে থাকিবে এ আর এমন বলিবার কথা ? ছোট পল্লী, প্রায় শ'দেড়েক ঘর ; আজকাল শতকরা ভাঙিয়া সংখ্যা দেওয়াই নিয়ম—সে-হিসাবে অর্ধেকের কিছু বেশি মুসলমান। যে-অংশটায় রহমানের বাড়ি সেখানে বোধ হয় আরও একটু বেশি ; মাঝে একটা পুকুর-বোজানো মাঠ। বোধ হয় লড়াইএর জন্যই জমি বিলি হয় নাই, বাড়িঘর ওঠে নাই, জায়গাটা খালি পড়িয়া আছে ; তাহার পরে আবার বাড়িঘর।

রহমানদের অংশের পল্লীর এটা পিছনে পড়ে, সামনে পার্ক।

পার্কের অপরদিকে ছিল পরেশদের ভাড়াটে বাসা। পার্কটা চারিদিককার বাড়িগুলার প্রাঙ্গণ। শীতের প্রায় সমস্ত দিনটাই আর গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে পল্লীর চারিদিকের ছেলেমেয়েরা, বৃদ্ধেরা নামিয়া এই জায়গাটুকুকে ভরাট করিয়া রাখে। এইখানেই একদিন প্রাক্-স্কুল দিনে ওধারের শিশু-পরেশের সঙ্গে এধারের শিশু-রহমানের ভাব হইয়া গেল।...তাহার পর স্কুল ; যোগাযোগ এমন—একই স্কুলে, একই ক্লাসে ওদের হইল যাত্রা আরম্ভ। এটা যে-সময়ের কথা সে-সময় স্কুলের ঘরে পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের খড়ি কাটিয়া দিবার লোক হিন্দুস্থানে জন্মায় নাই।

স্কুলের পর কলেজের দুটো ক্লাস, তাহার পর একটু আগুপিছু করিয়া জীবন। উভয়েই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, পড়ার বিলাসটা আর বেশিদিন চলিল না। চাকরিটা আর এক-জায়গায় জুটিল না, ওরা দিনের মধ্যে ছয়-সাত ঘণ্টা করিয়া আলাদা হইয়া পড়িল।

এটুকু বিচ্ছেদ বোধ হয় জীবনের পক্ষে ভাল,—সকাল সন্ধ্যা আর রাত্রে ওরা দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সময় বিবাহও হইল দুজনের। বিবাহের নূতন দিনগুলিতে মানুষ শুধু নব-বধূকেই চায় না, পুরানো বন্ধুকেও তাহার বড় বেশি-প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

আরও একটা দিক আছে। একদিন শিশু-পরেশ হঠাৎ গিয়া শিশু-রহমানের বাড়ির ছেলে হইয়া গেল। সেই দিনই বা পরের দিন শিশু-রহমানও আসিয়া শিশু-পরেশেব বাড়ির সবার হৃদয় জয় করিয়া গেল। শিশুর মত এমন দিক্-বিজয়ী বীব তো আর হয় না। এর পরে শিশুর সূত্র ধরিয়া দুই পরিবারে হইল আলাপ হৃদ্যতা, মাখামাখি। মধ্যাহ্নের নির্জনতায় পরেশের মা-পিসিরা পার্ক অতিক্রম করিয়া রহমানের বাড়ি আসিতে লাগিলেন ; রহমানের আজি, মা বোরখা পরিয়া ঐ পথে পরেশের বাসায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। পরেশের পিসির সঙ্গে রহমানের মায়ের সম্বন্ধ দাঁড়াইল ভাজের, বোরখা লইয়া ঠাট্টার স্রোত বহিল। পরেশের পিসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বোরখা না ঘোচাই শেষ পর্যন্ত তো আমায় তখন ব'লো"···রহমানের মা হাসিয়া উত্তর দিলেন— "তোমার মাথার কাপড খুলে ধিঙ্গিপনা করে বেডানো বের না করি তো আমার নাম আমিনা নয়।"···শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় একখানি কাপড়ের মধ্যে সেলাই করিয়া কি একপ্রস্থ উপহার দিলেন, দিব্যি দেওযা রহিল শ্বশুরবাড়িতে গিযা একেবারে সবার সামনে খুলিবে, তার আগে নয়।···মোড়কটা খুলিতে বাহির হইল একখানি শাড়ি, একটি ব্লাউস, কিছু প্রসাধনদ্রব্য আর একখানি বোরখা— তাহাতে একটি ছোট কাগজ পিন করা আছে, লেখা আছে—"ধিঙ্গিপনার ওষুধ।"

অনেকদিন আগেকার কথা এসব। এর মধ্যে অনেকগুলা দাঙ্গাও হইয়া গেল,—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রাচ্যের সম্রাজ্ঞী কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনার জন্য নাম আছে, কিন্তু শুধু আবর্জনায় কুলায় না তার, রক্তের দরকার হয় ; শয়তানের পূজার জন্য এই যে আবর্জনার পুষ্প এগুলাকে রক্তচন্দনে মাখাইয়া লইতে হয়।···ওদিক্‌কার দাঙ্গাগুলা কিন্তু ছিল অন্ত ধরনের, তাহাতে দেশের শত্রু ইংরেজের হাতটা ছিল স্পষ্ট, তাই ইতরেরা যোগ দিত, ভদ্রেরা দূরে থাকিত। এর ব্যতিক্রম ছিল, তবে এই ছিল সাধারণ নিয়ম। এ পাড়ায় কখনও কিছুই হয় নাই ; সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বয়স্কেরা, বৃদ্ধেরা পার্কের মধ্যে অভিবাদন বিনিময় করিয়া ব্যথার সঙ্গে আলোচনা করিত, পরেশ-রহমানের বাড়ির মেয়েরা যেন ভাবিয়া কুল পাইত না—সম্ভব হয় কি করিয়া এমন সর্বনেশে কাণ্ড।

ও-যুগটা গেল। রহমানের আজি গেলেন, তাহার পর একে একে পরেশের বাবা গেলেন, রহমানের আম্মাজানু গেলেন, পরেশের মা গেলেন, রহমানেরও বাপজান গেলেন। দুই পরিবারের ঊর্ধ্বতন পুরুষ নিঃশেষ হইয়া একেবারে

নবীনের পালা আসিল। নূতন যুগও আসিল—যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, কাটাকাটি এ তো তাহার সাধারণ দান—সর্বজনের জন্য, ভারতের জন্য বিশেষ করিয়া আনিল এক নূতন সওগাৎ, যুগ-যুগের ইতিহাসে কেহ যে জিনিস কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। এই নূতন সওগাৎ একখানি খড়্গ—দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ করিবার জন্য দেশের ছেলেই সেটা তুলিয়া লইল; মনুষ্যত্বের একটা আব্রু রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণা করিল, সে এ মায়ের সন্তানই নয়।

দেশের শত্রুর অভিসন্ধি হইল পূর্ণ, সে হাতের আড়ালে ক্রুর হাসি চাপিয়া আসরের পিছনে গিয়া একটি নিরাপদ কোণ বাছিয়া লইল।

এই সময় এদের উভয়েরই পরিবারে স্ত্রী, নিজে, দু' একটি বাহিরের প্রতি-পাল্য; ছেলেয়-মেয়েয় চারিপাঁচটি করিয়া সন্তান—সাধারণত হিন্দু বা মুসলমানের পরিবার যেমন হয়।

আর একটা খবর, পরেশের ভাড়াটিয়া বদনাম অনেক দিন ঘুচিয়াছে। রহমানের বাড়ির খান দশেক বাড়ি পরে তাহার বিধবা ফুফুর খানিকটা জমি ছিল; রহমানের পিতা সুবিধায় পরেশকে সেইটুকু কিনাইয়া দেন, তাহার পর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই নিজের তত্ত্বাবধানে তাহার একটি বাড়ি করাইয়া দিয়া যান; পরেশরা এখন সেই বাড়িতে।

২

ভাঙনের কল-কাঠি বহিঃশত্রু যতদিন নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল ততদিন ব্যাপারটা ছিল এক রকম, দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া যখন সে চতুর দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিল তখন থেকে ব্যাপার দাঁড়াইল অন্য রকম। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভেদনীতি হইল আরও সফল। আগে ছিল "মন্দির ভাঙো, মসজিদ ভাঙো"-রব, তাহার চেয়ে 'দেশ ভাঙো' রবটা আরও মিষ্ট লাগিল—এক তরফা রব, কিন্তু সংঘর্ষে আটকাইল না, অখণ্ড ভারতীয়েরাও তো রহিয়াছে ওদিকে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। এত বিরাট একটা গণ্ডগোল যে, তাহার মধ্যে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ দুর্ভিক্ষ-মুমূর্ষুর হাহাকারও চাপা পড়িয়া গেল—তাহারা হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল।

শ্রাদ্ধটা আরও গড়াইয়া চলিল। তাহার কারণও টের পাওয়া গেল পরে। লোকে ভাবিয়াছিল নাটের গুরু বা শ্রাদ্ধের পুরোহিত চার্চিলের রাজনৈতিক মৃত্যু

হইয়াছে ; হয়তো হইয়াছে (কেননা ইংরেজ রাজনৈতিকদের মধ্যে জ্যান্ত মড়া প্রভেদ করা শক্ত), কিন্তু কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লেও— রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে নাই, সে আগের মতই ভাঙনের মন্ত্র ছাড়িয়া চলিতেছে।

এ-সব কিন্তু এ কাহিনীর মুখ্য অংশ নয়, পটভূমিকা মাত্র। এর পুরোভাগে যেটা আদৎ ব্যাপার সেটা এই যে, যে-মন-কষাকষিটা এক সময় অশিক্ষিত ইতর-সাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়িত, তাও সাময়িক বিক্ষোভে, সেটা এখন ভদ্র সাধারণের মধ্যে কায়েমি হইয়া বসিয়াছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে বম্বেতে একদিন দেশচ্ছেদ-বিশ্বাসীদের দল হঠাৎ জেহাদ ঘোষণা করিয়া বসিল—বাহ্যত ইংরেজ-রাজশক্তি আর হিন্দু উভয়ের বিরুদ্ধে ; কিন্তু কার্যত যে সেটা মাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে হইবে সেটা সকলেই বুঝিতে পারিল, কেননা ইংরেজর রাজশক্তির বিরুদ্ধে ওরা তখনও অস্ত্র ধরে নাই, বচনে অনেক জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে বহুবারই।...উনিশ-শ' বিয়াল্লিশের কীর্তি ছিল কংগ্রেসেরই।

গরম গরম জিনিস বেশি মুখরোচক—জেহাদের উল্লেখে বাতাস একটু ভারাক্রান্ত হইল। বাংলার হিন্দুর প্রতি কর্তারা গোড়া থেকেই একটু বেশি বিরূপ, আস্কারার সাহস আছে, বাংলার মন্ত্রীর গলা অন্য সবাইএর চেয়ে একটু বেশি শোনা যাইতে লাগিল।

এই বড় ব্যাপারের সঙ্গে একদিন একটি ছোট ব্যাপার ঘটিয়া বসিল। সেদিন কথা ছিল রহমান পরেশকে ডাকিয়া লইয়া সিনেমায় যাইবে। দেরি হইয়া গেল দেখিয়া পরেশ নিজেই জামা-জুতা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দূর থেকেই রহমানের বাড়ির বাহিরের বারান্দাটা দেখা যায়। রহমান রাস্তার দিকে পিছন করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া আছে ; মাঝখানে একটি টেবিল, তার ওদিকে একটা বেঞ্চ, খানকতক চেয়ার, তাহাতে জন চারেক যুবক বসিয়া। পরেশ আর একটু অগ্রসর হইতেই রহমান একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—মনে হইল যেন সামনের যুবকদের মধ্যে কেহ উহাকে পরেশের কথাটা বলিয়াছে। পরেশকে দেখিয়া রহমান নিশ্চয় উহাদের কিছু বলিল, উহারা সকলেই একটু যেন ত্রস্ত ভাবেই একসঙ্গে উঠিয়া পড়িল, এবং সেলাম করিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া সামনের রাস্তা দিয়া ডান দিকে চলিয়া গেল। দু-একজন পিছন ফিরিয়া একবার পরেশকে দেখিয়াও লইল। একটু কি রকম বোধ হইল পরেশের ; কিন্তু সিনেমার সময় হইয়া আসিয়াছে, অতটা গ্রাহ্য করিল না। রাস্তা ছাড়াইয়া সামনে একটু

জমি পড়ে, সেটা পার হইতে হইতে তাহার মনটা বেশ ছাঁৎ করিয়া উঠিল—সামনের টেবিলটা হইতে রহমান কতকগুলা ছড়ানো কাগজপত্র তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইতেছে; পরেশ যতক্ষণে বারান্দায় উঠিবে ততক্ষণে সবগুলা গুটাইয়া তাড়াতাড়ি একটা রোলারের মত করিয়া করতলগত করিল।

বলিল—"তুই-ই এসে গেলি?…যাবি নাকি?"

পরেশের হাতে ঘড়ি ছিল, দেখিয়া বলিল—"এখনও আছে সময়;…এক হিসেবে; মানে, খানিকটা তো টপিক্যাল দেখাবে…"

"তাহলে চল্…দেরি করিয়ে দিলে…"

"কারা ছিল ওরা?"

—কথাটা পরেশ সাদা কৌতূহল বশেই বলিল, আর নিতান্ত রহমান বলিয়াই, না-লুকোচুরির কেমন-একটা সংস্কার আছে, দু'জনের মধ্যে তো?

"আর বলিস নি…বলব এক সময়…যত সব ঝঞ্ঝাট!…" বলিতে বলিতে রহমান ভিতরে চলিয়া গেল।

অবশ্য বলিবার সময় আর পাইল না। দিন কতক কাটিয়া গেল।

৩

হাওয়াটা আরও গরম হইয়া উঠিল। গলাবাজি বাড়িল—মন্ত্রিমণ্ডলের কণ্ঠ যে তাহার মধ্যে শুধু বিশিষ্ট তাহাই নয়, জেহাদের দিনটা তাহারা একটা ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিল। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল সব তাতেই অগ্রণী, ওদের পুরোগামীদের জমার খাতায় আছে পঞ্চাশ লক্ষ স্বজাতীয়ের প্রাণসংহার, তাদের মধ্যে স্বধর্মীরই বেশি; এরা অন্তত এমন একটা দিনে ছুটিটুকু না দিলে উত্তরাধিকারের মর্যাদা বজায় থাকে কি করিয়া?…বাহিরের শত্রু ব্রিটিশ অন্য সময় আপত্তির একটা গলাখাঁকারিও দেয়, এ ক্ষেত্রে শুধু নীরবে হাসিতে লাগিল।…বাঙালী-হিন্দু, আজ তোমার জন্যই 'কুইট ইণ্ডিয়া' দিয়ে আমার অভিনন্দন; যাচ্ছি, কিন্তু তোমায় শেষ না করে নড়ব ভেবেছ? বুদ্ধিজীবী বলেই তোমার গুমর, তা দাবার চালেই তোমায় দুরস্ত করব!

ছুটিতে হিন্দুরা আপত্তি করিল, এক-সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডল, আপত্তি টিকিল না। একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কার পাশে পাশে উঠিল উল্লাসধ্বনি।

সেই দিন অফিস হইতে ফিরিতে পরেশ ওদের একটা বড় মিছিলের সামনে

পড়িয়া গেল। ট্রামে আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি কাটাইয়া আসিল মিছিলটা, কিন্তু একটা দৃশ্যে তাহার বুকটা সেদিনের চেয়েও বেশি ছাঁৎ করিয়া উঠিল—মনে হইল যেন মিছিলের একেবারেই সামনে কয়েক জনের সঙ্গে রহমান। ট্রামটা জোরে বাহির হইয়া যাওয়ায় এবং পিছনে ভিড়টা চাপ বাঁধিয়াছিল বলিয়া, বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল না; মনটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। যতই সময় যাইতে লাগিল ততই জোর করিয়া পরেশ মনকে বুঝাইবাব চেষ্টা করিতে লাগিল—ও রহমান নয়—হইতে পারে না…বাঃ, এতবড় কলিকাতা শহরটা, প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকেব বাস, রহমানের মত একটা লোক থাকিবে না? এ যে অন্যায় কথা!

ট্রাম থেকে যখন নামিল, খুঁৎখুঁতুনি অনেকটা গেছে, তবুও কিন্তু একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বাড়ি প্রবেশ করিল। একবার ইচ্ছা হইল খোজ লয় রহমান ফিরিয়াছে কি না; কিন্তু তাহার মধ্যে যে একটু অবিশ্বাসের ছিটা রহিল তাহাতে নিজের কাছেই লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

রহমান স্বয়ংই আসিল, রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময়, পরেশ যখন আহার করিয়া বাহিরে বসিয়া আছে। চেহাবাটা একটু নূতন ধরনেব, একটা যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাব উপর দিয়া।…মিছিলেব কথাটা পরেশ অনেকটা ভুলিয়া গিযাছিল, মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিল, "হঠাৎ এত রাতে?—এই ফিরলি নাকি?"

বোধ হয় শেষের প্রশ্নটার জন্যই রহমান একটু থতমত খাইয়া গেল, বলিল—"না, এখন ফিরব কেন? ফিরেছি তো অনেকক্ষণ। এত রাতে—মানে, একটা কথা তোকে বলতে এলাম—ইয়ে…তুই এই বাড়িটা ছেড়ে একটু অন্য জায়গায় চলে যা।"

বলার মধ্যেই স্বরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

পরেশ একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"হঠাৎ?"

রহমান একটু চুপ করিয়া রহিল—যেন কি বা কতদূর বলা চলে মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার পর বলিল—"ভাল বুঝছি না তেমন।"

"কি নিয়ে?"

"এই যা হচ্ছে সব…চোখ কান বুজে থাকলে চলবে না তো… লোক ক্ষেপে যেতে কতক্ষণ?"

"মন্ত্রীদের স্পীচের কথা বলছিস? একটা বলা দরকার, বলেছে, ওদের উদ্দেশ্য তা হতে পারে না—**They can never mean it.** ওদের দায়িত্বর বোঝে ওরা, পার্টি পলিটিক্স, হাওয়াটা গরম রাখা দরকার, রাখছে।"

রহমান একটু মাথাটা নীচু করিল, তার পর হঠাৎ তুলিয়া বলিল—Don't live in a fool's paradise পরেশ—ওরা serious."

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"আমি নিশ্চিন্ত মনে আকাশ-কুসুম দেখছি না রহমান, দেখছে তারা যারা পাকিস্তানের কল্পনায় বিভোর রয়েছে, আর, সবচেয়ে বড় কথা তারা নিজেও জানে যে ওটা আকাশকুসুম। ইংরেজের নাচানোতে···"

রহমান হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আকাশকুসুম!"

পরেশ স্তম্ভিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিল—"তুইও করিস নাকি বিশ্বাস?"

"অবিশ্বাসের কি···"

—সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—"ওসব বাজে কথা রাখ; কালই বাড়ি খুঁজে উঠে যা—আমিও দেখব চেষ্টা না হয়।"

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"পাকিস্তান থেকে তাড়াবি?"

তার পর তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল—"বেশ, তোর কথাই সই, কিন্তু জিন্না সাহেবের এদিককার স্টেটমেণ্টটা দেখেছিস তো?—স্পষ্টই তো বলেছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি নেই, এখানকার মন্ত্রীদেরও তো ঐ সুর, সে রকম উগ্র নেই তো আর, কাগজগুলো পড়ছিস না?···দিন যতই এগিয়ে আসছে, নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান নিশ্চয় ফিরে আসছে; বুঝছে তো—যা বলে ফেলেছে তাতেই খানিকটা মিস্‌চিফ হয়ে পড়বে।"

রহমান যেন একটা অবলম্বন পাইল, বলিল—"বেশ, সেই মিস্‌চিফ-এর জন্যেও না হয় অন্য জায়গায় কয়েকদিন চলে যা···নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দে···"

পরেশ হাসিয়াই বলিল—"সে আর এমন কি?—খানকতক দোকানপাট লুট হবে, একটু ছোরাছুরি; কলকাতার লোকের আর তার জন্যে অন্য জায়গায় গেলে চলে না।···তা ভিন্ন মনে হয় মিনিস্ট্রি সেটাও ঘটতে দেবে না, প্রিকশান নেবে।···আর, মাথার ওপর একটা গবর্ণরও তো রয়েছে; সেও তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতে পারে না···সবাই কি স্টুয়ার্ট সাহেব হতে পারে?"

রহমান অবোর একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"তাহলে তোর বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকবি?"

"অত অবিশ্বাস নিয়ে কতদিন বাঁচব?"

তাহার পর হাসিয়া বলিল—"তা নয়, সে রকম কোন সম্ভাবনা নেই বলেই বলছি। ওদের এদিককার স্টেটমেণ্টগুলোর মানে আছে। অবশ্য অনেক কিছু

ঘটছে, তবে এত বড বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার এমন কি কারণ আছে? There seems to be a positive ring of sincerity in what they are saying now'

রহমান একটু অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। পরেশই বলিল—"মনে হচ্ছে এখনও খাস নি, যা। না হয় বলছি, খেয়ে আয়, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ঝগড়া মেটানো যাবে।"

"আজ আর আসতে পারব না, ক্লান্ত আছি একটু।" বলিয়া রহমান উঠিয়া পড়িল।

খানিকটা গেছে, পরেশ আবার ডাকিল, বলিল—"ওরে রহমান, নুরীর মা পুডিং করে পাঠিয়ে দিয়েছিল, খেলাম, বলে দিস চমৎকার হয়েছিল।"

নুরুন্নেসা রহমানের ছোট মেয়ে, সব ছোট সন্তান। হঠাৎ দাড়াইয়া পড়িল কি ভাবিল, তাহার পর আসিয়া পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"বাড়িটা ছেড়ে সরে যা তুদিন বলছি।· না, জিদ করিস নি।"

রহমান আবার যখন নিজের বাড়ির কাছে গেছে তখন পরেশের মিছিলের কথাটা মনে পড়িল, কিন্তু আর ডাকিল না।

৪

এটা তেরো তারিখের কথা। গোলমালটা খুব বাড়িয়া চলিল। এলোমেলো গোলমাল, একটা খবরের সঙ্গে অন্য খবরের সংঘর্ষ,—মন্ত্রীরা সমস্ত রাজবন্দীদের খালাস করিয়া দিতেছে, তাহার পাশেই গুজব—না, ওটা মুলতুবি রহিল, আপাতত যত অন্তরীন মুসলমান গুণ্ডা আছে তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, পবিত্র জেহাদে যোগদান দিবার জন্য। শহরের খানিকটা অংশ একটু ছমছমে হইয়া উঠিল, খানিকটা অংশ পরেশের মত বিশ্বাসে রহিল নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয়। পরেশ-রহমানদের পাড়ায় নিশ্চিন্ত থাকার একটা সংস্কারই জন্মাইয়া গেছে, তবুও পাকিস্তানী পতাকার একটু বেশিরকম প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। তু'তিনটা হিন্দু পরিবার পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারাও গেল নিষুতি রাতে, প্রতিবেশীদের অবিশ্বাস করিয়া সরিয়া যাইতেছে এটা খোলাখুলি জানাইয়া যাইতে তাহারাও যেন লজ্জিত। পাড়ার একটা সম্ভ্রম ছিল, তাহাতে এই ভাবে একটু ঘুণ ধরিল।

মন্ত্রীরা ওদিকে আশ্বাস দিতে লাগিল—মাভৈঃ, আমরা রহিয়াছি কি করিতে ?…রহমানের আর দেখা পাওয়া গেল না। পরেশ তাহার পরদিন বিকালে অভ্যাসমতই ওর বাসায় গিয়া শুনিল সে বাহির হইয়া গেছে। বাড়ির ভিতর ছেলেমেয়েদেব মধ্যে খুব হট্টগোল চলিতেছে, মনে হয়ে যেন মিছিলেরই ছোট সংস্করণ। গলায় আওযাজ শুনিয়া নুরী ছুটিয়া আসিল, কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—"খালাজান, তুমি খেলবে না ? বলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ !"

পরেশ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, হাসিয়া বলিল—"কিন্তু তোর বাবা তো আমায় তাড়িযে দেবে পাকিস্তান থেকে—তখন ?"

নুরার মা আসিয়া দুয়ারের পিছনে দাড়াইল, প্রয়োজন হইলে এইরূপ পর্দার আড়াল হইতে সাধারণত একটু চাপা গলায় কথা কয় ; আজও আড়ালটা রাখিল, কিন্তু বেশ জোর গলাতেই বলিল—"নুরী, জিগ্যেস কর বন্ধুর পাগলামি ঘোচাতে পারছেন না ? আজ আপিস যান নি, সমস্ত দিন কি করে বেড়াচ্ছেন —আজ ক'দিন ধরে—কারা সব যাওয়া-আসা করে—আমার কাছে চাপাচাপি …আমার যে অসহ্য হয়ে উঠেছে…"

কণ্ঠে আশঙ্কা, অভিমান, উদ্বেগ—সব আছে, শেষে যেন একটু ধরিয়াও আসিল।

কয়েক সেকেণ্ড পরেশের মুখে কোন উত্তর যোগাইল না—মিছিলের কথা মনে পড়িয়া গেল, আর সেদিন কয়েকজন যুবককে লইয়া সেই জমায়েৎ, সেই কাগজপত্র গুটাইয়া ফেলা…মনটাকে গুছাইয়া লইযা বলিল—"আমি পাগলামি ঘোচাব কি, ও আমায় সুদ্ধু পাগলামিতে টেনেছিল আর একটু হলে—বলে 'বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যা'।…যাক, ভয় নেই, আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তবে রোদে বৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি করে অসুখে না পড়ে যায়।"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"বৌঠানের বাঁধন কিন্তু অত আলগা হলে চলবে না।"

মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়া যাইতেছে। এদিকের গুজবের জটলাও যাইতেছে বাড়িয়া শহরের আবহাওয়ায় যেন একটা কি রহিয়াছে—যেখানে সেখানে ফিসফিসানি—প্রেতলোক থেকে যেন একটা চাপা শব্দ ভাসিয়া আসে মাঝে মাঝে—দৃষ্টিতে কোথাও হিংস্র জ্বালা, কোথাও কুটিল সংশয়—কিছু না থাক, একটা সহজ প্রসন্নতার অভাব তো আছেই। এ আবহাওয়ায় মন্ত্রীদের আশ্বাসবাণী এক এক সময় কানে লাগে বেখাপ্পা—কিন্তু অসম্ভবটাকে কল্পনা করা যায় না—হাজার

হোক এই দেশেরই তো সন্তান এরা—রাজা মন্ত্রী যখন দায়িত্ব লয়, তখন ঈশ্বর থাকেন সাক্ষী—খোদা বলুক, আল্লা বলুক, একই তো।…এই সব তর্কও আছে, তা ভিন্ন মানুষের মনের গঠনই এমন যে, যারা শীর্ষে তাদের সহসা অবিশ্বাস করতে চায় না। এদের মধ্যেই অনেকে যে পঞ্চাশ লক্ষ স্বজাতির মৃত্যুকলুষিত—এত বড তত্ত্বটাও সবাই ভুলিয়া বসিয়া আছে।

মানুষের অবিশ্বাসের সীমা আছে, কিন্তু বিশ্বাসের সীমা নাই।

৫

ষোল তারিখ আসিয়া পড়িল, "জেহাদে"র দিন।.. "জেহাদ!"—এরা একবার ভাবিল না কতবড একটা কথাকে কত উঁচু থেকে কত নীচুতে টানিয়া নামাইল। ওদের ধর্মগ্রন্থের একটা পবিত্র শব্দ—শুধু স্বার্থকলুষিত রাজনীতিতে একটু সুযোগ-সুবিধার জন্য ধুলায় দিল মিশাইয়া।…জেহাদ না বলিলে লোকে খেপিবে কেন?—ভাই ভাইএর গলায় ছুরি দিবে কি করিয়া?

মন্ত্রিপরিষদের ফতোয়ার দিনটা রহিল ছুটির দিন।…উপভোগের অবকাশ চাই না? আমি রচনা করিলাম একটা অতি-নাটক—বিরাট এক ট্র্যাজেডি; আমিই যদি না পাইলাম দেখিতে, আমায়ই হদি দপ্তরে বসিয়া দস্তখতে মাতিয়া রহিতে হইল তো তাহার চেয়ে আর বড ট্র্যাজেডি কি হইতে পারে?

সকাল থেকে দিনটা থমথমে হইয়া রহিল। আরও শান্ত, অবিশ্বাস-আতঙ্কে আরও যেন চাপা। দিন যত বাডিতে লাগিল সেই শান্তি ভাঙিয়া ততই ঘন ঘন শব্দ উঠিতে লাগিল—'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!…লডকে লেঙ্গে পাকিস্তান!'… এখানে-ওখানে—চারিদিকে।…ময়দানের দিকে সব মিছিল চলিয়াছে।

খুব কাছে একটা শব্দ শুনিয়া পরেশ জানলার কাছে আসিয়া দাঁডাইল। পার্কের ওধার হইতে একটা দল পার্কের ভিতর দিযা চলিয়া আসিতেছে, দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিল, রহমানের বাডির সামনেও একটা বড জমায়েৎ, ওপারের দলটা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল—একটা তুমুল নিনাদে সমস্ত বাডিটা কাঁপিয়া উঠিল।

এক সময় এদিককার সমস্ত শব্দ থামিয়া গেল। অর্থাৎ দল সব চলিয়া গিয়াছে। ওদের সম্মেলনটা ময়দানে, যেখানে ঈদের দিনে সবাই প্রার্থনায় জমে।… সেখানে থাকিবে বংলার মন্ত্রীরা, সেইখানে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া জেহাদ শুরু হইবে।…স্থান-মাহাত্ম্য চাই না একটু? ধর্মযুদ্ধ যে!

বেলা প্রায় তিনটে, যুদ্ধ-হুঙ্কারের লেশমাত্র নাই কোথাও, পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া চটিজোড়াটা পরিয়া পরেশ বাহির হইয়া পড়িল। মেজ মেয়েটি অসুস্থ, একটা ঔষধ আনিতে হইবে। গলি হইতে বাহির হইয়াই বড় রাস্তার উপর মিত্র অ্যাণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়। দোকানটা বন্ধ। এর পরের দোকানটা রাস্তার ও-প্রান্তে, অনেকটা দূর। আজ সমস্ত দিন বাহির হয় নাই, রাস্তার চেহারাটা কেমন যেন বোধ হইল,—লোক খুব কম, দোকানপাট প্রায় বন্ধ।...আগের ও দোকানটা বন্ধ থাকিতে পারে, তবুও একবার দেখিয়া আসাই স্থির করিল, বড় দরকারী ঔষধটা।

প্রায় কাছাকাছি গেছে এমন সময় দেখা গেল, চার পাঁচজন ছোকরা মোড় ঘুরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে।—"পালাও! বন্ধ করে দাও দোকান—আসছে!..." বলিতে বলিতে ছুটিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেল।.. তাহাদের পিছনে আরও কিছু লোক; তাহার পরেই একটা গর্জন—বহুদূরে যেন মত্ত সমুদ্রের কল্লোল—প্রতিমুহূর্তেই আওয়াজটা আরও স্পষ্ট—আরও বিকট—'পাকিস্তান!... মারো—জ্বালাও!...'

পরেশের মুখটা শুকাইয়া গেল। বিশ্বাসে প্রথম আঘাত লাগিল।

কল্লোলটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দূরে—কাছে, অলি-গলি—চারিদিকে—জলটা যেন নদী খাল খানা খন্দর সর্বত্র ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রথমেই মনে পড়িল রুগ্‌ণ কন্যা অরুণার মুখটা, পরেশ ঘুরিয়া ছুটিল। খানিকটা আসিয়া একবার শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিয়া দেখিল, একটা বিরাট জনতা বড় রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে - সঙ্গে দুধারে লুটতরাজ, খুন, অগ্নিকাণ্ড—অনেকটা দূর, তবুও দেখা যাইতেছে—একটা ছোরা সূর্যের আলোয় ঝলসিয়া উঠিয়া বিদ্যুত বেগে নামিয়া পড়িল—আরও একটা—আরও—আরও...ঘুরিয়া আবার ছুটিল, কিন্তু কয়েক পা আসিয়াই হঠাৎ পা তাহার ভারিয়া গেল—তাহাদের পল্লী দিক হইতেও এই সাগর-কল্লোল। এক দিক হইতে নয়, চারিদিক হইতে ফেলিয়াছে ঘিরিয়া... ওকি!...ধোঁয়া ওঠে যে!...কার বাড়ি থেকে!.. আরও ধোঁয়ার স্তম্ভ! আরও একটা!...পরেশের হাঁটু মুড়িয়া যাইতেছে—স্বপ্নে দৌড়ানোর মত। পিছনের দল আগাইয়াআসিতেছে; কতকটাপ্রাণভয়ে,কতকটাপৃথিবীতেযারাসবচেয়ে প্রিয়তম, যাদের জন্য সব—তাদের টানে ছুটিল পরেশ।...গলির মুখে আসিয়া পড়িল।

মাথাটা তখন যেন অনেকটা বিকৃত হইয়া গেছে—যাহা দেখিতেছে যেন ভাল বুঝিতে পারিতেছে না—একটা মস্তবড় মানুষের চাপ—কত সবুজ পতাকা—চাঁদ

আর তারা—সামনে আগাইয়া যাইতেছে—কাজ তাহাদের যেন এখানে শেষ হইয়াছে···সামনে কিন্তু আরও অনেক কাজ···

অতি-বিশ্বাসের নিশ্চয়তায় আঘাতটা আরও বেশি করিয়া লাগিয়াছে। শুধু শাসকেরা নয়, বন্ধুও যে ছিল বিশ্বাসের গণ্ডীব মধ্যে। পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল;—তাহার এর মধ্যে কি করিবার আছে? মনে পড়িতেছে না পরেশের···

সামনের কল্লোলটা আগাইয়া গেল। পিছনে রহিল আর্তনাদ, জ্বলন্ত আগুনের শিখা···ওটা না মিত্তিরদের বাড়ি?

পিছনের কল্লোলে পরেশের সম্বিত হইল, আবার ছুটিল, অর্থ বুঝিতেছে—খালি ধ্বংস—ধ্বংস—পাকিস্তান মন্ত্রীদের জেহাদ—ঠিক, রহমানও তো ছিল!

বড় রাস্তার দলটা চীৎকার করিতে কবিতে চলিয়া গেল; অগ্নিশিখার সঙ্কেত—এদিকে কাজ হয়ে গেছে—শক্তি-ক্ষয়েব প্রযোজন নাই, তোরা আগাইয়া যা···

পরেশ বাড়ির সামনে আসিল, জানালা দুয়ার সব ভাঙা। একটা জানালার খানিকটা আগুনে খাবলাইয়া লইযাছে; আগুন কিন্তু নির্বাপিত, জল দিয়াই।

বাড়িতে কিন্তু সাড়া শব্দ নাই কেন?

পরেশ আর একটা ঝোঁকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিয়া পড়িল, উঠানের মাঝখানে প্রায় একজায়গায় জড়ো করা পবেশের সংসাব বলিতে যারা সবাই—স্ত্রী সুরমার পানে চাওয়া যায় না। শুধু নিহত করিয়াই পরিতৃপ্ত হয় নাই ওরা···

একেবারে এতগুলো মৃত্যুর সামনে মানুষ কাঁদিতে পারে না—নয়ন তো সমুদ্র নয়! পরেশ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে সামনেব থামে কয়লার আঁচড়ে একটা লেখার উপর নজর পড়িল, খুব তাড়াতাড়ি লেখা—"কি আর করা যায়? আমার মানা ছিল, কিন্তু জেহাদের উত্তেজনায় এরা বাড়ি ঠিক করতে পারে নি।—রহমান।"

'কি আর করা যায়'—ত্রিশ বৎসরের সুহৃদ রহমানের নিজের হাতে লেখা!

সমস্ত বিশ্বসংসার মুছিয়া গিয়া পরশের সামনে মাত্র দুইটি মূর্তি জাগিযা রহিল—দেশের মন্ত্রী আর ত্রিশ বৎসরের সুহৃদ রহমান। একবার বিশ্বাসের মূল্যসমষ্টির পানে চাহিয়া লইয়া পরেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

৬

বিশ্বাসের মূল্য দিতে হইল রহমানকেও।

সমস্তদিন চলিল ধ্বংসলীলা, শুধু হিন্দু—শুধু হিন্দু, রাত্রের আকাশও মথিত

করিয়া শব্দ উঠিতে লাগিল। রায়টে কলিকাতা এ পর্যন্ত কাহারও কাছে মাথা নত করে নাই, আজ নিজের কাছে নিজে হার মানিল।

সতের তারিখের দুপুর হইতে খবরটা যেন বাঁকা বাঁকা শোনা যাইতে লাগিল। রহমান ভীষণ ক্লান্ত ছিল, বাহির হয় নাই, ছেলে সমীম্ আসিয়া বলিল— "বাবা, শুনেছ বালিগঞ্জ, ভবানীপুব, শ্যামবাজারের দিকের খবর?"

রহমানের কথাগুলো একদিনেই চোযাড়ের মত হইয়া গেছে। মুখটা খিঁচাইয়া বলিল—"শুনেছি, এত কাঁচা ব্যবস্থা নয়, সমস্ত রাজ্যটা চালাচ্ছে ওরা, কাউকে মাথা তুলতে হবে না। তুই আর বেরুস নি, শরীরটা ভাল নয় তোর…বুঝলি?"

'বুঝলি?' কথাটা হঠাৎ এমন একটা বিকট চীৎকাবের সঙ্গে বিকৃত কণ্ঠে বলিল যে, সমীম্ একটু অপ্রতিভ ভাবে চাহিয়া রহিল। কাল থেকেই এই রকম হইযাছে, এক একটা কথায় যেন হঠাৎ মনের গ্লানি উছলিয়া পড়িতেছে। স্ত্রী রাবেযা আসিয়া দাঁড়াইল; কাছেই আড়ালে ছিল। ও কাছে কাছেই থাকিতেছে, তবে স্বামীব দৃষ্টি বাঁচাইয়া। কোলে নুরী, বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরা।… কাল দোতলা বাড়ির উপব থেকে একটি নুরীর মতই মেয়েকে ছুঁড়িয়া ফেলিল— ফ্রক্‌টা হাওয়ায় ফন ফন করিয়া উড়িতেছে—একটা চীৎকার, পৃথিবীতে কেউ কখনও সে রকম চীৎকার শোনে নাই—তার পর সব শেষ। হ'ক তারা মুসলমান, কিন্তু রাবেয়ার সেই থেকে কেমন একটা আতঙ্ক ধরিয়া গেছে, নুরীকে বুক ছাড়া করিতেছে না।…এ দুর্বলতার দৃশ্য রহমানের সহে না—কাল থেকে সহিতেছে না, অনেকবারই শাসাইয়া দিয়াছে স্ত্রীকে।

উগ্রভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি?"

"তুমিও বাইবে যেও না।"

"তাহলে?…তুমি যাবে?…ঐ অতবড় একটা দলকে চালাতে হবে…যা চাইবে তাই করতে দিতে হবে—ঠাণ্ডা হয়ে এলে তাতিয়ে দিতে হবে— পারবে?…পারা উচিত কিন্তু।"

রাবেয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; হাত দুইটা শুধু আপনা-আপনিই নুরীর উপর যেন চাপিয়া বসিল।

খুব ক্ষীণ, কিন্তু দীর্ঘায়িত একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল—"জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্!"…বহুদূরে কোথায় যেন, কাল থেকে সেই একটানা 'পাকিস্তান' ধ্বনির এই প্রথম ব্যতিক্রম। তিন জনের কানেই গেল; একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল।

রহমানের ঠোঁটটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—"জয় হিন্দ্‌!...আমাকে দিয়েও একদিন বলিয়েছিল!...ভাঁওতা!"

তাহার পর সমস্তটা যেন ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সহজ কণ্ঠে স্ত্রীকে বলিল—"এটা বাংলা—বাংলা!—বাংলা!!...শুনছ?...একটাও কাফেরের হাত এর শাসনকে নোংরা করছে না।"

তার পর আবার বিকৃত স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আমার মেয়ে হয় তো নুরীকে বারান্দার ধারে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখোগে।...'জয় হিন্দ্‌!—ভয় দেখাচ্ছে! ওঃ!"

নীচে থেকে ডাক আসিল—"রহমান ভাই আছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলে জালাল উঠিয়া আসিল, বলিল—"দলের ওরা ডাকছে।"

রহমান নামিয়া গেল। কয়েকজন যুবক, দু'একজন পাড়ারও আছে, এদেরই কয়েকজনকে পরেশ সেদিন দেখিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি; একজন বলিল—"শুনছেন খবর ওদিককার?"

তাহার পর কয়েকজন একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া বলিল—"শুনছি ভয়ানক অরগেনাইজ্‌ড্‌ হয়ে গেছে...শিখেরাও আছে...হিন্দুস্থানীরাও...শেঠরা কি বলছে শুনেছেন?"

রহমান একটু বিরক্তভাবে হাত উচাইয়া বলিল—"এক এক করে।...কিছু নতুন কথা নয়। যারা তোমাদের নামিয়েছে এই পবিত্র জেহাদে তারা জানে; যাও, তোমাদের নিজের কাজের কতদূর দেখোগে, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরুতে হবে।"

শব্দ হইল—"জয় হিন্দ্‌!!...বন্দেমাতরম্‌!!"

আরও আগাইয়া, আরও জোরে—এবং মনে হইল কণ্ঠের সংখ্যাও দ্বিগুণ হইয়া গেছে। রহমান একটু বিরক্তভাবে অন্যমনস্ক হইয়া গেল—রাবেয়ার পায়ের শব্দ, নুরীকে লইয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিকৃত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কাফের সব!"

রাবেয়াকে লক্ষ্য করিয়াই কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যদিও যুবকদের দিকে চাহিয়া। যতটা পারিল নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"যাও সব। তোমরা কাদের প্রটেকশনে রয়েছ মনে রেখো..."

কি একটু ভাবিল, তার পর বোধ হয় হুকুমের সঙ্গে যুক্তি মিশাইয়া সবার

বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যই বলিল—"এই তো আমি রয়েছি, স্ত্রী, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি—অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছি নাকি? তোমরা জোয়ান, নির্ঝঞ্ঝাট…"

একটি ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"আমাদের ওদিকটা শেষ করে দিয়েছে…বাপজান, ভাইজান কাউকেও…"

বছর তেরচৌদ্দ বয়স ; একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আওয়াজ উঠিতেছে—"জয় হিন্দ্ !! বন্দেমাতরম্ !!"

আরও উন্মত্ত—আরও কাছে—আরও মানুষ—একটা ধোঁয়ার শিখা দেখা দিল।

রহমান যেন প্রাণপণে সংযত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, তা সত্ত্বেও বিকৃত কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল—"ওবা কি কবছে ?…গাছে তুলে দিয়ে…"

হঠাৎ খেয়াল হইল। বারান্দা থেকে নামিয়া রাস্তা ˈরিয়া ছুটিল। টেলিফোনে যাইতেছে। চারিদিকে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেছে। দূরের গর্জন আরও আসিয়া পড়িল।

নিকুঞ্জ বসুব বাড়ি টেলিফোন , দোর জানালা ভাঙা, পোড়ানো…রহমান দুই তিনটা সিঁড়ি একসঙ্গে পার হইয়া উপরে উঠিয়া গেল।…টেলিফোনটা ছেঁড়া, ভাঙা, ছত্রাকার। দেয়ালে হঠাৎ চোখ গেল, জানালা-পোড়ানো কয়লায় লেখা—"পাকিস্তান !"

বিরাট নিনাদ—বাঙালী, পশ্চিমা, শিখ। পার্কের রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল নাকি ?

নামিয়া রহমান আবার সামনে ছুটিল—প্রশ্নের গাঁদি ঠেলিয়া ; ও এ পাড়ার সর্দার হইয়াছে এই অভিযানে। একটা বাড়িতে উঠিয়া পড়িল। মাঝের ঘরের মধ্যে দিয়া উপরের রাস্তা। প্রবেশ করিতেই একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া শোফা হইতে উঠিয়া পড়িলেন—"বেরোও ! বেরোও ! আভি নেকালো !!"

সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ মুসলমান, সম্ভ্রান্ত বাড়িতে মেয়েদের কেহ নাই ; চারটি ছেলে গুণ্ডামিতে নামিয়াছে—এরই প্ররোচনায়, চারটিরই দুইদিন হইতে দেখা নাই। কানের দোষে আওয়াজগুলো শুনিতে পান নাই ; রহমানকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রহমান আরও ক্ষিপ্ত, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া কয়েক লাফে উপরে উঠিয়া গেল।

টেলিফোন।—

"নং...

উৎকট প্রতীক্ষার মুহূর্ত। অন্য কণ্ঠ উত্তর হইল।

—"কে ?"

একটা সঙ্কেত দিয়া রহমান বলিল—"আমাদের পাড়ায় পুলিস বা মিলিটারি দরকার—এখুনি।"

"চেষ্টা হচ্ছে ; সামলে থাকুন ততক্ষণ।"

অদ্ভুত উত্তর। রহমান কিছু বলিবার আগেই ওদিকে ছাড়িয়া দিল। রহমান ডাকিল—"নং..."

কোন উত্তর নাই।

'জয়হিন্দ্—বন্দেমাতারম্' গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, আর সন্দেহ নাই। যন্ত্রটায় একটা ঝাঁকানি দিয়া রহমান আবার ডাকিল—

"নং..."

নিরুত্তর।

রহমান একটা প্রবল ঝটকা দিতে টেবিল সুদ্ধ টেলিফোনটা ছিঁড়িয়া ছিটকাইয়া ছত্রাকার হইয়া পড়িল। তাহারই একটা অংশ চক্ষু দিয়া অনুসরণ করিতে গিয়া জানালার মধ্য দিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়িল।.. ধোঁয়া।

ছুটিয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। ধ্বংসলীলা—বাঙালী, বিহারী শিখ....মুসলমান...মাখামাখি..

মুহূর্তখানেকেই চৈতন্য হইল.. ছুটিয়া আবার সেই ঘরে নামিল। ঘর অন্ধকার, দোর জানালা সব বন্ধ। ঝোঁকের মাথায়ই ছুটিয়া দোর খুলিতে গিয়া সের খানেকের এক তালায় হাত পড়িল ; অন্ধকারের আলোটুকুও যেন নিভিয়া গেল। রহমান চীৎকার করিয়া উঠিল—"হাজী সায়েব !!"

বধির বৃদ্ধ গোলমালের আঁচ পাইয়া হলঘরের দুয়ারে দুয়ারে তালা দিয়া ঘরটা নিরাপদ করিয়া ভিতরে কোথায় গিয়া বসিয়া আছেন। রহমান চীৎকার করিতে করিতে ভিতরের দিকের দরজায় গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। তালা দেওয়া। নূতন বাড়ি, মজবুৎ কবাটি জানালা...কোনও উপায় নাই...

আবার উপরে ছুটিয়া গেল। উপরে বাহিরের দুয়ারটিতে তালা আঁটিয়া বৃদ্ধ ওদিকে চলিয়া যাইতেছেন—দীর্ঘ বারান্দার শেষ দিকে। কালা, তায় দূরে, তায় পিছন ফিরিয়া ; রহমানের মনে হইল এইবার যেন গলা চিরিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসিবে।

নীচে ঘর, উপরে ঘর, মাঝখানে সিঁড়ি।—এইটুকুর মধ্যে অসহায়ভাবে আবদ্ধ রহমান কয়েকবার ছুটাছুটি করিয়া আবার উপরের জানালার সামনে দাঁড়াইল।…কাল—আজ সকালে পর্যন্ত—ওরাও এই ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছিল না কি? কী চমৎকার! কোথায় পাকিস্তান?—ঐ দোজকের মধ্যে দিয়া তো দেখা যায় না…

আর একটা ধোঁযার স্তম্ভ।…ওদের বাড়ি—রহমানের নিজের বাড়ি! রাবেয়া আছে—বুকে জাপটানো নুরী…সমীম্, জালাল, মেহের, কাদের…

"দাগাবাজ!!"

—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘুরিতেই চোখে পড়িল রাঙা সিল্ক দিয়া মোড়া একটি গ্রন্থের মত—একটা টেবিলে রাখা। সামনে একটা চেয়ার।…মনে পড়িল—হাজী সাহেবের কোরান।

"ইয়া আল্লা, বাঁচাও ওদের!"—বলিয়া অসহায়ভাবে রহমান মোড়কটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল,—রাবেয়া যেমন নুরীকে জড়াইয়া ধরে। সেইভাবেই সামনে দাঁড়াইল।

কে জানে কে বাঁচিল না বাঁচিল। ধ্বংসলীলা চলিয়াছে। কাল, আজ সকালে ওরাও কি এই ব্যাপারই করিয়াছিল?…কেন?

এ বাড়ির দুয়ারেও কি ধাক্কা পড়িতেছে?…

কেহ বাঁচিবে না। না হিন্দু, না মুসলমান, একখণ্ড দেশ থাকিবে পড়িয়া—শ্মশান-শকুনেরা উল্লাসে ডানা ঝাপটাইতেছে।

"ইয়া আল্লা!" বলিয়া রহমান আবার মোড়কটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

… … …

হঠাৎ নজরটা দূরে গিয়া পড়িল। পার্কের এক কোণে কে ও?—স্থির, কঠিন, অথচ যেন অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া আছে…

রহমান চিনিল—ত্রিশ বৎসরের চেনা, ক্রোশেক দূরেও চেনা যায়, এ তো মাত্র কয়েক গজ দূরে ঐ পার্ক।

পরেশ!…আর বুকে কি ওর?…রাবেয়ার মত করিয়া দুই ভীত, ব্যাকুল বাহু দিয়া জড়ানো?…নুরী না?…হ্যাঁ নুরীই তো—তাকে জীবনের পারাপার থেকেও যে যায় চেনা…

প্রায়শ্চিত্ত

তিনজনেই নোয়াখালি-ফেরৎ, কটু অভিজ্ঞতায় তিনজনের মন পূর্ণ, শুধু তফাৎ এই যে, একই ভাবে প্রভাবিত নয়।

সুখময় বলিল—"আগে কথাটা মানতাম না, এখন দেখছি সত্যিই একথা বলা যায় না যে অমুক ব্যাপারের একেবারে চূড়ান্তটা দেখা হয়ে গেল।—এক সময় মনে হয়েছিল পাশবিকতার শেষমন্ত্রটি বুঝি হিরোশিমায় উচ্চারিত হয়ে গেল, তার পর দেখা গেল পনেরই অগস্টের কলকাতা আছে, আবার তার পরেও অক্টোবরের নোয়াখালি বাকি ছিল, অতঃ কিম্?"……

সোমেন বলিল—"নভেম্বারের বিহার।"

সুখময় টিপ্পনীটুকুতে একটু আড়চোখে চাহিয়া হাসিল, বলিল—"তুমি ভুল বলছ সোমেন, জাপান পরে যদি এটম বম ফেলে নিউইয়র্ক ধ্বংস করত, এ তো বলা যেত না যে শয়তানিব ফার্স্ট প্রাইজটা তারই প্রাপ্য, বিহার প্রতিশোধের জন্যে কলকাতা-নোয়াখালির নকল করতে গেছল, শয়তানির রাজটিকা তার প্রাপ্য হয় কি করে? দুটো সম্প্রদায়—বেশ, না হয় স্বীকার করলাম এক জাত নয়—ওরা যখন বলছে আমরা আরব দেশের বেদুইন তো স্বীকাব করে নেওয়াই ভাল—বেশ তোমরা তাই; কিন্তু প্রতিবেশী তো? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন বিরোধও তো নেই, শুধু পাঁচের পাশে পঁচানব্বই বলে সেই পাঁচকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"কি করবে—সেই পাঁচ যদি ওদের গায়ে বেঁধে?"

"এতদিন বেঁধে নি তো।"

"যখন পাশে রয়েছে, যে কোন দিন বিঁধতে পারে, সেই সম্ভাবনাটা বন্ধ করে দিচ্ছে, দোষটা কোথায়?"

"তাহলে আমাদেরও পঁচাত্তরের গায়ে পঁচিশটা বিঁধবে বলে সেই ব্যবস্থা করতে পারি। সমস্ত দেশটা ধরে বলছি।"

মৃত্যুঞ্জয় মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"পারতে বাধা কি?—তবে তোমরা জান, ভগবান তোমাদের গণ্ডারের চামড়া দিয়েছেন, হাজার খোঁচা খেলেও বিঁধবে না; নিশ্চিন্দি আছ, থাকবেও।"

তিনজনেই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর সুখময়ই বলিল—"তুমি ওদের সব কাজই সমর্থন করবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছ মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু সত্যিই কি তুমি অস্বীকার করতে পার যে চার্চিলের প্ররোচনায় কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর হাতে পড়ে মুসলমান জাতটা নিজেদের-আত্মাকে হারিয়ে ফেলছে—অর্থাৎ মানুষ হিসেবে সে তার আত্মিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলছে?"

মৃত্যুঞ্জয় সেই রকম কঠিন মুখেই বলিল—"তোমরা যে অর্থে 'আত্মা আত্মা' করে লাফালাফি কর কথায় কথায় সে অর্থে হয়তো করেছে নষ্ট, কিন্তু দেহটা বজায় রাখছে, তোমাদের যে দেহ আত্মা দুই-ই যেতে গেল, তার কি ব্যবস্থা করছ তাই বল।"

আর একটু নীরবতা, সুখময় বলিল—"সোমেন কিছু বলছ না যে? তুমিও তো কম দিন কাটালে না নোয়াখালিতে।"

সোমেন তর্কের মধ্যে বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল, উত্তর করিল, "আমায় বেশি রকম আশাবাদী বলে বদনাম দিয়ে রেখেছ, যেখানে এত মৃত্যুর ছড়াছড়ি সেখানে আমার কোন কথা কি আমল পাবে?"

সুখময় বলিল—"আমল তো দেখছ আমরা কেউ কারুর কথাকে দিচ্ছি না, যদি নাই দিই তোমার কথাকেও, ক্ষতি কি?—এমন কথা তো বলতে পারি না যে, বিধাতা-পুরুষ আমাদের ভোট না নিয়ে এক পা এগুবেন না।· বল তোমার বক্তব্যটা, যেমন বাড়াবাড়ি করে তুলেছেন তিনি, দুটো ফাঁকা আশার কথা শুনলেও তাঁর চক্রান্তটা একটু এড়িয়ে থাকা যাবে।"

সোমেন একটু হাসিল, 'চক্রান্ত' কথাটার জন্য, কি 'আশার কথা'র সঙ্গে 'ফাঁকা' এই বিশেষণটা জুড়িয়া দেওয়ার জন্য, কিছু বোঝা গেল না, তাহার পর বলিল—"আমি অভিমত না দিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তা থেকে যা বোঝ তোমরা।"

অল্প একটু ভাবিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"আমাদের ক্যাম্প খোলার চারদিন পরের কথা। সেদিন খুব বেশি রকম অবসন্ন হয়ে সন্ধ্যের একটু আগেই ফিরেছি। খুব যে ঘুরেছি তা নয়, তবে যা দেখছি চারদিন ধরে, যে-সব কাহিনী শুনছি তা এতই মর্মন্তুদ, সভ্য মানুষের সমাজে এতই অসম্ভব গোছের যে মনটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। দামোদর-বন্যায় এর আগে আমি কাজ করেছিলাম, তার পর সেবারে মেদিনীপুরেও, মানুষের দুর্গতির চরম দেখেছি, কিন্তু একদিনের জন্যে উৎসাহ হারাই নি, মনে পড়ে কোনদিন রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরি নি, টানা মাসখানেকের ওপরের ইতিহাস বলছি; নোয়াখালিতে চারদিনের মধ্যেই বুঝলাম বেশ ভেঙে পড়ছি। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। শত্রুর সঙ্গে লড়া যায়, তাতে অবসাদের বদলে উৎসাহই আসে, তা সে-শত্রু মানুষই হ'ক বা দৈবই হ'ক; বর্ধমান-মেদিনীপুরে দৈব এসেছিল শত্রুর বেশে, মানুষের পক্ষ থেকে তার চ্যালেঞ্জটা, হাতে

করে তুলে নিয়েছিলাম, বুকে বল পেয়েছিলাম, নোয়াখালিতে শত্রুর সাক্ষাৎ পেলাম না…”

সুখময় বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—“চোখে ঠুলি বেঁধে কাজ করছিলে।”

সোমেন বলিল—“মুসলমানদের কথা বলছ, কিন্তু তারা কি সত্যিই শত্রু? ভূতে পাওয়ার গল্প নিশ্চয় শুনে থাকবে; সে-অবস্থায় বাড়ির নিতান্ত আত্মীয়ের আচরণও এমন হয়ে পড়ে যা বাইরের লোকের কাছেও আশা করা যায় না। মুসলমানকে ইংরেজ-ভূতে পেয়েছে, যা কিছু হচ্ছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ইংরেজ করাচ্ছে ওদের দিয়ে। এই জন্যে নোয়াখালির কাণ্ড দেখলে আক্রোশের চেয়ে অবসাদই আসে বেশি, নিজের লোক পরের হাতের অস্ত্র হয়ে করছে বলে ট্রাজেডিটা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়, যে আসল শত্রু তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না বলে বড় যেন নিরুপায় বলে মনে হয়। এর সঙ্গে আর একটা কারণ ছিল, নোয়াখালির পশুলীলা সব জায়গায় একরকম ভাবে হয় নি, কোনখানে প্রধানত ধর্মের ওপর দিয়ে গেছে, কোনখানে ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে, কোনখানে হত্যার ওপর দিয়ে; আমাদের যে অঞ্চলটায় ক্যাম্প খোলা হয়েছিল সেখানে পশুত্বের আর কোনও দিকটা বাকি ছিল না—আগে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে নিয়ে গেছে—লীগের চাঁদা—এই ধারণা দিয়ে যে তাদের কিছু বলা হবে না, তার পর উৎকটতর পশুত্বের প্রেরণায় লুটতরাজ করে গেছে, ঘর জ্বালিয়ে গেছে, তার পরেও এসে করেছে ধর্মান্তর, হত্যা, মেয়েদের অপমান। একটা বাড়িতে দুটি মাত্র মানুষ দেখলাম—একজন বৃদ্ধ আর তার বছর ছয়-সাতেকের একটি নাতি। এর ওপর দিয়ে সব ঢেউগুলি এক এক করে ভেঙে গেছে। বেশ সম্পন্ন গেরস্ত, খানচারেক পাকা ঘর, গোটাকতক চালা, দুটো টিনের, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে। মেয়ে পুরুষে একুশ জন লোক ছিল—ঐ দুটিতে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েদের মধ্যে তাদেরই শেষ করে নি যাদের নিজেদের অন্তঃপুরে ভরে রাখা যায়। সব চেয়ে চরম হচ্ছে ঐ বৃদ্ধ আর তার নাতি ঐ শিশুটিকে ছেড়ে দেওয়া। জান পশুত্বের মধ্যেও আর্ট আছে, এ তাই। বৃদ্ধ গেল পাগল হয়ে। বদ্ধ পাগল নয়, আর সবই প্রায় স্বাভাবিক, শুধু মাঝে মাঝে ঐ নাতিটিকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর হাত-পা নেড়ে, মুখ লাল করে স্টেজ-অ্যাক্‌টিং করে—সে ওর নাতিকে দিয়ে এর প্রতিশোধ একদিন নেওয়াবে। ঐ সময়টা তার কিছু ঠিক থাকে না—আস্ফালনের সঙ্গে অ্যাকশন পৈতে-ছেঁড়া আর তাতে গেরো দেওয়া—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ময়লা পৈতেটা রুদ্রাক্ষের মালার মতন হয়ে উঠেছে। ছেলেটাও

কচি হাত তুলে হুঙ্কার করে—কেউ কিছু বলে না, অনেক জায়গায় বরং ডেকে শোনে। জীইয়ে রেখেছে, উপভোগ করবার জন্যে ; যেন প্লের পর একটু ফার্সের দরকার হয় তো ?”

সুখময় বলিল—“তবু তুমি শত্রু দেখতে পাও নি !”

সোমেন একটু হাসিয়া বলিল—“না, তবুও আসল শত্রুকে ছেড়ে দৃষ্টিটা আমার নকল শত্রুর ওপর এসে পড়ে নি।...যাক্, আসল বক্তব্য থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি, যা বলতে যাচ্ছিলাম শোন। ক্যাম্পে এসে একটু অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছি। এমন সময় অতুল বলে ক্যাম্পেরই একটি ছোকরা এসে খবর দিলে একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে ; বললাম, নিয়ে এস। একটু পরেই ছেলেটি এসে সামনে দাঁড়াল। বয়স সতের-আঠার বছর হবে, বেশ সবল চেহারা, রংটা ফরসা, গায়ে একটা ফতুয়া, তার নীচে এক গোছা মোটা ধপধপে পৈতে ঝুলছে। চুলটা সমানভাবে ছোট ছোট করে ছাঁটা, মাঝখানে একটি টিকি আছে। মুখটায় পাড়াগেঁয়ে ছেলের সরলতা মাখানো, তার সঙ্গে কিন্তু এমন কিছু একটা আছে যাতে মনে হয় বাড়িতে ওর কৃষ্টি আছে, পাঁচটা ভালমন্দ কথা আলোচনা হয়, চোখে মুখে চিন্তার ছাপ আছে।

এসে নমস্কার করে দাঁড়াল, কি দরকার জিগ্যেস করতে বললে, ক্যাম্পে থেকে কিছু রিলিফের কাজ করতে চায়। তার পর আরও প্রশ্ন করে জানা গেল বাড়ি ওর ঢাকা জেলার পশ্চিম প্রান্তে, জাতিতে বৈদ্য, নাম বললে কিরণচন্দ্র সেনশর্মা। রিলিফ ক্যাম্পে কাজ করা অভ্যেস আছে কি না জিগ্যেস করায় বললে—না, এই প্রথম ওর এ কাজে নামা, কি কি কাজ করতে হয় খোঁজ নিয়েছে, পালা করে যে বাঁধতেও হয় ঐটুকু সে পারবে না, আগুনের তাত একেবারে সহ্য হয় না, কারণও কবিরাজের। বললাম—‘বেশ, কর কাজ।’

তার পরদিন থেকেই ছেলেটি কাজে একেবারে মেতে উঠল। তার কাজ দেখে মনে হল তার সামনে এতদিন একটা বাধা ছিল, হঠাৎ সেটা সরে যেতে তার উৎসাহটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, কি বাধাটা আমি তখন টের পাই নি, তবে ওদিকে কাজে মেতে ওঠার সঙ্গে সে যেমন আমার দিকে কৃতজ্ঞতায় আকৃষ্ট হয়ে উঠল, তাতে মনে হল বাধাটা যাই হ'ক আমা হতেই সেটা অপসারিত হয়েছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম, আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে যখন অত্যাচারের নিদর্শন-গুলো দেখতাম, কাহিনীগুলো শুনতাম, ও যেন আমাদের চেয়ে অন্যরকম ভাবে অভিভূত হত। তোমরা আমায় নরমপন্থী বলে দোষ, প্রত্যক্ষ সব দেখে আর

যারা সর্বস্বান্ত হল তাদের নিজেদের মুখে সব কাহিনী শুনে আমারও চোখে আগুন জ্বলে উঠত, কিন্তু ওর মুখে চোখে থাকত অন্য ভাব,—একটা ব্যাকুল অসহ্য ভাব, আমরা যে সর্বনাশটা প্রত্যক্ষ কচ্ছি বা যে সর্বনাশের কাহিনী শুনছি ও তার চেয়ে ঢের বেশি একটা সর্বনাশ উপলব্ধি করে যেন একেবারে ভেঙে পড়ছে।

চোখে ওর আগুনও জ্বলত, ওর উপলব্ধ সর্বনাশটা আরও উৎকট বলে চোখের আগুনটাও মনে হত আরও জ্বালাময়। একদিনকার কথা মনে পড়ে। ভোর হতেই খবর পেলাম মাইল তিনেক দূরে একটা জায়গায় রাত্রে লুটতরাজ হয়ে গেছে। সবাইকে জাগিয়ে দেওয়া হল, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে; ছেলেটি খবরটা শুনে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তার পর জিগ্যেস করলে —'আবার নতুন করে? কেন—হয়ে তো গেছে।' বললাম—'মানুষ জানোয়ার হয়ে উঠলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা তো যায় না, নাও, ওঠ সব তোমরা, বেরিয়ে পড়তে হবে।'...আমার দিকে খানিকক্ষণ সেই রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল—যেন ভেবে অন্যায়টার থৈ পাচ্ছে না। পথেও আমায় কয়েকবার থেকে থেকে ঐরকম প্রশ্ন করলে—'দেখুন বরাবর এইরকম করতে থাকবে নাকি? ...এখনও না থামলে ওদের উপায় কি হবে ভাবছে না? ভগবান তো আছেন।' ...আমায় এমনভাবে সাক্ষী মানবার কারণটা আমি বুঝতে পারলাম না, কোন একটা কারণে এমন অসহায় বোধ করছে যে মানুষের মুখে ভালমন্দ একটা অভিমত পেলেও যেন অনেকটা স্বস্তি পায়।

ঘর সাত-আট হিন্দুর বাড়ি নিয়ে একটা ছোট্ট গ্রাম—একটা উঁচু জমির ওপব, যেমন ওদিককার গ্রামগুলো হয়—তার পর বিঘে দশেক একটা নীচু মাঠ, তাব পরেই বড একটা গ্রাম, মুসলমানদের বসতি।

পুড়িয়েছে গ্রামটাকে। টাটকা ধ্বংস, তাজা রক্তের মত আগুনের চাপ এখানে ওখানে জমাট বেঁধে রয়েছে—এক এক জায়গায় হঠাৎ একটা শিখা উঠে আবার তখুনি নিভে যাচ্ছে;—গাছগুলো পোড়া ঝলসানো, একটা মাঝারি সাইজের তালগাছের মাথাটা তখনও জ্বলছে, ধ্বংসের জয়পতাকার মতন। একটা পাখির আওয়াজ নেই, একটা মানুষের সাড়া নেই, শুধু একটা পাঁশুটে রঙের কুকুর আগুন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যেখানে-সেখানে নাক ঠেকিয়ে খুব ব্যস্তভাবে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এর আগে যেখানে-যেখানে গেছি সঙ্গে সঙ্গে কাজ পেয়ে গেছি—হয় সবাইকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, সাহস দিয়ে আবার ঘরবাড়ি ঠিক করে নিতে বলা, নিজেদের কর্মী দিয়ে কাজ সুরু করিয়ে দেওয়া, সাহায্যের জিনিস বিলি করা; না

হয়, যেখানে আতঙ্ক বড বেশি, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, গুছিয়ে-সুছিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করা। এখানে লোক নেই, সুতরাং কাজ নেই, তার ওপর ব্যাপাবটাও একেবারে সদ্য, ধ্বংসের আসল রূপটা ভাল করে দেখবার যেন সুযোগ আর অবসর দুই পেলাম। কর্মী ছেলেরা গ্রামের ভেতর ঢুকে পডেছে, আমি একটা আধপোডা আমগাছের তলায় যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁডিয়ে আছি, এমন সময় পাশের গ্রাম থেকে জন-পাঁচেক লোক এসে আমার কাছে দাঁডাল; সব মুসলমান,—দু'জন বৃদ্ধ, চেহারা দেখে মনে হয় সহোদর ভাই, দু'জন মাঝবয়সী লোক আব একটি ছোট ছেলে, বছর ছয় সাতেকের। কথাবার্তা হল, চাবজনেই খুব আপসোস করতে লাগল। ওদের গ্রাম পাশের এই ছোট্ট হিন্দু গ্রামটিকে বাঁচিযে রেখেছিল এতদিন, তার পব টের পেলে ওদের গ্রামেরও অনেকে উলটে যাচ্ছে, কাল ওদেবই একজন গ্রামের কয়েকজন হিন্দু মাতব্বরকে নিয়ে থানা, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ আরও কযেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, চারিদিকেই শয়তানের এখতিয়ার—কেউ মৌখিক একটু সহানুভূতি দেখালে, লোক দেবার চেষ্টা করবে বললে, কেউ তাও নয়—ভেতরে ভেতরে কি সব ব্যবস্থা হচ্ছিল, তার পর রাত্রে হঠাৎ এই কাণ্ড।

কথাবার্তা কইছি, দেখি সেই ছেলেটি গ্রামের ভেতর থেকে একটু মাথা গুঁজে হনহন করে বেরিয়ে আসছে, খুব অন্যমনস্ক, বেশ খানিকটা এগিয়ে না আসা পযন্ত মাথা তুললে না, তার পরই আমার পাশের ওদেব ওপর নজর পডতে চেহারা গেল বদলে, চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল, আমাদের পেছনেই একটু দূরে তালগাছটা দাঁডিয়ে ছিল, তার ছায়াটা চোখে পডতে সত্যিই মনে হল জ্বলছে যেন চোখ দুটো, তার পর ব্যাপারটা কি বোঝবার আগেই কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই সে এসে একেবারে বৃদ্ধদের মধ্যে যে বড তার হাতটা খপ করে ধরে ফেললে, সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে, চোখের আগুন যেন ঠিকরে পড়ছে; হাতটায় একটা টান দিয়ে বললে—'চলুন চলুন দেখবেন কি করেছেন আপনারা! এখনও সবটা পোড়ে নি—মা আর তার কচি ছেলে—চলুন!'

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার—মাঝবয়সী লোক দুটোর চোখের ভাব একেবারে গেছে বদলে, আমি একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ছেলেটার হাতে একটা কড়া ঝটকা দিয়ে, তাকে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে বললাম—'একি করছ কিরণ!—পাগল হলে নাকি?'

সবার সম্বিৎ ফিরতে একটু সময় নিলে; বৃদ্ধের মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, সেই আগে ঠাণ্ডা হল, বাকি ক'জনকে হাতের আড়াল করে রেখে শান্ত কণ্ঠে

বললে—'থাক্ থাক্, কি আর হয়েছে—ছেলেমানুষ, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। আমরা তো করি নি, করেছে যাদের ঘাডে শয়তান সওয়ার হয়েছিল। কার ছেলে তুমি ? আগে দেখেছি বলে মনে পডছে না তো।'

ক্যাম্পে এসে ওকে ভাল করে বোঝালাম। একটু বিরক্তি ধরেছিল, মনেব কথা খুলেও বললাম কিছু আডালে ডেকে—কাগজে লেখালেখি ভিন্ন যে-দেশে এতবড একটা অত্যাচারেও কাজের সাডা জাগল না—একজন বড লীডাব এসে বিপদের মধ্যে হাত তুলে দাঁডাল না গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে—দেশের একটা অংশ মার খেলে, একটা অংশ হাঁ-করে দাঁডিয়ে তামাসা দেখলে, ঐ ক'টা কর্মী যোগাড করতে যেখানে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়েছে—সেখানে মুসলমান বলেই একটা নিরীহ বুডোকে নিয়ে টানাটানি করলে কি হবে ? হাজারে একজন হ'ক, কি লাখে একজন হ'ক, ভাল লোক তো থাকেই এক-আধজন সব জায়গায়, রাগে ও রকম অন্ধ হয়ে পডলে কার গায়ে হাত দিতে কার গায়ে গিয়ে হাত পডবে ঠিক আছে ?

সব বলে এটাও জানিয়ে দিলাম যে, ও রকম উগ্র মেজাজ নিয়ে কাজ করা চলবে না এই রকম অবস্থার মধ্যে—ক্যাম্পের বদনাম হবে—শুধু শত্রু বাডবে, যা করতে এসেছি ফল তার ঠিক উল্‌টো হবে। শেষে এও বললাম—যদি এ ভাবটা না শোধরাতে পারে তো ওর ক্যাম্প ছেডে যাওয়াই ভাল।

ছোকরা কাতর হয়ে আমার হাঁটুটা চেপে ধরলে, বললে কথা দিচ্ছে, এবার থেকে সামলে থাকবে, তাডিয়ে যেন না দিই ওকে।

—সে কাতর-ভাব দেখলে মনে হয় কত বড বিপুল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ওকে যেন বনবাসে পাঠাতে যাচ্ছিলাম !

সেই থেকে ওর চোখের সেই আগুন আর দেখি নি। কিংবা শুধু একবার শেষ-বারের মতন দেখেছিলাম, সেকথা পরে বলব। কিন্তু এর পরে একটা নতুন জিনিস ওর মধ্যে ফুটে বেরুল। গোডায় বলেছি পাডাগেঁয়ে হলেও ওর চেহারায় একটা ক্লষ্টির, বেশ একটু চিন্তাশীলতার ছাপ ছিল, ঐ ব্যাপারটার পর ওর কথাবার্তায় সেই জিনিসটার পরিচয় পেতে লাগলাম বেশি করে। এই ঘটনার পরে ওর কাজের দিকটা একটু কমে এল, বোধ হয় পাছে মেজাজ এইরকম হারিয়ে ফেলে এই ভয়ে বাইরে কাজ করতে যাওয়াটা মাঝে মাঝে এডিয়ে যেতে লাগল। আমাদের ক্যাম্পেই ঘর-ছাডাদের সংখ্যা দিন দিন বেডে যাচ্ছিল—যেমন বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল তেমনি জুটছিলও এসে বেশি করে দিন দিন, ও তাদের মধ্যেই বেশি করে কাজ করা আরম্ভ করলে—নেহাৎ যেদিন লোকাভাবে বা অন্য

কোন কারণে টান পড়ত সেদিন বেরুত বাইরে। ক্যাম্পের কাজ হালকা, ও বাকি সময়টা ওর চিন্তা নিয়ে কাটাত—চারিদিকে যা হচ্ছে, হয়ে গেছে তার ওপর ওর মনের প্রতিক্রিয়া। আমি ফিরে এলে আমার কাছে এসে হাজির হত, জলটা এগিয়ে দেওয়া কি গোটাকতক পান সেজে দেওয়া এই রকম সামান্য একটু আধটু যা দরকার সেগুলো যুগিয়ে ওর আমায় সেবা করার স্পৃহাটা মেটাত, তার পর আমি একটু গড়াতাম আর ও গল্প করে যেত—এই যা হচ্ছে, হওয়া উচিত তাই নিয়ে মন্তব্য—বলার মধ্যে একটা গভীর বেদনার সুর থাকত, অন্য প্রায় সবার আলোচনাতেই যেমন একটা আক্রোশের ভাব দেখতাম, সেটা থাকত খুব কমই। হ্যা, এইখানেই আর একটা কথা বলে রাখি—ওর কথাবার্তায় মার্জিত ভাব দেখে, ঝোঁকের মাথায় যা এক-আধটা ইংরাজি কথা বেরিয়ে পড়ত তাব উচ্চারণের ভাব দেখে একদিন কতকটা জেদ করেই একটু সবিস্তারে ওর পরিচয় চাইলাম। টের পেলাম ছেলেটি গ্রামের স্কুলেই ম্যাট্রিকের ছাত্র, ভাল ছাত্রই ছিল, এই সব দেখে-শুনে পড়ায় মন বসছিল না বলে পালিয়ে এসেছে। ওর বাপ চিকিৎসা ব্যবসা করেন, এক কাকা প্রফেসার, একটি বড ভাই কলেজে বি-এ পড়ে।...মিনস্ট্রির কুকীর্তি নিয়েই হত বেশি কথা -'আচ্ছা, একটা মিনস্ট্রি দুর্ভিক্ষ ঘটালে—অমন দুর্ভিক্ষ—সার। ভারতবর্ষে যার মতনটি এর আগে হয় নি, পরের মিনস্ট্রির সেইটেই সামলানো উচিত তো? তা সে দাঙ্গাবাজি নিয়ে রইল। এ কি? ধর্ম ধর্ম করে চীৎকার করে পরের বিভ্রম ঘটানো যায়, তাই বলে ভগবানকেও তো বিভ্রান্ত করা চলবে না। প্রমাণ দেখুন, যে দুর্ভিক্ষটা ঘটালে তাতে শেষ হল ওদের ধর্মের লোকই বেশি—বাংলায় যদি মুসলমানই বেশি হয় তো তাদেরই বেশি না মরে যে উপায় নেই এটা তো বোঝা উচিত ছিল। বুঝবে না; আশ্চর্য! কি যে হবে আমি বুঝতে পারি না।'

একদিন বললে—'এক একবার কি মনে হয় জানেন?—আমরা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, ওরা যেমন বলছে সাহায্যের দরকার নেই, আমরাই ঠিক করে নোব—না হয় দেওয়া যাক একটা চান্স।'

বললাম—'কথা রাখবার নমুনা তো দেখছ? তা ভিন্ন অনেক জায়গায় তো রিলিফ ক্যাম্প পড়েও নি এখনও, শুনছ ত সেসব জায়গা থেকে খবর কি সব আসছে?'

ছোকরা খুবই মুসড়ে গিয়ে একটু চুপ করে রইল, তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—'তা তো বটেই, অথচ আমাদের স্কুলের মৌলুবি সাহেবকে একদিন..

হলে লেকচার প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি—মুসলমান কথাটার মানে মুসল্লম ইমান, অর্থাৎ ইমান যাদের পূর্ণ ; এই তার নমুনা ? ওদের কেউ ভাবছে না কেন যে সমস্ত জাতটা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে ?'

সমস্যার দুশ্চিন্তাটাতেই একটু চুপ করে রইল, তার পর বললে—'না, আমি সেকথা বলছি না, আমি বলছি আমরাই করছি-কর্মাচ্ছি বলে ওরা বোধ হয় বুঝতে পারছে না ওদের পাপটা কত ভীষণ - সেটা না বুঝতে পারলে তো ওদের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হবে না, আর প্রায়শ্চিত্ত ওদের দরকার, নৈলে জা[illegible]বে শেষ হয়ে যাবে ওরা। সে দিক থেকেও কি ব্যাপারটা দেখা উ[illegible] আমাদের ? আপনি কি বলেন ?'

কথাটা উঁচুদরের হলেও আমার সেদিন হাসি পেয়েছিল, বললাম—'একটা সম্প্রদায়ের শুধু প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ করে দেবার জন্যে যদি অন্য সম্প্রদায়কে শেষ হয়ে যেতে দিই কিরণ, তো আমাদের প্রায়শ্চিত্তের কি উপায় থাকবে বল ?' একটু সুবিধে পেলে তো দেখছ এখনও ওরা অত্যাচারেরই চূড়ান্ত করে ছাড়ছে।'

ছোকরা একটু লজ্জিত হয়ে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়ল, বললে—হ্যাঁ, তাওতো বটে···যাক, ভগবান যা করবেন তাই হবে—ভেবে কিছু উপায় দেখি না।'

আর এক দিনের কথা, ক্যাম্পে ফিরে আমার সেদিন কয়কজনের সঙ্গে একটু কাজ ছিল—হিসেব, চিঠিপত্র, এইসব। লক্ষ্য করলাম একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ছেলেটি চুপ করে এক ধারে বসে আছে। কাজ শেষ হলে সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে উঠে এসে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললে—'এইখানটা পড়ুন।'

একটা লীগপন্থীদের দৈনিক কাগজ,—চোখরাঙানি—যেখানটা দেখালে সেখানটায় এসে উচ্ছ্বাস খুব ফেনিয়ে উঠেছে—যেমন হয়, এখানে আর কুলুচ্ছে না, তৈমুরলঙ্গকে, চেঙ্গিজ খাঁকে, এনে হাজির করেছে। আমি সমস্তটা পড়ে একটু হেসে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—'এ তো হচ্ছেই, নতুন কথা কি ?'

ওর মুখে সেই নিরুপায়ের দুশ্চিন্তা, বললে—'আমি সেকথা বলছি না, লেখেই তো এভাবে, আমার একটা কথা স্ট্রাইক করে বড়—দেখুন আর সব জাতই শপথ করে তাদের শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়ে, ক্রিশ্চানরা ক্রাইস্ট, হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, এরা কাদের নিয়ে শপথ করছে, না, তৈমুর, চিঙ্গিজ—কোনও স্ট্যাণ্ডার্ডেই যাদের দস্যুর ওপরে স্থান দেওয়া যায় না ? আর মানুষ যতই সভ্য হবে, যাদের সম্বন্ধে ধারণা আরও ঘৃণিতই হয়ে আসবে, একদিন মুসলমানকেও

যাদের কনডেম করতেই হবে। কৈ, স্বধর্মী বলে মুসলমানদের বাদ দিয়েছে বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ আছে ?'

এই রকম ধবনের সব কথাবার্তা, আলোচনা। ক্রমে লক্ষ্য করতে লাগলাম যতই দিন যেতে লাগল, ক্যাম্পে লোক জমতে লাগল, কাজ বেড়ে যেতে লাগল, আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল, দবকার পড়ল বেশি লোকের, বেশি খাটুনির—ওর [illegible]ের ভাগ যেতে লাগল কমে। যতই বেশি দেখতে লাগল, যতই শুনতে লাগল, [illegible]যেন মুসড়ে যেতে লাগল, ভাবে, মনে মনে গোমরায়, ফুরসৎ পেলে আমার [illegible] ঐ ধরনের আলোচনায় লেগে যায়। দু'একবার কাজের তাগাদা দিলাম, এক[illegible] বিশেষ কোন ফল না পেয়ে ওব মনেব স্বাস্থ্য নিয়েই বেশ একটু ভয় [illegible] গে[illegible]—এ রকম নিষ্কর্মা হয়ে এইসব অত্যাচাবের ব্যাপাব চাক্ষুষ করতে থাকা, গল্প শুনতে থাকা আব তাই নিয়ে খালি ক্রুড করা তো ভাল নয়। ঠিক করলাম, ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দোব। আমাব কাজও অনেক গেছে বেড়ে, বলব বলব কবে দুটো দিন কেটে গেল, এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল—

অতুল বাইরে একটু দূরে একটা কাজে গেছল, গাড়ি থেকে নেমে টিকিট দিয়ে স্টেশন থেকে বেরুবে, গেটের কাছে ভিড় থাকায় একটু দাঁড়িয়ে যেতে হল। গেটের বাইরেও কতকগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল, ভেতরে আসবে, অতুলের হঠাৎ একটি বোরখাপরা মেয়ের দিকে নজর গেল আর ঠিক সময়টিতেই মনে হল মেয়েটি ভেতর থেকে একটু টান দিয়ে বোরখাটা পায়ের গোছের কাছে যেন একটু তুলে ধরলে। দুই পায়ের আঙুলের কিছুটা ওপর পর্যন্ত মুসলমানী ঢঙে চিত্রবিচিত্র করে মেহদির দাগ। মেয়েটি যেন আর একটু তুললে বোরখাটা। সঙ্গে সঙ্গে অতুলের মনে হলো সেই আঁকা-বাঁকা রেখার মধ্যে দুটো অক্ষর রয়েছে। অতুলের উপস্থিত বুদ্ধিটা বেশ প্রখর, পাছে কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করে এই জন্যে চোখটা ফিরিয়ে নিলে, ভিড়ের ঠেলাঠেলি চলেছে, তারই মধ্যে একটু এগিয়ে আবার আড়ে চোখ নামিয়ে দেখলে লেখা রয়েছে 'হিন্দু'—রেখাগুলোর সঙ্গে একটু মেলামেশা করে, তবে ভুল হবার নয়,—অক্ষরগুলো ওরই মধ্যে বেশি স্পষ্ট। প্রায় সবাই মুসলমান, শুধু স্টেশনমাস্টার হিন্দু, পাশেই জন পাঁচেক পুলিস নিয়ে একজন সাব-ইন্স্পেক্টার ক্যাম্প ফেলে আছে, কিন্তু রক্ষকের চেয়ে ভক্ষক হিসেবেই তার নাম হয়েছে বেশি। এইখানে জানাজানি করে ফল যে ভাল হবে এমন মনে হল না অতুলের। মনে পড়ল পরের স্টেশনেও একটি ক্যাম্প আছে আর সেখানে দুর্গামের

জন্যে একজন মুসলমান অফিসারকে সরিয়ে একজন হিন্দুকে আনা হয়েছে, পুলিসের মধ্যেও হিন্দু আছে। অতুল নির্লিপ্তভাবে টিকিট দিয়ে বেরিয়ে এল, তার পর কাউন্টারে গিয়ে পরের স্টেশনের টিকিট চাইলে। সেইখানেই দাঁড়িয়ে দেখলে একটি লোক নিজে গাড়িতে উঠে মেয়েটিকে হাত ধরে তুলছে, মুখে লম্বা দাড়ি, লুঙ্গি পরা, গায়ে কুর্তার ওপর একটা রুমাল ফেলা, পেছনেও একটা লোক দাঁড়িয়ে ছোকরা গোছের, তার মুখটা আর দেখতে পেলে না, একটু সাজগোজ থাকলেও মনে হয় চাষাভুষো মানুষ। গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি দিয়েছিল, টিকিটটা [illegible] অতুল দুখানা গাড়ি বাদ দিয়ে একটা থার্ডক্লাসে উঠে বসল।

পরের স্টেশনেও স্টেশনমাস্টার হিন্দু, বিলিফ উপলক্ষে জানা[illegible]না আছে, নেমেই ঘরে গিয়ে তাঁকে একটু পাশে ডেকে গাড়িটা থামিয়ে রাখতে বলে ক্যাম্পে চলে গেল, স্টেশন থেকে মিনিট তিনেকের রাস্তা।

পুলিস যখন এল, সে-লোক দুটোকে আর পাওয়া গেল না, গাড়ি ছাড়ে না দেখে তারা সন্দেহ করে সরে পড়েছে। মেয়েটির বোরখা খোলা হল, মুখের মধ্যে কাগজ ঠোসা, তার ওপর শক্ত নেকড়া দিয়ে মাথার পিছনে গেরো দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা। অতুল বললে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত মেয়েটি কোন কথা কইতে পারে নি, জিভ অসাড় হয়ে গেছল। তার পর বাড়ির কথা বললে, আমাদের ক্যাম্প থেকেই মাইল পাঁচেক দূরে রূপ্‌সি বলে একটা গ্রামে। বাড়িতে মেয়ে-পুরুষে ছেলেয়-বুড়োয় এগার জন লোক ছিল, চারজনকে নিজের চোখের সামনেই মরতে দেখে। তার পর ওকে ধরে নিয়ে আসে আর কিছু খবর জানে না। এজাহার দিয়ে তিনজন বন্দুকওয়ালা পুলিস সঙ্গে দিয়ে অতুলের সঙ্গে মেয়েটিকে আমাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন সাবইন্‌স্পেক্টার। অতুলের জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম, রাত্রি প্রায় আটটার সময় অতুল ক্যাম্পে এসে পৌঁছল।

সোমেন একটু চুপ করিল। সুখময় বলিল– "না হয় এই পর্যন্তই থাক সোমেন, শোনাটাও যেন মৃত্যুযন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই সব পিশাচদের সম্বন্ধেও তুমি মনটা কি করে ঠাণ্ডা রাখ বুঝতে পারি না।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"না, বল, বেশ লাগছে, যে কাজটা করে বেশ আটঘাট বেঁধে করে, আমাদের যেন সবই যায় ভেস্তে, শেখবার আছে এদের কাছে।"

সুখময় বলিল—"শেখবার আর জিনিস পেলে না?—শাগরেদি করবারও আর গুরু পেলে না?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিল—"অবস্থা বুঝে অনুরূপ গুরু খুঁজে নিতে হয়; এ তো তবু

হাতের কাছে নিজেদের মধ্যেই পাচ্ছি, দেবতাদের এক সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে ধর্না দিতে হয়েছিল, আর তা নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে নয়।”

সোমেনের যেন এসব তর্কাতর্কিতে কান ছিল না, বাহিরে চাহিয়াছিল, দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সুরু করিল—“মেয়েটিকে নিয়ে এল আমার সামনে। চোখে এক অদ্ভুত ভাব, অমনটি আমি দেখি নি কোথাও—ভয়ে এমন হয়ে রয়েছে যেন ভরসাকেও বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না। থেকে থেকে যেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে, চারিদিকে চায়, প্রশ্ন করে ‘কেউ এসে পড়বে না তো—আঁ্যা’ তার পর আবার নিজেব কাহিনী বলে চলে। শেষ হলে যতটা সম্ভব সাহস দিয়ে বললাম—‘এখানে কোন ভয় নেই, হিন্দু পুলিস, তারা যতটা সম্ভব খোঁজ নেবে, আমবাও কাল সকাল থেকেই চেষ্টা করব, ক্যাম্পে তোমার জন্যে জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, তুমি এখন মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও আগে।’

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল কবে চেয়ে রইল আমার দিকে, বললে—আমি এখন খাব না তো।’

জিগ্যেস করলাম—‘কেন?’

মেয়েটি একবার চাবিদিকে চেয়ে দেখে আমার মুখের পানে চাইলে; কিছু বলতে চায় বুঝতে পেরে আমি সবাইকে সরিয়ে দিলাম, মেয়েটি আর একবার চেয়ে বললে—‘অপনি আমার বাবা—কাকে বলি, আমার জাত-ধর্ম কিছু নেই আমায় যা-তা খাইয়েছ—আর—আর…’

হঠাৎ আমাব পা দুটো জড়িয়ে পায়ের ওপর মাথা চেপে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, তারই মধ্যে ভাঙা ভাঙা গলায়—‘আমার সিঁদুর—আমার কপালের সিঁদুর—আমার তো কোন দোষ নেই—আমায় প্রাশ্চিত্তির করিয়ে আগে সিঁদুর দিন আমায়—কি প্রাশ্চিত্তির আমার? আমার কি দোষ?’

আমি হাত ধরে তুলে বসালাম, বললাম—‘প্রায়শ্চিত্তের তো দরকার কিছুই নেই মা, ব্রাহ্মণেরা বিধান দিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীজিকে জান নিশ্চয়—তিনি বলেছেন এ অবস্থায় কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। সিঁদুর তুমি পাবে, এ ক্যাম্পে অনেক সধবা মেয়ে এসে আছেন, সিঁদুরের অভাব হবে না, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু…’

মেয়েটি যে বুদ্ধিমতী তা তাঁর পায়ে মেহদির সঙ্গে পরিচয় দেওয়া থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু বলে আমি থেমে যেতে বললে—‘আমি বু…

কি বলতে চান আপনি। আমার স্বামী বেঁচে আছেন, নিশ্চয় বেঁচে আছেন তিনি—চারজনের মধ্যে তাকে মারে নি—তার পরে জানি না—তবে বেঁচে নিশ্চয় আছেন—হিন্দু মেয়েরা টের পায়—আমায় সিঁদুর দিন আগে।'

জুতো সুদ্ধু পা দিয়ে ঘসে ঘসে কপালের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল ওরা, কাফেরের ধর্মের জিনিস হাত দিয়ে ছুঁতে নেই কিনা—সীমান্তের চুলগুলো উঠে গেছে, সমস্ত কপালটায় ঘা হয়ে গেছে। সিঁদুর আনিয়ে দিতে বুকে ছুঁইয়ে বাঁ-হাতের যেখানে শাঁখা নোয়া থাকত সেখানটা ছুঁইয়ে দেবতার নির্মাল্যের মতন কয়েকবার কপালে ছুঁইয়ে আস্তে আস্তে সেই ঘায়ের ওপর পরলে, তার পর·· ”

সুখময়ের যেন আর ধৈর্য রহিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মৃত্যুঞ্জয়, শেখবার মতন আরও কিছু শুনতে চাও নাকি ?”

মৃত্যুঞ্জয় একটু হাসিয়া বলিল—“তুমি চটছ, কিন্তু এটা তো ঠিক যে এ-জিনিসটা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছেও পাওয়া যেত না।”··

সুখময় একটু শ্লেষের কণ্ঠে বলিল—“তার পর কি আছে বের কর সোমেন, মৃত্যুঞ্জয়ের সাধ মিটছে না।”

সোমেন বলিল—“সাধ মিটবে কিনা বলতে পারি না, তবে এর পরে যা আছে তাতে শেখবার যে আছে অনেক কিছু সেটা তোমায় পর্যন্ত মানতে হবে। সেই ছেলেটির কথায় ফিরে আসা যাক। পেছনে একজায়গায় বসে শুনছিল সব কাহিনী। তার পর থেকে কিন্তু একেবারে চুপ করে গেল। একরকম কারুর সঙ্গে কোন কথাই বলে না, খেলেও না ভাল করে, ক্যাম্পের চারিদিকে যেন অস্থির হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার পর রাত যখন নিশুতি হয়ে এসেছে, আমার বিছানার পাশে এসে ডাকলে—‘ঘুমুচ্ছেন আপনি ?’

ঘুমের সঙ্গে আড়াআড়ি চলছে আমার তখন, জিগ্যেস করলাম—‘কেন ?’

‘ঐ মেয়েটিকে আমায় দিন, আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মার মতন করে রাখব। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি এই।’

বললাম—‘সেটা কি সম্ভব কিরণ ? উনি রাজি হবেন কেন ? তা ভিন্ন ওঁর সবাইএর খোঁজ নিচ্ছি আমরা। সব ছেড়ে তোমাদের বয়সের কথাই ভাব না—তোমার মনের পবিত্রতা দুনিয়া কি বিশ্বাস করবে ?’

যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বললে—‘তাহলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে ?’

বললাম—‘প্রায়শ্চিত্তের তো দরকার নেই।’

একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলে—‘না, না, ওঁর প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?—

উনি কেন করতে যাবেন ? তবে কাউকে তো করতে হবে এর জন্যে ? কেউ যদি না করে চলবে কেন ?'

অদ্ভুত চোখের ভাব, অসংলগ্ন কথা, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তবে সেটা প্রকাশ না করে বললাম—'তুমি এখন যাও, একটু ঘুমোও গিয়ে, আমারও এখন বড্ড ঘুম পেয়েছে,। বেশ কাল মেয়েটিকে বলে দেখব। তা ভিন্ন, ও যদি আবার সংসার পাততে পারে সেখানে তো তুমি থাকতে পার, নয় কি ?'

মুখটা ওর উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—'হ্যাঁ, বেশ ভাল কথা বলেছেন, তাও তো হয়।'

বললাম—'যাও, শোওগে।'

ঠিক কবলাম পরদিনই ওকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে ; হচ্ছে-হবে করে বড্ড দেরি করে ফেলেছি ; মাথাটা বুঝি গেলই বিগড়ে।

তার পরদিন সকাল থেকে ওর দেখা নেই। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে রইল। চারিদিকে লোক পাঠালাম খোঁজ করতে, কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মাইল তিনেক দূরে স্টেশন, সকাল আটটায় আর সাড়ে নটায় দুদিকে দুটো গাড়ি —যতদূর খবর পাওয়া গেল কোন গাড়িতে যায় নি। যাকে পাঠিয়েছিলাম তাকে বলাই ছিল বিকেল পর্যন্ত থাকবে, ঐ সময় দিনের শেষ গাড়ি, সেইটে দেখে স্টেশনমাস্টারকেও ভাল কবে বলে চলে আসবে। সে এসে খবর দিলে ও পথে যায় নি। মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রইল, ক্যাম্পের কর্মীদের শত্রু চারিদিকে, একটা ছটকে পড়লেই বিপদ, কি যে হয়েছে বুঝতে আর বাকি রইল না। অবসন্ন মনে কম্বলের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েছি, এমন সময় বাইরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল—'আমি কিরণ—বলছি আমি কিরণ, যেতে দিন আমায়—দিন যেতে, বড্ড দরকার—যেতে দিন আমায়…'

একটা ধস্তাধস্তি—মিনিট খানেকের, আমি উঠে বসেছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটা ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, একটু ধোঁকা, তার পরেই লালটেনের আলোয় চিনলাম সেই ছেলেটাই। তবে চেনায় অনেক বাধা ছিল…লুঙ্গিপরা, হাতে একটা টার্সি ক্যাপ দোমড়ানো, ফতুয়ার নীচে পৈতের গোছাটা নেই, আর নেই সেই টিকিটা—সেটা ছিল বেশ নজরে পড়বারই মতন।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, মুখচোখ বসা, দৃষ্টি একেবারেই পাগলের মতন।

কয়েক সেকেণ্ড কথাই বেরুল না, তার পর বললে—'সত্যিই আমি কিরণ—

বিশ্বাস করুন, এই বেশ করে ওঁর গাঁয়ে গিয়েছিলাম—কাল যিনি এসেছেন—ওরা আসছে—মস্ত দল নিয়ে—এসে পড়বে এবার—কি হবে ?—ওঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ··সব চুপ করে রয়েছেন কেন ?—কি হবে···কি করতে হবে করুন—পুলিসে খবর দিয়ে এসেছি—আসবে না—বললে আসছি—জানি আসবে না—কি হবে? —বিশ্বাস করছেন না ?—আমি কিরণই—সত্যি কিরণ—সত্যি আসছে ওরা—এসে পড়ল বলে।'

এ ভুলটা আমাদেব হওয়া উচিত ছিল না, ছেলেটিকে সমস্ত দিন না পাওয়ার জন্যে হ'য়ে গেছে, মনটা বড অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। যাই হ'ক, তাডাতাডি লেগে গেলাম ব্যবস্থায় সবাই, দু'জন ছুটল পুলিস ক্যাম্পেব দিকে, বাকি সবাই বাঁশ লাঠি যা হাতের কাছে পেলে নিয়ে, দু'একটা মশালের ব্যবস্থা কবে, আশ্রিতদেবও মধ্যে মেয়েদের সব একত্র করে, বাকি সবাইকে যতটা সম্ভব সশস্ত্র করে তোয়ের হতে হতে হঠাৎ একটা শব্দ উঠল 'আল্লা হো আকবর!' আমাদের ক্যাম্পের প্রায় শ'তিনেক গজ দূরে একটা পুকুব ঘেরে ঘন আমকাঁটালের বাগান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাতে পাঁচ-সাতটা মশালের আলো জ্বলে উঠল, তার পবই সেগুলো ছুটল আমাদের দিকে।

তার পর যা হ'ক সেটাকে খণ্ড যুদ্ধের কম কিছু বলা যায না। আমার এই কপালের দাগ সেইদিনই অর্জন কবা। পাঁজবার নীচেও একটা আছে, পডল অনেকে, তবে দু'পক্ষেই, কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা সেদিন মুছে যেতাম—কর্মীদেব বেশির ভাগই ছেলেছোকরা, এসব জিনিসে অনভ্যস্ত, আশ্রিতবা তো আরও অসহায়—সময়ও পাওয়া যায় নি তোয়ের হবাব।

কিন্তু হঠাৎ সামলে গেল—ছেলেটি ভুল বলেছিল—খুবই সম্প্রতি পুলিসের আচরণের জন্য আন্দোলনটা জোর হয়ে ছিল—অতটা আর সাহস করলে না ওরা; জনচারেক লোক নিয়ে পৌছে গেল দারোগা, একটা রাউণ্ড বন্দুক চালাতেই কয়েকটাকে রেখে পালিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা হলে হিসাবের পালা চলল। বেশিভাগের চোটই লেগেছে, মরেছে শুধু অতুল: বড সাহসী ছেলে ছিল, মোহডাটা নিতে গিয়েছিল নিজের বুক পেতে। তার রক্তমাখা দেবদেহটা বুকে জড়িয়ে ধরতে যাব এমন সময় নরু বলে একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার হাতটা ধরে বললে—'চলুন শীগগির চলুন, কিরণ আপনাকে ডাকছে—শীগগির—আর বেশিক্ষণ নেই।'

গিয়ে দেখি পড়ে আছে, পাঁজরার নীচে একটা ধারাল অস্ত্রের ঘা, হাত দিয়ে

সবটা ঢাকতে পারে নি, হাতটা ছাপিয়ে তাজা রক্ত নীচেব মাটির খানিকটা পর্যন্ত দিয়েছে রাঙিয়ে। অসহ্য বেদনায় মুখটা গেছে সিঁটকে, বিকৃত হয়ে।

একটু ঠাহর করে দেখে আমায় চিনলে, বললে—'এসেছেন আপনি—আর সময় নেই—আমি মুসলমান—কিরণ নয়—সামেদ—কি হবে ;—কি হবে ?—কে প্রায়শ্চিত্ত করবে ? ওদের মার্জনা—বুঝছে না কেন ওরা·· ?'

আমাব গলাটা এমন বদ্ধ হয়ে পড়ল যে আশ্বাসের একটা কথা বলতে পাবলাম না। আমার গা বেয়ে গড়াচ্ছিল আমাব নিজেব রক্ত, তাব সঙ্গে মিশেছিল অতুলের বক্ত, আমি সেই অবস্থায় সামেদেব রক্তমাখা দেহটা বুকে কবে ধরলাম জড়িয়ে, তখনও বোধ হয় প্রাণটা ছিল সে-দেহেব মধ্যে।·

ওকি, চোখে হাত কেন ? তোমাদেব দুজনেব চোখেই একসঙ্গে কিছু পড়ল নাকি সুখময় ?·· অভিমত একটা চাই যে আমার।"

সত্যাগ্রহী

যুবকটি আসিয়া পড়িলে ঘটনাটুকুব সত্যরূপ আমার নিকট অপ্রকাশই থাকিয়া যাইত, কিন্তু একথাও নিশ্চিত কবিয়া বলিতে পারি সেজন্য আমার মনে কোন খেদ থাকিত না, কেন না মিশিরজী তাহাকে যে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন সেটাও কম মোহনীয় ছিল না আমার পক্ষে।

মিশিরজী ছাপরার একজন সাকলদ্বীপী কবিবাজ, বেশ হাতযশ আছে, কিন্তু এইটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং তদুপরি কবি ; এদিকে খদ্দরধারী, দেশের কাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগ আছে। আমার সঙ্গে পরিচয়টা আকস্মিক, যখন শুনিলেন আমিও একজন সাহিত্যসেবী, আবার হিন্দীভাবারও 'প্রেমী', মিশিরজী বেশ একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহার পর তিনিও আসেন আমিও যাই, কবিতা শোনান, আর আপসোস করেন—বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া তাঁহার সাধ মিটিল না জীবনে। ভিতরকার কথাটা এই যে, মিশিরজী একটি মহাকাব্য লিখিতে চান, ইতিহাস বা পুরাণের কোন কাহিনী লইয়া নয়, সে সব তো পুরানো আর বিরস হইয়া গেছে, নূতন কিছু ঘটুক পৃথিবীতে, আর সেই

নূতনকে তিনি মহাকাব্যে রূপ দিন, এই তাঁর অন্তরের বাসনা। সেটা আর পূর্ণ হইতেছে না।…

এবার গেলাম অনেক দিন পরে, এর মধ্যে কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের প্রথম দফা গেছে, নোয়াখালি গেছে বিহারের জেরও প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে। মিশিরজী আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "এবারে অনেকদিনেব অদর্শন গেল মুকুর্জিবাবু।"

বলিলাম—"হ্যাঁ, দেশে একটু বিলিব্যবস্থা করতে গেছলাম, দেখলেনই তো কি কাণ্ডটা হয়ে গেল, হিহারও তো বাদ গেল না।"

মিশিরজী মুখটা একটু বিষন্ন কবিয়া লইলেন, কিন্তু তাহারই মাধ্য কোথায় একটু স্মিতহাস্তেব রেশ রহিল লাগিয়া, বলিলেন—"হ্যাঁ মুকুর্জিবাবু, বড দুঃখেব কথা, যে-বিহারকে মহাত্মাজীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বলা হয়…"

চুপ করিয়া মুখটা একটু নীচু করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য কবিলাম সেই স্মিতহাস্যটুকু ধীরে ধীরে যেন প্রসার লাভ কবিতেছে। এক সময় মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"একটা কথা কিন্তু মুকুর্জিবাবু, আমি আমার মহাকাব্যের খোরাক পেয়েছি এতদিনে। ঘটনাগুলো খুব দুঃখের নিশ্চয়, কিন্তু এসব দৈব ব্যাপাবেব ওপব যখন কারুর হাত নেই তখন এ থেকে কি উঠল সেইটিই কি আসল কথা নয়? সমুদ্রমন্থনে নষ্টই হল বেশি, কিন্তু উঠলেনও তো লক্ষ্মী…আমি সেই দিক থেকে বলছি—কষ্টটা অবশ্য আমারও কম নয়। আপনি কি বলেন?"

বলিলাম—"দুঃখের মধ্যে দিয়ে ভগবান কল্যাণকে আনেন বলেই তো সে-দুঃখ আমাদের সহনীয় হয় মিশিরজী।"

মিশিরজীর যেন একটা সঙ্কোচ কাটিল, বলিলেন—"তাহলে শুনুন মুকুর্জিবাবু, আমি আপনাকে নিছক ঘটনাংশটাই বলছি, সেইটুকুর চারিধারে আমার কাব্যটা উঠবে গডে।"

একটু চুপ করিলেন, তাহার পর গবাক্ষপথে একটু বাহিরের দিকে চাহিয়া মনে মনে বক্তব্যেব প্রথমাংশটুকু যেন একটু গুছাইয়া লইয়া আরম্ভ করিলেন—"জায়গাটার নাম স্বরূপগড়। সারণ জেলা, তবে একেবারে চম্পারণের লাগোয়া। পূর্বদিকে দিগন্তবিস্তৃত নারায়ণী নদী, তাই থেকেই একটা সুঁতি বেরিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রায় দশ বারো মাইল লম্বা আর মাইল তিন চারেক চওড়া একটা চাকলা ঘিরে পশ্চিম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই সুঁতিটাই নারায়ণীর পুরনো খাত। এর মাঝের এই জমিটায়…"

এই সময় যুবকটি আসিয়া প্রবেশ করিল, দীর্ঘাঙ্গ, টকটকে রং, আগাগোড়া খদ্দরপরা। গোড়াতেই বাধা পড়ায় মনে হইল মিশিরজীর মুখটা একটু যেন কুঞ্চিত হইল, তখনই সেটা সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি দরকার আপনার ?"

"আপনার কাছেই দরকার।"

"বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আমার একটু কথা হচ্ছে ; দেরি হলে ক্ষতি হবে ?"

"না···ক্ষতি নেই। আমি বাইরে থেকে আসছি, ফিরতে হবে ; তবে আমার গাড়ির এখনও ঘণ্টা তিনেক দেরি আছে।··"

বাইরের বারান্দার দিকে একবার চাহিয়া বলিল—"বাইরেই বসি তাহলে আমি ?"

মিশিরজী এক নজরে যুবকটির আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া মুহূর্তমাত্র কি যেন একটু ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—"না, বাইরে বসবেন কেন ? ভেতরেই বসুন ওই চেয়ারটায়, কথা আমাদের এমন কিছু গোপনীয় নয়।···আপনিও ত দেখছি খদ্দরধারী।" একটু হাসিলেন ; মনে হইল কাব্যবিষয়ের আর একজন উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া যেন হৃষ্টই হইয়াছেন।

যুবক চেয়ারটিতে গিয়া উপবেশন করিল।

মিশিরজী আমার দিকে ফিরিয়া আবার শুরু করিলেন—"হাঁ, যা বলছিলাম—নারায়ণীর পুরনো আর নূতন খাতের মাঝখানে এই জমিটায় ছাড়া-ছাড়া কতকগুলো গ্রাম আছে ; তার মধ্যে একটির নাম বললাম আপনাকে, এইখানে বাবু রঘুবীর সিং-এর বাড়ি···"

যুবক হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"কোন্ রঘুবীর সিং ?"

এই দ্বিতীয় বাধায় মিশিরজীর মুখটা একটু স্পষ্টভাবেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, একটু চুপ করিয়া গেলেন। ব্যাপারটি অপ্রিয় হইয়া ওঠে দেখিয়া আমিই বলিলাম—"উনি স্বরূপগড়ের বাবু রঘুবীর সিং-এর কথা বলছেন···"

মিশিরজীর বিরক্তিটা তখনও কাটে নাই, একটু ব্যঙ্গের হাসির সহিত প্রশ্ন করিলেন—"আপনার আছে পরিচয় তাঁর সঙ্গে ?"

যুবকের মুখটা বেশ একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কি একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"না।···বলুন আপনার গল্পটা ; বাধা দেওয়ার জন্যে মাপ করবেন।"

মিশিরজী নরম হইলেন, বোধ হইল যেন একটু অপ্রতিভও, বলিলেন—"না, বাধা দেওয়ার কি হয়েছে এতে ?···আমি বলছিলাম—রঘুবীর সিং-এর তো অভাব

নেই দুনিয়ায়, তা জিগ্যেস করেছেন তো আর বাধার কি হয়েছে?…কোথায় বলছিলাম মুকুজ্জিবাবু?"

আমি কহিলাম—"বলছিলেন সেই স্বরূপগড়ে বাবু রঘুবীর সিং এর বাড়ি।"

হঁ্যা, ঠিক।…রঘুবীর সিং শিশোধিয়া রাজপুত, সমস্ত চাকলাটাতে খালি শিশোধিয়া রাজপুত, গোয়ালা আর কিছু মুসলমানের বাস। এর মধ্যে শিশোধিয়ারাই বেশি প্রতাপশালী,—একে তো শিশোধিয়াই, তায় জমিজমা বেশির ভাগ তাদেরই, মাথা গুনতিতে কম হলেও তাদেরই দাপটটা সবার ওপরে, সমস্ত চাকলাটার নামও চর-শিশোধী। এখন হয়তো আর ততটা নেই, তবে একসময় বড ভয়ঙ্কর জায়গা ছিল এই চর-শিশোধী, মুকুজ্জিবাবু—মানে, আপনার আমার মত মানুষের থাকবার স্থান নয়। একে দুটো জেলার সীমানায়, তায় অল্প একটু পশ্চিমে গেলেই অন্য প্রদেশ—ইউ, পি'র গোরখপুর জেলা এসে পড়ে, উত্তরে বিশ-পঁচিশ মাইলের পরেই নেপাল,—শাসনই যায় একেবারে পালটে—এই সব কারণে লুটতরাজ, চুবিডাকাতি বড্ড হত এই জায়গাটায়। এ তো গেল বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা, এদিকে আবার ঘরোয়া লড়াইও লেগেই আছে, জাতে জাতে, আবার প্রত্যেক জাতে আপসের মধ্যেও। কথাটা বুঝলেন না?—চর জায়গা যে—এদিকে ঐ ভয়ঙ্করী নারায়ণী, অন্যদিকে তার স্থঁতি—বর্ষা নামলেই যার পূর্ব গৌরবের কথা মনে পড়ে যায় যে সেও একদিন ঐ নদীরই মূল প্রবাহ ছিল—এই দুটো নদী মিলে পাগলের উল্লাসে সমস্ত চাকলাটাকে নিয়ে ভাঙা-গড়ায় ওঠে মেতে—পুরনো জমির নিশানা যায় মিটিয়ে—নতুন জমি জেগে ওঠে স্বয়ংবরা কুমারী মেয়ের মতনই স্বামিত্বে লুব্ধ করে সবাইকে—কার শক্তি আছে আমায় গ্রহণ কর—সমস্তচরে দাঙ্গাহাঙ্গামা ওঠে জেগে, কত মাথা পড়ে ধড থেকে গড়িয়ে, বছর ধরে আদালতে চলে তার জের, তার পর আসে বর্ষা—আবার ঘটনাচক্রের ঐ এক আবর্তন—চর-শিশোধীর এই হল মোটামুটি ইতিহাস। এ-হেন স্থানে বাবু রঘুবীর সিং ছিলেন আবার বিশিষ্ট। প্রথমত ও-রকম একটা চেহারাই তো চোখে পড়ে না রাজপুতদের মধ্যেও—দীর্ঘ সাড়ে ছফুট লম্বা চেহারা, মাথায় সিংহের কেশরের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে রয়েছে, ইয়া মোছ ইয়া গালপাট্টা, সিংহের মতনই সরু মাঝা, তার উপর বুকখানা মনে হয় যেন একজোড়া শাল কাঠের কপাট ভেজানো রয়েছে। গলার আওয়াজটা খনখনে, যখন নিতান্ত সাধারণভাবেও কথা কইতেন, শ্রোতার বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠত।

লোকে বলে বয়সকালে বাবু রঘুবীর সিং ডাকাতিও করতেন,—তাঁর দল তিনদিকের সীমান্ত পেরিয়ে, চম্পারণ, ওদিকে অযোধ্যা প্রদেশ আর উত্তরে নেপালে গিয়ে হানা দিয়ে ধনদৌলত নিয়ে আসত। অতটা জানি না, আর বিশ্বাস করাও শক্ত, তবে এটা ঠিক যে এক সময় সারা চাকলাটায় ওঁর মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক আর অন্য কেউ ছিল না। জমিদার ওঁর চেয়ে ঢের বড় বড় ছিল আর সব, বরং জোতজমি বলতে ওঁর যা সামান্য ছিল তা থেকে জমিদারদের মধ্যে গণ্যও করা চলত না ওঁকে, কিন্তু বোলবোলাও ছিল ওঁরই সবার ওপরে। অল্প কথাতেই দাঙ্গাহাঙ্গামায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চর-শিশোধীর মত জায়গাতেও ওঁর জোড়া দ্বিতীয়টি ছিল না, আর হারা কাকে বলে তা তো জানতেনই না বাবু রঘুবীর সিং। তেমনি অত্যাচারীও ছিলেন—চরের বাইরে কি করতেন জানি না, তবে চরের মধ্যে বছর গেলে তিন চারটে মাথা তো খসাতেনই ধড় থেকে—নিজের হাতে, বাকি চেলা-চামুণ্ডারা যা করুক, তাঁর দল ছিল শিশোধিয়া আর গোয়ালা মিলে, মুসলমানদের উনি পরিহার করতেন, বলতেন খাঁটি রাজপুতদের সঙ্গে ওদের কখনও মেলে নি, মিলবেও না।···নিজের নিজের মত আর কি।

ক্রমে রঘুবাবু একটা আতঙ্ক হয়ে উঠলেন চর-শিশোধিয়ার, তার পর তিনটে জেলা আর নেপাল মিলিয়ে সারা তল্লাটটার। প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা সুনাম ছিল—ডাকাতদের সঙ্গে আমরা সাধারণত যা মিশিয়ে থাকি—গরিবের ওপর অত্যাচার না করা, বড় মানুষদের লুটে গরিবদের সাহায্য করা,—ক্রমে তার সঙ্গে নানান রকম বদনামও যেতে লাগল মিলিয়ে। এ প্রায় বছর ত্রিশ আগেকার কথা বলছি আপনাকে, আমরা তখন সতের-আঠার বছরের ছোকরা, বুঝতেই পারেন রঘুবীর সিং-এর নামটা আমাদের নও-জোয়ানী কল্পনায় আগুনের শিখা জেলে দিত ; তার পরেই সেই গৌরবময় নামের সঙ্গে নিছক অত্যাচারেরই অল্প অপবাদ মিশে আমাদেরও কল্পনার শিখাকে একটু একটু করে ধূমায়িত করে আনছে এমন সময় বিহারের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যসূর্যের উদয় হল, মহাত্মাজী চম্পারণ সত্যাগ্রহ নিয়ে এখানে পদার্পণ করলেন।”

মিশিরজী একটু থামিলেন, শুধু বিরতির জন্যই নয়, মনে হইল, সেই নব-সূর্যোদয়ের পবিত্র স্মৃতি তাঁহার মনটিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—“আমার মহাকাব্যে চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে গোটা দুয়েক সর্গ দোব মনে করছি মুকুজ্জিবাবু, কিন্তু আপাতত তার উল্লেখ এইজন্যে করছি যে বাবু রঘুবীর সিং-এর জীবনে সেটা একেবারে আমূল পরিবর্তন

এনে দিলে। কবি বলে গেছেন—চুম্বক মাটিকেও টানে না, কাঠকেও টানে না, টানে শুধু লোহাকে, কেন না লোহাতে আছে বস্তু। তাই হল,—অমন দুর্ধর্ষ-যে রঘুবাবু, নিতান্ত অসহায়ভাবে আব নিতান্তই নিবিডভাবে মহাত্মাজীর কাছে পডলেন টানা। চর-শিশোধীর নাট্যমঞ্চ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তার জায়গায় শোনা যেতে লাগল মহাত্মাজীব পাশে চম্পাবণ সত্যাগ্রহে বাবু বঘুবীরেব কীর্তি-কলাপের কাহিনী—তন্ মন্-ধ্যান্ দিযে তিনি নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহে গেছেন মেতে নিতান্ত তপশ্চারীর মতনই, মহাত্মাজীর একেবারে দক্ষিণ হস্ত—বিহাব থেকে নীলকুঠিরূপ কলঙ্ক একেবারে মুছে ফেলবাব জন্যে নিজের সমস্ত সম্পত্তি মহাত্মাজীর হাতে তুলে দিয়েছেন, জীবন পযন্ত করেছেন পণ।

বাবু বঘুবীর সিংকে আমি জীবনে দুবাব দেখি, একবাব কি একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা ছিল, আমার বাডির সামনে দিয়েই একটি দলেব সঙ্গে তিনি যান, কি জানি কেন, পদব্রজেই। আমার কথাটা বোধ হয় পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হবে, কিন্তু ছাপরা পৌরুষেব পীঠস্থান মুকুজ্জিবাবু, এখানকার পথে ঘাটে পুরুষের মতন পুরুষ দেখা এমন কিছু অসাধাবণ ব্যাপাব নয়, কিন্তু তবুও তার মধ্যেও বাবু বঘুব র সিং-এব সেদিনেব সেই মূর্তিটি আমার এখনও যেন চোখে লেগে আছে—একটি কম্প্র আগুনের শিখা যেন পথ বেয়ে চলেছে—দেখবাব জন্যে বাস্তাব দুধাবে লোক দাঁডিয়ে গেছল, বাডিতে বাডিতে জানালা-কপাট গেছল খুলে।·· তাব পর দ্বিতীয়বাব দেখলাম চম্পারণ সত্যাগ্রহ শেষ হলে তিনি যখন ফিবে আসেন, ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মণ্য তপেব অমন অপূর্ব সমন্বয় আমি জীবনে আর দেখি নি। আগাগোডা মোটা খদ্দর পরা তাতেও প্রয়োজনেব এতটুকু বেশি নেই কোথাও, শরীর অনেক ক্ষীণ, তবুও কেমন করে যেন মনে হয় সে বলেব সমস্তটাই আছে, শুধু আধাবের বাহুল্যই গেছে কমে। কি তুলনা দিই ?—প্রথম দিন যদি তাঁকে আগুনের শিখা বলে মনে হয়েছিল, সেদিন মনে হল এ যেন একটা তপ্ত ইস্পাতের ছড, সেই আগুনই, তবে আলগা নয়, জমাট, শিথিল নয়, সংহত।

ছাপরায় সমস্ত জেলার তবফ থেকে তাঁকে একটা অভিনন্দন দেওযার জন্যে টেনে আনা হয়েছিল। টেনে আনা হয়েছিল বললাম কেননা অহিংসার সঙ্গে মহাত্মাজী তাঁর অণুতে অণুতে আর একটা জিনিস যা সাঁদ করিয়ে দিয়েছিলেন তা নিস্পৃহতা। আমি গিয়েছিলাম সেই সম্মেলনে, মনে হচ্ছিল যশের তিলক পরাবার জন্যে এই যে বিরাট জনসমাবেশ এ তাঁকে পীডিত করছে, পরিত্রাণ পেলেই যেন বাঁচেন—তাঁর যেন কত অপকার করছে—যশের ভার চাপিয়ে তাঁর ব্রত থেকে যেন

তাঁকে নামিয়ে আনছে ধীরে ধীরে। আমি সেদিন বসে বসে শুধু সেই প্রথম দেখা রঘুবীরের সঙ্গে সে-দিনের রঘ্‌ঘুবাবুকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম আর মনে মনে কল্পমূর্তি গড়বার চেষ্টা করছিলাম সেই পুরুষের যাঁর মন্ত্র সেই শক্তিমত্ত রত্নাকরকে এই তপঃসিদ্ধ বাল্মীকিতে পরিণত করতে পারে।

এর পরেই রঘ্‌ঘুবাবু স্বরূপগড়ে গিয়ে বসলেন, তার পর এই ত্রিশ বৎসর ধরে নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, হিংসালেশহীন মন দিয়ে একটু একটু করে অশান্ত, আত্মবিচ্ছিন্ন চর-শিশোধীর রূপ দিলেন একেবারে বদলে, তাকে করে তুললেন সত্যাগ্রহীর মহাতীর্থ। এর মধ্যে শুধু একটা চঞ্চলতা জেগে উঠেছিল— বিয়াল্লিয়ের জন-বিক্ষোভ, কিন্তু তাতেও চর-শিশোধীর বিশেষত্ব ছিল, সে প্রাণ দিয়েছিল, নেয় নি একটিও প্রাণ।

এর পর এল ভারতের অধুনাকালের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। যে-মুসলমানের সঙ্গে এক হয়ে নেতাজী ইংরাজের আসনের গোড়া কাঁপিয়ে দিলেন, সেই মুসলমানকে হাত করে সে তার শেষ পরীক্ষা আরম্ভ করে দিল—এল ছেচল্লিশের পনেরই আগস্ট। কলিকাতা বম্বাই গেল তছনছ হয়ে, তারপর একটা সাময়িক বিরতির পর এল নোয়াখালি, তার গায়ে-গায়েই বিহার। কলকাতার হত্যাকাণ্ডেও বিহারের হিন্দু মাথা ঠিক রেখেছিল, কেননা সেটা মোটামুটি গভর্ণমেণ্ট বনাম হিন্দু অধিবাসী হলেও হিন্দুরা সংখ্যায় কম ছিল না আর সেইজন্যে দ্বিতীয় দিন থেকেই কড়া জবাব দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু নোয়াখালির নিতান্ত সংখ্যালঘুর ওপর অমানুষিক অত্যাচারে—যার মধ্যে ধর্ম আর স্ত্রীলোক ছিল প্রধান লক্ষ্য—বিহার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। আমি এই শহরে বসে সে-বিক্ষোভ দেখেছি মুকুর্জিবাবু, যা শুনেছি তার কথা বাদই দিই। কয়েকদিনের জন্য মানুষ যেন আর মানুষ রইল না; হত্যা, ধ্বংস, লুট—কোনটা দিয়ে যে প্রতিশোধের বাসনাটা মেটাবে যেন ভেবে ঠিক করতে পারে না। হিন্দু যে এক কথাতেই এত উগ্র হয়ে উঠতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না মুকুর্জিবাবু; সেই শান্ত নিরীহ জাত, যুগ যুগ ধরে নীরবে সহ্য করতেই যারা অভ্যস্ত, একদিনেই গেল একেবারে বদলে; এ যেন ঠিকএকটা মলয়পবনের প্রবাহ নিমেষেই কালবৈশাখীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কোথায় আরম্ভ হল প্রথমে বলা কঠিন, একবার আরম্ভ হবার পর শহরের ধাক্কা লাগল গ্রামে, গ্রামের ধাক্কা লাগল শহরে, এক জেলার প্রতিধ্বনি উঠল অন্য জেলায়, সারা বিহার যেন ধ্বংসের হিংসা মাতুনিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই বিহারেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর সম্বোধি লাভ করেছিলেন নাকি?—তার

পর আড়াই হাজার বছর পরে এই নিতান্ত সেদিন নবকলেবর নিয়ে অহিংস সংগ্রামে যে হিংসার অবসান ঘটিয়ে গেলেন সে না এইখানে এই বিহারেই ?

ক্রমে চর-শিশোধীতে এর সাড়া পৌঁছুল।

আগেই বলেছি চর-শিশোধীতে কিছু মুসলমানেরও বাস আছে। তারা সাধারণভাবে হিন্দুদের সঙ্গে মিশ্রিতই হয়ে আছে—এ গ্রামে দশ ঘর, ও গ্রামে পনর ঘর, এই রকম ; এ ভিন্ন সমস্ত চাকলাটায় একেবারে নিছক মুসলমান নিয়ে একটা গ্রাম আছে, নাম হাসানপুর। জায়গাটা স্বরূপগড় থেকে মাইল পাঁচেক দূরে মূল নারায়ণীর একেবারে তীর ঘেঁসে ; বড় গ্রাম, প্রায় দেড় শত ঘরের বসতি, সমৃদ্ধও। নিজ স্বরূপগড়ে দশ বারো ঘর মুসলমানের বাস।

অল্প অল্প গুঞ্জন উঠল চর-শিশোধীতে। রঘ্‌ঘুবাবুর কাছে চরের মুসলমানেরা পৌঁছুল, সমস্ত গ্রাম থেকেই দু'একজন করে একত্র হয়ে। রঘ্‌ঘুবাবু তাঁর খদ্দরেব বস্ত্রটা দেখিয়ে তাদের আশ্বাস দিলেন। ওরা চলে গেলে একদিন পরে এল হিন্দুরা, চরের কাজে যারা অগ্রণী—লীডার বলতে পারা যায়—জনতা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তারা বলছে এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে—মুসলমানদের মতে সেটা জাতীয় সংঘর্ষই—চর-শিশোধীর এই নিষ্ক্রিয়তা কাপুরুষতাতেই দাঁড়াচ্ছে, চারিদিকে তার বদনাম যাচ্ছে রটে।

জনতার নামে কথাগুলা বললেও রঘ্‌ঘুবাবু বুঝলেন যারা বলতে এসেছে তাদের অন্তরের কথা। তাঁর এতদিনের ব্রত এই বৃদ্ধ বয়সে নষ্ট হতে চলল নাকি ? মনে মনে ক্ষুণ্ণই হলেন, কিন্তু বাইরে সে ভাবটা না দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—'একটা কথার উত্তর দিন আপনারা—সংযম কি কাপুরুষতা ? অন্তত আপনারা কি এই শিক্ষাই এতদিন ধরে পেয়েছেন ?'

সবাই চুপ করে মাথা নীচু করে রইল, শেষে একজন মাথা তুলে প্রতিপ্রশ্ন করলে—'কাপুরুষতাকে কি অনেক সময় সংযমের পোশাক পরিয়ে গৌরবান্বিত করা হয় না ?' নও-জোয়ান, খদ্দরপরিহিতই, কিন্তু চোখের দৃষ্টি আর সবাইএর চেয়ে একটু অন্য রকম ; বেশ সোজা মুখ তুলে অকুণ্ঠস্বরে উত্তরটা দিলে।

বাবু রঘুবীর সিংএর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এ ধরনের প্রতিপ্রশ্ন, চোখ তুলে ছেলেটির দিকে চাইলেন ; তাঁর অত বিশিষ্ট চেহারার মধ্যে আবার সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিল তাঁর চোখদু'টি, বিশাল আর রক্তপ্রান্ত ; রক্তরেখাগুলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যে, তখুনি দৃষ্টি শান্ত করে সে ছেলেটিকে বললেন—'তুমি এখানে এস।'

ছেলেটি এসে ডান হাতটা তার পিঠে দিয়ে বললেন—"আমার পাশে ব'স তুমি।"

একটা থমথমে ভাব রইল ছেয়ে। একটু পরে বাবু রঘুবীর সিং পিঠে হাত দিয়েই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—"আমার বয়স আশির কাছাকাছি হয়ে এল; এবার তো চর-শিশোধীর ইজ্জৎ তোমাদের হাতেই তুলে দিয়ে যেতে হবে। অন্যায় দিয়েই তার নূতন ইজ্জৎ গড়বে তোমরা?"

—ছেলেমানুষ, এ-ধরনের ব্যবহারে আর এতবড় সম্মানে যুবকের গলাটা একটু ধরে এসেছিল হঠাৎ, তবু কিন্তু পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—'আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু অন্যায় কি আমরা আরম্ভ করেছি?'

'এখানে তো আরম্ভ করতে যাচ্ছ।'

'জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ যখন, একে অন্যায় বলা যায় না।'

'জাতিতে জাতিতে—এ তো ইংরেজের কথা, আর ইংরেজের হাতের খেলনা হয়ে যারা সর্বনাশ করছে দেশের, সেই সব মুসলমানের কথা। তুমি যাঁর চিন্তা আর অভিমতের প্রতীক ঐ খদ্দর পরছ তিনি বলেন—ভাইয়ে ভাইয়ে। কার কথা বিশ্বাস করবে বল?'

যুবক নিরুত্তর রইল। উত্তর দিলে অন্য একজন, বয়স্থ এবং কতকটা নরমপন্থীই, বললে—'মুশকিল হচ্ছে কলকাতা থেকে রোজই কিছু কিছু লোক পালিয়ে আসছে—হিন্দু মুসলমান দুই-ই। আতঙ্কে পালিয়ে আসা এক কথা, কিন্তু গুজব মুসলমানদের অনেকেই লুটের মাল নিয়ে আসছে, কেননা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা থাকায় প্রথম ঝোঁকে এবং পরেও লুট করেছে ওরাই। তার ওপর এমনি আক্রোশ তো আছেই, বিনা দোষে মার খেলে, ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেটা স্বাভাবিক। এই চাকলার মধ্যেই অনেকের বাপ গেছে, ছেলে গেছে, ভাই গেছে!'

রঘুবাবুরও এবার একটু চুপ করে রইলেন, তাঁর পরে বললেন—'যেটা স্বাভাবিক সেটা যে সব সময় ন্যায়সঙ্গত হবেই এমন নয়, আমার বক্তব্য এই—রামের দোষে শ্যামকে মেরে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে কলকাতা। নোয়াখালি করে তুলে কি হবে?…তবে একটা কথা আমি নতুন শুনছি, এই লুটের মাল নিয়ে এসে চর-শিশোধী ভর্তি করা। আমি অথর্ব হয়ে এসেছি, সব জিনিসের সে-রকম খোঁজ রাখতে পারি না, সব কথা কানেও আসে না আমার। চর-শিশোধীকে আমি এ-ভাবে অপবিত্র হতে দোব না এই কথা আপনাদের দিচ্ছি—যারা এ অপরাধে অপরাধী তারা সাজাও পাবে। এক কাজ করুন—যে মুসলমানেরা

আমার কাছে কাল এসেছিলেন তাঁদের কাল বিকেলে আবার একবার আসতে বলুন, প্রতিগ্রামে মুসলমান পাড়ায় একজন দুজন করে লোক পাঠিয়ে দিন তাহলেই হবে ; আর আপনারাও আসুন। আমি সব ঠিক করে দোব, আর গোলমাল থাকবে না।'

তার পর যুবকটির পিঠে আবার হাত দিয়ে জিগ্যেস করলেন—'তোমার নামটি কি বাপু?'

ছেলেটি বললে—'জগৎকিশোর যাদব।'

একটু হেসে প্রশ্ন করলেন—'কি ঠিক করলে?'

যুবক নত হয়ে পায়ে মাথা ঠেকালে, তার পর মুখ তুলে, সেইরকম স্পষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—'আপনার চর-শিশোধীতে আমি অন্যায় হতে দোব না কখনও, প্রতিজ্ঞা করছি।'

রঘুবাবু তাহার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—'আমার আশীর্বাদ রইল তোমার সঙ্গে।'

যুবক বলল—'ক্ষমাও আমার কম দরকার নয়; আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেছি। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলুন!'

রঘুবাবু সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—'আমারও তাই মনে হয়েছিল আগে, আমার ত্রিশ বছর আগেকার দুশ্‌মণ রাগকে তুমি টেনে বের করেছিলে একটু হলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভুল ভেঙে গেছল, ওটা ঔদ্ধত্য তো নয় তোমার, তুমিই আসল সত্যাগ্রহী, ভয়ে বা সঙ্কোচে অন্তরের সত্য বিশ্বাসটা চেপে রাখ নি। তোমার প্রতিজ্ঞাও কখনও ফাঁকা কথামাত্র হয়েই থাকবে না। তোমার প্রায়শ্চিত্তের কথা আসে না, আসে পুরস্কারের কথা—আমি তোমায় একটা বড় কাজের ভার দিলাম। চর-শিশোধীতে পনেরটা গ্রাম আছে, আমার ঘোড়াটা নাও, যে মুসলমান ভাইএরা কাল এসেছিলেন আমার কাছে, ঘুরে ঘুরে তাঁদেরই সবাইকে আবার বলে এস, গ্রামে গেলেই টের পেয়ে যাবে কারা এসেছিলেন।'

পরের দিন যথাসময়ে চরের হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা এসে রঘুবাবুর দেউড়িতে জমা হল। তিনি বিধান দিলেন প্রত্যেক গ্রামে দুজন করে হিন্দু আর দুজন করে মুসলমান নিয়ে একটা অনুসন্ধান পার্টি হবে এবং তাঁরা নির্ণয় করবেন কার ঘরে কি লুটের মাল এসেছে—হিন্দুই হ'ক বা মুসলমানই হ'ক। সেই জিনিসগুলি আপাতত চর-শিশোধীর কংগ্রেসভবনে জমা হবে, আলাদা আলাদা করে সে-সবের একটা পুরো ফিরিস্তি রাখা হবে। যারা লুটের অপরাধে অপরাধী

তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হল চর-শিশোধী তাদের চিরতরেই ছেড়ে যেতে হবে—তা সে বাড়ির কর্তাই হ'ক, বাড়ির ছেলেই হ'ক বা কোন আত্মীয়স্বজনই হ'ক।"

মিশিরজী একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"সাজাটা একটু বেশি হয়ে গেল না? সবার তো সমান দোষও ছিল না।"

মিশিরজী উত্তর করিলেন—"সেই কথা ওরাও বললেন কাকুতি-মিনতি করে, এমন কি কয়েকজন হিন্দুও যোগ দিলে, রঘুবাবুর দেউড়িতে এলে সবারই কেমন একটা উদারতা এসেই যেত। কিন্তু তিনি অনেক ব্যাপারেই নরম হলেও এই জিদটা একেবারেই কড়া হযে ধরে রইলেন। অনেকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এর জন্যে; আমারও মনটা এই কথাটা শুনে প্রথম প্রথম একটু ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার পর এরই সূত্র ধরে একদিন আমার একটা মস্ত বড় সমস্যা মিটে গেল মুকুর্জিবাবু।"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলাম, মিশিরজী বলিলেন—"বড় আশ্চর্যের কথা নয় কি?—যিনি একেবারে সত্য আর ন্যায়ের মূর্তি হয়ে দাড়িয়েছিলেন্ শেষ জীবনে, এই অপরাধটা এত বড় করে দেখলেন কেন? দাঙ্গায় লুটতরাজ করে এনে ঘর ভর্তি করেছে—এর বেশি কিছু নয় তো? তার পর একদিন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত একটা কথা মনে উঠে সবটা যেন পরিষ্কার হয়ে ওর চরিত্রটাকেও আমার চোখে যেন আরও নির্মল করে দিলে; যৌবনে যখন ওঁর ডাকাতি করার অপবাদ ছিল তখন শেষ দিকে তার সঙ্গে এটাও জুড়ে গিয়েছিল যে লুণ্ঠিত টাকাকড়ি গয়নাপত্র উনি নিজের ঘরে জমা করতে আরম্ভ করেছেন—যা নাকি করতেন না আগে—বড়দের অত্যাচারীদের লুট করে গরিবদেরই পোষণ করতেন। আমি মনে মনে রঘুবাবুর চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে চরিত্রের যে কল্পচিত্রটি এঁকেছিলাম, এই মসীরেখাটুকু তাকে যে বিকৃত করেছিল, আমি যে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম এটা অস্বীকার করব না আমি। ওঁর এই জিদ দেখে আমার আর সন্দেহ রইল না যে ও-অপবাদটা সর্বৈব মিথ্যা। এই যে হীনবৃত্তি, এই যে আত্মম্ভরি লালসা, এটাকে উনি নিজের জীবনে প্রশ্রয় দেন নি কখনও বলেই এদের মধ্যেও তা ক্ষমা করতে পারলেন না কোন মতে। উনি দাঙ্গাটাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন—নিজের নিজের স্বার্থের জন্যে কতকগুলো লোক মানুষকে ধর্মের নামে নাচিয়ে পাগল করে তুলেছে; কিছু মাথা না গিয়েই পারে না সামলাতে সামলাতেও; কিন্তু শেয়ালের মতন এই হেয় সঞ্চয়-বৃত্তি কেন? এই সঙ্গে আরও একটা কথা ছিল,—চর-শিশোধীর সম্বন্ধে তাঁর

অপরিসীম শ্রদ্ধা,—তিনি এ পবিত্র ভূমিকে কলুষিত হতে দেবেন না, শৃগালবৃত্তিকেরা বাইরে গিয়ে তাদের পাশবিকতা চরিতার্থ করুক।

কিন্তু এর ফল হল অন্য রকম। সেকথা পরে বলছি। আপাতত কয়েকদিন সব ঠাণ্ডা রইল। লুটের মাল যথানির্দেশ কংগ্রেস অফিসে জমা হতে লাগল। মুসলমানদের মধ্যে একটু অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল বটে, বিশেষ করে হাসানপুরের মতন জায়গায়, কিন্তু তারা কিছু বলতে সাহস করলে না। হয়তো লুটের অপরাধীদের মধ্যে যারা তেমন নজরে পড়ে নি সবার, তাদের কিছু কিছু রইল লুকিয়ে, কিন্তু অধিকাংশকেই যেতে হল—অন্তত কিছুদিনের জন্যে ; বৃহত্তর বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে গ্রামের মুখিয়াবা ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলে, তা ভিন্ন বাবু রঘুবীরসিংএর সংস্পর্শে এসে বয়স্থ মুসলমানদেব মধ্যেও এমন অনেকে ছিল যারা এই সমস্ত ব্যাপারটাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখে পারছিল না। বেশ ঠাণ্ডা হল চর-শিশোধী।

কিন্তু এই অতি-কঠোরতার কুফলটা ফলল অন্যদিক দিয়ে। আস্তে আস্তে একটা ধারণা হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠতে লাগল যে, বাবু রঘুবীব সিং মুসলমানদের ওপর বিরূপ হয়েছেন , স্পষ্ট বলছেন না, তবে এই যে একবকম লঘু পাপে গুরু দণ্ড এটা তারই অতি স্পষ্ট সঙ্কেত। লোকের মাথা তখন গরম, নদী পেরিয়েই চারিদিকে লুট, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড চলছে, বিহারেব চারিদিক থেকে নিত্যই এসে পড়ছে গরম গরম খবর, ওরা আর ওঁর চরিত্রের মূলমন্ত্রটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে না যে, এই প্রবঞ্চনা, এই পেটে-এক মুখে-এক ওর পক্ষে কতটা অসম্ভব। ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠছে, নোয়াখালির নিত্যনতুন খবব আসছে—উগ্র, সত্যমিথ্যায় মাখামাখি। ওরা নিশ্চেষ্টতাব অসহিষ্ণুতায় মনে মনে ছুতো খুঁজছিলই, এইটুকুকেই নিজের মনের বঙে রাঙিয়ে প্রতিশোধেব জন্যে তোযের হয়ে উঠতে লাগল ভেতরে ভেতরে।

তিন দিন পরের কথা। সব ঠিক যাচ্ছে, লুটের মাল আজও কিছু পৌছে দিয়েছে, আরও কয়েকজন বহিষ্কৃতহয়েছে সে খবরওপেয়েছেন আজ, চর-শিশোধী ঠাণ্ডা। একমাত্র নতুন খবর, দুটো নদীতেই বন্যার জল আরও ঠেলে উঠেছে··· ভাল, বাইরের এই হত্যালিপ্ত জগৎ থেকে চর-শিশোধীকে যতটা বিচ্ছিন্ন করে দেন মা নারায়ণী···রাত বারোটার সময় নিশ্চিন্ত এবং কতকটা প্রসন্ন মনেই তাঁর গীতাপাঠ, চরখা-কাটা শেষ করে শোবার ঘরে প্রবেশ করেছেন রঘুবাবু, এমন সময় চাকর এসে খবর দিলে একটি ছোকরা ডাকছে, বললে বিশেষ জরুরী কাজ।

বাইরে এসে দেখেন জগৎকিশোর। উত্তেজনায় মুখটা রাঙা, চুলগুলো উষ্কখুষ্ক, বেশ টের পাওয়া যায় দৌড়েই এসেছে; ঘেমেছে, সংযত হবার চেষ্টা করেও একটু একটু হাঁপাচ্ছে;

রঘুবাবু প্রশ্ন করলেন—'কি ?—এত রাত্রে তুমি যে—এভাবে ?'

'গোকুলচরের মুসলমানদের ওপর হামলা হবে।'

'কারা করবে ?'

'নরসিংপুরের গয়লারা, সুঁতির ওপার থেকে এসে।'

বয়সে রঘুবাবুর কণ্ঠ শিথিল হয়ে এসেছে, তবু হঠাৎ উত্তেজনায় খন্‌-খন্‌ করে উঠল— নরসিংপুরের কি অধিকার আমার এলাকায় পা দেবার ?'

তখুনি হুঁশ হল জগৎকিশোরের কাছে এর উত্তর নেই। সংযত করে নিলেন নিজেকে, কিন্তু তখনও ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, প্রশ্ন করলেন—'কখন ?'

'সেটা ঠিক জানি না, তবে সকাল পর্যন্ত নিশ্চয়। আর একটা কথা, নামটা নরসিংপুরের কিন্তু এপারেই দূরের দূরের কয়েক গ্রামের লোকে করবে কাজটা, কিছু নৌকা থাকবে ওপারের, তার সঙ্গে এপারের নৌকা সব যোগ দেবে।'

'কেন ?'

প্রশ্নটা করেই উত্তর রঘুবাবু নিজেই পেয়ে গেলেন, দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—'ও! আমায় খাতির! রঘুবাবুর ভয়! এ প্রহসনের দরকার ?... কে আছে এখানে ?'

চাকর এসে দাঁড়ালে বললেন—'আমার ঘোড়ায় জিন্‌ কষতে বল্‌।'

জগৎকিশোরকে বললেন—'তুমি স্বরূপগড়ে তাড়াতাড়ি জানিয়ে দাও চারিদিকে যে আমি গোকুলচরে যাচ্ছি, তার পর সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে তুমি যত শীগগির পার চলে এসো।'

গোকুলচর প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, ঠিক সুঁতির ওপর। গ্রামটা হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত গ্রাম, প্রায় আধাআধি, সবসুদ্ধ সত্তর-আশি ঘর লোক হবে। রঘুবাবু যখন ঘোড়ায় করে গিয়ে পৌঁছলেন তখন রাত প্রায় দেড়টা হবে। মুসলমান পাড়াতেই গিয়ে উঠলেন, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, পাড়ার মাঝামাঝি একটা খোলা জায়গায় একটা পাকুড়গাছের নীচে অনেকে জমা হয়েছে, লাঠি, ফরসি বর্শাও আছে অনেকের হাতে। রঘুবাবুকে দেখে সবাই ঘেরে ঘুরে হৈ হৈ করে দাঁড়াল। জিগ্যেস করলেন—'এখানকার হিন্দুরা নেই তোমাদের মধ্যে ?'

বয়স্থ গোছের কয়েকজন এগিয়ে এল, জড়াজড়ি করে উত্তর দিলে—'তারা

বললে ওপার থেকে ওরা এসে পডলে তারা এসে বাধা দেবে…কযেকজন বললে —'হুজুর…সবাই নয় ‥'

'বাকি সবাই তাদেব সঙ্গে যোগ দেবে ?'

'যোগ হয়তো দেবে না…কিছু কিছু হয়তো পারেও দিতে‥ তবে আমাদের সাহায্য কেউ করতে আসবে বলে আমাদেব বিশ্বাস নেই হুজুব‥ '

'গ্রামে প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে গিয়ে বল রঘুবাবু এসেছেন, প্রত্যেক ঘবের সমর্থ লোককে আসতে বলছেন যা অস্ত্র আছে হাতে নিয়ে।· দাডাও, এমনি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কে ঘোডা চডতে পাব তোমাদেব মধ্যে ?'

অনেকেই পারে বলে এগিয়ে এল। একজনকে বেছে নিয়ে রঘুবাবু বললেন —'আমাব ঘোডাটা নিয়ে যাও, অবিশ্বাসেব ছুতো কবতে পাববে না কেউ।'

কথা স্বভাবতই কম কইতেন, লোকটা চলে গেলে একেবাবে চুপ কবে একদিকে স্থিবদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে বইলেন।

হিন্দুরা জমা হতে লাগল দু'দশ জন কবে, আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টাবেব মধ্যে প্রায় শ'তিনেক হিন্দু হল জমা। রঘুবাবু মুসলমানদেব বললেন, 'তোমরা সবাই বাড়ি যাও, ইচ্ছে হয় জেগে থাকতে পাব, তবে কোন ভাবনা নেই, হিন্দুর অন্যায়েব জন্যে হিন্দুবাই প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কববে।'

জগৎকিশোর এসে পৌছুল, একটা সাইকেল যোগাড কবেছে। বললে, স্বরূপগডের হিন্দুরা আসছে, পথেও যে গ্রাম পডেছে, বলতে বলতে এসেছে জগৎ-কিশোর। কাছে পিঠেব গ্রাম থেকে জুটতেও লাগল হিন্দুরা, সবাই হাতিয়ার-বন্দ্। দলবল নিয়ে রঘুবাবু নদীব তীরে এসে দাঁড়ালেন। কতক কতক লোককে গ্রামটার অন্যদিকে গিয়ে পাহাবা দিতে বললেন, জমির দিক থেকে আক্রমণের ব্যবস্থা না করে নৌকো থেকে নামা যে দুষ্কর এটা আব কেউ না বুঝুক তাঁর বুঝতে দেরি হল না।

ভরা জ্যোৎস্না বাত্রি, বন্যাব গৈরিক জলে সুঁতিটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, এ কূল থেকে ও-কূল দেখা যায় না। লোকে বলাবলি করে, নদী বোধ হয় এবার পুরনো খাতেই নামবে। যতদূর দৃষ্টি যায় একটিও নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। আস্তে আস্তে উষার আলো ফুটল, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত হল, কোথায় নৌকো ? আরও একটু আলো স্পষ্ট হওয়ার পর দেখা গেল বহুদূরে কতকগুলো নৌকো প্রাণপণে দাঁড ঠেলে যেন উত্তর দিকে চলেছে।

গ্রামের মধ্যে চর ছিল ওদের। সুঁতির ওপরেই আগে থাকতে খবর পৌছে

গেছল স্বয়ং রঘ্‌ঘুবাবু মুসলমানদের আগলে দাঁড়িয়েছেন,—নামা তো দূরের কথা, কেউ চেহারা দেখাতেও সাহস করলে না।

মনে হল চর-শিশোধী নিরুপদ্রব হল, কিন্তু এই সময় বিহারের হাওয়াটা বড় এলোমেলো হয়ে উঠল। মহাত্মাজী বললেন বিহার ঠাণ্ডা না হলে তিনি আমরণ উপবাস করবেন। দিল্লী থেকে বড়লাট এসে পড়লেন, নেহ্‌রুজী এলেন, বললেন—হিন্দু ঠাণ্ডা না হলে ওপর থেকে বম্‌ বর্ষাবার ব্যবস্থা কববেন। হিন্দুদের ওপর চলল গুলি। মহাত্মাজীর প্রাণের ভয়েই হ'ক বা নিজেদের প্রাণের ভয়েই হ'ক, হাঙ্গামাটা যেমন হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ নরম হয়ে এল।

মুসলমানদের মধ্যে কিন্তু এর প্রভাব অন্যরকম হল। অবস্থাটা বেশ স্থির-ভাবে না বুঝে তারা উলটে মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে—বিশেষ করে যেখানে সংখ্যায় বেশি। পবে শুনেছি ঠিক এই সময়ে ছোট-বড় কয়েকটা দাঙ্গা তাদেরই শুরু করা। দূরের কথা ভাল রকম জানি না, কিন্তু চর-শিশোধীতে কতকটা সেই ধরনেব ব্যাপার হল।

আগেই বলেছি হাসানপুরে বরাবরই একটু অন্যরকম ভাব ছিল, সব লুটের অপরাধীকে সেখান থেকে তাড়ানো হয় নি বা তাড়াতে পারা যায়নি, লুটের মালও থেকে গিয়েছিল অল্পবিস্তর। এই সময় আবার সাহায্য দেবার ছুতোয় অনেক পাঞ্জাবী মুসলমান বিহারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চর-শিশোধীতে সাহায্যের কোন প্রশ্নই না থাকলেও তাদের অনেকগুলো পড়ল ঢুকে। তারা ঘুরে ঘুরে মুসলমান-দের মনে বিষ ঢেলে বেড়াতে লাগল। বিশেষ করে হাসানপুরে গুঞ্জন গেল বেড়ে, সেখানে পাঁচ-সাত ঘর হিন্দু ছিল, তারা মেয়েছেলেদের দিলে সরিয়ে।

গোকুলচরের মুসলমানেরা নাকি একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে শোনা গেল; হাসানপুরের মুসলমানেরা নাকি তাদের 'অওরাৎ' বলে ঠাট্টা করছে, তারা হিন্দুর পাহারার জোরে, তার দয়ায় বেঁচে আছে।

এই সময় বাবু রঘুবীর সিং-এর শরীরটা বেশ অসুস্থ যাচ্ছিল। বয়স হয়েছে অতিরিক্ত, সেদিন গোকুলচরে রীতিমত অত্যাচারও গিয়েছিল দেহমনের ওপর দিয়ে। তবুও সবাইকে ডেকেডুকে তিনি ঠাণ্ডা করে রাখলেন। এই ডাকার মধ্যেও একটি ব্যাপার হতে লাগল ক্রমেই বেশি করে—মুসলমানরা কম আসতে লাগল, কোন কোন স্থলে ছুতানাতা করা সত্ত্বেও মনে হল ইচ্ছে করেই, কোন কোন স্থলে যারা আসতে চায় তাদের রুখে রাখলে। তবে এলও অনেকে, সম্প্রদায়ের দিক থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলে। এ সব ছোটকথা যে তিনি বড় করে

দেখবার লোক নয়, আহত হয়ে তাদের মনের ভাবটা যে কতকটা এ রকম হওয়াও স্বাভাবিক—এইসব বলে তাদের সান্ত্বনা দিলেন রঘ্‌ঘুবাবু। হিন্দুরাও এদিকে বিচলিত হয়ে উঠেছে। জগৎকিশোর একদিন একা পেয়ে হাত কচলে বললে—'অন্যায় বড বেড়ে যাচ্ছে যে—লুটের মাল আবার অবাধে আসতে আরম্ভ হয়েছে, সেই সব লোকেরাও অনেকে আসছে ফিরে।'

রঘ্‌ঘুবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন—'মনে কর আমি নেই জগৎকিশোর—দেখছ তো, না থাকার মধ্যেই—তোমার হাতে চর-শিশোধী রয়েছে মনে করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যাও। যতই করুক, ওরা উলট হাঙ্গামা বাধাতে কোন মতেই সাহস করবে না। এদিকে গবর্নমেণ্টও খুব সতর্ক হয়ে উঠেছে, এই রকম লোক আর এই রকম চোরাইমালের ব্যবস্থা এবাব তারাই করবে, আমাদের ভাবতেও হবে না।'

হঠাৎ জগৎকিশোরের হাত দুটো ধরে মিনতির স্বরে বললেন—'জগৎ, মনে হচ্ছে আমার দিন হয়ে এসেছে, যাবার সময় আমার সোনার চর-শিশোধীকে রক্তরঙীন দেখে যেতে হবে তোমরা থাকতে ?'

চোখ দুটো ছলছল করে এল,—যে-চোখে কেউ কখনও অশ্রু বলে জিনিস দেখে নি।"

মিশিরজী একটু চুপ করিলেন, তাহার পর আমায় প্রশ্ন করিলেন—"কি রকম লাগছে মুকুর্জিবাবু ?—একটা মহাকাব্যের সম্ভাবনার দিক দিয়ে জিজ্ঞেস করছি।"

বলিলাম—"ভালই; কাঠামোটা ভালই বলে মনে হচ্ছে তো।"

"শেষটা শুনুন এইবার। সহিষ্ণুতা যখন তার পরীক্ষায় প্রায় উত্তীর্ণ, সেই সময় ব্যাপারটা হল।"

কতকটা সুস্থ হয়েছেন রঘ্‌ঘুবাবু। ওরা যখন ডাকলে ভাল মনে আসছে না তখন গুরু মহাত্মাজীর মতনই ঠিক করেছেন নিজেই একবার যাবেন হাসানপুরে। ঘোড়ার ওপর আর সম্ভব নয়, পালকির ব্যবস্থা করতে গেছে। রঘ্‌ঘুবাবু নিজের বৈঠকখানায় বসে আছেন, এমন সময় আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি যুবক বাইরের বারান্দায় এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে।

প্রশ্ন করলেন—'কে ? কোথা থেকে আসছ ?'

'আসছি হাসানপুর থেকে।'

হাসানপুরের নামে রঘ্‌ঘুবাবু একটু সচকিত হয়ে উঠলেন, প্রশ্ন করলেন—'কি খবর ? এস ভেতরে এস।'

যুবকটি ভেতরে এসে নিজের কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটি খুব ছোট্ট করে ভাঁজ-করা কাগজ বের করে হাতে দিলে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই ভাঁজটা খুললেন রঘুবাবু, তার পর চশমাটা চোখে দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু চেয়ে থেকে বললেন—'মনে হচ্ছে বাংলা লেখা, কোথায় পেলে এটা ?'

যুবক বললে—'হাসানপুরেই আমাব বাড়ি, আমি জাতিতে নাপিত। আমার বোন ঐখানে মুসলমানদের বাড়িতে মেয়েদেব নোক কেটে দেয়, মেহদি পরিয়ে দেয়। মহবুব মিয়াব বাড়িতে একটি ময়ে নোক কাটাতে কাটাতে খুব লুকিয়ে চিঠিটি আমাব বোনের হাতে দিয়ে দেয়। মেয়েটি নতুন এসেছে ও বাড়িতে, বয়স তেইশ-চব্বিশ, ওবা এক আত্মীয়া বলে পরিচয় দিয়েছে, নাকি গাজীপুর থেকে এসেছে। বলে বোবা। আব একটা কথা, দুদিন দেখেছে মেয়েটিকে, সর্বদাই দু'তিন জন তার কাছে কাছে থাকে। চিঠিটি নিয়ে আমাব বোন সোজা আপনাব কাছেই আসতে বলে দিযেছে, আর কোথাও দাড়াই নি আমি।'

রঘুবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'মেয়েছেলে!···বোবা!···গাজীপুর থেকে!' —ঘবে পায়চারি করতে করতে কথাগুলোর মধ্যে থেকে যেন নতুন অর্থ বের কববার চেষ্টা কবতে লাগলেন। একটু পরে যুবকটিকে জিগ্যেস করলেন—'বাঙালী নেই কাছাকাছি কেউ ?'

ওর উত্তরের অপেক্ষা না করেই চাকরটাকে ডেকে পাড়ার জন দুই লোকের নাম করে তাদের ডেকে আনতে বললেন।

তাদের কাছেই টের পাওয়া গেল মাইল ছয়েক দূরে বিলৌরি গ্রামের মিড্‌ল্‌স্কুলে একজন বাঙালী সম্প্রতি হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। তাদের মধ্যে থেকেই একজন বঘুবাবুর ঘোড়া নিয়ে ছুটল। তখন বিকেল হয় হয়, সন্ধ্যে পর্যন্ত সে চিঠিটা তর্জমা করিয়ে ফিরল। লেখা আছে—আমি নোয়াখালির বাঙালী, কে হিন্দু আছেন বাঁচান, সব যায়।

রঘুবাবু যেন পাগল হয়ে উঠলেন, বললেন—'জগৎকিশোর কোথায় ?'

দু মাইল দূরে জগৎকিশোরের বাড়ি, তখুনি ঘোড়ায় করেই লোক ছুটল। ফিরে এসে বললে সে আজ তিনদিন বাড়ি নেই।

এতটা আত্মসংযম হারাতে আজ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কেউ দেখে নি রঘুবাবুকে। যারা দুজন এসেছিল তারা আরও জনতিনেক লোককে ডেকে আনিয়েছিল—এরা পাঁচ জনেই রঘুবাবুর মতনই সত্যাগ্রহে প্রকৃত বিশ্বাসী। অনেক করে তাঁকে শান্ত করলে, বোঝালে গোলমাল করলে মেয়েটিকে সরিয়ে

ফেলতে পারে, এমন কি হত্যাও করে লাস লুকিয়ে ফেলতে পারে। ঠিক হল পরদিন জন চার-পাঁচ মুখিয়া গোছের মুসলমানকে ডেকে তাদেরই মেয়েটিকে আস্তে আস্তে উদ্ধার করে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেতে। পাছে বাইরের হিন্দু দেখলে কেউ সন্দেহ করে এইজন্যে আলিজান বলে স্বরূপগড়েরই একজন বিশ্বাসী মুসলমানকে পাঠানো হল।

সন্ধ্যের একটু পরে বেরিয়ে সে রাত বারোটার পর ফিরে এল। বললে দুজন আসতে চাইল না, জনতিনেক আসছিল, গ্রাম থেকে খানিকটা এগিয়ে আসতে বেশ একটা ছোটখাটো দল এসে তাদের টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, একজন একেবারে বুড়ো, বাকি দুজন মারধোরও খেলে একটু আধটু। আলিজান ঘোড়াটা মাইল খানেক দূরে একটা হিন্দুর বাড়িতে রেখে গিয়েছিল, কোন রকমে পালিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে।

ক'জনে উদ্বিগ্নচিত্তে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছিলেন। রঘুবাবুর মুখ চোখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হয়ে উঠেছে। ওরা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে, বললে—'আমরা যাচ্ছি—এক্ষুনি, নিজেরা একবার চেষ্টা করি।'

ত্রিশ বৎসর আগেকার কণ্ঠস্বর ফিরে এল রঘুবাবুর কণ্ঠে—'চেষ্টা!—চেষ্টা কাদের সঙ্গে করা চলে আপনারা এখনও বুঝলেন না! ··কে আছে বাইরে?'

একটা অস্বাভাবিক কিছু চলেছে, চাকর-বেয়ৎ মিলে ছ'সাতজন বারান্দায় অপেক্ষা করছিল, সামনে এসে দাঁড়াল। রঘুবাবু সেই রকম বজ্রকণ্ঠে বললেন—'আমি চর-শিশোধী থেকে হাসানপুর মুছে ফেলতে যাচ্ছি—মেয়েছেলের ইজ্জতের যার একটুও খেয়াল আছে—বালক থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত, সবাইকে যেতে বল্—যাদের ঘোড়া আছে তারা আমার সঙ্গে চলুক।'

ঘোড়া ছিল ক্লান্ত, পৌঁছুতে প্রায় ভোর হয়ে গেল, রঘুবাবু একেবারে মহবুব মিয়ার বাড়ি গিয়ে উঠলেন। ক্লান্তিতে ক্রোধে অসংযত হয়ে রয়েছেন, পথে একটি কথা উচ্চারণ করেন নি। মহবুব বেশ সম্পন্ন বড় গৃহস্থ, চামড়ার বড় কারবার আছে। সবে দু'পাঁচ জন উঠেছে, তার মধ্যে মহবুবের বড় ছেলে সেলিম। সাত আট জন ঘোড়সওয়ারের হঠাৎ আবির্ভাবে সদ্যোত্থিত গ্রামে ওরই মধ্যে একটু সাড়া পড়ে গেছে, জন দশ বারো লোক জড়ো হয়ে গেছে। রঘুবাবু বজ্রকঠোর স্বরে সেলিমকে আদেশ করলেন—'তোমার ঘরে নোয়াখালির একটি হিন্দু মেয়ে আছে, বের করে আনো।'

কি যে হল ঠিক বলা যায় না, বোধ হয় মেয়েটিকে এতদিন লুকিয়ে রেখে

একটা নাম কিনে এতগুলো লোকের সামনে সেলিম আর ভীরুতার অপবাদটা নিতে চাইলে না। বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই বললে—'আমার এখানে কেউ নেই।'

বাবু রঘুবীর সিংএর স্বর এক পরদা আরও চড়ল—'আছে, আমি ভেতরে গিয়ে দেখব।'

ওদিকেও এক পরদা চড়ল—'কোন হিন্দু মুসলমানের জেনানায় ঢুকতে পারে না।'

'আমি আশি বছরের বৃদ্ধ, দোষ নেই, এর চেয়ে ঢের বড় দোষ করছ তোমরা।'

আরও লোক জমতে আরম্ভ করেছে, কারুর কারুর হাতে হাতিয়ার। সাহস বাড়ার জন্যেই হ'ক বা পরমায়ু কমার জন্যেই হ'ক, সেলিমের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল…'বুড়ো হলেও কাফের, আমি…'

আর শেষ করতে হল না। খাপে তলোয়ার ছিল, সেলিমের কাঁচা মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে ধড় থেকে পড়ল ছিটকে।

সেই হল সঙ্কেত। ঘোড়া ক্লান্ত থাকার জন্যে রঘুবাবুর দেরি হয়ে গিয়েছিল, স্বরূপগড়ের হিন্দুরা প্রায় এসেই পড়েছিল; আরও অনেক গ্রামের হিন্দু—জানেনই, এসব খবর যেন হাওয়ায় ওড়ে। সেই সকাল থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত চলল ধ্বংসলীলা, হত্যা, অগ্নি-কাণ্ড। মহবুব মিয়ার বেটাছেলেদের কেউই রইল না। দু'চারটি শিশু আর জেনানার মেয়েদের পাশে নিয়ে রঘুবাবু স্থিরদৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে একটি মেয়ে কাপড়ে ঢাকা তাঁর পায়ের কাছে শোয়ানো। তার গলার প্রায় সমস্তটা কাটা। কোথা থেকে একটু সিঁদুর যোগাড় করে শেষ মুহূর্তে বোধ হয় সীমন্তে দিতে যাচ্ছিল, দুটি আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে।

সম্মোহিতের মতন স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রঘুবাবু, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। হাসানপুর ক্রমেই একটা অঙ্গারস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, সুঁতির গৈরিক জল হয়ে উঠছে রক্ত-রাঙা। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হয়ে এসেছে তাঁর যেন হুঁশ হল। হুঁশ হওয়া অর্থাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরুল, জিগ্যেস করলেন—'এটা কি জায়গা?'

পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল বললে—'হাসানপুর হুজুর।'

রঘুবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন একটু, যেন কি ভাবছেন, তার পর বললেন—'ও! নোয়াখালির সেই মেয়েটি!…মনে পড়ছে।'

কাপড়ে ঢাকা মেয়েটির দেহ পাশেই শোওয়ানো। দৃষ্টি ঘুরিয়ে তার দিকে

একটু চেয়ে রইলেন, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল, কতকটা আপন মনেই তুলসী-রামায়ণের একটা দোঁহা বিড় বিড় করে আওড়ালেন, তার পর আপন মনেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললেন—'হবেই, মেয়ের ওপর অত্যাচারে সোনার লঙ্কা ছারখার হয়েছিল। আমি কি করতে পারি!…'

তার পরেই কণ্ঠস্বর গেল বদলে, দৃষ্টিতে ভরে উঠল আতঙ্ক, যেন হঠাৎ এমন একটা কি সর্বনাশের কথা মনে পড়ে গেছে যার সামনে এ সংহার-লীলা অতি তুচ্ছ। ডান হাতটা একটু সুমুখের দিকে বাড়িয়ে খদ্দরের আস্তিনটার দিকে চেয়ে বললেন—'কিন্তু আমার খদ্দর!—আমার ত্রিশ বৎসরের ব্রত!—আমি যে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ যে-দেহমনকে খদ্দরে আবৃত করলাম তাদের দ্বারা কখনও হিংসার আচরণ হবে না—তার কি হল?…'

পাশের লোকেরা বললে—'হুজুর তো চেষ্টা করেছিলেন…'

রঘ্‌ুবাবু অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে চাইলেন, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন—'চেষ্টা নয়; চেষ্টা করলাম—ওটা তো একটা কথার প্যাঁচ। রাখলাম না সে প্রতিজ্ঞা!—কি হবে? হাসানপুর প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হল—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি করে হবে?…কি হল!'

তার পর ব্যাপারটা এত হঠাৎ হল যে কেউ যেন মাথার ঠিকই রাখতে পারলে না। প্রায় হাত ত্রিশেক দূরে মহবুব মিয়ার একটা পাহাড়প্রমাণ পোয়ালের ডাঁই জলতে জলতে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল—কাঠাখানেক নিয়ে একটা আগুনের চাপ। ভরা যৌবনের শক্তি আর ক্ষিপ্রতা পায়ে করে বাবু রঘুবীর সিং হঠাৎ সেইদিকে দিলেন ছুট—মুখে শুধু—'আমার খদ্দর!—আমার প্রতিজ্ঞা!—আমার প্রায়শ্চিত্ত!'—ব্যাপারটা কেউ বুঝে ওঠবার আগেই সমস্ত শক্তি একত্র করে সেই গনগনে আগুনের মাঝখানে দিলেন ঝাঁপ।"

… … …

মিশিরজী চুপ করিলেন। যুবক সামান্য একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—"বোধ হয় শেষ হয়েছে আপনার, এবার আমার কথাটা বলি—বাবু রঘুবীর সিংকে একটু দেখতে যেতে হবে, তিনি অসুস্থ।"

মিশিরজী প্রশ্ন করিলেন—"কোন রঘুবীর সিং?"

"স্বরূপগড়ের—যাঁর কথা আপনি বলছিলেন।…আমার নাম জগৎকিশোর।"

মিশিরজী একটুও অপ্রতিভ হইলেন না, নিতান্ত সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"অসুখটা কি? কবে থেকে…?"

আমি আর নিজের কৌতূহল চাপিতে পারিলাম না, মিশিরজীর প্রশ্নের মাঝ-খানেই যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আগুনে দেন নি ঝাঁপ তিনি?"

যুবক কবিরাজকে বোধ হয় সাক্ষাৎ ভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস করে নাই, আমার প্রশ্নে মনের ভাবটা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া বেশ একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলিল—"আমাব গুরু শিশোধিয়া রাজপুত, অন্যাযের জন্যে দুর্বৃত্তকে সাজা দিয়েছেন, এর মধ্যে প্রাযশ্চিত্তের কথা কোথা থেকে আসে? সাজা দিতে অসমর্থ হলেই বরং করতেন প্রায়শ্চিত্ত…"

বর্ধিত কৌতূহলেই আবার প্রশ্ন করিলাম—"তাহলে ব্যাপারখানা…?"

"মোটামুটি ঐ, তবে…"

মিশিরজীব মুখের পানে চাহিয়া অল্প একটু হাসিল, ঐ, কবিরাজ বলিয়াই সমালোচনাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ করিল না।

শূন্য পুরাণ

পূজার ছুটি এসে গেল। মেয়েদের হোস্টেলের একটা নাটক ছিল, রাত দশটার সময় গেল ভেঙে।

মণিমালার ছিল নায়কের ভূমিকা। বাংলার অগ্নিযুগের একটি ছেলে, চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স, দেশের জন্য আত্মাহুতি দিল, যা হলে বিপ্লব চলে না, কিন্তু যা না হলে নাটক হয় অচল, প্লটটা মোটামুটি এই। তারই সঙ্গে এক দিক থেকে ব্যর্থ প্রেমের একটু তপ্তশ্বাস আছে; বইটি কলেজেরই একজন প্রফেসারের লেখা।

চমৎকার অভিনয় করলে মণিমালা, হাততালি যেন একচেটে করে নিয়েছে। শেষ হলে এল প্রফেসারদের, মেয়েদের অভিনন্দন। সেটার বেগ কমে এলে মণিমালা স্টেজের বাইরে খানিকটা তফাতে একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে দাঁড়াল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি, এতদিন পার্ট তোয়ের করার মধ্যে নিজের ভূমিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে যে ভাবটা লেগে থাকত মনে, আজ অভিনয়ের সাফল্যে, সবার অভিনন্দনে সেটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভেতর থেকে একটা বীর-রস যেন ফেনিয়ে উপচে পড়ছে, সেই সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের একটা কারুণ্যও। পুরুষের মন তাহলে এই!

নভেল পড়েছে, নাটক পড়েছে, অভিনয়ও দেখেছে অনেক, কিন্তু প্রত্যক্ষের এত কাছাকাছি হয়ে এ ভাবে কখনও এ জিনিসটাকে উপলব্ধি করে নি মণিমালা। একবার আগাগোড়া ভাল করে নিজের নূতন সাজটা দেখল ; পায়ে বেটাছেলের জুতা, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, চোখে টরটয়েজ শেলের চশমা ; মেক্-আপ করবার লোক ভাড়া করে আনা হয়েছিল, চুলটাকে বেঁধেছেঁদে অদ্ভুত ভাবে অবিকল বেটাছেল বাবরির মত করে দিয়েছে, খুব হালকা একটু গোঁফ, কানের পাশে, চোয়ালের ওপর দাড়ির অল্প অল্প রেখা আছে। সব মিলিয়ে বিচিত্র এক কাণ্ড যা স্টেজের ওপর এমন করে ঠাহর করবার ফুরসৎ হয় নি। এই কাঠামোর মধ্যে মণিমালা বলে যে একটি মেয়ে ছিল এতদিন, তাকে আর অনুভবই করা যাচ্ছে না।

কি সব আজগুবি আজগুবি কথা মনে হচ্ছে ক্রমে ক্রমে,—এই ধর বাড়ি ফিরে যাওয়াটা, মনটা যেমন একটু উঁচু পর্দায় বাঁধা রয়েছে তাতে একজন পুরুষের অভিভাবকত্বে যাওয়াটা তার যেন কেমন হালকা বলে মনে হচ্ছে, কতকটা আত্মাবমাননাই বলা চলে। কেন এতটা পরাশ্রয়ী হওয়া? ঠিক এর পাশেই আবার নিজের পোশাকের, নিজের দাড়ি-গোঁফের কথা ভেবে একটু হাসিও ঠেলে উঠছে মাঝে মাঝে। গুরু-লঘু দুই-এ মিলিয়ে কি যেন একটা করতে ইচ্ছে করছে মণিমালার, একটা নূতন রকমের কিছু।

স্টেজের দিকে খোঁজ পড়ে গেছে—"মণিমালা কোথায়?…মোনু হঠাৎ কোথায় গেল?"

স্বাতি এসে উপস্থিত হল—"বাঃ, মোনুদি, তুমি এখানে? আর ওদিকে তোমায় গরু-খোঁজা করছে সবাই। প্রফেসার মিত্রের মোটরে তুমি বাড়ি যাবে তো? তাঁরা সবাই তোয়ের…"

মণিমালা কি ভাবছিল; স্বাতির মুখটা চেপে ধরলে, একটু চাপা গলায় বললে—"ওঁকে বল্‌গে আমি অরুণাদির কারে চলে গেছি অলরেডি…যদি জিগ্যেস করেন কার কাছে টের পেলে—নিশ্চয় করবেন না অত খুঁচিয়ে জিগ্যেস—কারুর নাম করে দিস, লক্ষ্মীটি যা, অবিশ্যি যে চলে গেছে তার নাম করবি।"

"তা যাবে কি করে তুমি? রাত প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে এল…"

"বাঃ, কেন, এত বড় বীরের পার্টটা করলাম, আর নিজে একটু একলা বাড়ি যেতে পারব না!"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে, একটু হেসে তার মাথায় হাতটা দিয়ে বললে—"না রে বোকা, আছে ব্যবস্থা তাইতো বলছি, তুই যা, লক্ষ্মী দিদি আমার।"

স্বাতি স্কুল বিভাগের মেয়ে। ছেলেমানুষই, তবু কথাগুলো তার একটু কি-রকম কি রকম লাগল, কিন্তু আর কিছু বললে না, আস্তে আস্তে চলে গেল।

মণিমালা সত্য কথাটাই একটু ঠাট্টার ভাবে বলেছে। আর স্টেজ বা সাজ-ঘরের দিকে ফিরে গেল না। সেইখান থেকেই বেরিয়ে একটু গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে একেবারে খানিকটা দূরে একটা মাঝারি গোছের রাস্তায় গিয়ে উঠল। এখান থেকে তার বাড়ি দুদিক দিয়েই যাওয়া যায়, সারকুলার রোড হয়েও, আবার কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হয়েও। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ঢের কাছে, কিন্তু সেই জন্যেই কারুর না কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, থিয়েটার ভাঙল, এখন সবাই ঐদিককার ট্রাম বাসই ধরবে। মণিমালা হন হন করে সারকুলার রোডের দিকে চলল, এবং পৌঁছুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম পেয়ে গেল।

একেবারে শেষ ট্রাম নয়—শেষ ট্রামের ভরসা করে নিশ্চয় আসতও না মণিমালা—তবু বেশ খালি, রাত অনেকখানি হয়েছে তো। মণিমালা বেশি না এগিয়ে সামনের একটা মেয়েব সীটেই বসে পড়ল। গোটা দুয়েক স্টপেজের পরই একেবারে হুড-মুড করে মাঝারি গোছের একটি দল—অবশ্য বেটাছেলের দল—উঠে পড়ে সমস্ত আসনগুলি ভর্তি করে ফেললে। পরে টের পাওয়া গেল এক জায়গায় সব নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল, কোন জিনিসটা কি-রকম হয়েছিল তার সমালোচনা আছে, ঢেঁকুর আছে, ভরা পেটের রসিকতা আছে, বেশির ভাগই ছেলে-ছোকরা, যুবা। অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রামটা সরগরম হয়ে উঠল। একজন মণিমালার পাশেও বসেছে, একটু বেশি রসিক, অপরিচিত হলেও মণিমালাকেই সাক্ষী মেনে ভোজন-শাস্ত্র সম্বন্ধে দু'একটা সরস মন্তব্য করলে; একটু চেয়ে চেয়ে মুখটা দেখলেও, সুপুরুষকেও তো দেখে থাকে লোকে।...অদ্ভুত লাগছে মণিমালার, আজ অদ্ভুত লাগবার যেন মরশুম পড়ে গেছে।...একটু অন্য ধরনের রসিকতাও করলে, মেয়েদের সীটেই বসে আছে দুজনে, সেই নিয়ে—"তাঁদের কেউ যদি দয়া করে এসে পড়েন মশাই, তো ভরা পেটে উঠে পড়তে হবে।"

মণিমালা বললে—"আমিই না হয় উঠে পড়ব'খন, আপনার অবস্থা বুঝিয়ে বললে আপত্তি নাও করতে পারে, আজকাল অনেকে এসব মাইণ্ড করে না।"

"আপত্তি করে না আপনাদের মতন ইয়ে সম্বন্ধে—আমাদের এই কাটখোট্টা চেহারা, এতে কখনও আমল দেয় মশাই?—নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার আউট্!—তার ওপর আবার খেয়ে কুমীর হয়ে রয়েছি...অসভ্যর মতন ঢেঁকুর মাঝে মাঝে..."

পেটে হাত বুলুতে বুলুতে একটা সন্থ সন্থ উদ্গার করে নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।···এও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আজ মণিমালার,—ঠাট্টাটা গায়ে লাগল শপাৎ করে,—ঐ যে "আপত্তি করে না আপনাদের মতন ইয়ে সম্বন্ধে"—কিন্তু নীরবে পরিপাক না করে উপায় নেই, বরং সত্যিকার পুরুষ এত আলগা মুখের জন্ম সেখানে হয়তো একটা থাবা মারতে পারত, নকল পুরুষকে বেরসিক বলে গণ্য হবার ভয়ে একটু হাসতেও হল, পুরুষে পুরুষেই কথা হচ্ছে তো, এতটুকুও হবে না? বিশেষ করে ত্রিসীমানার মধ্যে যখন কোনও লেডি নেই।

ছোকরা স্থকিয়া স্ট্রীটে নেমে গেল, ও একাই এ-পাড়ার ছিল দলের মধ্যে।

স্থকিয়া স্ট্রীটে উঠল একটি মেয়ে, বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে, স্থন্দরী, সাজ-গোজে মনে হয় একেবারে আপ-টু-ডেট্, বাঁ হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত।

ঐ একটি মাত্র খালি সীট, মণিমালার বাঁয়ে; পাশে এসে দাঁড়াতে পুরুষ সাজার জরিমানা হিসাবে মণিমালাকে উঠে দাঁড়াতে হল। মেয়েটি একটু হেসে বললে—"আপনিও বস্থন···তাতে আর হয়েছে কি।"

নিজে বেশ অসঙ্কোচেই আসন গ্রহণ করলে। মণিমালা একটু থতমত খেয়ে গেছে, লোকটা যা বলে গেল একেবারে তাই!—আর সঙ্গে সঙ্গেই!···তখনও একটু বাকি আছে কিন্তু, মণিমালা বসে না দেখে বেশ একটু ভঙ্গির সঙ্গে ঘাড়টা বেঁকিয়ে মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে বললে—"উলটে আপনারই শুচিবাই দেখছি!"

এবার হাসিটা আর একটু স্পষ্ট করলে। মণিমালা বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল, ও যেন বাস্তবিকই একজন বেটাছেলে, একজন অতি-আধুনিকার কাছে প্রগতির দিক দিয়ে খেলো হয়ে গেছে।

ট্রামের যত লোকের দৃষ্টি ওদের দুজনের ওপর এসে পড়েছে। পুরুষের পোশাকের মান রাখার জন্যও কিছু একটা উত্তর অন্তত দিতে হয়—আবার রয়েছেও এতগুলি পুরুষের মাঝে বসে, মণিমালা বললে—"না, তা নয়, আপনার একটু অস্থবিধা হচ্ছে তো···"

"আই ডোণ্ট মাইণ্ড্ (I don't mind)"

মণিমালা কাঠ হয়ে বসে রইল। একটু আগে ঠিক এই কথাটাই না ওর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল! কিন্তু এতটা ভেবে বলেছিল কি?···একটা ধন্যবাদ যে দেওয়া উচিত ছিল, বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ে সেটা আর হয়েই উঠল না।

ট্রাম এগিয়ে চলল। রাজাবাজারের স্টপেজে দুজন নেমে গেল, সামনের একটা বেঞ্চ থেকে। সবাই মেয়েটির দিকে ঘুরে চাইলে,—এবার তো উঠে গিয়ে

বসা উচিত, সমস্ত বেঞ্চটাই খালি। উঠল না কিন্তু। মণিমালার দিকেও চাইছে লোকে, সেই অস্বস্তিতেই মণিমালা সঙ্গিনীকে বললে—"আমিই না হয় উঠে যাচ্ছি, আপনার অসুবিধে…"

সে একটু হেসে বললে—"অসুবিধে এই যে আপনাকে পথ ছেড়ে দিতে আমায়ও দাড়াতে হবে।"

বললে ওকেই, কিন্তু কাছের ক'জন যে শুনলে, কান পেতে আছে, তার পর কথাটা ফিসফিসানির মধ্যে চারিয়েও গেল—সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।…হাতে রুমালটা রয়েছে—ইভিনিং ইন্ প্যারিসের খুব হালকা গন্ধ, মাঝে মাঝে তাই দিয়ে কপালের চুলগুলো তুলে দিচ্ছে; এদের যা রসিকতা হচ্ছে মাঝে মাঝে তাতে মুখে রুমাল চেপে একটু একটু হাসছেও।

শেয়ালদার মোড়ে এসে সমস্ত দলটি ধুয়ে মুছে নেমে গেল। রাত হয়েছে, উঠল মাত্র তিনজন। তিন জনেই বয়স্থ, কি ভেবে আর এদিকে না এসে ট্রামের পেছন দিকেই গিয়ে বসল।

এত খালি, মেয়েটি তবুও উঠল না, পাশের সীটে গিয়েও বসতে পারত, তাও না। অতগুলি পুরুষের দৃষ্টির নীচে মণিমালারও যে এতক্ষণ একটা সঙ্কোচের ভাব ছিল সেটা গেল কেটে।…তার জায়গায় একটি সকৌতুক কৌতূহল জেগে উঠছে, দেখাই যাক না এর তল কোথায়; ক্ষতিটা কি?—মেয়েই যখন দু'জনে শেষ পর্যন্ত।

প্রশ্ন করলে—"আপনি যাবেন কোথায়?"

"আমি নামব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে; আপনি?"

"আমি আরও খানিকটা এগিয়ে।…কোথায় গিয়েছিলেন?…মানে একটু রাত হয়ে গেছে বলে জিগ্যেস করছি…অফেন্স নেবেন না আশা করি।"

মেয়েটি একটু ভাবলে, যেন একটু কুণ্ঠা, তার পর মুখের পানে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতেই চেয়ে বললে—"বন্ধুর বিয়েতে।"

কি মনে হতে কতকটা যেন আপনা-আপনিই মণিমালার দৃষ্টি তরুণীর সীমন্তের ওপর গিয়ে পড়ল, সেটা লক্ষ্য করে সে নিজেই একটু হেসে বললে—"না, আমার নিজের এখনও ও-পাঠ পড়া হয় নি।"

—বলে মুখে রুমাল চেপে বেশ একটু তরল কণ্ঠে হেসে উঠল।

কেন এত সরস মন এতক্ষণে বুঝল মণিমালা। বললে—"আপনারও তাহলে ওদের মতন নেমন্তন্নর ব্যাপার।…আমিই শুধু উপোসী।"

"কেন, নেমন্তন্নবাড়ির গন্ধ তো পেলেন, এতগুলো লোকের গায়ে···ঘ্রাণে অর্ধভোজনম্···"

—রুমালে মুখ চেপে হেসে এবার একটু কাৎ হয়ে পড়ল, অবশ্য মণিমালার দিকে নয়। মণিমালা একটু সাহস করলে, বললে—"অবিশ্যি ঠিক খাওয়ার দিক দিয়ে না হ'ক, অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে গেছে বৈকি।"

তার পর কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে সামলে নিলে—"মানে, তাবই গল্প শুনতে শুনতে তো আসছি বরাবর।"

মেয়েটি একটু গম্ভীর হয়ে চেয়ে থেকে বললে—"এই কথা?···ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

"কেন?

"আমি মনে করি পুষিয়ে যাওয়া মানে বুঝি···" অসম্পূর্ণ রেখেই আবার লজ্জিত ভাবে হাসতে হাসতে সীটের পিঠে লুটিয়ে পড়ল।

মণিমালার মনে অদ্ভুত রকমের এক সুড়সুড়ি লাগছে।···প্রশ্ন করলে—"কিন্তু একটা কথা—যদি কিছু মনে না করেন।"

"মনে করবারই মতন মানুষ দেখছেন "

"না, মনে রাখবার মতন।"—একটু হাসলে মণিমালা—এত সাহস বাড়তে দিলে না বাড়ানো উচিত বেটছেলে হয়ে? তাব পর বললে—"আমি জিগ্যেস করছিলাম—বন্ধুর বিয়ে, কিন্তু বাসর জাগতে আটকে রাখলে না যে?"

"এ কথাটা আপনার জিগ্যেস করা খুবই ভুল হয়েছে···"

"কেন?"

"আটকে রাখলেই আটকে পড়ে থাকতে হবে?"

"আপনারও এ কথাটা ভুল হয়েছে।"

"কেন?"

"এই তো আমায় আটকে রেখেছেন।···পারছি যেতে?"

মেয়েটি উঠে সরে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে—"যান।"

ওঠবার যথেষ্ট সময় দিয়ে আবার বসতে বসতে বললে—"আপনার কথার উত্তর,—হিংসে বলেও তো একটা জিনিস আছে—আমার বন্ধু আবার আমার চেয়ে অন্তত বছর দুয়েকের ছোট···বসে বসে তার বিয়ে দেখা—আবার তারই বাসর-ঘরে বসে···"

—এবারের হাসি আগের সবকেই ছাড়িয়ে, যেন যতই চাপতে চাইছে, শরীরের দুকূল ভেঙে ততই ছলকে ছলকে পড়ছে—খিল খিল খিল—খল খল—উঃ!…

এবারের উত্তরটাও যেমন সহজ সহজ তেমনি সরস, মণিমালার জিভ চুলকোচ্ছে। গাড়িও একেবারে খালি হয়ে গেছে কখন, এক যা কন্‌ডাকটারটা অন্যমনস্ক হবার ভান করে সিঁড়ির কাছে রডটা ধরে আছে দাঁড়িয়ে।…তা থাক্ গিয়ে। তা ভিন্ন সেই কথা,—সত্যিকার পুরুষ হয়ে উত্তরটা দিলে তখন দোষ ছিল, এ তো শুধু একটু অভিনয়ই, যা এতক্ষণ করে এল তারই মেয়াদ একটু বাড়ানো—না হয় একটু অন্যভাবেই।…বলে ফেলতে যাবে, এবারে হাসির ঘটা দেখে কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ হল মনে—পাগল নয় তো! একেবারে পুরোপুরি নিশ্চয় নয়, তবু…

এই সময় ট্রামটা দাঁড়িয়ে পড়ল, মেয়েটিও বাইরের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, নমস্কার করে বললে—"ওয়েলিংটন স্কোয়ার!…আসি তাহলে… আপনাব খানিকটা সময় একেবারেই বৃথা নষ্ট করলাম…ক্ষমা চাইছি।"

মণিমালাও নমস্কার করে দাড়িয়ে উঠেছে, বললে—"সেকি! এত সার্থক খানিকটা সময় তো আমার জীবনে আসেই নি…কখনও আসবে বলেও ভরসা হয় না…"

বিদায় নেবার জন্য ও-ও তরুণীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে; যাই হ'ক, কাটল তো চমৎকারই।

তরুণী নামবার মুখে একটু ঘুরে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে—"ছুটির আগে আমাদের কলেজের ড্রামা ছিল আজ—বিজয়া—আমার ছিল বিজয়ার পার্ট… আমার নিজের নাম যদুপতি চট্টোপাধ্যায়…এও একটা ড্রামাই হল তো—অন্তত তার খানিকটা, কি বলেন?…আচ্ছা, নমস্কার।"

ট্রাম চলতে আরম্ভ করেছে। মণিমালার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে এমন টুপ করে নেমে গেল যে, সে আর বলবার অবকাশই পেলে না পরিপূর্ণ ড্রামাটা একেবারেই অন্যরকম।

বাস্তব

আমাদের পাড়ার সরস্বতী পূজাটা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে হত, এবারও হচ্ছে তবে দুটো দল হয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল। আর বছর পূজার পর থেকেই কানাঘুষা আরম্ভ হয়, চাপা পড়ে যায়, তার পর এ বছর আবার পূজার হুজুগ আরম্ভ হতে পাড়ার এক দল উৎসাহী ছেলে আমার কাছে এসে উপস্থিত হল। খানিকটা ঠেলাঠেলি ফিসফিসানির পর বিমল ভেতর থেকে এগিয়ে সামনে এসে বললে—"আজ্ঞে এবার আমরা মনে করছি পুজোটাকে ইয়ে করব, মানে সার্বজনীন করে দোব।"

বললাম—"তাই তো রয়েছে; আমার বাড়ির পুজো তো নয় এটা, তোমরাই পাঁচজনে চাঁদা করে করছ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো করছি…"

চুপ করে গেল, পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে বললাম—"সার্বজনীন মানে তো সব জাত এসে দর্শন করবে, পুজো দেবে…তাতে তো কেউ বাধা দেবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো সেটা পছন্দই করি।"

"না, সে বাধা নয়, বাধা একটু অন্য জায়গায় হচ্ছে, আমরা সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।"

"কোন্ জায়গায়?"

আবার একটু চুপচাপ। বিমল ফেল করলে দেখে ঝড়ু ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, বললে—"বাধা হচ্ছে জায়গাটা নিয়েই। একজনের প্রাইভেট চণ্ডীমণ্ডপ, সেটা তো সার্বজনীন হতে পারে না, তাই মনে করছিলাম পুজোটাকে বাইরে নিয়ে যাব। তাই এরা সব বললে, চল ওঁর মতটা জেনে আসি, প্রেসিডেণ্ট তো, তাই—"

বললাম—"নিজের বাড়ি বলেই বলছি না,—একটা ভাল জায়গা পাচ্ছ পাড়ার মাঝখানে, সেটাকে ছেড়ে…"

নিবারণের ছেলেটি একটু লেখেটেখে শুনেছি, বোধ হয় ভাবলে, একজন সাহিত্যিক, তাকে সাহিত্যিকের ভাষায় না বললে বুঝবে না, ভেতর থেকেই বললে—"আজ্ঞে গোলমালটা বেধেছে সার্বজনীন কথাটুকু নিয়ে, একটা ধরুন প্রাইভেট গাড়ি,—হাজার ভাড়া খাটানো যাক, তার প্রাইভেট এই বদনামটুকু তো ঘুচবে না?"

আরও না উপমা জড়ো করে সেই ভয়ে বিমলকেই প্রশ্ন করলাম,—"বেশ, তা তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কোথায় মাকে?"

"রহিম শেখের আস্তাবলে"

এবার আমার মুখেই কথাটা ফুটতে একটু দেরি হল। তার পর প্রশ্ন করলাম—"আস্তাবল হওয়া নেহাৎই দরকার কি? চণ্ডীমণ্ডপ যদি নিতান্ত অচল মনে হয়, একটা দোচালা তুলে নিতেও তো পার।"

পেছন দিকে চাপা তর্ক আরম্ভ হয়েছে। কানে যাচ্ছে—ওঁর আসল যা আপত্তি—ন্যারোনেস (Narrowness)…বাঃ, বলতে হবে না? ওসব যে চলবে না আর…"

ঝড়ু আরম্ভ করেছিল—"দোচালায় যে খরচটা হত…"তাকে বাধা দিয়ে খাঁতু পেছন থেকে এগিয়ে এসে বললে—"মোছলমানের আস্তাবল বলে আমাদের যে সেকেলে আপত্তিটা সেটা তো এদের এযুগ আর মানতে চাইবে না।— যদি ওটুকু গলদই থেকে গেল মনে তো আর…"

ঝড়ু একটু নরম করে দিলে, বললে—"আর ওটা তো নামেই রহিমশেখের আস্তাবল, ঘরটা তো নিত্যহরি কাকার, ভাড়া নিয়েছে রহিমশেখ। তাহলে মাকে আর গণ্ডীর বাইরে যেতে হচ্ছে কৈ?"

নিবারণের ছেলেটি পরিষ্কার করে দিতে যাচ্ছিল—"আমার বাড়ির একটি মাধবীলতা যদি পাশের বাড়ির মঞ্চে গিয়ে…"

আমি কেটে দিয়ে ঝড়ুকে জিগ্যেস করলাম—"হ্যাঁ, তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে? দোচালায় যে খরচটা লাগত…"

একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি আরম্ভ হল আবার। আমি জানি হবে, ভেতরের কথা খানিক-খানিক শোনা আছে তো! একটু পরে বিমলই বললে—"আজ্ঞে আপনার কাছে তো লুকিয়ে লাভ নেই, এইটেই হচ্ছে আসল কথা—খরচ যা বাঁচবে অন্যদিকে লাগানো যায়; সবাই একটু আর্টের দিকে যেতে চায়, আজকাল যেমন চারিদিকে হচ্ছে। অথচ আমরা এ পাড়ায় সেই সাবেক চাল ধরে বসে আছি —মানুষের যে একটা আর্টিস্টিক সেন্স আছে সেটাকে ভোঁতা করে দেওয়া…"

বললাম—"বুঝেছি, আর্ট! মানে সিনেমা-আর্টিস্টদের ঢঙে মায়ের মূর্তি যা তা করে গড়ায় আমার যে আপত্তি সেই কথা বলছ। দেখ, মায়ের একটা ধ্যান-মূর্তি আছে, যিনি পূজোটি কল্পনা করেছিলেন তিনি ধ্যানে সেই মূর্তিটি পেয়েছিলেন। …যাক, সেকথাটাও না হয় বাদ দিলাম—মূর্তি-সাদৃশ্যের একটা ব্যবহারিক দিক আছে—এমনই আমরা হিন্দু জাতটা ভেদবুদ্ধিতে ভরা, মূর্তির মধ্যে এত বিভিন্ন আদর্শ এসে গেলে সেটা বেড়ে যাবে না? ক্রমে দাঁড়া-সরস্বতীর উপাসক, বসা-

সরস্বতীর উপাসক, হ্যালা-সরস্বতীর উপাসক…যাক্, এও নয় ধরলাম না, কিন্তু মূর্তির চেহারায়, ভঙ্গিমায় একটা দেব-ভাব থাকা চাই তো? স্বর্গকে হলিউড-টালিগঞ্জে নামিয়ে আনলে, কিংবা হলিউড-টালিগঞ্জকে স্বর্গে ঠেলে তুললে…"

খাঁদু বললে—"শুধু মূর্তিই তো নয়, সে আমরা তো মেনেই নিয়েছি, ওদিকে অন্য অন্য পাড়ার ওরা রেষারেষি করে কত এগিয়ে গেল সেদিক দিয়ে। পাল-পাড়ার মুকুন্দ বলছিল ওরা এবার সুইমিং সরস্বতী দেখাবে—খালি মুখটি আর পা দুটি বের করা—অঞ্জলি নেবার জন্যে…"

বলতে বলতেই সঙ্কোচ-জড়তাটা কেটে আসছে সবার, যতীন বললে—"একটা কথা ভেবে দেখবার মত, মা বসে রয়েছেন পদ্মের ওপর, পা রয়েছে হাঁসের গায়ে, দুটোই জলের…"

বললাম—"ঠিকই তো, একবার একটু সাঁতার কেটে নিতে ইচ্ছে হবে না? ‥ কোনও পাড়ায় মার ডুবসাঁতারের মূর্তি দেখাবে ঠিক করেছে কি? ওদিকেও দেখ না রেষারেষি করে কত এগিয়ে যাবার চান্স আছে।"

একটু লেগেছে, সব চুপ করে রইল। ওরই মধ্যে একটু খিক্ খিক্ করে চাপা হাসি উঠতে দেখি জন পাঁচেক কখন একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমীর বললে—"এরাই দেখাক না, কাজ কি অঞ্জলিতে?"

নিজেদের মধ্যেই আবার কথা-কাটাকাটি করে গোলমাল না করে, আমি খাঁদুকে জিগ্যেস করলাম—"হ্যাঁ, শুধু মূর্তিই নয় বলছিলে, আর কিসে তোমাদের আর্ট বাধা পাচ্ছে?"

"এই দেখুন না, ব্যাকগ্রাউণ্ড, তার পর ডেকোরেশন, আজকাল ইলেকট্রিক লাইট দিয়েই কত রকম ট্রিকস্ দেখাচ্ছে, গত বৎসর বেনেটোলার মূর্তির পেছনে ছটার ব্যবস্থা করেছিল—একটা সাইকেলের চাকাকে কি করে…বন্ বন্ করে ঘুরছে—লাল নীল সবুজ বেগুনে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে—তাক লাগিয়ে দেয় একেবারে—আমরা একটু স্কোপ পাই তবে তো সে-সব ট্রিকস্ দেখাব?"

বোঝাবার চেষ্টা করলাম—"দেখ, মূর্তি নিয়ে পুজো করটা বড় শক্ত জিনিস, নিরাকার পুজোর চেয়ে ঢের বেশি শক্ত, কেন না এতে একট এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই পুতুল-পূজোর দোষ এসে পড়ে। এটা অস্বীকার করা আত্মপ্রবঞ্চনা যে, আমাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে সেইটে, আর সেই জন্যেই আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনে এত ব্যর্থতা এসে পড়েছে। এইটে বেশি করে এনে ফেলছে তোমাদের ঐ যাকে বলছ ট্রিক্স্। ওটার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ভোজবাজি—

যার সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই—আর এটা তো স্বীকার করবে, পুজোতে আত্মা আর মন নিয়েই যা কিছু। আর ভোজবাজি হচ্ছে প্রবঞ্চনা, তাহলে আকারে ঠিক একরকম না হলেও এটা কতটা সেইরকম—জান তো? আমাদের দেবমূর্তিরা মাঝে মাঝে পাতাল ফুঁড়ে উঠে আসেন?—না বেরিয়ে উপায় থাকে না, তাঁদের নীচে থাকে ছোলা ভিজনো; সেও ট্রিক্‌স্‌। আমার বলার উদ্দেশ্য, পূজো নিয়ে আর্ট আর বাজি-দেখানো নিয়ে আর্ট এ দুটো আলাদা হওয়া উচিত। আর্টেই চোখ ধাঁধিয়ে যদি মায়ের আসল রূপ না দেখতে দিলে তো…"

নিষ্ফল জেনে মাঝপথেই চুপ করে গেলাম, কিন্তু এবারও দেখলাম গুটি ছয়েক ছেলে একটু পাশ কাটিয়ে এ-দলে চলে এল। সমীর বললে—"আসল কথা তো তা নয়—ট্রিক্‌সের নেশাও আছে কিছু কিছু—তবে আসল কথা হচ্ছে, ওরা এবার স্বপন-দাকে প্রেসিডেণ্ট করতে চায় …"

এদের সবাই ওর দিকে কটমটিয়ে চাইলে, সমীরও একবার চেয়ে নিয়ে আমায় বললে—"আজ্ঞে সে আমরা জানতাম আপনি ওখানে প্রেসিডেণ্ট হতে চাইবেন না—তাই জন্যে…"

আমি ক্লান্তও হয়ে পড়েছি এদিকের কয়েক বছরে, উৎসাহের সঙ্গে বললাম—"এই তো চমৎকার এক ব্যবস্থা—তোমরা স্বপনকেই কর না প্রেসিডেণ্ট, সব দিকই বজায় থাকে, জায়গা বদলাবার দরকার কি?"

পেছন থেকে আর একটি ছোকরা দুপা এগিয়ে এল, চিনি না তেমন, বললে—"তাতে সব দিক কৈ বজায় থাকে?"

আমি চুপ করে একটু ভাবলাম। আমিই না হয় একটু নরম হই,—মাকে রহিমশেখের আস্তাবলে টেনে তুলবে তার চেয়ে না হয় চণ্ডীমণ্ডপেই কিছু 'ট্রিক্‌স্‌' উঠে আসুক, যুগের হাওয়া আটকাবেই বা কতদূর?

বললাম—"ডেকোরেশন বিজলিবাতির খেলা—এই সব বলছ তো? আমি যখন প্রেসিডেণ্ট থাকব না, তখন আর আপত্তি করবই বা কেন? আর চলবেই বা কেন?"

এবার একটু বেশিক্ষণ চুপচাপ গেল; ঠিক চুপচাপ নয়, এ দলেও কানাঘুষা ও দলেও কানাঘুষা, তার পর বিমল বললে—"আজ্ঞে, মুশকিল হচ্ছে, স্বপনদা আবার চণ্ডীমণ্ডপে হলে প্রেসিডেণ্ট হতে চাইছেন না।"

"মানে?"

বলছেন—"অপরের চণ্ডীমণ্ডপ…"

বললাম—"তা আমাব যদি আস্তাবল নাই থাকে..."

"আজ্ঞে, তা নয়। আস্তাবলটা আমরা ভাডা কবে নিচ্ছি কিনা। ফর দি টাইম বীইং (for the time being) ওটা সার্বজনীন হয়ে গেল।"

আমি আবও একটু এগুলাম—"না হয় চণ্ডীমণ্ডপের জন্যেও আমায় কিছু ভাডা দিয়ে ওটাকেও সার্বজনীন করে নিও।"

২

কিন্তু আটকানো গেল না।

তবে, আগেই বলেছি, এদিকেও একটা দল থেকে গেল। আমি বেশি থাকতে পারি না, তবে খবব পাচ্ছি বেষাবেষিব ফলে আয়োজন উভয় দিকেই খুব জোর হচ্ছে। অবশ্য নূতনত্ব ওদিকে, তাই ওদিকেই আকর্ষণটা বেশি, তবে এবাও যাতে নিরাশ না হয় সেই জন্যে আমি অনুবাবের তুলনায় সাজানোর দিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি। এরা সেক্রেটাবি করেছে বিমলকে—যে ছেলেটি প্রথমে দল ছেডে এদিকে আসে। ছেলেটি বড ভাল, আই-এ'তে কুডি টাকা বৃত্তি পেয়ে বি-এ পডছে, সত্যই পূজায় শ্রদ্ধান্বিত, মর্মটা বোঝবার চেষ্টা করে, বুঝিয়ে আনন্দও আছে, ওর হাতে ছেডে দিয়ে আমি আরও নিশ্চিন্ত আছি এই জন্যে যে ওর চমৎকার একটি সামঞ্জস্যবোধ আছে। ও যেমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পূজোটাকে বোঝবার চেষ্টা কবে তেমনি এটাও বোঝে যে আডম্বরের দিকেই বেশিব ভাগের নজর। আমাব কাছে মাঝে মাঝে আসে, দেখি দুদিক মানিয়ে বেশ করে যাচ্ছে।

আমার নজরটা থাকে যাতে দলাদলিব ভাবটা বেশি বেডে গিয়ে কুৎসিত আকার না ধারণ করে। আমার ইচ্ছা ছিল এদিককার সভাপতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঐ বিষয়েই লক্ষ্য রাখব, তাতে সুবিধা হত বেশি, কিন্তু কোনমতেই ওরা রেহাই দিল না, ভাঙনের মুখে একটু বেশি দিশাহারা হয়ে উঠতে পারে ভেবে আমিও বেশি জোর দিলাম না। তবু দু পক্ষকেই মানিয়ে রাখবার চেষ্টা করি, ওদিকেও যাই, বয়স হিসাবে ওরা খাতির তো করেই, পরামর্শটা-আসটা চায়, নেয়ও, স্বপন পর্যন্ত মাঝে মাঝে আসে।...এমনি সব তো দিব্য ছেলে, মাথায় একটা কি ঢুকে গেছে, কি করবে?

মোট কথা পূজাটা দু'জায়গায় হচ্ছে, এ ভিন্ন আর কোন বিশেষ উৎপাত এ পর্যন্ত হতে দিই নি। একটু যে ব্যতিক্রম এখানে-ওখানে না হয়ে পডছে এমন

নয়। আমাদের ঠাকুরের নাম পড়ছে 'গোঁড়া সরস্বতী', ওদের ঠাকুরকে এরা বলছে 'রহিমশেখের সরস্বতী'।··· মার যদি দুষ্টু-সরস্বতী হয়ে নিজ হতে গাল খাবার সাধ হয়ে থাকে, আমি আর কতদূর কি করতে পারি ?

এদিকে ওরা রহিমশেখের আস্তাবলটা ঘড়া ঘড়া গঙ্গার জল দিয়ে ছাপ্পর থেকে নিয়ে নীচে পর্যন্ত আগাগোড়া ধুয়েছে, সামনের বড় প্রাঙ্গণটা চেঁচে-ছুঁলে পরিষ্কার করে সমস্ত জায়গাটার চেহারা দিয়েছে বদলে। আর, সমস্তই করেছে নিজেরা, এদিক দিয়ে সত্যই ওদের যশ দিতে হয়। শামিয়ানা টাঙিয়ে, ম্যারাপ তুলে, দেবদারুপাতা, রঙিন কাগজের শেকল দিয়ে যে সাজিয়েছে তাতে যেমন মেহনৎ আছে তেমনি বাহাদুরিও আছে।

সন্ধ্যার সময় আমি যখন গেলাম তখন ওদের বিজলির ব্যবস্থাও সব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমায় অনেকগুলো ট্রিকস্ দেখালে—সেই সাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল নীল সবুজ আলোর ছটা দেখানো—অবশ্য সাইকেলের চাকা বোঝবার উপায় নেই,—তার পর মাঝে মাঝে জলের খুব হালকা ফোয়ারা ছড়িয়ে তার ওপর আলোকরশ্মি ফেলে রামধনু করবে—সেটাও দেখালে। প্রতিমার পায়ের নীচে দিয়ে তার এনে একটা ব্যবস্থা করেছে, যাতে মনে হবে মায়ের পাদুটি থেকেও ছটা বেরুচ্ছে—আলতা পরা বলে লাল ছটা, এটা সুইচ-অন করা হবে অঞ্জলি দেবার সময়। ঝড়ু বললে—"মানে মা অঞ্জলি অ্যাকসেপ্ট (accept) করলেন আর কি।"

মন্দ হয় নি, কোন কোনটা—যেমন রামধনুর ব্যবস্থাটা, বেশ মনোজ্ঞ; কোন কোনটা আবার বিবেকে আঘাতও করে—যেমন অঞ্জলি গ্রহণ করবার ট্রিক্স্‌টা। অবশ্য সে-কথা আর তোলবার দরকার নেই, তুললামও না। বিমল বললে—"প্রায় লাইফের (life-এর) কাছাকাছি নিয়ে আসি নি ?"

হেসে বললাম—"তা এনেছ, তবে আর এগিও না; ধর পেছন থেকে রেকর্ড বাজিয়ে আশীর্বাদও তো করানো যেতে পারে।"

হাসলেই, আমিও যে ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে ঠাট্টা করব না, এটা বোঝে।

এদিকে এদের পূজাও সাধ্যমত 'জীবন্ত' করবার চেষ্টা করছি। নিজের আইডিয়া আছে, আমিও কিছু কিছু দিচ্ছি। একটা অভিনবত্ব—এদের প্রতিমার সামনে পায়ের ঠিক নীচেই হাত-দেড়েক চওড়া আর হাতদুয়েক লম্বা করে মেঝের শানটা খুঁড়িয়ে একটি চৌবাচ্চা বাঁধিয়ে দিয়েছি, ওরা সেটিকে জলে পূর্ণ করে কোথা থেকে একটি পদ্মলতা এনে বসিয়েছে, তিনটি ছোট-বড় পাতা,

দুটি ফুল, একটি কুঁড়ি। বেশ চমৎকারভাবে বসিয়েছে সেটি ; দুটি পদ্মের ওপর মার দুটি পা, কুঁড়িটিকে আধ-ফুটন্ত করে একটু হেলিয়ে এমনভাবে রেখেছে যেন একটি লুব্ধ প্রতীক্ষার ছবি—কবে ফুটবে, কবে পাবে স্পর্শ। জলভরা চৌবাচ্চারও চৌকো ভাবটা থাকতে দেয় নি, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে কাপড়ের ওপর জলের ছবি এঁকে খানিকটা ভেতর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এমন কৌশলের সঙ্গে লুকিয়ে দিয়েছে যে মনে হয় হাঁসসুদ্ধ সমস্ত প্রতিমাটি যেন জলের ওপর। বাস্তব-অবাস্তবে মিলিয়ে যে ভাবটি ফুটিয়েছে সেটি হয়েছে যেমন সুন্দর তেমনি পবিত্র।

বলেছিই, সুস্থ রেষারেষি ভাবটা আছে, কিন্তু আড়াআড়ির ভাবটা যাতে না আসতে পারে আমার নজর সেই দিকেই , ওরাও আসছে, এরাও যাচ্ছে, দেখছে, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, প্রশংসাও করছে, আবার দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলছে। পুষ্করিণী যখন প্রায় শেষ হয়েছে, যশ ছড়িয়ে পড়েছে, ওদের কয়েকজন দেখতে এল ; রাত তখন প্রায় এগারটা, সকালে পূজা।

ঝড়ু আর বিমলও ছিল। ঝড়ু বলল—"নাঃ সমীরই নিলে মার হাত থেকে কাপ্‌টা।"

৩

তার পর সকালে এল ওদের জিতের পালা।

ভোরবেলা। পুজোর শানাইএর রাগিণীতে একবার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়ে আবার আরও বেশি করে জমিয়ে তুলছে, এমন সময় ছোট ছেলেমেয়েগুলো যার যা সম্বন্ধ ধরে হৈ-হৈ করতে করতে কপাটে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলে।

"কি, ব্যাপার কি ?"

"শেখের সরস্বতীর ঘরে হাঁস।…রাজহাস !!…দেখবে চল…ওদের মা কেমন হাঁসে চড়ে এসেছেন !…স্বপন পিসিডেন্টের দল জিতল!…সত্যিকারের রাজহাঁস !!"

বললাম, "বেরোঃ, জিতুক। আমায় ঘুমোতে দে।"

"কাকা! শৈল-কাকা! উঠেছেন ?"

ঝড়ুর গলা। জিগ্যেস করলাম, "কি ব্যাপার ? ঝাঁপটা বন্ধ কর নি রাত্তিরে ? ওগুলো আবার বড্ড নোংরা জাত…"

"আপনি দেখবেন আসুন দয়া করে—উঠুন শীগগির……না, আসুন শৈল-কাকা—বলেন আর্ট করতে যাই বলে মা চটেন—একবার দেখবেন আসুন ব্যাপারখানা…"

যেতেই হল।

সকালবেলায় সদ্য-ঘুমভাঙা মন, তায় পূজাব প্রভাত, গিয়ে যা দেখলাম তাতে গাযে একটু কাঁটা দিয়ে উঠলই।

বাঁশের বাতা দিয়ে যে বেড়াটা করেছে সেটা তখনও আস্তাবলের মুখের ওপর লাগানো, তালা-আঁটা। বাতাগুলো ফাঁক ফাঁক করে বসানো, মধ্যে দিয়ে বড ছাগল না যেতে পারলেও হাঁসটাস স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারে।

প্রতিমার সামনেই একটা রঙিন কাগজেব-শিকলের স্তূপ, যেগুলো টাঙাতে বাকি ছিল—তার ওপর, প্রতিমাব ঠিক পাযেব নীচেই একটি ধবধবে সাদা রাজ-হাঁস পিঠের ওপব লম্বা গলাটি চেপে বসে আছে—ঘরের মধ্যে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় রঙিন কাগজের গাদাব মধ্যে সত্যই যেন মনে হচ্ছে জলের মধ্যে অর্ধেক গা ডুবিয়ে ভাসছে। হাঁসেব মুখ পাশ দিযে দেখলে একটু হাসি-হাসি বলে সব সময় হয়ই মনে, আমাব পানে যখন চাইল তখন সত্যই মনে হল যেন তার সঙ্গে একটু ব্যঙ্গের ভাবও মাখানো রয়েছে মুখটাতে।

ততক্ষণে খবরটা বেশ চারিয়ে গেছে, আর সবার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের দলও কতক কতক এসে উপস্থিত হয়েছে, দুএকজনের মুখেব ওপর নজর পড়তে দেখলাম এ বকম প্রত্যক্ষ পরাজযে মুখটা গেছে একেবারে শুকিয়ে।

দল জমে উঠতে লাগল, যারাই আসছে, দুব থেকেই হাতের ইশারা দেখে চুপি চুপি এসে দাঁড়াচ্ছে। একটা নীরব সম্ভ্রম সমস্ত জায়গাটিতে থমথম করছে; সোজা নয় তো, মার বাহন একেবারে! সেটা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, রইলও না; প্রথমে একটা চাপা গুঞ্জন, তার পর সেটাও একটা মৃদু কলরবে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, হাঁসটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।

যা আন্দাজ করেছিলাম তাই—রঙিন কাগজগুলোর মাঝখানটিতে একটি সাদা ধবধবে ডিম। গোলমালের মধ্যে বোধ হয় নিজের বাসা থেকে উৎখাত হয়ে রাত্রে এই নিরিবিলি জায়গাটুকু বেছে নিয়েছে।

নূতন উৎপাতে নিশ্চয় থ হয়েই বসে ছিল এতক্ষণ, উঠে পড়ে ডানা ঝাপটে ছুটোছুটি করে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ করে দিলে, তারপর বেড়াটার তালা খুলে রাস্তা করে দিতেই চেঁচাতে চেঁচাতে দূরের ডোবাটার দিকে ছুট। গুটিপাঁচেক

সঙ্গী ডোবাটার ধাবে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল, মাঝখানে গিয়ে পড়তেই সঙ্গে করে তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে নেমে পড়ল।

আমাব পাশেই গুটি-চার ছোট ছেলে,—নয দশ বছর, এইরকম; মনে হল দু দলই মেশানো রয়েছে।

চণ্ডীমণ্ডপ-পার্টির প্রেসিডেন্ট হিসাবেই বোধ হয় আমায় সাক্ষী রেখে একটি বললে—"বিষ্ণেও হবে ঐ রকম, কি বলেন, না?"

বাকি তিনটিই বোধহয় অপর পক্ষের। ছেলেমানুষ, মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটু ভেবে নিয়ে আমায়ই সাক্ষী মেনে বললে—"ঘোড়াব ডিম তো নয়, কি বলুন?"

সমস্ত ব্যাপারটুকুর মধ্যে কোথায হাসি কোথায় বেদনা যেন খুঁজে ঠিক করতে পারছি না আমি; ছেলেটির পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললাম, "ঠিকই তো! আর মাকে যে-হাঁসরা বয়ে নিয়ে বেড়ায তাদের ডিম হবে না? —বাঃ, তাহলে তো খুব উপকার করেন মা!"

পরেশদা

১

মুখটা চুন করে গিয়ে বললাম—"আবার রমাদিদিকে দেখতে আসছে এক জায়গা থেকে পরেশদা।"

পরেশদা পড়বার ঘরে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ছিল, সর্বদাই পড়ে এবং প্রতি বছরেই ফেল করে। আমাদের ছেলেবেলাকার কথা, তখন ম্যাট্রিকুলেশনের রেওয়াজ হয় নি, এণ্ট্রান্স চলছে; শক্ত পরীক্ষা; পাস করুক আর নাই করুক একটা ছেলে যে পড়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর এই-টাকেই সাধারণ লোকে যথেষ্ট মনে করত। প্রায় চল্লিশ বছর হল তো, দ্বাপর যুগটা তখনও এত দূরে পড়ে যায় নি, লোকেরা তপস্যায় বিশ্বাস করত।

তপস্যা অবশ্য সেই চেয়ারটিতে বসে থাকা, চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো।

আমাদের কাছে সেগুলা আগুনের মত উত্তপ্তই ছিল, পরেশদার কাছেও যে নিতান্ত জল ছিল না, তখন অত খেয়াল না করলেও এখন ফলাফল মিলিয়ে বেশ বুঝতে পারি।

ঐখান থেকে আমাদের কয়েকজনকে তালিম দিয়ে তৈরি করত পরেশদা; স্বদেশী, সমাজসেবা, গ্রাম-সংস্কার এই রকম সব ব্যাপারে। যে নির্ঝঞ্ঝাটে পাস করে যাচ্ছে, ফার্স্ট সেকেণ্ড হচ্ছে, স্কলারশিপ পাচ্ছে, ছেলেবেলায় তার প্রতি বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তি থাকতে পারে, অবিমিশ্র ভালবাসা থাকে না। পাস করবার বালাই না থাকায় পরেশদাব প্রতি এই জিনিসটি আমাদেব পুরোমাত্রায় ছিল, ওকে যেন লেপটে থাকতাম। ফলে ঘবটা এক দণ্ড খালি থাকতে পেত না, দু'একজন করে রয়েছিই, পবেশদার তালিম চলছে, হয় লেকচার দিয়ে, না হয় বুদ্ধি দিয়ে; হয় স্বদেশী, না হয় গ্রাম-সংস্কার, না হয় সমাজসেবা। একটা কথা বেশ মনে আছে—সমস্তটুকুর গোপনীয়তা আমবা বেশ ভালভাবে রক্ষা করে ছিলাম। সেটা টাটকা স্বদেশী যুগ, শপথ নেবার কডাকডি চলছে, আমরা ধরা পড়েছি, কিন্তু লীডারের নাম প্রকাশ পায নি। পরেশদার দিক থেকে বাঁচোয়া, তাঁব ঘরটা ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড তিনমহল বাড়ির একেবাবে একটেরেয়; তার উপর আমরা যে পরিমাণে ওঁকে ভালবাসতাম, ফেল করবার ঘটা দেখে প্রায় সেই পরিমাণে ওর বাড়ির লোকেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। গ্রামের লোকেদের এদিকে দৃষ্টি যাবার কোন অবসরই ছিল না, একটা ছেলের ফেল করেই ফুরসত নেই, সে এসব বাজে কাজে মন দেয় কখন!

স্বদেশী বা গ্রাম-সংস্কার নিয়ে কি কি করা হয়েছিল তার ফিরিস্তি এখন থাক, অপ্রাসঙ্গিক হবে। সমাজসেবা কিছু করেছিলাম, আত্মগৌরবের কথা বেশি না বাড়িয়ে এখানে এইটুকুই বলি যে একটি বিয়ে এবং মেয়ে দেখার গুটি চারেক ব্যাপার আমরা গ্রামের মধ্যে পণ্ড করি। তাহ মধ্যে তিনটি রমাদিদিকে দেখা নিয়ে।

এ যা এসে রিপোর্ট দিলাম সেটা হচ্ছে চতুর্থ।

পরেশদা একটা বাংলা বই পড়ছিল, বোধ হয় নভেল, মুখ না তুলেই বললে —"আসবে না দেখতে? আইবুড়ো থাকবে তোদের রমাদি?"

রমাদিদি সম্বন্ধে এ ধরনের খবর আনলে প্রথমটা নিরুৎসাহই করে দেয় পরেশদা, এর আগের তিনি বারও করেছিল, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরেশদাই একটু পরে সেইভাবে আবার প্রশ্ন করলে—"উত্তর দিলি না যে ?"

উত্তরটা ওঁর অজ্ঞাত নয়, কিন্তু আমাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ হবার নয় বলে চুপ করেই থাকতে হল। রমাদি ছিল আমাদেব দক্ষিণ পাড়ার বেচুপণ্ডিতের বাপ মা-মরা ভাগনী, তাঁরই গলগ্রহ। যে যুগে বারো বছরের মেয়েরা অরক্ষণীয়া হয়ে উঠত সে-যুগে তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ পেরিয়ে গেছে এবং কথাটা নিয়ে বেশ কানাকানি আরম্ভ হয়ে গেছে। বেচুপণ্ডিত স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, পনেবটি টাকা মাইনে পান, নিতান্ত ছা-পোষা মানুষ।...এই অবস্থায় আমাদের অর্থাৎ পরেশদার শিষ্যদেব মধ্যে কেমন করে একটা সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, গ্রামে সমাজসেবার সব চেয়ে বড পাণ্ডা পরেশদাই শেষ পর্যন্ত এব একটা বিহিত করবেন। করছেন না তাব কারণ এণ্ট্রান্সটা পাস করতে পারছেন না।

আমরা সেবা-ধর্ম নিয়ে থাকতাম বলে পডাশুনার বেশি সময় পেতাম না, ওদিক থেকে যে সময়টা বাঁচত সেটা দিতাম নভেল পড়ায়। সুতরাং পরেশদা রমাদির সম্বন্ধে সাধারণত খুব কম কথা বললেও এবং রমাদিদি পরেশদার সম্বন্ধে একেবারেই নীবব থাকলেও, ভেতবের কথাটা বোঝবার মত ক্ষমতা আমরা লাভ করেছিলাম। আমাদের মধ্যে ওস্তাদ ছিল নিবারণ, সে তখন নভেল লিখতেও আরম্ভ করেছে ; তার মতে পরেশদা পাস করতে পারছে না বলে যে বিয়ে হচ্ছে না এ কথাটা সত্য হলেও, বিয়ে হচ্ছে না বলে সে পাস করতে পারছে না এটা আরও বড সত্য।

একটু বাদে পরেশদা আবার বললে—"উত্তর কিছু না থাকে তো যা।... সামনেই আমার টেস্ট, জানিস না ?"

বললাম—"তেমন ছেলের জন্যে দেখতে আসে, কে বারণ করছে ? কিন্তু বর শুনছি ভয়ানক কুচ্ছিত, তার ওপর দোজবরে।"

"তোদের রমাদিদি অপ্সরী ?"

"তা...তা তো নয়।"

"খুকি ?...দোজবরের সঙ্গে বেমানান হবে ?"

"তা...তা তো হবে না খুব।"

"ধরে নিলাম অপ্সরী, আট বছরের কচি খুকিও। বেচুপণ্ডিত ওর যুগ্যি বর যোগাড করতে পারবে ?...আছে সে কোমরের জোর ?"

"তা...তা-তা তো কৈ..."

"তোরা একটা রাজপুত্র কি কোটালপুত্র ধরে এনে দিতে পারবি ?"

এবার একেবারেই মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। পরেশদা বেশ রাগতভাবেই আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, বললে—

"যা, জ্বালাস নি।···পার হচ্ছে কোন রকমে, খুশি হবারই কথা, গ্রাম থেকে একটা আপদ বিদায় হচ্ছে···"

ফিরে আসছিলাম, ডেকে বললে—"ওরা এলে বরং আমায় খবর দিস, যদি তেমন সুবিধে দেখি ত একটু আমড়াগাছি করে আসব, যাতে সম্বন্ধটা না ভেঙে যায়।···একটা গরিবের কন্যাদায়, তোদের যেন ফুর্তি পড়ে গেছে।"

২

বর দোজবরে একথা শুনেছি, কিন্তু কুৎসিত, এমন কথা কারুর মুখে শুনি নি। ওটুকু নিজের মন থেকে জুড়ে দিয়েছিলাম কেস্‌টা আরও মজবুত করবার জন্যে; পরেশদা ভণ্ডুল তো করে দিক, তার পর বর কুশ্রী কি বিশ্রী কে অত দেখতে যাচ্ছে? আমরা বড় বড় সত্য, বড় বড় আদর্শের জন্যে সর্বদাই প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তৈরি থাকতাম বলে এ রকম ছোটখাটো মিথ্যাগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতাম না।

তবু একটা ধুকপুকুনি লেগেই ছিল, সকালে পাত্রীপক্ষের লোকেরা যখন সদর-দরজায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামল, আহ্লাদের চোটে মনে হল চেঁচিয়েই উঠি কিংবা ডিগবাজিই না খেয়ে বসি সব ভুলে। তিনজন নামল, তার মধ্যে একজন মাত্র একটু কুশ্রী, কিন্তু তার বরের বাপ হবার মত বয়স হয় নি। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন তবু একটু চলনসই, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যতদূর কদাকার হতে হয়। মিশকালো, যেমন লম্বা তেমনি আড়ে, দাঁতগুলো যা-তা করে বসানো, তার উপর ঘাড় পর্যন্ত লটকানো একমাথা কোঁকড়ানো চুল রেখে আরও যেন ভীষণ করে রেখেছে চেহারাটাকে। বরের কে কি হয় শুনবার আগেই আমি ছুটে গিয়ে আমাদের চিলের ছাদে রাধাগোবিন্দজীউর সামনে ধন্না দিয়ে পড়লাম— "দোহাই ঠাকুর, ঐটে যেন বরের বাপ হয়, আমি তোমার ভরসাতেই বরকে কুচ্ছিত বলেছি পরেশদার কাছে, ঐটাকে বরের বাপ করে দাও ঠাকুর!"

দুপুরবেলা টিফিনের সময় স্কুল থেকে এসে শুনলাম লোকটা বরের মামা। রাধাগোবিন্দজীউ সে প্রার্থনার চেয়েও এত বেশি করে দয়া করবেন ভাবতে পারি নি। নরানাং মাতুলক্রমঃ; এই যদি বরের মামা হয় তো আর ভাগ্নের কিছু

নেই ; একে দেখেও রমাদির জন্যে মন গলবে না এমন পাষাণ হতেই পারে না পরেশদা।

খবর দেবার কথা অবশ্য স্কুল থেকে ফিরে বিকেলবেলায়, কিন্তু তখন আর মুহূর্ত দেরি সইছে না, এই নূতন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আগে থাকতে মন ভাঙিয়ে রাখবার আর একবার চেষ্টাও করতে হবে। বই-খাতা রেখে মাঝের পাড়ায় ওঁদের বাড়িতে গেলাম।

পরেশদা একটা মোটা ইংরেজী বই খুলে রেখে একটা চটি বাংলা বই পড়ছিল।

জিজ্ঞেস করলে—"স্কুলে যাস নি ?"

একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করত এ ধরনের কথাগুলা। বললাম—"মাথা ধরেছিল—তাই…"

ঐতেই হয় ; ধরা মাথা নিয়ে এই দুপুর রোদে কেন এলাম সে কথা আর তুললে না পরেশদা ; দৃষ্টি আবার বাংলা নভেলটার ওপর নামিয়ে প্রশ্ন করলে… "তার পর ?"

সব বলে গেলাম—"আজ সকালের গাড়িতে এসেছে পরেশদা, যখন ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামল তখন আমি সেখানেই। সদর-দরজায় পা দিতে না দিতে কি তম্বি !—'চা লে আও…গড়গড়া কোথায় ?…পান হাজির কর', যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ নামলেন! চেহারার দিক দিয়েও তাই, অন্তত খানিকটা ; তিন জন নামলেন, তিন জনেই সমান—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। মরুকগে, দু'জনের কথা বাদই দিলাম—একজন, ওরই মধ্যে যে ছোট সে বরের বন্ধু, একজন পাড়া সম্পর্কে খুড়ো। কিন্তু মামাকে তো বাদ দেওয়া যায় না, শাস্ত্র যদি সত্যি হয় বর তো তার দিকেই যাবে, তার চেহারাটা একটু দেখো ভাল করে। তুমি মনে করতে পার শৈলটা সেদিন বানিয়ে বলেছিল, একবার মাতুল-মহাশয়ের লাশখানা দেখলে তোমার আর সে ধোঁকা থাকবে না পরেশদা। গরিবের ঘরের বাপ মা-মরা মেয়ে রমাদি, ময়ূর ছাড়া কাতিক তাঁর জন্যে আসবে কোথা থেকে ?—সবই মানি, কিন্তু কুরূপেরও একটা হিসেব আছে তো ? একবার মামার বপুখানি দেখো, ভাগ্‌নে যদি তার কাছে ঘেঁষেও যায়…"

যতদূর বুদ্ধিতে আসে সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বলে যাচ্ছিলাম, পরেশদা এইখানে ঘাড় তুলে বললে—"তা হলে তোদের রমাদির ভাগ্যি।"

আমি থমকে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

পরেশদা বললে—"রাজপুতেরা গালপাট্টা রাখে, মুসলমানেরা দাড়ি রাখে, শিখেরা তাদের ওপর টেক্কা দিয়ে দাড়ি চুল দুই-ই রাখতে লাগল—কেন জানিস ?"

চুপ করে রইলাম।

"বেটাছেলেরা লড়াইয়ের জাত, মেয়েদের মতন ঘর-সাজানো জিনিস নয়। তাই তারা যত ভয়ঙ্কর হবে ততই সুন্দর। এই হল বেটাছেলেদের সৌন্দর্যতত্ত্ব, এতে তিলফুল নাসা, কি বিম্বাধরের ঠাঁই নেই। অর্জুনের ছিল আকর্ণবিস্তৃত চোখ—দুটোই, একবার মনে মনে ভাব দিকিন সেই চোখ তুলে তোর দিকে চেয়েছে!—গাণ্ডীবও ধরতে হবে না। রূপ সম্বন্ধে—তোদের রমাদির বর যে পুরোপুরি মামার মতন হবে তার আশা নেই, যদি এক ভগ্নাংশ হয় তো তার জোরবরাত বলতে হবে।...কিন্তু চুলোয় যাক, বিয়েই হবে না ওখানে তো বর স্বরূপ কি কুরূপ!"

ক্রমেই বেশি অবাক হয়ে যাচ্ছি। পরেশদা বেশ ভাল করে ঘুরে বসল, বললে —"তুই কি ভেবেছিস তোর ভরসাতেই বসে আছি, কখন শৈল এসে খবর দেবে? খেয়ে দেয়েই ছুটেছিলাম, মামাকে পটাতে, একবার নাকচ করে যদি চলে যায় তো এ চান্সটাও যাবে গরিবের ভাগ্নীর। কিন্তু, নাঃ, কোন আশাই দেখছি না।"

মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও টাটকা টাটকি সৌন্দর্যতত্ত্ব শোনবার পর মুখটা সাধ্যমত বিষণ্ণ এবং চিন্তাগ্রস্ত করে নিতে হল, বললাম—"কেন পরেশদা, কি আবার বিপদ এসে জুটল শুভকাজে? তুমি যেমন বলছ, ছেলে তো তাহলে সোনার চাঁদ।"

"অনেক করে ধরলাম, একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে, আর দুটো যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে; বললাম—গরিবের মেয়ে, কিন্তু রূপে গুণে ওর জুড়ি নেই পাড়ায়, মামার গলগ্রহ হয়ে রয়েছে—তার পর আজকালকার মেয়ে, ক্রমাগতই কথা ভেঙে যাচ্ছে দেখে শেষে আপিনই খায় কি কেরাসিন তেলই ঢালে কাপড়ে —যদি কোন খুঁতখাৎ পড়ে চোখে সেটুকু ক্ষ্যামাঘেন্না করে মেয়েটিকে নিন দয়া করে।...যতদূর বলা যায় বাড়িয়ে-টাড়িয়ে বললাম, কিন্তু..."

"কি বললে মামা ?"

"দেখছি ভয়ঙ্কর কড়া লোক, আর একেবারে সেকেলে। বললে—'ওহে ছোকরা, তুমি তো বলছ; কিন্তু সুন্দর মেয়ে নিয়ে তো ধুয়ে খাব না। আমরা সেকেলে

লোক, যতই দেখছি ততই একালের মেয়ে ঘরে আনা দুর্ঘট মনে হচ্ছে ; একটি কথা জিজ্ঞেস করতে যা দেরি, মুখে তড়বড়-তড়বড় যেন খই ফুটতে থাকে। সাতটি মেয়ে দেখলাম এই মাস ছয়েকের মধ্যে, সাত জায়গায়ই এই কাণ্ড। অপরাধের মধ্যে, একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গান-টান আসে মা ? জানে না আশা করেই জিজ্ঞেস করা, সে গট্‌গট করে উঠে গিয়ে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এসে রাগিণী ভাঁজতে আরম্ভ করে দিলে।—যেন মুকিয়ে বসেছিল। ঠেকা দিতে না বলে বসে বাঁযা-তবলা আনিয়ে—সেই ভযে সুড়সুড় করে উঠে এলাম। এই তো দুনিয়ার হালচাল। তুমি খুঁতখাঁতের কথা বলছ ছোকরা, আমি বোবা-কালা হলেও রাজী আছি, অন্য খুঁতের কথা থাক ; কিন্তু ব্যারিস্টার মেয়ে ঘরে আনতে পারব না। আমাদের বনেদী সেকেলে ঘর, বউমানুষ মাটি থেকে চোখ তুলবে না, সাত চড়ে কথা কইবে না।...সুন্দরী তো বলছ, কিন্তু যা খুঁজছি তা হবে বলতে পার কি ? আশা তো হয় না যে একটা মেয়ে অমনি দলছাড়া হয়ে যাবে আমাদের ভাগ্যে, তায় আবার বয়সও হয়েছে, পেকেছে একটু বেশি। দেখাই যাক, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ; আজ বিকেলেই বুঝতে পারব।"

সবটা বলে পরেশদা আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"এতে ভয় হয় না যে গেল সব পণ্ড হয়ে ?"

আমিও যতটা সম্ভব ভয়ার্ত হয়ে বললাম—"তা হলে কি হবে পরেশদা ? কোনও উপায় নেই কি ?"

পরেশদা বললে—"উপায় থাকবে না কেন ? আর উপায় খুব সোজাও, কিন্তু করেই বা কে ? আর বলেই বা কে ?"

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি উপায় বল না, দেখি যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।"

"বলেই বা কে এই জন্যে বলছি—একটা ঠাউরে রেখেছি উপায়, কিন্তু সেটা কাজে লাগাবে তো তোদের রমাদিই, অবিশ্যি যদি ও চায় বিয়েটা হ'ক ; আর যদি তোরই মতন বরের মামাকে দেখে শাস্ত্র আওড়ায় আর নাক সিটকোয় তো থাকুক আইবুড়ো হয়ে, কার বয়েটা গেছে ?...কিছু বলেছে এ নিয়ে ? তোর সঙ্গে তো খুব দহরম-মহরম শুনি।"

বললাম—"পাঁচুদিদিকে একবার নাকি বলেছিল আর কতদিন মামাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে জানি না। পাঁচুদিদি মাকে একদিন বলছিল..."

পরেশদা বাইরের দিকে চেয়ে একটু ভাবলে, তার পর আমায় দৃষ্টি সরিয়ে

নিয়ে বললে—"হুঁ…আত্মহত্যার লক্ষণ।…উপায় তো ঠাউরেছি, খুব সোজা, নিজেই ভেবে নিতে পারত যদি মামাশ্বশুর কি চায়টের পেত, কিন্তু বলে কে? ভলন্টিয়ারি কে করে?"

ঐ 'ভলন্টিয়ারি' কথাটুকুই যথেষ্ট ছিল, তখন ওর উপরই স্বদেশী আন্দোলনটা চলছে। নিজের পছন্দ অপছন্দ সব গেলাম ভুলে—ভুলে যাওয়াটাই তো পৌরুষ, শুধু মনে রইল ভলন্টিয়ারি করতে হবে, লীডারের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে দিতে হবে বলি; একটা নারীকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে হবে; বললাম—"কেউ না যায় আমি যাব পরেশদা, তাতে যত বিপদই থাক না কেন।"

পরেশদা বললে—"ঐ তো বললাম, তোদের রমাদিও ভেবে ঠিক করে নিতে পারে, শুধু মামাশ্বশুর কি চায় সেইটে তাকে বলে দেওয়া …মানে, বোবার শত্রু নেই। বেশ তো, তোমরা যদি চাও কনে' সাত চড়ে কথা না কয় তো তাই সই। …কিছু ঢুকল মাথায়?"

আমি বললাম—"হুঁ, পাঁচবার জিজ্ঞেস করলে একবার উত্তর দেওয়া।"

"খুব মিহি গলায়, শুনতে না পেলেই ভাল।…একেবারে কোন উত্তর না দিলেই বেশি যশ।…যা, যদি আইবুড়ো নাম ঘোচাবার ইচ্ছে থাকে তো পরামর্শটা নেবে। কি বলে জানিয়ে যাবি আমায়। কিন্তু খবরদার আমার নাম করবি নি।"

রমাদির সঙ্গে খুব অল্প কথাই হল। বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময় পৌঁছলাম, সে তখন একটা নভেল মুখে করে ছাদে চুল শুকোচ্ছে। বাড়িতে অল্প লোক, সবাই ঘুমোচ্ছে; মেয়ে দেখা সেই একেবারে সন্ধ্যার একটু আগে, কারুর তাড়া নেই।

সবটা শুনে রমাদি বললে—"কার কাছ থেকে এ সন্দেশ বহন করে আসা হচ্ছে মশাইএর?"

ওর চোখ দুটো ছিল যেমন মিষ্টি তেমনি আবার কড়াও; আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে রইলাম।

রমাদি একটু ভ্রূ নাচিয়ে বললে—"আমি বলব?—ক্যাপ্টেন পরেশনাথ রায় চৌধুরী।…তাঁকে বল, তিনি যদি এণ্ট্রান্স নিয়ে সারা-জীবন পড়ে থাকতে পারেন, আমারও সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে পড়ে থাকলে দোষ হয় না।"

পরেশদাকে অবশ্য ওভাবে রিপোর্ট দেওয়া গেল না। পথে একবার নিবারণের সঙ্গে দেখা হওয়ায় দুর্ভাবনার কথাটা সব বললাম। নিবারণ একটু মুচকি হেসে বললে—"এ তো ঠেস দিয়ে কথা!"

আর একটু মুচকি হেসে চলে গেল; মনে হল ওর নভেলের যেন কিছু নূতন খোরাক পেয়েছে, নোটবুকে টুকে রাখতে চলল।

বেলা পড়ে যেতে আবার যখন রমাদির বাড়ি গেলাম তখন প্রায় সব ঠিক। বৈঠকখানায় তিন জনে তিনটি আসনে বসেছে, সামনে রেকাবি-ভরা খাবার, কাঁচের গেলাসে জল। আমি যখন পৌছলাম, তখন মামার পাতে আরও ঢেলে দিচ্ছে। যেন দেখতে পায় নি এই ভাবে মুখ ঘুরিয়ে সে গল্প করছিল, রেকাবি ভর্তি হয়ে গেলে ঘুরে দেখে শিউরে উঠে বললে—"এঃ, করেছেন কি!"

ভেতরের দিকে দরজা দিয়ে রমাদি ওর মামার সঙ্গে এসে একখানি আসনে সামনাসামনি বসল। এই নিয়ে চারবার হল। বেশ পোক্ত হয়ে গেছে। এর আগের বার পর্যন্ত দেখেছি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আসে, বসে, এবার কিন্তু বসল খুব জড়সড় হয়ে। আমার বুকের ধুকপুকুনিটা গেল বেড়ে, মনকে সান্ত্বনা দিলাম এ হয়তো মামাশ্বশুরের ওপর নজর পড়ার ফল, আবার কেটে যাবে এক্ষুনি। মামার মুখের ভাবটা ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্যে আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়েছি, ভেতরের দরজা ঘেঁষে। একখানা বড় ছানাবড়ায় কামড় দিয়েছিল; ছানাবড়া, দাঁত আর গোঁফে একাকার হচ্ছে, ও এদিকে রমাদির পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটু পরে 'হুঁ' করে বেশ একটা তৃপ্তির শব্দ করে জিগ্যেস করলে—"তোমার নামটি কি মা?"

আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠায় এসে দাঁড়িয়েছে, কি হয় কি হয়! তার পর, যাঃ, সব আশা বুঝি গেল! অত ঠেস দিয়ে কথা বললেও রমাদি পরেশদার কথাই শুনলে বুঝি! কোন উত্তর না দিয়ে, মামার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

—"বল মা তোমার নামটি কি, লক্ষ্মী মেয়ে!"

রমাদি ঘাড়টা এবার একটু নীচু করলে।

—"বল, নাম বলবে তাতে লজ্জা কি?"

আমি একটু পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; রমাদির মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে, উত্তর কিন্তু দিলে না, শুধু ঘাড়টা আরও নীচু করে নিলে।

মামার মুখের দিকে নজর গেল আমার, কি যেন ভাবছে, তার পর গলাটা বেশ একটু চড়িয়ে বললে—"জিগ্যেস করছি, তোমার নামটি কি?"

একই ভাব, কোন উত্তর নেই। বেচুপণ্ডিতের দিকে নজর গেল, মুখটা একটু শুকিয়ে গেছে। তার সঙ্গে খানিকটা রাগ বা বিরক্তির ভাবও আছে ; এক পা এগিযে এসে বললেন—"তোব নাম জিগ্যেস করছেন, বলতে হবে না ?"

কথাগুলো বেশ জোরেই বেরুল তাঁর মুখ দিয়েও। রমাদি শুধু বেচু পণ্ডিতেরই কানে যায় এই রকম খুব মিহি সুবে নামটা বললে। তিনি আরও একটু রেগে বললেন—"তা ওঁকে বল, বোবা হয়ে থাকলে চলবে কেন ?"

মামা একটু হেসে বললে—"বোবা হতে যাবে কেন ?...একটু জোরে বল তো মা, আমিও আবার একটু কালা।"

ঘবে একটু ফিসফিসানি হচ্ছিল, বিশেষ করে ভেতরের দরজার দিকে, সব একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বেচুপণ্ডিত কতকটা রাগে, কতকটা নিরাশায় বললেন—"আজ্ঞে ও কালা নয়, কালা হলে কি তঞ্চকতা কবে ডেকে আনি আপনাকে ?"

আমি একটু গোলমালে পড়ে গেছি ; মামার মুখে একটু মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে তখনও, অথচ ঠিক হাসির কথা কি ? ধোঁকাটা অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। মামা রমাদিকে বললে—"যাও মা তুমি ভেতরে।" তার পর নিজেও উঠে সদবের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—সেও হেসেই বললে—"মেয়ে বলছে সে কালা মশায়, সাত ডাকে উত্তর দেয় না, আপনি যদি বলেন নয়, তাই মানতে হবে ? মিছে এ ভোগাস্তিটা হল তো ?"

ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুতই ছিল, তিন জনে সরাসরি গিয়ে উঠে বসল।

বেচুপণ্ডিত ব্যাকুলভাবে গাড়ির দরজাটা ধরে বললেন—"আজ্ঞে কালা নয় মেয়ে আমাদেব, একরত্তিও নয়, আপনি একেবারে উঠে পড়লেন, নইলে—আরও দুটো কথা জিগ্যেস করলে..."

মামা বললে—"আপনি তার জন্যে এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন ? কালা মেয়ে কি হয় না পৃথিবীতে ?...তবে আমাদের বড় সংসার, কনের কাছ থেকে কোন উত্তর আদায় করতে হট্টগোল পড়ে যাবে বাড়িতে...। হাঁকা রে, গাড়িটা আবার না ফেল করি, যা সুযাত্রা !"

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম পরেশদার বাড়ি, আহ্লাদের চোটে আর কিছু জ্ঞানগম্যি নেই। ঘরের দরজায় পা দিয়ে হঠাৎ হুঁশ হল, এ তো সুখবর হবার কথা নয়!

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হবার চেষ্টা করে বললাম—"সর্বনাশ হয়েছে পরেশদা! ওরা বুঝলে না, কালা বলে রিজেক্ট করে দিয়ে গেল। এবারেও..."

পরেশদা বাংলা চটি বইটা থেকে নিরুদ্বেগ ভাবে দৃষ্টিটা একটু বাঁকালে, বললে—"তুই মাঝখান থেকে কোন্ দিন হার্ট ফেল করে মরবি এই নিয়ে।···র‍্যাকের ওপব ঐ প্লেটে আমাব জন্যে চারটে ছানাবডা রেখে গেছে খেয়ে নিয়ে একটু জিরো!···এবারে কেন, ও মেয়ের কোনবারেই আইবুড়ো নাম ঘুচবে না। ···পরশু নাকি বাবা দেখতে যাবেন শুনছি, এবার কালার ওপব বোবাও সেজে বসতে বলে দিস, নিদেন, নাম জিগ্যেস করলে যেন আরও কালা সেজে বলে—"মনোহরপাঠ।"

প্রভু

গিয়া তাঁহার পাশটিতে বসিলাম। 'তাঁহাব' বলিয়া আবম্ভ করিলাম যেহেতু 'অভিধা'টা কি দিব বুঝিয়া উঠিতে পাবিতেছি না। তিনি শৈব, শাক্ত আবাব বৈষ্ণবও। তবে প্রথম দুইটা তাঁহার ঐতিহাসিক সত্তা,—তাঁহার মুখেই শিব-তাণ্ডবের কথা শুনিয়াছি, চণ্ডী শুনিয়াছি,—কিন্তু সে কাহিনীরূপে; এখন তাঁহাব কণ্ঠে অন্য স্বর, মৃদু বিগলিত—যেমন যমুনার কলস্বন। এমন যে তিনি, তাঁহাকে কি অভিধা দিব? তবুও তো একটা দরকাব,—'প্রভু' বলিয়া চালাই আপাতত।

আশ্রমটি গঙ্গার ধারে। হিন্দুর ইহকাল-পবকাল জাহ্নবী,—এখন বর্ষায় দিগন্তপ্রসারিত গৈরিক জলরাশিতে পূর্ণ, উদ্দাম, বেগ-চপল গতি দাম্ভিক ঐরাবতের দুরদৃষ্টের কথা মনে কবাইয়া দেয়; আশ্রমের তলাটিতে কিন্তু সুব একেবাবে অন্য রকম। তিনি ভাববিহ্বল কণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলেন—"আমায় জয়দেবের পদাবলীর কথা মনে কবিয়ে দেয়, যেন যমুনা হয়ে গেয়ে চলেছে—ধীর সমীবে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী···" আমি বলি···"গঙ্গাও যদি যমুনাব সুর ধরেন তো সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য নয় কি প্রভু? তাহলে আর এ অভাগাদের রইল কি?"

তিনি শুধু হাসেন।

কবে যে এ হাসিটি বন্ধ হইবে সেই কথাই ভাবি। অর্ধনিমীলিত নয়নে মদির সে হাসি, ষোডশীর হাসির কথাই মনে করাইয়া দেয়; ষোড়শীদের জলকেলির কথা চিন্তা করিয়া করিয়াই কি এই পরিণতি? ভাবিয়া কূল পাই না।

আরও একটা বিষয়ের কূল পাই না—হাজার ভাবিয়াও,—প্রভু কি করিয়া বাঁচিয়া আছেন, এবং কেন ? হাতদুইটি একেবারেই ছিনে-ছিনে, পা দুইটিও তদনুরূপ—অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া দিয়া জীবনীশক্তির প্রবাহ সেই চারিটি অঙ্গই তাঁহার প্রায় নিষ্ক্রিয়। তবুও আহার আছে; রক্ত, মেদ, মাংসের সৃষ্টি হয়, সেগুলি সব গিয়া যেন সঞ্চয় হয় উদরে। অতি ক্ষীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে অতি-বিরাট উদর, এক কিম্ভূতকিমাকার শরীর লইয়া প্রভু আশ্রমে থাকেন বসিয়া।

আমি মাঝে মাঝে গিয়া বসি। কেন বসি ঠিক বলিতে পারি না—হয়তো বিকারত্বেরও একটা আকর্ষণ আছে, কিংবা হয়তো মনের কোথাও একটা উচ্চাশা আছে প্রভুর শৈবরূপ কি শাক্তরূপও একদিন দেখিতে পাইব, এই দেহেই তো সেই সব রূপের বিকাশ হইয়াছিল। বোধ হয় মগ্নচেতন মনের এই উচ্চাশাবশেই প্রভুকে এক একদিন আলোচনায় নাবাই। নিষ্ক্রিয় আলোচনায় প্রভুর উৎসাহ খুব। গীতাই মুখ্য বিষয়, অমন আনন্দও প্রভু আর অন্য কোন কিছুতে পান না, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ লইয়া সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের জাল বুনিয়া বুনিয়া চিন্তাজগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া চলেন। সে তর্কের রহস্য উদ্ঘাটন করাই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতে যোগদান তো অসম্ভবই। শুধু নীরব বিস্ময়ে শুনিয়া যাই। দেখি তর্কের প্রসঙ্গে কর্মযোগের উপরই প্রভুর পক্ষপাতিত্বটা বেশি, কেন যে, সেটাও বিস্ময়করই ঠেকে আমার কাছে,—কর্মের সঙ্গে যোগ নাই জীবনে বলিয়াই কি তার্কিক কর্মযোগে তাঁর এত টান? এক একদিন বলি—“প্রভু, কর্মযোগের প্রতীক-মূর্তি তো শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ—যেরূপে কর্ম-ক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি অর্জুনকে সেই কর্মে, সেই বীরধর্মে প্রণোদিত করছেন, জীবনের যা মূলসত্ত্ব। সে-রূপ তো কৈ দেখি না জীবনে। সেই রূপই তো সেই মহাকর্মীর শ্রেষ্ঠরূপ—আর সেই রূপের ভজনা করলে বৈষ্ণবই তো শ্রেষ্ঠ শাক্ত হত, সেই রূপই তো—আপনার মুখে যেমন শুনি—চিরদিনই ভারতের শ্রেষ্ঠ আরাধ্য রূপ ছিল; তাকে বিলুপ্ত করে কি করে এই অতি কোমল, বিলাসরূপ আসর জমিয়ে নিলে? ত্রিভঙ্গিমঠামের এই বিনোদরূপ, বামে কিশোরী—পূজকের, সাধকের অন্তরের নিভৃততম কোণটি থেকেও যে-রূপ কর্মের ক্ষীণতম প্রেরণাকে নির্বাসিত করতে বাধ্য…”

প্রভু শুধু তাঁহার সেই সর্বনাশা হাসি হাসেন; ভাবে চক্ষু আসে মুদিয়া, দর-বিগলিত ধারায় স্থূল গণ্ড বাহিয়া নামে অশ্রু। নিরাশ হইয়া চলিয়া আসি।

আজ আবার বহুদিন পরে আশ্রমে গিয়াছিলাম। কয়টা বছরে কয়টা যুগের ঘটনা ঘটিয়া গেল। সারা জগতে দ্রুত পরিবর্তনের সূচনা; এই চির-অভাগা জাতি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত—এর পরিবর্তন কিসে—বিলুপ্তিতে কি নবজাগরণে কিছুই বোঝা যায় না। কি করিয়া জানি না, কতবারই মনে হইয়াছে প্রভু আমাদের জাতীয়তার প্রতীক—আমাদের ধর্ম, সংস্কার, রাজনীতি, সমাজনীতি সব কি করিয়া যেন প্রভুর মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। তরঙ্গে-আবর্তে কল্যাণে-অকল্যাণে এই যে বিক্ষুব্ধ কর্মস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, প্রভুর মধ্যে, প্রভুর আশ্রমে এর কি প্রতিক্রিয়া হইল—কোনও প্রতিক্রিয়া হইল কিনা—জানিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য জাগিল। এখনও কি প্রভুর মুখে সেই অর্ধচেতন মদির হাসি?—আশ্রমের গঙ্গা এখনও কি জয়দেবের পদাবলীর কলতান তুলিয়া চলিয়াছে?

গিয়া দেখি প্রভু নিষ্ক্রিয় পা দুখানি মুড়িয়া, শুষ্কপ্রায় হাতদুখানি কোলে রাখিয়া তমালছায়ায় বসিয়া আছেন, মাথায় একটি কান-ঢাকা গৈরিক টুপি, কণ্ঠ পর্যন্ত নামিয়া গণ্ড দুটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু ভেদ করিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নামিয়া আসিতেছে।··ওদিকে আশ্রমগঙ্গার যমুনা-কলস্বন যেন আরও দ্রব, আরও মৃদু; আরও যে আরও কি, বুঝিয়া ওঠা যায় না।

প্রভুর অশ্রুকে আমি চিনি, কেননা ওঁর অস্তিত্বের একটা বড় নিদর্শনই হইতেছে ওঁর অশ্রু—প্রভুই যেন নিয়ত গলিয়া গলিয়া অশ্রু হইয়া বহিতে থাকেন। আজকের অশ্রু কিন্তু একটু ধোঁকা লাগাইল। এ ওঁর ভাববিহ্বল আনন্দের অশ্রু না ব্যথার অশ্রু?

একবার মনে হইল এ হয়তো ব্যথা-আনন্দ দুইয়েরই অশ্রু—জাতির সর্বাঙ্গের আঘাত প্রভুর অঙ্গে চেতনা জাগাইয়াছে, বেদনায় প্রভু আতুর, তাহার পাশেই জাগিয়াছে নবজাগরণের আনন্দ—প্রভুর মধ্যেকার শৈবশক্তি ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।···বড় আনন্দ হইল, এতবড় শুভ-সূচনা প্রভুর আশ্রমে আর কখনও পরিলক্ষিত হইয়াছে কিনা মনে পড়ে না।

অনেকক্ষণই চুপ করিয়া রহিলাম, একটা আশা, প্রভু আজ নিজের অন্তরের আবেগেই তাঁর বাণী উচ্চারণ করিবেন, প্রশ্ন করিয়া কিছু বাহির করিতে হইবে না। প্রশ্নের উত্তরে যে বাণী, তাহা যেন কূপোদকের মত; তাহাতে তৃষ্ণার তৃপ্তি আছে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত স্রোতে অবগাহনের যে আনন্দ, তাহা নাই; আমি চাই সেই স্বতউচ্ছ্বসিত ঝরনা—প্রভু আজ প্রবুদ্ধ-চেতন, তিনি নিজের আনন্দ-প্রেরণায় অ-পৃষ্ট হইয়াই কিছু শোনান আমায়।

প্রভুর তুরীয়ভাব কিন্তু ঘুচিল না, তখন বাধ্য হইয়াই প্রশ্ন করিলাম—"প্রভু, আজ এ অশ্রুর অর্থ কি? প্রভুর এ আনন্দ, না বেদনা?"

প্রভু প্রশ্ন শুনিয়া ভাল করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, সেই মদির হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তোমায় আজ অনেক দিন পরে দেখছি।"

বলিলাম—"কিঞ্চিদধিক তিনবৎসর পর।"

"তাই বোধ হয় তুমি আমার অশ্রুর কারণ অবগত নও,—আমার এ অশ্রুতে আনন্দ আর বেদনা দুইই ওতপ্রোত হয়ে আছে। এত আনন্দ আমি জীবনে কভু পাই নি, কিন্তু তবুও সে আনন্দ আমার অপূর্ণ, - সেই বিরাট ব্যর্থতার গভীর বেদনাতেই আমার স্বচ্ছ অশ্রু আজ আমলিন।"

সবটাই একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালির মত। প্রভু নিজেই যেমন একটা হেঁয়ালি। কিছু বোধগম্য না হওয়ায় আমি মূঢ়ের মতো হাঁ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রভু হাসিলেন, তাহার পর কানঢাকা টুপির বাঁ-দিকটা তুলিয়া ধরিলেন।

বীভৎস দৃশ্য! আমি একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম; অমন স্থূল বাঁ গালটা একেবারে নাই বলিলেই চলে, একেবারে কোটরগত, একটা অতি ক্ষীণ চামড়া নীচের চারিদিকের হাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া গেছে, সমস্তটার ওপর একটা নিদারুণ বুভুক্ষা—একটা ক্রুর দুর্ভিক্ষের ইতিহাস যেন লেখা রহিয়াছে। অতৃপ্ত ক্ষুধায় এ যেন নিজেরই একটা অংশকে বসিয়া বসিয়া উদরস্থ করা।

প্রভু টুপির ঝাপটা ফেলিয়া দিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"এই আঘাতটা দিলেন সেদিন, আহা কত যে ব্যথা লাগল তাঁর হাতে।"

তাহার পর ডানদিকের ঢাকনাটা তুলিলেন। সেই একই ভাবের ক্ষমাবিগলিত হাসি। বলিলেন, "এইটে দিয়েছেন সন্ত; কি নিষ্করুণ আমার এই গণ্ডদেশ, কত ব্যথা যে দিলে তাঁকে!"

সমস্ত গালটা আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত! ওটা ছিল ক্ষুধায় বিশুষ্ক; হিংস্র অস্ত্র এটার শেষ মেদকণাটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

নিরতিশয় বিস্ময়ে আমি প্রভুর মুখের পানে চাহিলাম, বলিলাম—"প্রভু, আপনার ভাষা এত শ্রদ্ধান্বিত দেখে আমি বেশ একটু ধাঁধায় পড়েছি—যা দেখছি তার দুটোতেই তো শয়তানের হাতের ছাপ।

প্রভুর সমস্ত মুখখানি আবার ক্ষমার কারুণ্যে ছাইয়া গেল, অশ্রু নামিল আবার দরবিগলিত ধারায়। তুরীয়ভাব অতি সন্নিকট দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি

বলিলাম—"প্রভু, আপনি সব ভুলে সব ক্ষমা করে ভু[redacted]বার আগে আমার একটা সংশয় মিটিয়ে দিন,—আপনার দু[redacted]র পর একটি পেতে দিয়েছেন—তা বেশ গুছিয়ে দুটিই শেষ কর[redacted] আঘাত গ্রহণেই যদি আনন্দ তো সে আনন্দ তো পু[redacted]য়েছেন আপনি, অপূর্ণতাটা এল কোথা থেকে ?"

প্রভু শেষবারের মত একবার চক্ষু খুললেন,[redacted]র পাতা যেন মণ-খানেক ভারী হইয়া পড়িয়াছে, অশ্রুধারায় শুষ্ক[redacted]ছে ভাসিয়া, অপূর্ণ আনন্দের বেদনায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—[redacted]এই দুটি মাত্র গাল দিয়েছেন নিষ্ঠুর বিধাতা। হাতের [redacted] তিনি যদি আবাব আঘাত দিতে চান তো এবার [redacted]ই ভেবে যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি…"

শোক-শোভা

স্বরূপ মণ্ডল একটু অন্যমনস্কভাবেই দেখে নিয়ে বলল—"আসুন দা'ঠাকুর, ব'স্তাজ্ঞে হ'ক"—তারপর আবার দৃষ্টি নত করে তামাক টানতে লাগল।

একটু অপেক্ষা করে বললাম—"ব্যাপারখানা কি মণ্ডলের পো ? আজ একটু যেন বেশি চিন্তাকুল দেখছি ?"

স্বরূপ হুঁকোটা ছ্যাঁচা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে দিয়ে আমার কড়িবাঁধা হুঁকোটা নিয়ে এল, তারপর তার মাথায় কলকেটা বসিয়ে আমার হাতে দিতে বলল—"আজ্ঞে, তা একটু চিন্তায় ফেলেছে…কিছু যে বুঝতে নারলুম !"

প্রশ্ন করলাম—"জিনিসটা কি ?

"পয়লা সওয়াল হচ্ছে—শোক-শোভা—সে বস্তুটো আবার কি ?"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—"বোধ হয় সভা শুনতে শোভা শুনেছ স্বরূপ, শোক-শোভা বলে কোন কথা আছে এমন তো মনে হয় না।"

"কে জানে ; বয়েস হয়েছে, মগজে কথাগুলো আর তেমন ধরে তো রাখতে পারি নে ; মনে তো হল যেন সভা বলেই নে' গেল, তার পর গিয়ে দেখি সাজিয়েছে যেন যাত্রার আসর, তাই একটু ধোঁকায় পড়েছেলুম।…আপনি যখন

বলছ, ও সভাই হবে, [illegible]। কিন্তু দোসরা সওয়ালের জবাব পাই কোথা? শোক হয়েছে [illegible] ঘটা করে সভা করতে গেলি, অথচ…"

জিগ্যেস করলাম—"শোকটা কিসের?"

"তাহলে সবটাই শুনুন আগাগোড়া, খাবলা-খাবলা করে শুনলে মিটবেও না সমিস্যেটা। পরশুকোর কথা, এটা যেন হল দুপুর, সন্দের সময় এমনি করে একলাটি বসে গুড়ুক টানছি, বামুন আর বস্তিপাড়ার একপাল ছেলে এসে উপস্থিত। তার মধ্যে জন চার-পাঁচকে চিনি—ভটচাব্যি মশায়ের মেজছেলেটি আছে, রায়েদের বাড়ির একটি ছেলে আছে, স্যানমশায়ের নাতিটি আছে, আমাদের নটবরের বড় ছেলেটি আছে—বাকি আর সব তেমনি চিনি নে দা'ঠাকুর, আর তো এই আস্তানাটুকু ছেড়ে বেরুই নে তেমন; আর তারই এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমার নাতি পদ্মলোচন—যিটি গেল বছর পাস দিলে গো!…ভর্‌সন্দের বেলা, কথা নেই বার্তা নেই একেবারে এতগুনি ভদ্দরলোকের ছেলে, জিগোলুম—'কি চাও তোমরা বাপু?' একটু উসখুস উসখুস করলে সবাই, তার পর নটবরের ছেলেটি একটু এগিয়ে এসে বললে—'পুরুষোত্তম ঠাকুরদা তো মারা গেলেন, গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো লোক, প্রায় আশি বছর পুরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই আমরা ভাবছি তাঁর জন্যে একটু শোক প্রকাশ করব।'…একটু ধাঁধায় পড়ে গেলুম দা'-ঠাকুর, ঐ যে 'ভাবছি' বললে কিনা। জিগোলুম—'শোকটা তো বুঝলুম, প্রকাশটা বুঝি নে বাপু, একটু বুঝিয়ে বল।' বললে—'প্রকাশ করব, মানে জানাব আর কি যে আমরাও শোকটা পেয়েছি।'…তখনও ধোঁকাটা কাটে নি দা'ঠাকুর, বললুম—'তা শোক হয়েছে, প্রকাশ করবে তার জন্যে আবার ভাবতে হবে কেন? সে তো আপনিই ঠেলে বেরিয়ে আসবে।'…ও বোঝাতে পারছে না দেখে স্যান-মশায়ের নাতিটি এগিয়ে এল, 'তা নয়, আমরা এর জন্যে একটা সভা করব ভাবছি'—সভাই বলেছেন দা'ঠাকুর, আপনি যখন বলছ, ওটা আমারই ধোঁকা ছেল—'একটা সভা করব ভাবছি, কালকেই বিকেলে, তা আপনাকে সভাপতি হতে হবে।' …এক ফ্যাসাদ মিটতে না মিটতে আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত, বললুম—'সে আবার কি? শোক প্রকাশটা না হয় বুঝলুম কোন রকম করে, আবার সভাপতি কি? কি করতে হবে আমাকে? আর তো খাটবার বয়েস নেই আমার, এক-সময় সবই করেছি।'…বললে—আপনাকে করতে কিছুই হবে না, সভার মাঝ-খানটিতে একটা উঁচু আসনে বসে থাকবেন, মানে আপনি হলেন ঐটুকু সময়ের জন্যে সভায় সবচেয়ে বড় আর কি, এই যেমন জেতের মধ্যে আপনি হচ্ছেন [illegible],

মানে কিনা সব চেয়ে বড়।'…আমার তো [illegible] মতন হয়ে উঠল দা'ঠাকুর…বললুম—'বামুনপাড়ার সবাই রইল, [illegible] সবাই রইল, আমি তাঁদের মাঝখানে গিয়ে উঁচু আসনে বসব!—[illegible] হয়েছে পুরুষোত্তম ঠাকুর গেলেন, এখন স্বরূপ মণ্ডলই যমের ঘাঁটি আগ[illegible]গ্রামে—কিন্তু বয়সটাই তো সব নয় বাবাঠাকুররা। কি করতে হয় বুঝিও না, [illegible] কাউকে ধর গিয়ে; বসে থাকব'খন এক কোনে।'…একটু চুপ করে রইল সব; চুপ করে থাকা মানে উসখুসুনি আর কি—কি বলবে, কি বলবে—তার পর আর একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—'আপনার তার জন্যে ভাবতে হবে না, ওঁদের মানে, বড়দের তেমন কেউ আসবেনই না।'…জিগ্যেস করলুম—'কেন, তাঁদের বাদ দিচ্ছ?'…'না, বাদ দোব কেন, আসেন, আদর করে বসাব, কিন্তু দেখবেন, কেউই আসবেন না, আপনার কিছু ভাবনা নেই।'…গোলমেলে কথা সব, কোন কথারই হদিস পাচ্ছি না দা'ঠাকুর, সব যেন আবল-তাবল বকছে, দলাদলির ব্যাপার নাকি?—তাই যদি হয় তো ব্রাহ্মণ-সমাজের ব্যাপার, এর মধ্যে আমায়ই বা টানবে কেন? শেষকালে ভাবতে ভাবতে আমার একটা কথা মনে হল—পুরুষোত্তম ঠাকুর ছিলেন গাঁয়ের যাকে বলে মাথা—তিনি গেলেন, আর তো ম'শনে অন্ধকার হয়ে গেল। শোকে এদের মাথা বিগড়ে গেল না তো? বললুম—'না বাবাঠাকুররা, পুরুষোত্তম ঠাকুর গেছেন, অবিশ্যি শোকের কথা বইকি, তবে গেছেনও তো তেমনি ড্যাং-ডেঙিয়ে, চার কুড়ি বছর আজকাল বাঁচছে ক'টা মানুষে তাও দেখতে হবে তো। তোমরা ঠাণ্ডা হও, অত মুশড়ে পড়তে হয় কি?—দেখলে না, কেমন সাজ্যে-সুজ্যে কেত্তন করতে করতে, খই-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে নে' গেল গঙ্গায়, যেন বরযাত্রী চলেছে—ঐ হল ওঁদের পাওনা। তোমরা যাও, যেমন পুরুষোত্তম ঠাকুর গেলেন, তেমনি তোমরা সবাই রইলে—হীরেরটুকরো—তানার স্থান নেবে, ম'শনে সোনার জায়গা, লোকের অভাব হয় না কখনও। যাও সব থির হয়ে বাড়ি যাও, অত দুঃখ কিসের?'

ঝাড়া একটি ঘণ্টা দা'ঠাকুর সেই ভরসন্দের সময়, না আমি ওদের কথা বুঝতে পারি, না ওরা আমার কথা বুঝতে পারে, ক্রেমেই যেন জোট পাকিয়ে যাচ্ছে। ক্রেমেই অন্ধকারও হয়ে আসছে, বুনো রাস্তা, সাপখোপের ভয়, শেষকালে না পেরে বলনু—"বেশ, রাত্তিরটা দেখি ভেবে, নতুন কাজ তো, কাল সকালে পদাকে দিয়ে খবর দেব'খন।…বললে—'অন্য খবর আমরা শুনছি না, কাল তাহলে আরও দলবল নিয়ে এসে ধর্না দোব।'…একবার কলকেটা নোব দা'ঠাকুর।"

নিজের হুঁকায় বসিয়ে কয়েকটা টান দিল, কিছু না পেয়ে নাতনীটিকে ডেকে সেজে আনতে বলে আবার আরম্ভ করল—

"ওরা চলে যেতে পায়া ধবে বসল রাজি হতেই হবে। ওর কাছেই সব কেচ্ছাটাও শুনলুম। এরা নোতুনেব দল আর পুরনো কিছুই মানছে না তো—বড জাত আর ছোট জাত আবাব কি? সেই জন্যেই সবাইকে বাদ দিয়ে স্বরূপ মণ্ডলকে সভাপতি করা—অনেক দিন থেকেই একটা তাগ্ খুঁজছেল, পুরুষোত্তম ঠাকুর মারা যেতে এই মতলবটা এঁটেছে।...ছোঁড়াকে বোঝালুম অনেক, কে শোনে দা'ঠাকুর? দুনিয়ার রকমখানাই গেছে বদলে, বললে—খাবে না, শোবে না, এমন কি শেষ পর্যন্ত যদি রাজি না হই তো আত্মহত্যে হবে। বাড়ির সবাইকেও নিজের দলে টেনে নিলে, ভয় দেখিয়েই হ'ক বা যা করেই হ'ক, শেষকালে যখন বুড়ি পর্যন্ত এসে নথ নেড়ে বললে—'হ্যাঁঃ, বামুনকায়েতে তো সগ্গে তুলে ধবেছে!'—তখন বললুম—তাহলে কর যা করবি বুড়োকে নিয়ে, হাল ছেড়ে দিলুম।"

আমি বললাম—"ভালই করেছিলে স্বরূপ, তোমার মতন গ্রামের পুরানো একজন লোককে মর্যাদা দিয়ে ওরাও ভালই করেছিল, না দিলেই অন্যায় হত। আর সে-ধরনের সভাপতি হওয়া নয় যে, বই থেকে লিখে পড়ে বড বড কথা আওডাতে হবে; শোক-সভা, গ্রামের একজন প্রাচীন লোক মারা গেছেন..."

আমার মুখের পানে চেয়ে মন্তব্যটা মন দিয়ে শুনছিল স্বরূপ, বাধা দিয়ে বললে—"আমারও তো সওয়াল তাই, দা'ঠাকুর; মরুকগে, সভাপতি করলি তো করলি, কিন্তু গ্রামের এতবড় একটা প্রাচীন লোক গেল বলে যে শোক-সভার ঢং করলি, তা ঐ তোর শোক-সভা?"

বললাম—"একটু সাজিয়ে থাকে—ছেলেমানুষদেরই ব্যাপার তো—অবিশ্যি যখন শোক-সভাই তখন ওসব না করলেই ভাল ছিল..."

"সে আম্মো ত্যাতো ধরছি নে দা'ঠাকুর; একটা গান গাইলে সেও তোমার গিয়ে কেত্তন নয়—তাও ধরি নে, কিন্তু শোক-সভা বলে এই যে একগাদা মেয়েপুরুষ জড়ো করে..."

জিগ্যেস করলাম—"মেয়েরাও এসেছিলেন?"

স্বরূপ একটু বিস্মিত ভাবে আমার পানে চাইল, বলল—"নাও, শোন কথা দা'ঠাকুরের! সমিস্তে মেটাবে কি, আপনি যেন আরও গুলিয়ে দিচ্ছ,—শোক-সভা তাতে মেয়ে থাকবে নি, কোন্‌দিন বলবে হেঁসেলেও মেয়ে না থাকলে চলে।

চলে, তার পরে বলবে আঁতুড়েও।…পদার মুখে যখন শুনলুম আমি সভাপতি হচ্ছি বলে বামুন-বস্তিপাড়া থেকে বডদের কেউ এগুবে নি তখন আমিও নিজের পাড়ার মেয়েপুরুষ সবাইকে ডেকে ব্যাপারখানা ভাল করে বুঝিয়ে দিলুম, একটা কাজ যখন ঘাড়ে করেইছি—আর যা-তা কাজ নয়, পুরুষোত্তম ঠাকুরের শোকসভা—তখন তাতে যেন খুঁৎ না থাকে সেটা দেখতে হবে তো—নয়তো ঐ ওনারাই শেষকালে বলবেন—দেখেছ, মোড়লের পো নাপ্যে গেল, গিয়ে পুরুষোত্তম ঠাকুরের কী অমর্য্যাদাটাই না করলে!…সব্বাইকে একত্তর করে বললুম—'দেখ, বামুনও নই, কায়েৎও নই, বস্তিও নই, থালা থালা মেঠাই মোণ্ডা খাচ্ছি না, কিন্তু এ না যেন বলে লোকে, শোক করতেও মোড়লপাড়া পেছপা হয়ে গেল—বছর না ঘুরতে একটা না একটাকে তুলেই দিচ্ছিস সব যমের হাতে। যে নেহাৎ অথব্ব তার কথা ধরি নে—বাকি সবাই দল বেঁধে এসবি। কি করতে হবে, কেমন করে বসতে হবে সমাজের মধ্যে সব বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিদেয় করলুম—অভ্যেস তো নেই এ সবের কারুর, শেষকালে বদনাম হতে তো সেই স্বরূপ মণ্ডলই।…ইদিকে, আমায় দে।"

নাতনী তামাক সেজে এনেছে, কলকেটা নিয়ে আগুনে টোকাটাকি মেরে ঠিক করে দিলে স্বরূপ, তার পর নিজের হুঁকাব ওপর বসিয়ে বললে,—"নিরেট দা'কাটা, আপনার হাতে তো শানাবে না, ধরিয়ে দিই এই।"

বেশ ভাল করে ধরিয়ে কলকেটা আমার হুঁকায় বসিয়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করল স্বরূপ—"তা এসেছেল দা'ঠাকুর, মোড়লপাড়া তো ম্যালেরিলে উজোড হয়ে গেছে, তবু দেখনু প্রায় শ'খানেক মানুষ—মেয়ে-পুরুষে, সভার দক্ষিণ দিকটা জুড়ে বসেছে—অবিশ্যি মেয়েই বেশি, প্রায় চার কুড়ি তারাই—বুড়ি, মাঝবৈসী, আপনার গিয়ে যুবী, সবাই সাজ্যে বসেছে। বলতে নেই, একটু ইয়েও হয়েছে তো দা'ঠাকুর, তাদের মোড়লকে এতটা ইজ্জৎ!

প্রেথমেই ঐ ধোঁকাটা লাগল দা'ঠাকুর, গোডায় বললুম না? মনে করলুম—দূর ছাই, বোধ হয় শুনতেই ভুল হয়েছে আমার—শোভা শুনতে সভা শুনেছি—বুড়ো মানুষ গেছেন, একটু সাজাবে নি?…আমায় ওরাই এসে বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নে' গেছল, সঙ্গে করেই তো সভার মাঝখানে একটা ফরাস-পাতা চৌকির ওপর বসালে। দুদিকে ফুলদানিতে ফুল সাজানো রয়েছে; আরও কি করে না করে বুঝতে না পেরে আমি আগে থাকতেই মানা করে দিলুম দা'ঠাকুর—যেন গঙ্গাফড়া আমদানি না করে বসে, খবরদার, ও চলবে না! না, ওদিকে আর কিছু

বাড়াবাড়ি করলে না। তা না করুক কিন্তু শোকসভা কোথায় দা'ঠাকুর? গোড়ায় একটা গান যা গাইলে তা কেত্তনও নয়, শ্যামাসঙ্গীতও নয়, ও আপনার গিয়ে আউল-বাউলও না, আর কী যে মাথামুণ্ডু তাও বুঝলাম না। মুকোব না দা'ঠাকুর, ঐ যে হাততালির মধ্যে যাত্রার আসরে এসে ঢুকলুম—ও ধোঁকাটা আমার বেড়েই চলল। আর যেদিকেই চাই ছেলে-ছোকরাদেরই দল, শুধু ধোঁকা বলি কেন, মনে মনে একটু রাগও হতে লাগল, অত বড মানুষটাকে নিয়ে একি ছেলেমানুষি করছে সব! স্থানমশায়ের নাতিটা কাছে ছেল—ওই সেকেটারি না কি শুনলুম—বললুম—'বাবাঠাকুর, নিদেন পক্ষে একটা দেহতত্ত্বও গাইবার ব্যবস্থা কর।'…বললে—'আপনি চুপটি করে বসে থাকুন—সব ঠিক হচ্ছে।'…তোর ঠিক হবার নিকুচি করেছে।…কিন্তু করব কি? রায় মশাই বলতেন—স্বরূপ, যস্মিন দেশে যদাচারো—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। চুপ করেই রইলুম; কিন্তু তাই বা কতক্ষণ পারে মানুষে?—গান গেল তো নেকচার।…তাই কি একটা আধটা?—এক জনের পর একজন উঠছে, তালি পড়ছে, যাত্রার দলের ভীমের মতন হাত পা নেড়ে নেকচার দিচ্ছে, তালি পড়ছে, বসছে তালি পড়ছে, আবার একজন উঠছে—বিরাম নেই দা'ঠাকুর—তালি থামে তো নেকচার থামে না, নেকচার থামে তো তালি থামে না—ধৈয্য ধরেই আছি, কিন্তু আর কত সয় বলুন না? আবার একবার স্থানমশায়ের নাতির জামার খুঁটটো টেনে বললুম—'বাবাঠাকুর, এযে তানাকে সগ্‌গে উত্তমফুত্তম করে তুললে তোমরা। কোথায় ভবলীলা সাঙ্গ করে একটু জিরুতে গেছেন। আর শোকের তো কিছু দেখলুম না এখন পজ্জন্ত।'…বললে, 'সব ঠিক আছে, আপনি থির হয়ে বসুন, একটু পরে আপনাকে সভাপতি হয়ে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের এই পদ্ধুতি।'…তোর পদ্ধুতির নিকুচি করেছে। কিন্তু কি করি দা'ঠাকুর, হাতপা কোলে করে বসে রইলুম। মনে মনে এও ভাবলুম—ছেলেমানুষরা করছে, স্বরূপ, শোকের চড়ুইভাতি বলে ধরে নে, উতলা হলে চলবে কেন। তুই রয়েছিস, যতটা পারিস দিস সামলে, তাইতেই পুরুষোত্তম ঠাকুর পরিতুষ্ট হবেন'খন, সগ্‌গ থেকে তো সব দেখছেনই তিনি। আর উতলা না হয়ে চুপ করেই রইলুম।

শেরায় যখন সন্দে হয়ে এসেছে, উদিকে হাত-ব্যথাও হয়ে এয়েছে ইদিকে গলাব্যথাও হয়ে এসেছে, আমায় বললে, এবার আপনার—অভি দিয়ে কি একটা কথা বললে দা'ঠাকুর স্মরণ নেই—তাই হবে।"

আমি বললাম—"অভিভাষণ বলে থাকবে।"

স্বরূপ বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, অভিভাষণই ; ঠিক, ঐ কথাই, তা লুকোব না দা'ঠাকুর, বেশ শক্ত কাজ, ফাঁফরে পড়ে গেলুম একটু। তোমাদের ছিচরণের কৃপায় শোক কখনও তো পাই নি তেমন—কবে বাবা মারা গেছে, মা মারা গেছে, তার আগে কবে ঠাকুরমা বুড়ি মারা গেছে, সে সব ভেবে এতদিন পরে কান্না এসবে কেন দা'ঠাকুর ?…বলবেন 'কেন, ঐ তো পুরুষোত্তম ঠাকুর গেছেন, এখনও ছেরাদ্দও হয় নি—অত বড একটা লোক, গাঁয়ের মাথা…।'…সবই মানি, বসে বসে তাঁর চেহারাটা ভেবে ভেবে গলা কাঠ-কাঠ করেও এনেছিলুম—কিন্তু ঐ যে নেকচার আর তালি—ঐতেই সব ভেস্তে দিয়েছে।…পা আর ওঠে না দা'ঠাকুর ; শোকসভার সভাপতি হয়ে উঠেছি, ইদিকে চোখে এক ফোঁটা জল নেই, একি নিগ্রহ ক'ন না। তখন মা-কালীকে মনে মনে বললুম—মা, ভেলা তো ভাসালুম অগাদ সলিলে, এখন তুমি করুণাময়ী যা কর।

বললে না পেত্যয় যাবে দা'ঠাকুর, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন উৎলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই কথা—পেসাদের মাকে লতুন বিয়ে করে নিয়ে আসছি, আর তার সেই ডাক ছেড়ে কান্না !—মানে, সেই পেরায় তিনকুড়ি-দশ বছর পূব্বেকার কথা।

শুধু উঠে দুটি কথা বলেছি—তাও পুরেপুরি দুটি কথা নয়—সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখে বান ডেকে এল দা'ঠাকুর, কথা গেল বন্ধ হয়ে। বন্ধ না হলেও ক্ষেতি ছেল না, কেন না হাজার চেঁচালেও তখন তো কেউ শুনতে পেত না।…দিন, একটু পেসাদটা পাই।"

জিগ্যেস করলাম—"কেন, হলটা কি ?—শুনতে পেত-না যে বলছ ?"

স্বরূপ গোটাকতক টান দিয়ে বলল—"ঐ যে বললুম, সকালে সবাইকে ডেকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলুম তো ? আমি কেঁদে উঠতেই মোড়ল-পাড়ার ওরা সবাই মডাকান্না তুললে। অবিশ্যি একসঙ্গে পারলে না, আগে বিনোদের খুড়ি তার শাশুডির নাম করে কেঁদে উঠল, তার পর রতনের মা রতনের খুডোর নাম করে, তার পর ছিদামের পিসি, তার পর অভিরামের দিদিমা—যার যেখানে শোক, সভা ফাট্যে কেঁদে উঠল দা'ঠাকুর। তার পরে কি আর দেখতে হয় ?—মেয়েমানুষই তো সব, একটুখানির মধ্যেই নিজের নিজের শোক থেকে পুরুষোত্তম ঠাকুরের ব্যাপারে এসে পড়ে এমন শোকসভা দাঁড় করিয়ে দিলে যে চারিদিক থেকে আধখানা গ্রামের সবাই হৈ-হৈ করে ঘর থে' বেরিয়ে ছুটে এল।

ওরা প্রেথমটা থ' মেরে গেছল, ওদের পদ্ধতি তো নয় দেখলুমই ; কয়েকজনা

মোড়লপাড়ার ওদের দিকে ছুটে গেল থামাতে। কয়েকজনা আমায় ধরে বসিয়ে দিতে এল—'ও মণ্ডল মশাই! একি করছেন? আসুন, আসুন, থামতে বলুন ওদের—একি কাণ্ড!…এযে পদ্ধতি নয়…"

তখন আর রাগটা চাপতে পারলুম না, দা'ঠাকুর—মানুষেরই শরীল তো? …নিজেরা তো কিছু করলি না, এত কষ্ট করে যদি বা দাঁড় করালুম একটা তো তাতেও বাগড়া!…চাপতে পাবলুম না রাগটা দা'-ঠাকুর—'তবে তোমাদের রৈল ঢঙের শোকসভা'—বলে এমনি করে বুড়ো আঙুল দুটো দেখিয়ে হন হন করে ওদের যাত্রার আসর ছেড়ে চলে এলুম।

তা তো হল দা'ঠাকুর, কিন্তু সওয়ালের আমার জবাব কৈ?—শোকসভা করলি তার সবটাই পদ্ধতি, চোখে কারুর একফোঁটা লোনা জল জুটল না!"

স্মৃতি-মাত্র

১

পরিবারটি একটু বড়, তাই শিশু প্রায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তাকে নিয়ে আদরের কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়ে যায়। ষষ্ঠী-সেটেরা, শুদ্ধি-অশুদ্ধি এই সবের দোহাই দিয়ে বাড়ির গিন্নিরা ছোট বড় ছেলেমেয়েদের ঠেকিয়ে রাখে, কিন্তু বড়দের কি করে এঁটে উঠবে? একটি কাকা ডাক্তার, তার না আছে শাস্ত্রের বালাই, না আছে শুদ্ধি-অশুদ্ধির; একটি শিশু হল, তার পর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত তার অতি সূক্ষ্ম দেহযন্ত্র নিযে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল,—এর বিস্ময়, এর কৌতূহল তাকে আঁতুড় ঘরে টেনে নিয়ে আসে। ওর নিজের মধ্যেও চলে একটা স্থূলসূক্ষ্মের খেলা,—এই বিস্ময়, এই কৌতূহলই গিয়ে দাঁড়ায় স্নেহে, ডাক্তারকে সরিয়ে কাকাই পূর্ণভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে, স্নেহের দিক থেকে দেখতে গেলে শিশুর মায়ের পরেই নিবিড়তম সম্বন্ধ দাঁড়ায় ঐ কাকার সঙ্গে, তার বাবাও পড়ে যায় খানিকটা দূরে।

আরও সব আছে। মেজকাকার কাছে সমস্ত জীবনটাই বিস্ময়কর বলে একেবারেই গোড়া থেকে পরম কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এর দিকে—সুপ্ত-চেতনার ঘুম ভেঙে আমাদের জগতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠা—কবে ঠোঁটের কোণে হঠাৎ একটু হাসি ফুটে সঙ্গে সঙ্গেই গেল মিলিয়ে, কবে সেটুকু স্থায়িত্ব পেলে, কখন্

হাসিতে-অশ্রুতে মাথামাখি হয়ে একটি ক্ষণিক শরৎমধ্যাহ্ন হল রচিত—তার পর ফুটল উষার কাকলি—জীবনকে অনুভব করছে শিশু, অনুভব করবার তন্তুগুলি ধীরে ধীরে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের মধ্যে প্রসারিত হয়ে পড়ছে—আলো দেখলে চোখে আলো ফোটে, অন্ধকারে আতঙ্ক; মিষ্টি ডাকে হাসি ফোটে, ধমকের ভান করলেই ঠোঁট ফোলে, ভুরু দুটি কুঁচকে ওঠে, নীল চোখ দুটি নীল পদ্মের মতই জলে থাকে ভাসতে।...কত শিশু এল, কিন্তু দেখেও অন্ত পাওয়া যায় না রহস্যের। যেন একখানি বই, কিন্তু কী সে মায়া রচনা, যত পড়ে ততই নূতন।

আদরের কথা হচ্ছিল। একটু একটু করে যেমন বড় হয়, চারিদিককার আদর যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকে, যাদের শুচিবাই তফাৎ করে রেখেছিল, তারাও এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়। শিশু ধীরে ধীরে নব নব মায়া বিস্তার করতে থাকে; কবে দু'টি দাঁত হল, তার নূতন হাসি; কবে পা হল, তার আনন্দে মাতাল হয়ে চলা; তারপর ক্রমে আরও কত নূতনের মিছিল—অমোঘ আকর্ষণে সবাইকে টানে শিশুর দিকে, কাজ ভুলিয়ে দেয়, আরাম ভুলিয়ে দেয়।

ওকেই কি কম দণ্ডটা দিতে হয় এই মায়া-বিস্তারের অপরাধের জন্য?...এক কাকা থেকে ফুরসৎ হল তো আর এক কাকা, কাকি শুইয়ে দিয়ে গেল তো মাসি নিলে তুলে, একজনের সঙ্গে হাসির হুল্লোড় শেষ হল তো একজনের শখ হল বকাবকি কান্নাকাটির অভিনয় করবার; একজন লোফালুফি করে পরিশ্রান্ত করে দিয়ে যাচ্ছে, আর একজন এসে সদ্য সদ্য তার কোল থেকে নিয়ে শুরু করে দিলে আদরের নিপীড়ন। ঘুমের মধ্যে থেকেও তুলে নিয়ে আদর করবার অত্যাচারী আছে, দুধের বাটি সরিয়ে নিয়ে তামাসা দেখার মত লোকেরও অভাব নেই।...আদরের উপদ্রবে সারাদিনই হচ্ছে নাকাল।

তার পরেও আদরের স্রোত গড়িয়ে চলে, অর্ধস্ফুট নূতন বুলির মধ্যে পুরানো ছড়া কিংবা চলতি গানের মধ্যে নূতন সুর ঢেলে দেয় শিশু,—আসরে আসরে গায়কের পড়ে ডাক, টানাটানি কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।...আদরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে লোফালুফি হয়ে এগিয়ে চলে শিশু।

কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত, তারপরেই সব যেন যায় উলটে।

মোনুর সময়টা একটি সাদা দাগ কেটে এসেছিল ঐ বহু-আকাঙ্ক্ষিত হাতে-খড়ির দিনটি। ঐটিই যেন জীবনের শেষ আনন্দের দিন; তারপরেই এল পড়া; আর সে যখন-তখন যা-খুশি বই নিয়ে পড়া নয় যাতে খোকার পড়া দেখবার জন্য সবাই ভিড় করে এসে জুটত। এ নূতন পড়ার সামনে আছে ঝাপসা চোখ,

পেছনে মায়ের, বাবার, কাকার, দাদার রুক্ষ দৃষ্টি। কেমন করে যে গেল বদলে বুঝতে পারে না মোনু। ঐ ছোটকাকা, অত তো ভালবাসত, এখন পড়া নিয়ে আর সবার মত অত কড়াকড়ি না থাকলেও আর-সব নিয়ে আছে—যে সবের সঙ্গে মোনুর বেশি সম্বন্ধ—রোদ, জল, মুক্ত আনন্দে একটু ছুটাছুটি, অসুখ হলে অসুখেরই ইচ্ছামত দুটো কিছু খাওয়া! ক্রমাগতই টিক-টিক করবে ছোটকাকা, ওরই ছিল সবচেয়ে নেওটা, এখন ওকেই যেন ভয় করে সবচেয়ে বেশি। মেজকাকার আছে আইন-কানুনের কড়া শাসন—অত হেসো না, অত জোরে কেসো না, পড়তে বসে চারিদিকে চাওয়া কেন?—'তুই' বললে?—দাদা হয় না?—এই বিয়ে হচ্ছে বুঝি?

—মোনু তো বিয়ের জন্যে আর তত লালায়িত নয়; কিন্তু কি করে বলে সে কথা? কেই বা বোঝে?

নূতন-তম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়েছে, ইস্কুলের পাঁচটি মাস্টারে। যেদিন প্রথম গেল ইস্কুলে বেশ লেগেছিল, হাতেখড়ির দিনের মতই। হেড-মাস্টার মশাই পিঠে হাত দিয়ে কত মিষ্টি করে কত বললেন। তারপর এখন—বাড়ি যেন তবু ঢের ভাল!

ক্রমে এই-জীবনই সহজ হয়ে এসেছিল; তার পর আজ ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে যেটুকুও আদর ছিল এখানে-ওখানে লুকিয়ে—এর একটা কথায় ওর একটা হাসিতে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত—সেটুকুও যেন যেতে বসেছে।

২

ক'দিন হল খোকা এসেছে মামার বাড়ি থেকে। মোনুর ছোট ভাই খোকা, ও তো মামার-বাড়িতেই জন্মালে; কত মন-কেমন যে করছিল মোনুর খোকার জন্য! একে তো কখনও দেখে নি, তার ওপর খোকা জন্মেই মোনুকে দাদা করে দিয়েছে! কত যে মন-কেমন করছিল ছোট ভাই খোকার জন্যে!

আর কী চমৎকার যে হয়েছে! রাঙা রাঙা ঠোঁটের মাঝখানটিতে চারটি দাঁত, ওপরে দুটি, নীচে দুটি। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো কালো চুল, ছোট কাকার ঘরে টাঙানো বিস্কুট-হাতে-করা খোকার মতই মোটাসোটা, ধপধপে, নরম তুলতুলে, ঘাঁটতে যে ভাল লাগে! মা বলেছে, এবার তো এখানে এল, এইবার মোনুকে দাদা বলবে।

যত ঘাঁটতে ইচ্ছে করে ততই ঘাঁটতে কিন্তু পায় কৈ মোন্থ? একে তো বেচারার বাড়ির মাস্টার-মশাই থেকে, স্কুল থেকে ফুরসৎ নেই, যদি বা হল তো খোকাই নেই খালি—হয় ছোটকাকার কোলে, না হয় বড়দা'র কাঁধে; হয় ছোটদি দিচ্ছে দোল, না হয় কাকিমা করছেন লোফালুফি। ছোটদের কারুর কোলে থাকলে আরও পাঁচজন ছোটর মত মোন্থরও হয় একটু সুবিধা—কেউ হাতটা টিপল, কেউ পা'টা, কেউ চুলে হাত বুললো, কেউ নরম পেটের ওপর; মোন্থর থাকে সাদা ঝিকঝিকে দাঁত দুটির ওপর নজর; কিন্তু হলে কি হবে, অত ভিড় পড়ে যায় বলেই বড়দের কেউ এসে নেয় কেড়ে—

"শেষ করলে ছেলেটাকে···খাবলে-খুবলে সাবাড় করে দিলি তোরা, দে আমায়···"

মোন্থর সবচেয়ে সুবিধা হয় খোকা যখন থাকে মায়ের কোলে। মা অনেক কথা বলেন মোন্থকে পাশে বসিয়ে—খোকা কথা কইতে শিখেই আগে কেমন মোন্থকে দাদা বলতে শুরু করবে; মোন্থই তো খোকার ঠিক ওপরে, মোন্থই তো সবচেয়ে কাছের দাদা। খোকাকে এক একবার মোন্থর কোলেও তুলে দেয় মা। কিন্তু মা বেচারিই বা পায় কতটুকু খোকাকে?—সেই তো কখন একটু দুধ খাওয়াবার সময়, কি কোলের ওপর শুইয়ে কখন একটু কাজল পরাবে, পাউডার মাখাবে খোকাকে। তাতেও তো টানাটানি কাড়াকাড়ি, দিদিদের কেউ এসে বলবে—"তোমার কর্ম নয় কাকিমা, দাও আমায়, কি চমৎকারটি করে সাজিয়ে দিচ্ছি দেখো!"

এক এক সময় রাগ হয় মোন্থর, এক এক সময় আবার কেন যে কান্না ঠেলে আসে ঠিক বুঝতে পারে না। ওর মনে হয় খোকার ওপরও ওর রাগ হয়েছে। যেমন খুব ভালবাসে তেমনি আবার একেবারেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছেটা যে ঠিক কি করে ভাল করে বুঝতে পারে না মোন্থ। কেবলই মনে হয় ও কেন সর্বদা সবার কোলে গিয়ে ও রকম করে খিলখিলিয়ে হাসবে? না হাসলে, না কথা কইলে, মুখে আঙুল দিলে কুটুস করে কামড়ে হেসে না গড়িয়ে গেলে তো কেউ ওকে নিয়ে অত কাড়াকাড়ি করতে যায় না। তাহলে তো সারাক্ষণ মোন্থর কাছেই থাকতে পায়!···আড়াল থেকে মোন্থ কিছু করতে পারে না, কিছু বলতে পারে না বলে কান্নায় ওর গলাটা টনটন করতে থাকে। এই সময় যদি মায়ের কাছে চলে যায় খোকা, মা ডাকে "মোন্থ আয়, তোর ভাইটিকে নিবি" —মোন্থ যায় না।—রাগে আর কিসে গলাটা আরও টনটন করতে থাকে,—নেবে না তো অমন ছোটভাইকে, দাঁদাও বলতে দেবে না কখনও···

শুধু খোকার ওপরই হয় না রাগ, আর সবার ওপরও হয়, খুব বেশি করে ; সব চেয়ে বেশি করে হয় ছোটকাকার ওপর। আর কেউ ডাকলে যদিও বা কথা কয়, ছোটকাকা ডাকলে কোনমতেই যাবে না, একটিও কথা কইবে না।

যাবে না, কথা কইবে না বলেই দোরের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোটকাকা রোগীদের দেখছে, কি সব লিখছে ; আবার দেখছে, আবার কি সব লিখেছে দেখে, কিন্তু ডাকে না খোকাকে।···ভালই হল, ডাকলে কি যেত মোন্নু ?··· ফিরে আসে, শুধু প্রথম দু চার পা ফিরে আসবার সময় কেমন লজ্জা লজ্জা করে, তার পর কাকা যখন আর দেখতে পায় না তখন লজ্জাটা আর থাকে না, তার জায়গায় গলাটা শুধু আবার সেইরকম টনটন করে ওঠে।

৩

আজ ছিল ছুটির দিন। ক'দিন থেকে মোন্নু চেয়ে ছিল এই দিনটির পানে,—বাড়ির মাস্টারমশাই, স্কুলের মাস্টারমশাইরাও নেই কেউ, বেশি গাছপালা থাকে না বলে খেলার মাঠটা যেমন বেশ আলো আলো দেখায় ছুটির দিনগুলোও মোন্নুর ঠিক সেইরকম মনে হয়। কিন্তু আজ কি হয়েছে, সমস্ত দিনটাই নিজে যেন মাস্টারমশাই সেজে এসেছে।···সকাল বেলা ঘুম ভেঙে গেল, সে-সময় আর কারুর ঘুম ভাঙে নি। এই সময়টা রোজই একবার করে ঘুম ভাঙে, কেননা খোকা উঠে খেলা করে। অন্য অন্য দিন উঠলেই পড়ার কথা মনে হয় বলে মোন্নু আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে ; আজ খোকার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খেলা করল, খোকা দু'দিন থেকে দাদার একটা 'দা' বলতে আরম্ভ করেছে, সেইটেকে দুটো দা'-য়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে মোন্নু।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, মেজকাকার গলার আওয়াজে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। চেঁচাচ্ছেন—"স্কুল নেই বলে আজ আর উঠতে হবে না ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ কটা বেজেছে।···সাতটা বেজে গেল এখনও বাবুর ঘুম ! এইটুকু ছেলে এত আয়েসী। মায়েও দেখবে না, বাপেও খোঁজ রাখবে না, বিদ্যা যা হবে বুঝতে পারা যাচ্ছে।···বলি, ওঠ দয়া করে !"

অন্য দিনের মত আজ ইচ্ছে করে ঘুমোয় নি মোন্নু, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেও না, কিন্তু সে কথা বলে কাকে ? মেজকাকার কাছে আগে যেমন সব কথা বলা যেত তেমনি আজকাল একটি কথাও বলা যায় না।···উঠেই শাস্তি হল

দেরি করে ঘুমিয়ে থাকবার জন্যে আজ সকালে পুরো ছুটি নয়, চার পাতা হাতের লেখা করে দেখাতে হবে। কোলে খোকা ছিল, আদর করতে করতে চলে গেলেন মেজকাকা।

খাবার একটু আগেই, একটু খেলেটেলে বাড়ি ঢুকবে, ছোটকাকা খোকাকে আদর করতে করতে বেরিয়ে আসছেন। একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কানটা ধরলেন।—

"হুড়োহুড়ি করে মুখ যে রাঙা হয়ে উঠেছে, এটা খেলবার সময়?"

মোনু বললে—"ওরাও খেলছিল সবাই।"

কানটা নেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন ছোটকাকা—"বেশ করেছে ওরা। আবার নালিশ। ওরা পাঁচদিন আগে জ্বর থেকে ওঠে নি। যাও ঢকঢক করে জল খাও, তার পর আবার পড়!…ওরাও খেলছিল!"

কানটা আরও দুবার ভাল করে নেড়ে গেলেন।

মা যেন তোয়ের হয়েই ছিলেন, ভেতরে পা দিতেই হাতটা ধরে উঠোনের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেলেন, চড় তুলে বললেন—"দিই বসিয়ে? কোথায় ঘুরছিলি এতক্ষণ টো টো করে?…স্কুল নেই বলে আজ আর নাওয়া-খাওয়া করতে হবে না, না?"

জেঠাইমা বললেন—"হ্যাঁ, মেরে ফেল সবাই মিলে, তোরাই এক ছেলে মানুষ করতে শিখেছিস তো, আর তো কেউ শেখে নি…"

"ও আমাকে আজ সকাল বেলা বকুনি খাইয়েছে, দিদি। আমি সেই থেকে হতভাগাকে খুঁজছি।"

"তা খুঁজবি। যে বকলে তার তো কিছু করা যাবে না। কী না একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে, ছুটির দিন সব ছেলেই করে গড়িমসি একটু।…নিয়ে আয় তেলের বাটিটা, নেয়ে খেয়ে নে, নয় তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খা মার।"

মায়ের হিড়িকটা কমের ওপর দিয়েই কেটে গেল। কিন্তু মা একটু বললেও যে কত বেশি কষ্ট হয় তা তো বোঝেন না। জেঠাইমা যদি অমন করে ডেকে না নিতেন তো কখনই আজ নাইত না, খেত না।

এর পর আর একবার ছোটকাকা। এবার কবে পেটের অসুখ হয়েছিল তাই নিয়ে; তার পর বিকেল বেলা নতুন দা'।

নতুনদা'র ছিল নিজের কাজ, এক গ্লাস খাবার জল আনতে বলেছিল। নতুনদা'র জল আনতে হয় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে, তার পর পরিষ্কার গামছায়

হাত পুঁছে। মোন্থ ভেতরে গিয়ে দেখে সবাই খিড়কির দোর দিয়ে খেলতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াতে বললে, রাস্তা দিয়ে একলা গেলে আবার মেজকাকা বড্ড রেগে যান। কে দাঁড়াবে? সাবান খুঁজে পেতে হাতটা পর্যন্ত ধুয়েছিল, তারপর ওরা অনেক দূরে চলে গেল বলে আর দাঁড়াতে পারল না মোন্থ।

সন্ধ্যার একটু আগে নতুনদাও যখন খেলা থেকে ফিরল, ডেকে পাঠাল মোন্থকে।

"তোমায় না তখন এক গ্লাস খাবার জল আনতে বলেছিলাম? এনেছিলে?"

মোন্থ বলল—"আমি সাবান দিয়ে হাত পর্যন্ত ধুয়েছিলাম, তারপর ওরা কেউ দাঁড়াল না।"

"দাঁড়াল না মানে?—অন্ধকার রাত্তির ছিল?"

"খেলতে চলে গেল সবাই।"

"একজনের খেলা বড, না আর একজনের তেষ্টা বড?"

"একজনের তেষ্টা।"

নতুনদা কানটা মুচড়ে ধরলে।

"কথার ওপর কথা বেশ কইতে শিখেছ! একজনের তেষ্টা তো জলটা দিয়ে যেতে কি হয়েছিল? তেষ্টায় যে মানুষে অজ্ঞানও হয়ে যায়, সেটা জানা আছে বাবুর?"

হাতের পাকটা শেষ হতেই একটি চড। সঙ্গে সঙ্গেই আবার কানটা ধরে—"চললে তো নালিশ করতে ছোটকাকার কাছে?"

মোন্থ ঘাড নেড়ে বললে—"না।"

মোন্থ গিয়ে সদর দরজায় চৌকাঠটির ওপর চুপ করে বসল। সকাল থেকে একটি একটি কথা মনে হচ্ছে আর সেইরকম করে গলা টনটন করে উঠছে। কেউ ওকে দেখতে পারে না, মা থেকে নিয়ে নতুনদা পর্যন্ত কেউ নয়।···রাস্তা দিয়ে একটা কাবুলিওয়ালা যাচ্ছে, কাঁধে একটা ঝোলা। ও এসে মোন্থকে ঐতে পুরে নিয়ে চলে যায় তো বেশ হয়। 'কোথায় গেল মোন্থ, কোথায় গেল মোন্থ' বলে কান্নাকাটি পড়ে যায় বাড়িতে। যাক না নিয়ে, মোন্থ একটু চেঁচাবে না।

কাবুলিওয়ালাটা এধারেই আসছে, মোন্থ তাড়াতাড়ি উঠে ভেতর দিকে যেতেই কানে এল, খোকাকে সবাই আদর করছে। বাইরের রকের ওপর দিয়ে গিয়ে জানলার খড়খড়ির একটা পাব্ একটুখানি তুলে দেখলে—মা, ছোটকাকা, বড়দা, নতুনদা, সেজদি—খোকা মায়ের কোলে, ছোটকাকা আদর করছে, এরা সবাই

দাঁড়িয়ে দেখছে, হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে খোকাকে নতুন জামা পরে, ইচ্ছে করছে সেও ভেতরে চলে যায়। কিন্তু কেমন একটু লজ্জা লজ্জা করতে, আর একটু সেই রকম কান্নার মত হয়ে আসতে আর গেল না। ছোটকাকা আদর করে চলে যেতে বড়দা মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে লুফে লুফে একটু খেলা করলে। সেও চলে গেল, তার পর সেজদিদি, তার পর নতুন দাদা। ওরা সবাই যখন চলে গেল, মা একলাই খোকাকে কোলে পেতে আদর করতে লাগলেন, কাজল পরালেন, টিপ পরালেন। মোনু দেখেছে, খোকাকে যখন সবাই মিলে আদর করে আর তারপর মা একলা পান, তিনি আরও বেশি বেশি করে আদর করেন, মুখের দিকে বেশি বেশি করে চেয়ে থাকেন, বেশি বেশি করে চুমো খান।···মোনুর যে কি রকম বোধ হতে লাগল, বুঝতে পারলে না। কাজল আর টিপ পরিয়ে মা যখন পাউডারের ডিবেটা খুলেছেন, মোনু খড়খড়িটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে সেই রকম চুপি চুপি সরে এল। একবার মনে হল—সেই যেমন বসে ছিলুম সদরে গিয়েই বসি ; তারপর খোকাকে ভয়ানক দেখতে ইচ্ছে হল, ভেতরে গিয়ে—নিজেদের ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

মা যে দেখে সেটা মোনু চাইছিল কি চাইছিল না ঠিক বুঝতে পারছিল না। মা কিন্তু দেখেই ফেললেন—সঙ্গে সঙ্গেই ডেকে বললেন—"এই মোনু যে, কোথায় ছিলি? এদিকে আয়।"

মোনুর সেই গলার টনটনে ভাবটা বেড়ে গেল, কিন্তু এদিকে খোকার কাছে দাঁড়াতে মা যেই তার নাম করে খোকাকে আদর করতে লাগলেন অমনি কমেও গেল সেটা। মা বলতে লাগলেন—"খোকার দাদা এসেছে—খোকাকে সব চেয়ে ভালবাসে, খোকার মোনু-দাদা—বড় হয়ে রোজগার করে খোকাকে আরও কত নতুন জামা কিনে দেবে—জামা, জুতো, কাপড়···না রে মোনু?"

মোনু এগিয়ে গিয়ে খোকার গায়ে হাত দিলে, আদর করলে। তরপর মা খোকাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে দুলে দুলে আদর করতে লাগল।

··· ··· ···

মোনুর আবার কি-রকম কি-রকম করে উঠতে লাগল মনটা—একটু লজ্জা-লজ্জা, আর সেই রকম গলার ভেতর একটু একটু টনটনানি।···সামনে থেকে আস্তে আস্তে পিঠের কাছটায় সরে গেল।···সকাল থেকে সবার অনাদরের সঙ্গে, কতদিন আগে ভুলে যাওয়া কত আদরের টুকরো-টাকরো যেন আবছায়া স্বপ্নের মত একটু একটু মনে পড়ছে—এত আবছায়া যে বিশ্বাসই হয় না—তার সঙ্গে

আবার মায়ের এখনকার আদর।…একটা প্রশ্ন ঠেলে আসছে, কিন্তু সেটাকে ঠিক রূপ দিতে পারছে না মোন্থ; তারপর দু'বার ঢোঁক গিলে মায়ের পিঠের কাছ থেকেই আস্তে আস্তে ডাকলে—“মা।”

খোকাকে আদর করতে করতেই মা উত্তর দিলেন—“কি রে মোন্থ ?” গলার সেই টনটনানিটা আর একটু বেড়েছে, আরও দু'বার ঢোঁক গিলতে সেটা যেই কমল, মোন্থ জিগ্যেস করলে—“আমাকেও এইরকম কবে ভালবাসতে ?”

“ওমা! বাসতুম না ?—এইরকম করে বুকে চেপে…”—খোকাকেই দোল দিতে দিতে উত্তর দিচ্ছে মা।

“সব্বাই মিলে ?—তুমি, ছোটকাকা…”

গলাব আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতে মা ঘুবে দেখলেন, তার পরেই আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—“ওমা! তুই যে কাঁদছিস!…কাঁদছিস কেন মোন্থ ?…ভালবাসতুম ? সেকি—এখনও কত বাসি—খোকনের চেয়ে বেশিই…ওমা, ও কি রে মোন্থ! দেখ কাণ্ড! চুপ কর, ওকি!…”

—খোকাকে রেখে দিয়েছে মা; মোন্থ পিঠ থেকে লুটিয়ে মায়ের খালি কোলে গুঁজড়ে একেবারে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল। গলার সেই টনটনানিটা কমে এসেছে, কিন্তু লজ্জা—তাব সঙ্গে আরও কত সব কি যে এসে জুটেছে, মুখটা তুলতে কোনমতেই দিচ্ছে না মোন্থকে।

ভাগ্যিস মাইনে বাড়ায় নি

১

ছেলেটিকে যখন ধরে নিয়ে এল তখন স্টেশনমাস্টার গুপীকেষ্টবাবু ট্রেনটা পাস করিয়ে সবে একটু বাসায় গেছেন। মাঝারি গোছের একটা গঞ্জ জায়গা; চারটে বিয়াল্লিশের এই গাড়িটা বেরিয়ে গেলে এই সময় আমাদের একটু আড্ডা জমে। আমিই প্রায় জুটি সবচেয়ে আগে; তারপর বাসার একটু খোঁজখবর নিয়ে বাচ্চা-চাকরটার হাতে গড়গড়া দিয়ে ঠুক ঠুক করে গুপীকেষ্টবাবু উপস্থিত হন; তারপর ক্রমে থানা, পোস্ট অফিস, রেজেস্টারি অফিস প্রভৃতি থেকে আর সবাই, যেমন একে একে জুটি হতে থাকে। গুপীকেষ্টবাবু মানুষটি বেঁটেসেঁটে, গোল-গাল, মাথায় একটি

বড় টাক, ঘাড়ের ওপর কাঁচাপাকা চুলের একটি হালকা ঝিরঝিরে বাবরি। স্বভাবের দিক দিয়ে একটু বেশি ব্যস্তবাগীশ, কিন্তু সে এই চারটে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত ; গাড়িটা চলে গেলে এই সময় একটু আপিনও চড়িয়ে আনেন, তারপর যে ঝোঁকটা ধরল।

ছেলেটিকে দেখলে মনে হয় নিরীহপ্রকৃতির। টিকিট-কলেকটার বৃন্দাবনবাবু একটা খালাসি সঙ্গে দিয়ে দাঁড করিয়ে গেছে, ছোট-বড-মাঝারি অনেকগুলি কৌতূহলী লোকের মাঝখানে মাথা নীচু করে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার পা-তুটো জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল—"আমায় মাপ করুন—একটি পয়সা নেই—সমস্ত দিন খাই নি···"

তাড়াতাড়ি পা-তুটো সরিয়ে নিয়ে ওকে তুলতে তুলতে বললাম—"তুমি ভুল করছ বাপু, আমি স্টেশন-মাস্টার নয়, আমি হচ্ছি এখানকার স্কুলের হেড-মাস্টার।"

ছেলেটি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন বাঘ দেখেছে ; কারণটা বুঝে একটু নরম গলায়ই বললাম—"তা বিনাটিকিটে আসবার এ-তুর্মতি হল কেন ? ভদ্দরলোকের ছেলে দেখছি ; পয়সা ছিল না ?"

উত্তর দিলে খালাসিটা—"পয়সার সওয়াল নয় তো বাবু, ফুটবলের দল, পয়সা থাকলেও দেবে না কোম্পানিকে। আজও আবার একটা দল নেমেছে কিনা, ধর্ ধর্ করতে করতে সবাই ইদিকে-উদিকে দে' সটকে পড়ল, ইনি আর পারলেন নি, জালে আটকা পড়ে গেছেন।···আজ্ঞে, পয়সা আছে, শুনবেন নি ওসব ওজর, কাছা থেকে বেরোয়, পেট-কাপড় থেকে বেরোয়, জুতোর সুখতলা থেকে বেরোয়। কত্তা আসুন না, বের করবেন, তাঁর ঘাঁৎঘোঁৎ সব জানা আছে।"

ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ হয়ে খালাসিটার দিকে চেয়ে বললে—"নেই পয়সা।"

আমার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বললে—"সত্যি নেই বলছি।"

গোপন স্থান থেকে পয়সা বেরুনোর ভোজবাজি দেখবার জন্য ভিড়টা চঞ্চল হয়ে উঠল—"নেই তো দেখিয়েই দাও না···নেই-ই যখন, কোথাও থেকে উড়ে এসে তো তোমায় আসামী করে দিচ্ছে না, ভয়টা কিসের ?···গালের মধ্যে রেখে দেয়—জিভের নীচেও, অথচ তোমার সঙ্গে দিব্যি কথা বলে যাবে—অব্যেস করে···"

ছেলেটি করুণ-দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে জুতোর ফিতা খুলতে যাচ্ছিল, আমি বারণ করলাম, বললাম—"দরকার হয় মাস্টার মশাই এলে দেখিও।" ওদেরও একটু ধমক দিতে ওরা একটু তফাতে ছড়িয়ে দাঁড়াল।

ছেলেটিকে প্রশ্ন করলাম—"কর কি ?"

চুপ করে মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"পড ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোন্ ক্লাসে ?"

সবার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে এনে আমার মুখের ওপর রাখলে, তার পরেই টপটপ করে আবার ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পডতে লাগল।

অত্যন্ত লজ্জায় পডে গেছে। আমি খালাসিটাকে একটু কডা হয়েই বললাম —"এরা এখানে করছে কি ? সব সরিয়ে দে ; মাস্টার-মশাই যা করবার করবেন, তামাসার কি আছে এত ?"

তাকেও সরিয়ে দিলাম, বললাম—"তুই কাজে যা, আমি তো রয়েছি।"

প্রশ্ন করলাম—"কোন্ ক্লাসে পড ?"

"আজ্ঞে ম্যাট্রিকে ; এইবার উঠেছি।"

আন্দাজ পাচ্ছি ক্রমে ক্রমে। আবার প্রশ্ন করলাম—"কি হয়ে উঠেছিলে ?"

আর একবার প্রশ্নটা করতে তবে উত্তর দিলে—

"আজ্ঞে প্রথম হয়েছিলাম।"—অশ্রু বেগটা বেডে গেল।

বললাম—"ফার্স্ট বয়, অথচ…"

"আজ্ঞে আসতে চাই নি ; 'ভাল-ছেলে ভাল-ছেলে' করে একেবারে উদ্ব্যস্ত করে তোলে ক্লাসের মধ্যে সবাই, তাই এবারে—এই প্রথম বার…"

নিজেদের স্কুল-জীবনের কথা মনে পডে গেল, এই রকমই হত,—এক দিকে অভিভাবক, শিক্ষক, একদিকে সহপাঠীরা, সঙ্গী সাথীরা ; 'বাহবা' লুটি কি টিটকিরি থেকে আত্মরক্ষা করি ? বললাম—"তা নামলেই যখন, ফার্স্ট বয়ের এভাবে লাস্ট হয়ে যাওয়া ভাল হয় নি।"

মুখে একটু হাসিও ফুটে থাকবে ; একজন হেড-মাস্টারের মুখে এ-ধরনের মন্তব্য শুনে একটু বিস্মিতভাবেই মুখের পানে চাইলে। আমি একটু সামলে নিলাম, বললাম—"না, এই জন্যে বলছি, এবার তো ওদের আরও জিৎ, যা বলত সেটার প্রমাণও হয়ে গেল ওদের দিক থেকে।…নিজের রাস্তা ধরেই থাকা ভাল, বিশেষ করে যখন জানি, যে-রাস্তাটা ধরেছি সেটা খারাপ নয়।……যাক্, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, উপায় কি। আর এ রকম মন্দ হবার যশের লোভে প'ড়ো না।"

"আজ্ঞে এই শেষ, আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।—এবার কিন্তু কি হবে ?"

সেই কথাই ভাবছিলাম মনে মনে। উপায় মাত্র দু'টি আছে—এক, স্টেশন-মাস্টার মশাইকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া। এ নিয়ে একটি মুশকিল হয়েছে, কালই আমাদের এই স্টেশনেব আড্ডায় ছেলেদের ডিসিপ্লিন অর্থাৎ নিয়মানু-বর্তিতা নিয়ে জোর তর্ক হয়ে গেছে; সপক্ষে আমরা দুই মাস্টার, গুপীকেষ্টবাবু আর আমি; বিপক্ষে আর সবাই, অবশ্য বিপক্ষে মানে বেশি কড়াকড়ি করার বিপক্ষে। এত টাটকা-টাটকি একটা সেই রকম মামলার ওকালতি করব কি করে, জজই বা কি করে রেহাই দেবেন সে একটা চিন্তার বিষয় বৈকি—ওঁরা সবাই তো এসেই পড়বেন। দ্বিতীয় উপায়, পয়সাটা নিজের গাঁট থেকে বের করে দেওয়া। যেখান থেকে এসেছে, জরিমানা নিয়ে টাকা-চারেক পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়,—সেও তো একজন গ্রাম্য স্কুলের হেডমাস্টারের পক্ষে খুব অল্প নয় মাসের এই শেষ দিকে। কিন্তু করতেই হবে তাই।...সাধ্যমত সহজ-কণ্ঠে বললাম—"হবে আর কি? ভাড়াটা দিয়ে দিতে হবে, জরিমানা সুদ্ধ..."

আজ্ঞে আমার কাছে নেই, এই, আপনার পা ছুঁয়ে...

নিরস্ত করলাম। বললাম—"সে ব্যবস্থা কিছু হবেই একটা; করে ফেলেছ একটা ভুল যখন..."

ছেলেটি একটু চুপ করে থেকে তার পরই উস্‌খুস করতে লাগল। আরও একটু ঐ-ভাবে অস্বস্তিতে কাটিয়ে বললে—"আজ্ঞে একটা কথা, আপনাকে না বলে এখানে কাকে বলি?..."

"বল।"

"ভাড়ার জরিমানা গুনে দিলে চিরদিনের জন্যে একটা দাগ লেগে যাবে।"

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বললাম—"সে কি!...আর না দিলে যে জেল—তাতে কি কপালে জয়টিকা...?"

"আজ্ঞে জেলে তো গান্ধীজীও যাচ্ছেন..."

অদ্ভুত নীতিজ্ঞান ওদের, একটা প্রথম শ্রেণীর ছেলেও বাদ যায় নি! আমি একটু স্পষ্টভাবেই হেসে ফেললাম, বললাম—"একে তো থার্ড-ক্লাসে যান, তার ভাড়া ঠকিয়ে কখনও জেলে গেছেন নাকি? এতবড় খবরটা—অথচ কৈ কানে যায় নি তো!"

লজ্জিতভাবে মুখটা নীচু করলে। বললাম—"তা হলেও ভাড়া গুনে দিচ্ছ কেউ দেখলে তবে তো দোষ, তবে তো দাগ লাগবে?"

মুখটা তুললে না, সেইভাবে থেকেই একটু আড়চোখে চেয়ে বললে—"দেখছে

স্যার, তিনজন তার ডিঙিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঢুকে ভিড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে।"

অদ্ভুত কারচুপি সব এদের। একসময় কি আমরাও করে থাকব?—আজ মনে পড়ছে না, তবে হেডমাস্টারির অন্তরাল থেকে লাগছে বড় কৌতুকাবহ। প্রশ্ন করলাম—

"কোন্ তিন জন?"

ছেলেটি মাথা হেঁট করেই রইল। নিজের স্কুল হলে যে কথাটা বের করবার জন্য শাসনের ব্যবস্থা করতে হত, পরের স্কুলের ছেলে বলে তার এই গোপনতা-প্রয়াসটুকু উপভোগই করলাম আজ। ছেলেটিও অতিরিক্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে; ও-প্রসঙ্গটাই ছেড়ে দিয়ে বললাম—"তুমি তো কিছু খাও নি-ও বলছিল?"

"সেই আটটার সময় একটু জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছিলাম, বাড়ির কেউ জানেন না।"

আবার একটু হাসি এসে গেল, বললাম—"অর্থাৎ খারাপ ছেলে হবে ঠিক করে নিয়ে একেবারেই প্রাণপণে খারাপ হতে আরম্ভ করেছ।...খালাসিটাকে সঙ্গে দিচ্ছি, আমার বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে এসো, ও বলে দেবে'খন। কাছেই বাড়ি আমার।"

একটু ইতস্তত করে বললে—"কি করে এলাম তাও বলে দেবে স্যার তাঁদের?"

একটু হেসে বললাম—"না, খাবার বাবস্থা করে, সেটা গলা দিয়ে যাতে না নামে তার ব্যবস্থাও করব কি?...তুমি নিশ্চিন্দ হয়ে খেয়ে এসো, ততক্ষণ ভেবে দেখি কি করতে পারি; হবেই একটা কোনও উপায়।...হ্যাঁ—পালাবে না তো খালাসিটাকে ঠেঙিয়ে?—চারজন হবে তোমরা..."

"না স্যার, বলেন তো আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করি। ওরা এগুলে আমি খালাসিটার দিকেই হব; কথা দিচ্ছি। আমি দুর্বল নয়, দেখছেনই।"

হেসে বললাম—"কিন্তু ওরা তিনজন কি-রকম তা তো দেখাও নি।"

"আপনি না-হয় আরও দুজন খালাসি সঙ্গে দিন স্যার।"

বললাম—"তার দরকার হবে না, তুমি যাও।"

খালাসিটাকে ডেকে বলে-কয়ে সঙ্গে করে দিলাম।

২

এরা গেটের এদিকেই, প্ল্যাটফর্মেরই মধ্যে, ভিড়টা আস্তে আস্তে ঘিরে জমে উঠেছে, এমন সময় গুপীকেষ্টবাবু বাসা থেকে বেরুলেন। চারটে বিয়াল্লিশের পরের ভাব নয়, অত্যন্ত ব্যস্ত, তাও কাজের যে ব্যস্ত-বাগীশ ভাবটা থাকে তা নয়, যেন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত এবং রুষ্ট কোন-একটা ব্যাপার নিয়ে, এই সময় যে একটু হাতমুখ ধো'ন, জলযোগ করেন, সে-সব যেন আধাখেঁচড়া করেই সেবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছেন। প্রায় বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁক দিলেন—"যতা!"

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে চেঁচাতে চেঁচাতেই আসছেন—"আজ আবার নাকি ফুটবলের দল নেমেছে? কৈ, তখন বললি নে তোরা তো। উত্তমফুত্তম করে তুলেছে।—বাপের নাম রাখতে হবে তো মন্দির করিয়ে দে, পুকুর খুঁড়িয়ে দে, নিদেন একটা ইঁদারা গাঁথিয়ে দে, তা নয়—শীল্ড—কাপ!—উচ্ছন্ন দিলে সব—মরুকগে, কিন্তু আমার ঘাড়ে এ পাপ কেন?—হারামজাদারা শীল্ড খেলবি তো বিনাটিকিটে গুষ্টিসুদ্দু...আর এই সারক্যুলারের ওপর সারক্যুলার...ওকি, প্ল্যাটফর্মে ভিড় কিসের? ক'টাকে পাকড়েছিস আজ?"

চাঁচা গলা, স্টেশনটা গমগম করতে লাগল।

যতীন খালাসি বললে—"আজ্ঞে একজনকে; গাড়ি না থামতেই প্ল্যাটফর্মের বাইরে টুপটাপ করে নাপ্যে ভাগল যে সব।...এই এনাকে ধরেছি।"

হনহন করে এগিয়ে আসছেন গুপীকেষ্টবাবু।

"এরা সব কে? পাকড়াও! পাকড়াও!"

ভিড়টা ছড়িয়ে পড়ল, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে গুপীকেষ্টবাবু উগ্র-দৃষ্টিতে একবার ছেলেটির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"এই?...নিয়ে আয় এদিকে পাকড়ে।"

আমরা বসি স্টেশন-ঘর থেকে একটু তফাতে খোলা প্ল্যাটফর্মে। "লে আও, হাজির কর!" বলতে বলতে এসে একটা চেয়ারে বসলেন, আমার দিকে চেয়ে বললেন—"এরা আমায় পাগল করবে মশাই।"

আমি হতভম্ব হয়ে গেছি, পাগল হতে বাকি আর কতটুকু? ছেলেটাকে কথা দিয়েছি, কিন্তু এ যা মূর্তি দেখছি বাঁচাব কি করে? এখন ভয় হচ্ছে একটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে সমস্ত দলের ওপরকার আক্রোশ না মিটিয়ে নেন।

ছেলেটিকে নিয়ে এল, এত নার্ভাস হয়ে গেছে যে পা-দুটো একটু একটু কাঁপছে,

আমার সামনে যে কান্নার ভাবটা ছিল প্রথম-প্রথম সেটাও নেই, আমার দিকে করুণদৃষ্টিতে একবার চেয়ে চুপটি করে দাঁড়াল।

· গুপীকেষ্টবাবু যতীনকে হুকুম করলেন—"টিকিট-কলেকটার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

টিকিট-কলেকটাব বৃন্দাবনবাবু হন্তদন্ত হয়ে আসছিলেনই, সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"হুঁা মশাই, আপনি এ-ছোকরাকে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নামতে দেখলেন, না, ফার্স্ট ক্লাস, না, ইণ্টার ?"

—মুখের দিকে যে চেয়ে রইলেন তাইতেই বৃন্দাবনবাবু প্রশ্নের মধ্যে সঙ্কেতটা নিলেন বুঝে। তবে কি ভেবে উত্তরটা মাঝামাঝি করে নিয়ে বললেন —"আজ্ঞে না, ফার্স্ট ক্লাস নয়, মিছে কথা কেন বলব ?—সেকেণ্ড ক্লাসের ওদিককার দরজা দিয়ে পালাচ্ছিল, যতীনকে বললাম ধর গিয়ে।"

ছেলেটি মিথ্যার বহর দেখে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে ; কি বলতে যাচ্ছিল, বোধ হয় জিভ গলা ঠোঁট সব শুকিয়ে যাওয়ায় কথা বেরুল না, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমিও যে কি করব একেবারে মাথায় আসছে না। ছেলেটাকে খেতে পাঠাচ্ছিলাম, টেনে এনে একটা এমন বিপদে ফেললে যা বেচারার কল্পনারও অতীত। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে বসেছে, তার জন্য তাকে এ রকম প্যাঁচে ফেলে যে অন্যায় কথা হচ্ছে, এটা মুখ ফুটে বলতেও পারছি না গুপীকেষ্টবাবুকে এইরকম মেজাজের ওপর, অথচ বলতে না পারাটা যে অন্যায় হচ্ছে এটাও বুঝতে পারছি। হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গিয়ে যেন ক্রমেই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল।

দারোগা বঙ্কুবাবু আসছেন। গেটে ঢুকতে ঢুকতে বলছেন—"আপনার এখানে আবার ভিড় কিসের মাস্টার-মশাই ?—একে তো ভিড়ে ভিড়ে অস্থির করে তুলেছে সাহা-রা এই শীল্ড কম্পিটিশনটা বের করা পর্যন্ত—তাই খেলা দেখতে এসেছিস, দেখে ভদ্রলোকের মতন যে যার বাড়ি যা—রেফারীকে ঠেঙাবে, মারামারি করবে, হুল্লোড়, ব্রীচ অব দি পীস যত রকম ভাবে হতে পারে—খেলা হলেই পুলিশ পাঠাও ফীল্ডে—যন্ত্রণার কথা বললেন না...আপনার এ কি ? ভন্লু-টি তো ?"

এসে একখানা চেয়ারে বসলেন, দারোগা দেখে ভিড়টা আবার একটু ছড়িয়ে

পড়ল। গুপীকেষ্টবাবু ছেলেটির দিকে দেখিয়ে বললেন—"আর কি? সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নাপিয়ে পালাচ্ছিলেন, ষতে ধরেছে। চার্জ যা দিতে পারবেন বুঝতেই পারছি, আপনার অতিথি হোন গিয়ে।"

ছেলেটির দিকে চেয়ে বললেন—"কি, দেবে চার্জ? তাহলে বৃন্দাবনবাবু, বলুন হিসেব করে ওকে কত দিতে হবে।"

ছেলেটি নিরুপায়ভাবে আবার আমার পানেই চেয়ে বললে—"স্যার, সেকেণ্ড ক্লাসে পাও দিই নি।"

৩

ব্যাপারটা চরমে এসে ঠেকেছে, বিশেষ করে দারোগাবাবু এসে পড়ায়। আর চুপ করে থাকা অন্যায় হয় দেখে আমি মুখ খুলতে যাব, এমন সময় একটু বাধা পড়ল; ডাকপিয়ন এসে উপস্থিত হল। এইখানেই ও আমাদের সবার চিঠিগুলো দিয়ে যায় এক জায়গায়। তিনজনেরই চিঠি আসায় আমরা তাই নিয়ে পড়লাম। সবাই ব্যক্তিগত সাংসারিক পত্র ছাড়া আপিস-সংক্রান্ত পত্রও থাকে কিছু কিছু; আজও ছিল, আমার একখানি, দারোগাবাবুর খান চারেক, গুপীকেষ্টবাবুর দুটি। আমরা পড়তে পড়তে আড্ডার আরও জন কয়েক এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদেরও চিঠি জমা আছে, চিঠি পড়ার মধ্যে বিচারপর্ব একটু স্থগিত রইল।

এই ক'টা মুহূর্ত কাটেও উৎকণ্ঠার মধ্যে, চিঠি পড়ে সবার মুখে নিশ্চিন্ততার ভাবটা ফুটে উঠলে তবে গিয়ে বাতাসটা পরিষ্কার হয়। বলা বাহুল্য কোনদিনই ভালভাবে হয় না পরিষ্কার; এতগুলি মানুষ, সবারই আত্মীয় স্বজন নিয়ে ঘর করা, তার ওপর আছে আপিস, কোন না কোনখানে একটু খুঁৎ থেকেই যায়।

চিঠিগুলি শেষ করে দারোগাবাবু উঠে পড়লেন। জিগ্যেস করতে বললেন —"আর বলবেন, বেশ আছেন ছেলেদের নিয়ে, হিংসে হয়।"

এক্ষুনি বোধ হয় কোথাও ছুটতে হবে পুলিস নিয়ে। ছেলেটির দিকে আপনা হতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, বিশেষ পরিবর্তন নেই, ভাবটা যেন—দারোগা উঠে যাক, থানা তো আর উঠে যাচ্ছে না। এর পরেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুপীকেষ্টবাবুর ওপর। দুখানা চিঠিই পড়া হয়ে গেছে; গোঁফজোড়া ফুলিয়ে ঠায় এক দিকে চেয়ে বসে আছেন। ব্যাপার মনে হল খুবই গুরুতর। ওঁর মেজাজের অবস্থা জানা আছে

খুবই দরকার; জিগ্যেস করলাম—"আপনার আবার কি খবর এল মশাই? দারোগাবাবুকে তো উঠে যেতেই হল।"

. গুপীকেষ্টবাবু দৃষ্টি না ফিরিয়ে চিঠি দুখানি আমার হাতে তুলে দিলেন। পডবার আগে বললাম—"আপনি আপনার মৌতাতটুকু চড়িয়েছেন?···বিনা টিকিট, সারকুল্যার—এ-সব তো আপনাদের আছেই লেগে।"

সুযোগটা পেয়ে মনটা ভেজাবার জন্য কয়েক ফোঁটা বারি সিঞ্চন করে রাখলাম আর কি। গুপীকেষ্টবাবু সংক্ষিপ্তভাবে বললেন—"যতা, কৌটোটা।··· আর মৌতাত নয়, কৌটো সুদ্দু খেয়ে ভব-যন্ত্রণা নিবারণ করতে হবে মশাই।"

চিঠি পডতে লাগলাম। একখানি দীর্ঘ সারকুল্যার,—রেলে ঘুষ, চুরি, এদিকে বিনা-টিকিটে ভ্রমণ অতিরিক্ত গেছে বেড়ে, কোম্পানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অথচ সারকুল্যারের পর সারকুল্যার দিয়েও কোন ফল হচ্ছে না। এ-অবস্থার আশু পরিবর্তন না হলে কোম্পানি খুব কড়া উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে —ইত্যাদি ইত্যাদি।···

এমন কিছু বড কথা নয়, মাসে দুখানা করে আসছে এ-লাইনে, লাইনের যেদিন পত্তন হয়েছিল সেইদিন থেকেই।

দ্বিতীয়খানি পডলাম, বুঝলাম তাই থেকেই গুপীকেষ্টবাবুর এই ভাবান্তর। মাইনে বাডালে না কোম্পানি, অনেকদিন থেকে লেখাপড়া করছিলেন—ভেবে দেখছি করছিল একদিন, আজ শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছে—এখন হবে না।

যতীন আপিনের কৌটা নিয়ে এল, একটা গুলি মুখে ফেলে দিলেন গুপীকেষ্টবাবু, বললেন—"দেখলেন তো?"

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পডেছি। মাথার মধ্যে কি যেন একটা উঁকিঝুঁকি মারছে, একটু স্পষ্টভাবে ধরবার চেষ্টা করছি সেটাকে। অন্যমনস্ক থাকবার দরুনই কিছু বললাম না। চিঠিদুটো রেজিস্ট্রারবাবু চেয়ে নিলেন।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি দ্বিতীয় চিটিটা নিয়ে। এতদিন লেখালেখি করে পাঁচটা কি দশটা টাকা যে বাড়াল না এটা দুঃখের বিষয় হলেও এমন মর্মান্তিক কিছু ছিল না বি. এন. ডব্লিউ. আর-এর সে সময়কার ইতিহাসে। উপরিটাই ছিল আসল, একটি ভাল স্টেশনে গুছিয়ে বসে সেটিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা এই ছিল সবার কাম্য, মাইনের টাকাটিকে সে সময় পান খাওয়ার টাকা বলে অভিহিত করা হত। সেটা ছিলও এখনকার তুলনায় ঢের অল্প, তার জন্য মায়াও থাকত না কারুর। ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যে জরিমানাটা দিতে হত কোম্পানিকে, মাইনেটুকু তাইতেই

ওদিক থেকে ও-দিকেই যেত বেরিয়ে। তা হ'ক, তবু সমস্ত দিন খেটেখুটে প্রভুর প্রীতির এইরকম নমুনা যদি হাতে আসে তো মনটা নিশ্চয় উল্লসিত হয়ে ওঠে না। গুপীকেষ্টবাবু চটেছেন, আমি মনের এই অবস্থাটিকে আপাতত কাজে লাগাবার চেষ্টায় আছি, ছেলেটিকে বাঁচাতে হবে এ যাত্রায়।

চুপ করে রইলাম, মৌতাতটা একটু জমুক। চিঠি দুটো হাত-ফের হতে লাগল, শেষ হলে নানা মুখে নানা রকম মন্তব্যও হল আরম্ভ—"দিলে না, কিন্তু সুরটা অনেকটা নরম হয়ে এসেছে গুপীকেষ্টবাবু, নেক্সট্ চান্সটায় বোধ হয় 'না' বলতে পারবে না!...আপনি একেবারে টি. এমের সঙ্গে দেখা করুন মশাই।... আমি বলেছি স্বরাজ না হলে এ-সব অবিচার যাবে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-গুলোকে দেখুন না, লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে..."

গুপীকেষ্টবাবু সেই রকম একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন। আমিও চুপ করে আছি।

তারপর এক সময় রেজিস্ট্রার বাবু আমায় বললেন—"মাস্টার-মশাই, আপনি কিছু বলছেন না?" থানার কেরানিবাবু বললেন—"উনি গুম হয়ে গেছেন দেখে-শুনে।"

আমি এ সুযোগটা আর হাতছাড়া করলাম না। চিঠি দু'টো আমার হাতেই ফিরে এসেছে, একটু নড়ে-চড়ে বসে গুপীকেষ্টবাবুর হাতে সে-দুটো ফিরিয়ে দিতে দিতে টেনে টেনে ভালমানুষের মত বললাম,—"গুম হয়ে গেছি সত্যি, কিন্তু একটা অন্য কারণে।...তুই আমাকে দেখবি নে, ছা-পোষা মানুষ,একটু খুশি হয়ে পাঁচটা টাকা বাড়াবি তার জন্যে মুখে রক্ত উঠিয়ে উদয়াস্ত খাটছি—তার পরিণাম তো এই—অথচ সঙ্গে সঙ্গেই সারক্যুলার—'আরও খাট—আহার ছেড়ে দাও, নিদ্রে ছেড়ে দাও, লাইনের ওপর চোখ ফেলে রেখে দেখ—কে একটু ফাঁকি দিলে, কোথায় আমার দুটো পয়সা মারা গেল।'...তা তো এই দেখছি রে বাপু। কিন্তু তুই মনিব হয়ে কৈ একটু চোখ চেয়ে দেখলি না তো! তা ভিন্ন চক্ষুলজ্জা বলেও একটা জিনিস থাকে মানুষের,—ঐ চিঠির সঙ্গে এই সারক্যুলার পাঠালি কি করে? ...দিন মশাই একটু নস্যিটা, বলতে গেলে অনেক দুঃখের কথাই বেরিয়ে আসে।"

সব আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মনে হল ঔষধটা ধরেছে, গুপীকেষ্ট-বাবুর বুকটা ওঠানামা করতে লাগল। আর একটু সময় দিলাম, তারপর ছেলেটির দিকে চেয়ে বললাম—"তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন হে? দিয়ে দাও ভাড়াটা যখন এসেইছ ফাঁকি দিয়ে—না সেকেণ্ড ক্লাস পার, ইণ্টার ক্লাসেরই..."

গুপীকেষ্টবাবু আমার দিকে চেয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন—“দেবে না মশাই! —এক পয়সা দেবে না—ইণ্টার চুলোয় যাক্ থার্ড ক্লাসের পর্যন্ত দেবে না—মাল-গাড়িরও ভাড়া নয়,···লুটে নিক সমস্ত রেল, বয়ে গেছে গুপীকেষ্টর···তোদের সারকুল্যারের নিকুচি করেছে—আমি থোড়াই কেয়ার করি তোদের চাকরির! —কিসের দায় মশাই যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চেয়ে থাকতে হবে কে কোথা দিয়ে টিকিট না দিয়ে বেরিয়ে গেল···যাও তুমি, কখনও এ শা······র লাইনে টিকিট নেবে না।···বৃন্দাবনবাবু, কেন এ-ভদ্রলোকের ছেলেকে আটকে রেখেছেন মশাই?—কেন নেবে টিকিট এই অগামারা লাইনে? চড়ে যে এই ওদের বাবার ভাগ্যি। ··আহার হয়েছে?”

ছেলেটি আগেকার চেয়ে হতভম্ভ হয়ে গেছে, শুধু ভয়ের ভাবটা নেই। আস্তে আস্তে বললে—“আজ্ঞে না।”

“যতা! নেবু, কিশমিশ আর পেস্তার পার্শেল এসেছে বাজারের—খুলে নিয়ে আয়—শুনুক হারামজাদারা কত আণ্ডার-ওয়েটের খেসারৎ গুনবে·· ক্ষতি কাকে বলে দেখাচ্ছি—সমস্ত রেল তোর লুটিয়ে দিয়ে তবে আমার নিষ্কৃতি।···বাড়াবেন না মাইনে, ওঃ!···আর শোন্, ফুটবলের দল যা নেমেছে—একটিকেও কিছু বলতে পাবি না, বৃন্দাবনবাবু আপনিও শুনে রাখুন—ফার্স্ট, সেকেণ্ড, ইণ্টার, থার্ড—যার যেখানে খুশি চড়ে ড্যাংডেঙিয়ে ফিরে যাক বেটাদের বুকের ওপর দিয়ে···কিসের গরজ মশাই?—আপনারা পাঁচ জন তো পড়লেন—ঐ সারকুল্যারের সঙ্গে ঐ চিঠি···”

রামায়ণী কারবার

আমি তখন পূর্ব-উড়িষ্যার একটি করদ রাজ্যে অরণ্যবিভাগের একজন ওভার-সিয়ারের পদে নিযুক্ত আছি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যে কাজ করিতেছিলাম, ঊর্ধ্বতন কর্মচারী মিস্টার সেন ডাকিয়া পাঠাইলেন, তল্পিতল্পা সমেত; বলিলেন —“মিস্টার মুখার্জি, পূবের দিকের জঙ্গলে একটু পাকারকম বন্দোবস্ত করতে চাই, গড়-বিজুরি আর মহুয়ালি একটা এলাকার মধ্যে না রেখে আলাদা আলাদা করে দু'জন ভিন্ন ওভারসিয়ারের অধীনে রাখতে চাই, মহুয়ালি অংশটার জন্যে আপনাকে ঠিক করেছি।”

উত্তরটার জন্য মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ; যেন একটা প্রস্তাব, নিম্নস্থ কর্মচারীর ওপর হুকুম নয়। মনে মনে মানচিত্রে জায়গাটার ধারণা করিয়া লইতে যে আধমিনিটটাক দেরি হইল, তাহার পর বলিলাম—"বেশ, যাব স্যার।"

আদেশটাকে প্রস্তাবের আকার দেবার যে একটু হেতু আছে সেটা পরে প্রকাশ পাইবে। দ্বিধাহীন উত্তরে মিস্টাব সেন যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন—"কারণটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন। দেখেছি মহুয়ালি নিয়ে ঐ যে একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে, সেই জন্যে ও অংশটা বরাবরই নেগ্‌লেক্‌টেড হয়ে এসেছে। কিছু দরকাব পড়লে, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, অফিসার নিজে ওদিকে গিয়ে ক্যাম্প ফেলে থাকতে চায় না, হয় একটা দিন বা তারও কম সময়ের জন্যে লোক-দেখানো এন্‌কোয়ারি করে রাত হবার আগেই পালিয়ে আসে, নয়তো নিজের মেটকে পাঠিয়ে দেয়। সেও প্রায় নিজে যায় না, একটা দুটো কুলি পাঠিয়ে কোনখানে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে, তার পর কুলির কথার ওপর অফিসারেব কাছে রিপোর্ট দেয়, সেও তারই শোনা রিপোর্টের ওপর ডায়েরি কবে এখানে হেড আপিসে পাঠিয়ে দেয়। কুলিটাও যে যায়ই একথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমবা যে খবর পাই সেটা এক হিসেবে একেবারেই ভুয়ো। এই করে দেখছি ও অঞ্চলটাই যেন ক্রমে ক্রমে এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে শেষ পযন্ত এই ব্যবস্থাটা করলাম, আর রিলায়েবল মনে কবে আপানাকেই ডেকে পাঠিয়েছি। স্টেটের খানিকটা খরচ বাড়ল, কিন্তু এ পরীক্ষাটা দবকাব হয়ে পড়েছে।"

যাত্রার দিন আরও খানিকটা উপদেশ-নিদেশ দিয়া বিদায় করিলেন, একটু প্রচ্ছন্ন প্রলোভনও দেখাইলেন···"মহুয়ালির দিক থেকে একটু নিশ্চিন্দি হলেও হেড আপিসে আমার একজন এসিসটেণ্টের জন্যে ওপরে লিখব, একে পেবে উঠছি না, তখন আপনারাও চেষ্টা করতে পারেন, আমি শুধু সিনিয়রিটিই দেখব না।"

জায়গাটা স্টেটের একেবারে প্রান্তভাগে, উত্তব-পূর্ব কোণে ; তিনটি প্রদেশ এখানে একটি কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, পশ্চিমে উড়িষ্যার এই করদ রাজ্য, উত্তরপূর্বে বিহার, দক্ষিণ-পূর্বে বাংলা। এইরূপ সংস্থানের জন্যই মহুয়ালির অরণ্য-সম্পদ রক্ষা করা একটু দুষ্কর। জায়গাটা খুব সমৃদ্ধ ; শাল, বাঁশ, মহুয়া, সাবুই-ঘাস, লাক্ষা, মধু প্রভৃতি জঙ্গলের সাধারণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি তো আছেই, এ ছাড়া খনি-সম্পদও প্রচুর, বিশেষ করিয়া তামা ও লোহা। মৃত্তিকার উপরের ভাগে কোথাও কোথাও পাথরের সঙ্গে মেশানো এই দুইয়ের কাঁচা আকর পাওয়া যায়, এবং এই সবই লইয়া তিনটি প্রদেশের সীমান্তবাসীদের মধ্যে বিপুল এক

চোরাকারবার চলে। এটা দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। মহুয়ালি সম্বন্ধে রাজধানি পর্যন্ত অনেক লোকের একটা আশঙ্কা যে, জায়গাটায় একটা জাদু আছে, অধিক দিন (সাধারণের মতে ত্রিরাত্রির অধিক) যাপন করিলে এখান হইতে ফিরিয়া আসা আর সম্ভব নয়। কি হয় সেটা কেহ বলিতে পারে না; নূতন যখন চাকরি লই, একটা কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়—এই যে একটা সারা অঞ্চল 'ক্ষুধিত পাষাণে'র রহস্য লইয়া পড়িয়া আছে ইহার কারণটা কি? কিছু অনুসন্ধান করি, এ-মুখে সে-মুখে শুনিয়া সমস্ত ব্যাপারটার যেটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা এই যে, এই জায়গাটা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস মহুয়ালি পৃথিবীর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, কতকটা শিবের ত্রিশূলের ওপর বারাণসীর অবস্থানের মত—আর, বহুদিন পূর্বে এইখানে যদুপতি মোহান্তি নামে একজন ফরেস্ট ওভারসিয়ার তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া চতুর্থ দিন হইতে একেবারে নিখোঁজ হন। জায়গাটি এই নূতন ব্যবস্থার পূর্বে গড-বিজুরি চাকলার অন্তর্গত ছিল। মোহান্তির পর ত্রিরাত্রি কেমন করিয়া আপনা-আপনিই মহুয়ালি-বাসের সীমানির্দেশ হইয়া গিয়াছে; নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া কেহ একটা রাত্রিও আর কাটায় নাই এখানে, এবং এ রহস্যের ওপর আর আলোকসম্পাতও হয় নাই।

এই সঙ্কীর্ণ ভিত্তিব ওপর আমি নিজে যে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লই তাহা এই যে, সমস্তটাই চোরাকারবারীদের কৌশল—হয়তো স্থানীয় বন্য জাতিদের মধ্যে ছিল একটা বিশ্বাস, নিজের নিজের ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে সাধারণত যেমন থাকেই ইহাদের ভিতর,—যাহাদের স্বার্থ তাহারা এইটাকে সুকৌশলে রাজধানী পর্যন্ত চারাইয়া দিয়াছে, তাহার পর হয়তো চক্রান্ত করিয়া মোহান্তির প্রাণনাশ ঘটাইয়াই কাহিনীটাকে একটা বাস্তবের রূপ দিয়া নিজেদের কারবার নিষ্কণ্টক করিয়া লইয়াছে।

সদরে অল্পদিন থাকার পর আমি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বদলি হই, অর্থাৎ মহুয়ালির একেবারে উল্টা দিকে, সেটাও সীমান্ত প্রদেশ, বহু সমস্যা, গড-বিজুরি মহুয়ালি লইয়া আমার কৌতূহলটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া পড়ে।

তিন দিন গোযান এবং হস্তিপৃষ্ঠে অভিযানের পর চতুর্থ দিবস বৈকালে আমার নূতন কর্মস্থলে উপস্থিত হইলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার পূর্বধৃত সিদ্ধান্তে প্রথম আঘাত লাগিল।

মিস্টার সেন বেশ প্রবল ভাবেই মহুয়ালি সম্বন্ধে ব্যবস্থায় লাগিয়াছেন ; ফরেস্ট অফিসটা যে বসাইয়াছেন তাহা একেবারে সমস্ত অঞ্চলটার কেন্দ্রে, পূর্ব ঘেঁষিয়া এমন একটি জায়গা যেখান হইতে সমস্ত সীমান্তটার ওপর আধিপত্য থাকে, অথচ অন্যদিকে নিবিড় দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলটার ওপরেও দৃষ্টি রাখা যায়, কেননা স্টেটের অভ্যন্তরেব যে চোরাকারবারী বুনো জাতের দল, তাড়া খাইলে তাহারা এই প্রাকৃতিক দুর্গের মধ্যেই আশ্রয় লয়।

কিন্তু আমি আপিসটার এই সুনির্ধারিত সংস্থানের কথা বলিতেছি না, আমার সিদ্ধান্তে যাহা প্রথম আঘাত দিল, তাহা অনির্দিষ্ট একটা কিছু—যাহা সমস্ত জায়গাটার মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন। পশ্চিম দিকটা কতকটা যেন বুকচাপ, ঘনারণ্য পাহাড়ের স্তূপ—মনে হয় কোন্ সেই সুদূর বিন্ধ্য-সাতপুবা-অমবকণ্টক থেকে পাহাড়ের ঢেউ গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া এইখানে একফালি ক্রেসেণ্ট চাঁদের একটি নীল রেখায় থামিয়া গিয়াছে। পূর্বদিকটা ফাঁকা, প্রথমত সমস্ত জায়গাটাই ঢালু হইয়া, অপিসটাকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় দশ-পনর মাইলেব একটা অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, যেন পশ্চিমের বিক্ষুব্ধ ঊর্মির এক-আধটা টুকরা ছিটকাইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। এর পিছনেই, আরও প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে একটি দীর্ঘতর ক্ষীণ পর্বতরেখা, উত্তরের দিকে একটু আয়ত, মসীঘন, তাহার পর দক্ষিণের দিকে ক্রমে ক্রমে মাটির রেখায় মিলিয়া গিয়াছে।

কিসে যে কি হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে জায়গাটাতে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের উপর একটি শ্রান্ত ঔদাস্য যেন ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি অন্তত তিনটি কারণ উপস্থিত ছিল ; প্রথমত মহুয়ালির আপন ঐতিহ্য, দ্বীতীয়ত দীর্ঘ যাত্রা-পথের অবসান, অর্থাৎ স্পন্দনঘন সচল জীবনের একটা বিরতি, তৃতীয়ত, দিনের যে সময়টিতে পৌঁছিলাম আমি। হয়তো এই তিনের মিলিত প্রভাবেই আমার মনে হইল, সমস্ত জায়গাটাতেই যেন আছে কিছু একটা, একদিন বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে খোঁজ করিতে গিয়া যে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম সমস্ত ব্যাপারটা চোরা-কারবারীদের কারসাজি, সেটাতে বেশ একটু সংশয় জাগিল।

অবশ্য তখন মনের এই বিলাস লইয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে অনেক বড় কাজ হাতে। আবাস-স্থানটা একবার দেখিয়া লইয়া লোকজন দিয়া জিনিসপত্রগুলা সবই গুছাইয়া লইলাম। চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নানাদি সারিয়া লইলাম ;

তাহার পর সঙ্গে যা আছে এবং এখানে যাহা অধীনস্থ লোকেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে রাত্রের আহার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া নবরচিত বাংলোর সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে গা এলাইয়া বসিলাম। মেট, কুলি, আর্দালি লইয়া জন কুড়ি লোক; কয়েকজন আমার সঙ্গেই স্থায়ীভাবে থাকিবে, কয়েকজন আশেপাশের গ্রামের অধিবাসী, সকলেই চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। পাচক একটা ক্যাম্প-টেবিলে চা জলখাবার রাখিয়া গেল, সেবন করিতে করিতে জায়গাটাব সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ করিবার জন্য লোকগুলার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলাম।

যে ঔদাস্যটা মনকে স্পর্শ. করিয়াছিল, সেটা ঠেলিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য যে ছিল না এ কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু সন্ধ্যা যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল ততই ঐ অনুভূতিটা যেন মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল; এমনি সন্ধ্যা সময়টাই নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, সেদিন যেন আরও আত্মস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলাম; এক সময়ে আকাশলগ্ন এই পূরবী সুরের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করিয়াই লোকগুলাকে সরাইয়া দিলাম।

সূর্যের রক্তিম আভা যতই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বেশি করিয়া আত্মলীন হইয়া উঠিতে লাগিলাম আমি। মনে হইল, দক্ষিণের বিস্তীর্ণ আতাম্র রুক্ষ ভূভাগ—এ যেন গৈরিকধারী উদাসী জীবন; তাহার সামনে আমার বামদিকে ঐ মৃত্যু, পর্বতের পুঞ্জীভূত তমিস্রার রহস্যময় রূপে; এই জীবন আর এই মৃত্যু উভয়ে পরস্পরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

পার্বত্য অরণ্যের মধ্যে বহুদিন কাটিল বহু নব নব প্রতিবেশে, কিন্তু ঠিক এ ধরনের অনুভূতি কখনও হয় নাই। দেহটা সেদিন দুর্বল ছিল, তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই মনটাও, দুর্বল মনকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ভাবিয়া সূর্যাস্তের পূর্বেই বাংলোর মধ্যে চলিয়া গেলাম। অস্বীকার করিব না এদিকে মোহান্তির রহস্যজনক পরিণামের কথাটাও মনের এক কোণে কোথায় জাগিয়া থাকিয়া মনটাকে অন্যভাবেও দুর্বল করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের যে কুলিরা একত্র হইয়াছিল তাহাদেরও সে-রাত্রে উপস্থিত থাকিবার হুকুম দিয়া আমি বাংলোর মধ্যস্থলে নিজের ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। ঠাকুরকে সকাল সকালই রন্ধন সমাধা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম, একটু রাত্রি হইতেই আহার শেষ করিয়াশয্যাগ্রহণ করিলাম।

তাহার পরদিন উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলাম—কতকটা যেন এই ভয়েও যে কালকের ভূত আবার ঘাড়ে আসিয়া না চাপিয়া

বসে। সবাইকে জড়ো করিয়া ম্যাপ সামনে রাখিয়া সমস্ত এলাকার একটা হিসাব লইতে লাগিয়া গেলাম—কোথায় কি রকম পথ, কোন্ বনে কি কি উৎপন্ন হয়, কোন্ গ্রামে কি রকম মানুষ, আরও সব খুঁটিনাটি যাহা আমার প্রয়োজন। চোরাকারবারের গতিবিধি সাধারণত কোন্ কোন্ পথ বাহিয়া তাহাও ইহাদের যতটা জানা আছে, এবং আমি জেরা করিয়া যতটা পারিলাম, জানিয়া লইলাম। ইহার পর এক সপ্তাহের একটা টুর-প্রোগ্রাম (পরিক্রমা-সূচী) ছকিয়া লইয়া লোকগুলিকে সেই দিন হইতেই প্রস্তুত হইতে বলিলাম। না, কাল যা নমুনা পাইয়াছি, খুব বেশি দিন এখানে থাকা চলিবে না। তা ছাড়া হেড আপিসে অ্যাসিস্ট্যাণ্টের পদের জন্য লোভটাও আছে, তাড়াতাড়ি মহুয়ালিকে সামলাইয়া দিয়া একটা সুনাম অর্জনের দিকেও প্রবল ঝোঁক আছে। আহারের পর অল্প একটু বিশ্রাম লইয়াই ঘোড়ায় জিন কষিতে বলিলাম।

টুরই এ বিভাগের প্রধান কাজ, সে-হিসাবে প্রথম দিনের সাফল্যে সন্তুষ্টই হইলাম। প্রায় মাইল ছ' সাতের একটা পরিধি শেষ করিয়াছি, নিজেব প্ল্যান অনুযায়ী দুইটি নূতন ঘাঁটিও বসাইয়া দিলাম, গ্রামের মাতব্বরদের সহায়তায় স্টেটের নিজের লোক চালাইবে। পরদিন জায়গাটার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য আরও বেশি কাজ করিতে পারিলাম, চতুর্থ দিনে মাইল দশেক দূরে একটা ক্যাম্প ফেলিয়া দুই দিন কাটাইয়া বাংলার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম। বেশ অনেকগুলি কাজ হইল, খবর পাইতে লাগিলাম ত্রিরাত্রি অতিক্রম করিয়াও মহুয়ালির হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায় চারিদিকে বেশ একটা বিস্ময়-গুঞ্জন তুলিয়াছি, চোরাকারবারীমহলও চকিত-বিস্ময়ে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাত দিন পরে বেশ একটি ভদ্ররকমের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম হেড আপিসে।

এদিককার খবরও দেওয়া দরকার। কাজকর্ম সারিয়া প্রায় সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া আসিতাম, তাহার পর ক্লান্তির জন্যই সেই প্রথম দিনের রুটিনটিই আমার পুনরনুষ্ঠিত হইত। মনের দিক দিয়াও হইত একই ধরনের অভিজ্ঞাতা। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা আমার দক্ষিণের আয়ত গৈরিক প্রাঙ্গণ আর বাঁয়ের ধূম্র পর্বত-স্তূপের উপর যখন শেষ স্পর্শ দিত, মনে হইত আমি যেন জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, মনটা কেমন যেন হইয়া যাইত—সেই কেমন হওয়ার বিশেষত্ব এই যে, জীবনের চেয়ে মৃত্যুটাকেই আমার পূর্ণতর সত্য বলিয়া মনে হইত।

একটা কথা বলা হয় নাই—বিশেষ করিয়া এই বৃহত্তর পটভূমির মধ্যে উপভোগ করিবার জন্য—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে গল্পগুলিকে রূপায়িত করিয়া লইবার জন্য, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গল্পের বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম—সন্ধ্যার পর সেইগুলি থেকে বাছিয়া বাছিয়া গল্প পড়া আমার নিত্য কর্ম হইয়া পড়িয়াছিল—বিশেষ ভাবে 'মণিহারা' আর 'ক্ষুধিত পাষাণ', তাহারও মধ্যে বিশেষ করিয়া 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এ আমার ছিল যেন কল্পলোককে বাস্তবে নামাইয়া আনার জন্য একটা মন্ত্র-সাধনা, ঠিক উপযোগী পরিবেশের মধ্যে, কতকটা শ্মশানে আসন পাতিয়া শক্তিসাধনার মতই। কিন্তু আশ্চর্য, অত করিয়াও ঠিক ও-ধরনের অনুভূতি জাগিল না আমার মনে। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মধ্যে আছে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মর্মভেদী সুর, মৃত্যুর পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া জীবনের দিকে লুব্ধ আতুর দৃষ্টিক্ষেপ ; আমার কিন্তু এ ছিল সম্পূর্ণ পুরবীর হুতাশ—বৈরাগ্যের, আমার দক্ষিণের জীবন বাঁয়ের মৃত্যুর দিকে যুক্ত-করে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোকে নিয়ত আত্মনিবেদন করিত—হে বিলয়, হে মুক্তি, হে বন্ধু, তুমি আমায় পরিপূর্ণ ভাবে তোমার মধ্যে গ্রহণ কর…

বেশ কিছু দিন গেল ; বাঁচিয়া আছি বলিয়া নিশ্চয় বহুলোকের বিরাগভাজন হইতেছি—কিন্তু কাজ হইতেছে। আমার নিজের জীবন নানারকম কাজের মধ্যে বিচিত্র, কিন্তু সন্ধ্যা আর রাত্রির জীবনটি সেই একই সুরে ঢালা। তাহার পরে হঠাৎ একদিন একটা কথা মনে হইল—যেদিন এখানে পদার্পণ করিয়াছি সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার মোটামুটি কর্ম ও অবসরের সূচী প্রায় একই রকম। সেই উদয়াস্ত কাজ, অস্তাচলগামী সূর্যের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসা, রাত্রে কিছু গল্প পাঠ, আহার, নিদ্রা।

এক দিন ইচ্ছা হইল, একটু ওলট-পালট করিয়া দিই। সমস্ত দিন একেবারে নিরম্বু কর্মহীনতায় কাটাইয়া বৈকালে ঘোড়ায় করিয়া নিতান্তই শুধু বেড়াইবার জন্যই বাহির হইয়া গেলাম। জায়গাটার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হইয়াছে, কোন লোক লইলাম না, শুধু কার্তুজের বেল্ট আর স্ট্র্যাপবাঁধা বন্দুকটা ঝুলাইয়া লইলাম।

এক একটা ঢালুর ধাপ বাহিয়া গেলাম প্রায় মাইল দেড়েক দূরে বাঁকাই নদীর ধারে। এই স্থানটির উপর অনেক দিন থেকে আমার লোভ ছিল, কিন্তু কাজের ভিড়ে আসা হয় নাই। আর কাজের ভিড় ঠেলিয়া সকাল থেকে এইটিকেই লক্ষ্য করিয়া ছিলাম।

যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্যাস্ত হইয়া গেছে। আমার আজকের প্রোগ্রামটা

নিতান্তই আকস্মিক, অত তিথি দেখিয়া ঠিক করি নাই, তবু আকস্মিক ভাবেই আজ তিথিটা আমার অদৃষ্টে পূর্ণিমা দাঁড়াইয়া গেল। সন্ধ্যার ছায়া একটু গাঢ় হইবার আগেই পূর্ব দিকচক্রে পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নদীর একটু তফাতে একটা বাবলা গাছ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া আমি অল্প একটু নীচে নামিয়া বসিলাম। এ অঞ্চলটায় জানোয়ারের খুব বেশি উপদ্রব নাই, তবু বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

সেই দিন রাজধানীতে রচা আমার যেই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে দ্বিতীয় আঘাত লাগিল—

বালু আর অগভীর কয়েকটা জলরেখা লইয়া নদীটা এখানে প্রায় শ'তিনেক হাত চওড়া, বাঁয়ের তটরেখা ক্রমেই রুক্ষ হইয়া হইয়া দূরে পর্বতের উপর উঠিয়া গিয়াছে, আমার সামনে এটা একটা বাঁক, এর পরই দক্ষিণে তটরেখা তুইটা নামিয়া নামিয়া আরও কয়েকটা বাঁকের পর দূরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

আমি কোন্ একটা অপার্থিব লোকে চলিয়া গিয়াছিলাম ; কখন, কোন্ পথে প্রবেশ করিয়াছি বলিতে পারিলাম না, যখন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খানিকটা চৈতন্য হইল তখন দেখি পূর্ণিমার চাঁদটা আকাশে বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, আমার সামনে বিস্তৃত বালুচরের ওপর জ্যোৎস্না একটি সুন্দরী রমণীর মতই অলস-শায়িত, নদীর ঈষচ্চঞ্চল বিচ্ছিন্ন জলধারাগুলা যেন তার স্রস্ত শাড়ির ভাঁজ—মৃদু হাওয়ায় তুলিয়া তুলিয়া উঠিয়াছে। শরৎকাল, এর পরেই সমস্তটা একটা গাঢ কুয়াশায় ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া হইয়া গিয়াছে।

আজ আমার মন্ত্র-সাধন সফল হইল। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণ'ই যে পূর্ণ সিদ্ধিতে রূপ লইয়া জাগিয়া উঠিল তাহা নয়। আমার অনুভূতির মধ্যে সন্ধ্যার পূরবী আর রজনীর বসন্ত-রাগ—বৈরাগ্য আর আবেগময় বাসনা তুয়ে মিলিয়া এক অপরূপ মিশ্র সুরের ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, পাইতে চাই—শুধুই পাইতে চাই—কি বা কাহাকে সেটা শুধু এই জন্যই বলা যায় না, যেহেতু সীমাতীত সৌন্দর্যে তা অচিন্তনীয় ; কিন্তু তা ভোগেরই ; সে-ভোগের নাম নাই, যেহেতু তা শুধু ভূমাও নয়, আবার পার্থিবও নয়। দেহ-মন-আত্মার যুক্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়া, পঞ্চেন্দ্রিয়, তারপর ইন্দ্রিয়াতীত কোন ইন্দ্রিয় যদি থাকে সে-সবের নিবিড়তম আলিঙ্গন দিয়া তাহা পাইবার বস্তু। আমার যে বৈরাগ্য তা এইজন্য নয় যে আমি কোনও তাপসবাঞ্ছিত মুক্তির অভিলাষী—এই পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধাদির শত প্রলোভনেও ভোগের দিক দিয়া নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাই আমি চাই নিষ্কৃতি।

…হে অসীম সুন্দর! হে অসীম সুন্দরী, তুমি কে? তুমি কোথায়?—এই ত্রিদিবস্খলিত জ্যোৎস্না-রজনীর রহস্য-আলোকে আমি তোমার অস্তিত্বের ইঙ্গিত মাত্র পাইয়াছি—কি তপস্যা চাই বল—আমায় তোমার পূর্ণতার মধ্যে ডাকিয়া লও…

জানি তাহা হইবার নয়, তবু হায়, অন্তত কাহিনীটিও যদি এইখানে শেষ করিতে পারিতাম!…

৩

পূর্ব সীমান্তেই আমার কাজ বেশি, তখন বাকিও অনেক, কিন্তু সেই রজনীর অভিজ্ঞতার পর বাঁকাই নদীটা কি একটা অদ্ভুত মোহে যেন পাইয়া বসিল আমায়, বিশেষ করিয়া এর বাম অংশটা, যেটা বঙ্কিম গতিতে ধীরে ধীরে গিরিশ্রেণীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে দক্ষিণে স্থানে স্থানে নদীটা দেখা আছে—সমতলের দিকে সৌন্দর্যও অনেকটা বিশেষত্ববর্জিত। এখানকার সৌন্দর্যটা সে রাত্রে এমন অভিভূত করিল যে মনে কেমন একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল, বাড়িতে বাড়িতে পশ্চিমে এ-সৌন্দর্য হয়তো এমনই হইয়া উঠিয়াছে যে দিবাভাগেও সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পুনরাবর্তন হইতে পারে। যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই তাঁহারা এ কথাটা ঠিক বুঝিবেন না, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের অতল রহস্যগাম্ভীর্যের মধ্যে এই ধরনের এক একটা অদ্ভুত মোহ দাঁড়াইয়া যায় কখন-কখনও—কোন-একটা পাহাড় লইয়া, কোন-একটা নদী লইয়া, এমন কি কখনও সামান্য কোন-একটা বৃক্ষ লইয়াও; অন্তত দেখিয়াছি আমার কয়েক ক্ষেত্রে হইয়াছে—আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে তো একটা কারণ ছিলই—সেই রাত্রির অভিনব অনুভূতি।

পরদিন বৈকালে টুর হইতে ফিরিয়া সবাইকে একত্র করিয়া বলিলাম—"এদিককার কাজ আপাতত বন্ধ রইল, কাল সকালে নদীর খাত বেয়ে পশ্চিম দিকে যাব, সেইমত তোয়ের থাকবে তোমরা।"

আশ্চর্য, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ যেন শুকাইয়া গেল, কোন উত্তর না দিয়া সবাই চাপা আতঙ্কে পরস্পরের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। এমনই একটা নূতন কাণ্ড যে, আমি থমকিয়া গিয়া মেটকে প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি মহাপাত্র?"

মেট ঠোঁট দুইটা জিভে ভিজাইয়া লইয়া বলিল—"নদীর পথ ধরে ওদিকে খুব বেশিদূর যাওয়া…সে ঠিক হবে না হুজুর…"

হঠাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে মস্তবড একটা তথ্য আবিষ্কারে আমার সমস্ত মনটা সচকিত হইয়া উঠিল—তা হলে নাকের নীচেই চোরাকারবারীদের আড্ডা! ঘোড়া হইতে নামিয়া বাংলোর দিকে যাইতে যাইতে হুকুমটা দিয়াছিলাম, বেশ ভালভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন, বাধা বা আপত্তিটা কি?"

উত্তর নাই, মাথা নীচু করিয়া আড়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ির ঘটা একটু বাড়িয়া গেল মাত্র। সন্দেহ মিটিয়া যাওয়ায় বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই আদেশ দিয়া আবার ফিরিয়াছি, মহাপাত্র দুই পা আগাইয়া পাশে আসিয়া বলিল—"ওদিকে তপস্যা করছেন…"

ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইল, মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন বাহির করিতে পারার আগেই মহাপাত্র তাহার বক্তব্যটা পূরণ করিয়া দিল—

"পওহারী বাবা ওদিকে তপস্যা করছেন হুজুর—এখান থেকে প্রায় পো'টাক পথ দূরে নদীর ধারে। কথাটা কাউকে বলা মানা, আর গেলেই একটা না একটা অনিষ্ট হয় তাই হুজুরকে মানা করছিলাম।"

এ-লোকটাকে ভাল বলিয়াই জানিতাম, একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বলিলাম—"ও, বলা মানা! শুধু বুঝি তোমরা এ ক'জনেই জানবে?…তা গেলে অনিষ্টটা কার হয় সেটা এবার বুঝতে পারবে—তোমরা সকলেই। অপাতত তোমার ওপর আমার হুকুম—তপস্বী কোন রকমে যেন খবর না পায় যে আমি আসছি। কাল আমি না বেরনো পর্যন্ত কোন লোক বাংলো ছাড়বে না, এ সত্ত্বেও যদি লোকটাকে কাল গিয়ে না দেখি তো দায়িত্ব তোমার। যাও।"

সেদিন সন্ধ্যার পর বাহিরে একটা ক্যাম্প-চেয়ার লইয়া বসিলাম। একাই। মনটা বড় চঞ্চল আজ, এক রকমের অনুভূতি নয়—ভেতরে একটা চাপা উল্লাস উঠিয়াছে, একটা খুব বড় সাফল্য সামনে, মহুয়ালির চোরাকারবারের রহস্য এত দিনে ভেদ করিতে চলিয়াছি, আমিই!…এর পাশেই বেশ একটা ভয়—আজই হয়তো আমার শেষ রাত্রি, মিত্র-বেশে এতগুলো শত্রু আমার ঘিরিয়া—রাজধানী থেকে আমার সঙ্গে আসিয়াছে মাত্র চার জন, কে জানে তাহারাও ভিতরে ভিতরে এদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে কিনা; ইহারা আজ প্রাণপণে চেষ্টা করিবে আমার

এ জগৎ থেকে লুপ্ত করিয়া ওদের পথের এই নূতন কণ্টক অপসারিত করিবার ; মহুয়ালির রহস্য ভেদ করিব কি, আজ রাত্রে হয়তো মোহাস্তিঘটিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইয়া সে রহস্য আরও জটিল, আরও দুর্ভেদ্যই হইয়া উঠিবে।

এর পর ভয় আর উল্লাসের মাঝখানে ধীরে ধীরে আর একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং হয়তো মহুয়ালির রাত্রির কুহকে সেইটাই আমার মনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা আবার সেই প্রথম দিনের উদাস সুরে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। দিনের পৃথিবী, কর্মের পৃথিবী আমার কাছে হইয়া উঠিতে লাগিল নিতান্তই অসত্য। এর জন্যে এত কেন ?···হয়তো সত্যই কোনও জীবন্মুক্ত পুরুষ কোন নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে করিয়াছেনই আত্মনিয়োগ, আমি বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াই কেন ? হয়তো মহুয়ালির বাতাস তাঁহার তপঃপ্রভাবেই এই রকম উদাস, এই রকম জীবন-বিমুখ। আমি এর পুণ্যে যদি নাই পারি অভিসিঞ্চিত হইতে, তো আমার সঙ্কীর্ণ স্বর্থের মোহে সেই মহাপুরুষের তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়া এ'কে কলুষিতই বা করিতে যাই কেন ?

গভীর রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবিলাম। এক সময় মহাপাত্রকে ডাকিয়া লইলাম এবং বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু জানিয়া লইলাম। সেও যে খুব বেশি জানে না—এত কাছে থাকিয়াও —এইটেই আমার শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয় দিল বাড়াইয়া। কিন্তু লোকে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছে তখন দেখিবার কৌতূহলটা চাপিতে পারিলাম না। ঠিক হইল দলবল না লইয়া গিয়া শুধু আমি আর মহাপাত্র এই দুই জনে যাইব। সে বার-দুই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করিবে।

মহুয়ালির রাত্রির সঙ্গে দিবসের কোন মিল থাকে না। সকালে উঠিয়া আবার ঠিক করিয়া লইলাম, না, সদলবলেই যাইতে হইবে। রাত্রির নির্দেশ খানিকটা মানিয়া লইয়া মাঝামাঝি একটা এই ঠিক করিলাম যে, দলটাকে কাছাকাছি ভালভাবে লুকাইয়া রাখিয়া একাই, অথবা নিতান্ত মনস্থির করিয়া উঠিতে না পারি তো মহাপাত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রথম সাক্ষাৎকারটা সারিব। অর্থাৎ *সন্ন্যাসী যে রূপেই দেখা দিতে চান প্রস্তুত থাকিব—মহর্ষি বাল্মীকি-রূপেই হ'ক* বা দস্যু রত্নাকর রূপেই হ'ক। রাতের সঙ্গে দিনের একটা রফা করিলাম।

৪

অদ্ভুত ব্যাপার।

একাই গিয়াছিলাম। জায়গাটা সত্যই অপূর্ব। দুই দিকে গগনচুম্বী পাহাড, তাহার মাঝখানে নদীটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়া খানিকটা অবসরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই একধারে পাহাডের কোলে বেশ বডগোছের একটা চাতাল। একেবারে নিষ্পাদপ নয়, খানিকটা ঝোপঝাপ আছে, এবং তাহাব মাঝখানে পাথবের উপর পাথর সাজাইয়া খানতিনেক ঘব লইয়া বেশ একটি বাডির মত। নিতান্ত হেলাফেলা ভাবে সাজানো নয়, মশলা দিযা বেশ ভাল করিয়া গাঁথা।

আশ্রমের রূপ দেখিয়াই আমার রাত্রির কুহক অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, যেটুকু বা হয়তো অবশিষ্ট ছিল, পরেব দৃশ্যে একেবাবে গেল ঘুরিয়া। একটি দীর্ঘ সবল পুরুষ, আমার দিকে পিছন ফিরিয়া উঠানেব মাঝখানে একটা বেলগাছের গুঁডি ধরিয়া প্রবল বেগে ওঠ-বোস কবিতেছে, মেহনতে সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘাম ঝবিতেছে, পালোয়ানী ঢঙেব একটা হিস হিস্ শব্দ হইতেছে নিঃশ্বাসের। এদিকে পালোয়ানের মতই একটা জাঙিয়া পরা।

লুকাইবার প্রয়োজন নাই, বিস্ময়েব সঙ্গে শঙ্কিতও হইয়া পডিয়াছিলাম। কিন্তু তখন মরীয়া হইয়া গিয়াছি, এদিকে হাতে রাইফেলটাও আছে, গলা-খাঁকারি দিলাম।

লোকটা ঘুরিয়া একেবারে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেল, দারুণ ভয়, এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, পাপীব মন, নিজের সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তবুও সঙ্গীদের জডো হইবাব জন্য হুইসিল্‌টা বাজাইয়া দিলাম, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"আমি হচ্ছি এই জঙ্গলের ওভারসিয়ার। আপনি এখানে করেন কি?"

বাঙালী নয়, তবে কি জাত ঠিক বোঝা যায় না। বয়স মনে হইল পঞ্চান্ন-ছাপান্ন, এইরকম। মাথাটা মুণ্ডিত। এমন লাস, তবু ভয়ে যেন কিস্তুতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। উত্তর না দিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

তখন আর আমার ভয় নাই। লোকগুলিও আসিয়া বাহিরে দাঁডাইয়াছে। বলিলাম—"উত্তরটা দিন। শুনছি এখানে নাকি কোন এক মহাপুরুষ তপস্যা করেন? তাঁকে দেখতে চাই আমি।"

লোকটা আগাইয়া আসিল এতক্ষণে, মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—"সো তপস্যা

আমিই কোরে উরসিয়র বাবু। মহাপুরুষ কি হোবে? মামুলি আদমি আছি —পাপের শোরীর…"

চোখটা একবার সমস্ত শরীরটার উপর বুলাইয়া লইলাম, বলিলাম—"ও! আপনিই করেন তপস্যা? তা বেশ, যেমন আছেন দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন, তপস্যার ফলপ্রাপ্তির সময় হয়েছে।"

এমন একটা দীন করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যে, সে-দৃষ্টিতে একটা দুর্বৃত্তের এতটুকু হিংস্রতা বা এতটুকু লোলুপতা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলিল —"কি বলছেন, উরসিয়ার বাবু, আমি একটুও সোমঝাতে পার্‌ছি না। আমি সোন্ন্যাসী মানুষ, ফল তো আমায় ভগবান দিবেন, যখন তাঁর মর্জি হোবে।"

বলিলাম—"তা হলে ভেঙেই বলি আপনাকে, যদিও না বললে চলত। মহুয়ালির জঙ্গলে আপনারা সবাই মিলে যে চোরাকারবারটা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করবার জন্যে দরবার আমায় মোতায়েন করেছেন এখানে। দলবল নিয়ে আমার সঙ্গে আপনাকে রাজধানীতে যেতে হবে।"

লোকটি একেবারে শিহরিয়া উঠিল; কিছু বোধ হয় ভয় ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে ঢের বেশি ঘৃণায় একবার দুইটা হাত দিয়া কান দুইটা স্পর্শ করিয়া বলিল —"আরে ছিঃ ছিঃ উরসিয়ার বাবু, আপনি একি কোথা বলছেন! আমার শোহোরে শোহোরে অত বড ব্যেবসা, আমি জঙ্গলমে এসে লেকড়ি-লাহ চোরি করব!…আমার গৃহস্থ আশ্রমের নাম মংনিরাম, কানপুরে আমার অতবড় গল্লার ব্যেবসা—মংনিরাম গৌরীশঙ্কর নামে, কোলকাতায় আমার মংনিরাম পিরুমল নাম দিয়ে অত বড কারখানা, উদিকে পাকিস্তানে…"

বিস্ময়ের সীমা হারাইয়া ফেলিতেছি, যা বলিতেছে, এবং যেভাবে, সেটা যদি অভিনয়ই হয় তো লোকটার অভিনয়ে বাহাদুরি আছে, বলিলাম—"বেশ, এখানে তা হলে করছেন কি? তপস্যার জন্যে তো ডন-বৈঠক করার কথাও নয়, আর এ পাকা এমারৎও তপস্যার জায়গা নয়।"

মংনিরাম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন যেন একটা কথা বলিবেন, কি বলিবেন না, মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহার পর বোধ হয় না বলিয়া উপায় নাই দেখিয়াই সেইরকম কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—"না উরসিয়ার বাবু, আমার তপস্যার অলাহেদা একটা মঞ্চ আছে, জঙ্গলের একটু ভিতরে, এখান থেকে চার রসি দূরে…আওর…"

বলিলাম—"হ্যাঁ, বলুন।"

"আওর, আমি যে তপস্যা করি তাতে ডণ্ড্-বৈঠ্কির একটু জরুরৎ আছে উরসিয়ার বাবু···শরীরে একটু তাকৎ দরকার।"

—অদ্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। সব গিয়া কৌতূহলটাই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম? তপস্যায় ডন-বৈঠকের কথা তো এ পর্যন্ত কৈ···"

মংনিরামের সহজ ভাবটা ফিরিয়া আসিয়াছে, বলিলেন—"আসুন উরসিয়ার-বাবু, আপনি আমার অভ্যাগৎ, একটু ঠণ্ডা হয়ে লিন, তারপর আপনাকে সোব বলছি, মঞ্চ্ ভি দেখলাচ্ছি।·· অরে ভিখুয়া, শববৎ কর্—দো গিলাস।"

দু'জন বেশ তাগড়া গোছের লোক একটা ঘরে এতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া ছিল, বাহির হইয়া আসিল। শরবৎ যা আসিল একেবারে পালোয়ানী—পেস্তা-বাদাম, শশাবীচি দেওয়া, ভিখুয়ার হাতে দুইটা বড় বড় সিদ্ধির গোলা। আমি লইলাম না, মংনিরাম নিজেরটা গেলাসে গুলিয়া চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া লইলেন। আমারটাও শেষ হইলে বলিলেন—"চলুন এবার মঞ্চ্টা দেখিয়ে আনি।"

মহুয়ালি এতদিন প্রাকৃতিক কুহকে যেমন ভাবে ভুলাইয়াছিল, তাহার মানুষ দিয়াও ঠিক সেই ভাবেই যেন মোহবিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। রসি চারেক দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা উপরে আচ্ছাদন দেওয়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো চমৎকার একটি বেদী। চারিদিকে মোটা লোহার ছড় দিয়া ঘেরা, মনে হইল যাহাতে তপস্যার সময় কোন জানোয়ার না আসিতে পারে। একটা দরজা আছে, মোটা চেনের সঙ্গে একটা তালা ঝুলিতেছে।

বিস্ময়ে এবার আমারই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে।

মংনিরাম আমার মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু বড় করিয়া হাসিলেন; প্রশ্ন করিলেন—"দেখলেন আমার তপস্যার মঞ্চ্?"

বিহ্বলভাবে বলিলাম—"তা তো দেখছি, কিন্তু কি তপস্যা করেন আপনি এর মধ্যে, ইন্দ্রলোকের জন্যে, কি চন্দ্রলোকের জন্যে, কি বিষ্ণুলোকের···"

মংনিরাম হাত দুইটা তুলিয়া বলিলেন—"কুছ্ নেহি, কুছ্ নেহি উরসিয়ার বাবু, আমি আপনাকে সোব বলছি, লেকিন আর্ কোই জান্‌বে না, আচ্ছা?··· বেশ, আসুন মঞ্চের ভিতর।"

ভিতরে গিয়া দুই জনে বসিলাম। মংনিরাম পদ্মাসন হইয়া বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া আমার পিঠটা একবার স্পর্শ করিয়া চাপা গলায় আরম্ভ করিলেন—

"আসল বাৎ, বিলকুল ভিতরের বাৎ···যাকে ফিরিঙ্গীরা টিরেড সিক্রেট বোলে—এ আমার তপস্যা নয় উরসিয়ার বাবু, আমরা কারবারী জাত, এ আমার এক কারবারকা ফন্দি—আমি রামায়ণী ব্যেবসা করব উরসিয়ার বাবু···"

"রামায়ণী ব্যবসা!"

কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। রামচন্দ্র তো ধান-চাল, কাপড, সোনা-রুপা সুদ্ধ সারা লঙ্কাটা বিভীষণের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আন্দাজের মধ্যে শুধু মনে পড়িল হনুমান আম খাইয়া আঁটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই সূত্রে আমের ব্যবসায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তো! কিন্তু তাহার সুযোগই বা কোথায়, এটা কোন্ সময়ই বা?

মংনিরাম বলিয়া চলিলেন—"দেখিয়ে উরসিয়ার বাবু, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যেখোনই কোনও মনুষ্য কোনও তপস্যা করতে যাবে—ইন্দ্রের গদ্দির জন্যে, কি চন্দ্রের জন্যে, দেবতারা একটা না একটা বাধা পৌছাবে। রামায়ণ-কা বাৎ খেয়াল করুন—বিশ্বামিত্র বেচারি, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে তপস্যা করতে লাগল তো উদিকে ইন্দ্র্ মহাবাজের আর চৈন্ রইল না, মেনকাকে বললেন···"

কহিলাম—"ও, আপনি মহাভারতের কথা বলছেন···"

"হাঁ তাই হোবে, আমাদেব গদ্দির একধারে মহারাজজি পাঠ করে—রামায়ণ চাহে মহাভাবত, ও একই কথা।···ইন্দ্র্ মহারাজ মেনকাকে বললেন—যা বেটি ওর তপস্যা নষ্ট করে দিয়ে আয়।···এই রকম আরও কোতো তপস্বীর তপস্যা নষ্ট হোলো। এবার আমি এক মতলব বের কবেছি···"

কহিলাম—"কি বলুন।"

"আমি দিন রাতের বিচমে সিরফ্ চার ঘণ্টা আরাম করি বাবু, বাকি সব মঞ্চে বসে তপস্যা আর তপস্যা। বেশ, চার ঘণ্টা বাদ গেল তো চার ছক্কা চৌবিশ, ছ'দিনে এক দিন বাদ গেল, বছরে হারাহারি দু'মাস। তা হলে উ সব মুনি ঋষিদের যেখানে বারো বছর লাগত, সেখানে আমার চৌদহ বছরে ফল হাঁসিল হোবে। এইবার শুনুন উরসিয়ার-বাবু, আমি বসে বসে তপস্যা করছে—ফল হাঁসিল হোবে, ফল হাঁসিল হোবে—এমন সময় ইন্দ্র্ মহারাজ মেনকা কি উর্বশী, কি রম্ভা, কি তিলোত্তমা যাকে হোক হুকম করবে—'যা বেটি, অমুক জঙ্গলে অমুক জায়গায় মংনিরাম তপস্যা করছে, আমার ইন্দ্রত্ব লিবে, তুই যা নষ্ট্ করে দিয়ে আয়···"

একটু হাসির সহিত বড় বড় চোখ করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি বিমূঢ় ভাবে নিরুত্তরই রহিলাম।

—"বেশ তো?…আচ্ছা, আব শুনিয়ে। আমি কিছু জানি না, চোখ বুজে আছি, এমন সময়, ঘুমতে-ফিরতে, নাচতে, গান করতে, ভাব বাৎলাতে বাৎলাতে আমার মঞ্চের কাছে মেনকা কি উর্বশী, কি রম্ভা এসে পড়ল, তারপর আরও কাছে, তারপর বিলকুল ভিতরে। তারপর ধেয়ান ভাঙছে—না দেখে যেই একেবারে কাছে এসে অস্পর্শ করতে যাবে কি এই এমনি করে শালীকে পাকড়ে…"

দেখাইবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া আমার দিকে ঝুঁকিতেই সভয়ে একটু সরিয়া গেলাম, মংনিরাম হাত দুইটা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—"না না, আরে না…কি হোবে আমার শকুন্তলার মতন এক লেডকী লিয়ে?…পর্লোকমে কাম দিবে?…হিসাব কা বাৎ, আপনি শুনুন—স্বর্গ্ থেকে রম্ভা, কি উর্বশী, কি মেনকা আসছে, তাও কি কাজ?—না, ধেয়ান ভাঙতে হবে তপস্বীর—গায়ে কিৎনা জেবর—জেব্রাৎ—হীরা, মোতি, পান্না, চুন্নি, পোখরাজ; তাও কি এখানকার জিনিস উরসিয়ার বাবু?—খাস স্বর্গ্কা মাল, এক এক টুকরার দাম এক এক কড়োর; শাড়িটাই যা পরে থাকবে তার হিসাব দুনিযার কে দিতে পারে?…ইরকম করে বাঁ হাতে জাপটে ধরে শাড়ি, চুড়ি, জশম্, তাগা, হাঁসুলি, হার, কণ্ঠি, কমরকা গোট, পায়ের মোল, নাকের বেশর, কানেব কুণ্ডল, মাথার মুকুট—সোব এক এক করে খুলে নিয়ে বলব—'যা শালী, তোব ইন্দ্র্ মহারাজকে বোল্ গিয়ে মংনিরামের ধেয়ান ভেঙে দিয়ে এসেছি!'…এ তো চুরি ইয়া ডকৈতি বলতে পারবে না উরসিয়ার বাবু,—কে ডেকেছিল উকে গরিবের ধেয়ানটি ভাঙতে?"

আমার মুখের ভাবটা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য দেহের উর্ধ্ব ভাগটা একটু পিছনে সরাইয়া লইয়া একমুখ হাসি লইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। নিজের বুদ্ধির সাফল্যে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেছেন। আমাব চেহারাটা নিশ্চয় তখন বর্ণনাতীত, মংনিরাম তাহার মধ্যে অন্য একটা কিছু সন্দেহ করিয়া একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া আমার হাতে একটা মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন —"আরে আরে না, না, উরসিয়ার বাবু, সে রকম কিছু মতলব নেই—শাড়ি আবার পিনিহেই পাঠিয়ে দিব বেটিকে…আরে জিতুয়া, পরীরানীকে শাড়ি তো হাজির কর্।"

দুটি অনুচরের মধ্যে একজন একটা শাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। হলুদের গোলায় ছোবানো একটি লালপাড়ের অতি সাধারণ সাঁওতালী শাড়ি। ডান হাতে

তুলিয়া ধরিয়া মংনিরাম হো-হো করিয়া দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে নিজের রসিকতার কথাও ভাবিয়া নিশ্চয়—কোটি কোটি টাকার বসন-ভূষণ দণ্ড দিয়া পরীরানীকে তো এই পরিয়া হেঁট মুখে ইন্দ্র মহারাজের সামনে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

গেছো ভূত

১

হৈ হৈ পড়ে গেল, মিত্তিরদের কনেবৌকে ভূতে পেয়েছে।

ঠিক দুপুর বেলা। গঙ্গা থেকে নেয়ে এলে খিড়কির বাগান দিয়েই আসা সুবিধা। অন্যদিন বড়কর্তা চন্দ্রমাধব সদর দিয়েই আসেন, আজ গঙ্গার ঘাটে তেল মাখতে মাখতে গল্প করতে করতে অতিরিক্ত দেরি করে ফেললেন। বাড়ি নিশ্চয় নিশুতি হয়ে গেছে, অদৃষ্টে বড়গিন্নীর নথনাড়া আছে আজ—এই সব ভাবতে ভাবতে বাগান দিয়েই তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে আসবেন, পুকুর-ধারটায় খরখরের সঙ্গে ধপ্‌ করে একটা আওয়াজ হতে চোখ তুলে দেখেন নীচে গ্যাঁদা ফুলের ঝাড়ের মধ্যে কে যেন পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে যেতে হাত দশেক পর্যন্ত এসে তাঁকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল ; নূতন বধূ, ছোট ভাই গোবিন্দমাধবের স্ত্রী! কিন্তু থমকে যে দাঁড়াতে হল সে শুধু ভাদ্দরবৌয়ের চেহারা আর ভাবগতিক দেখে। মাথায় ঘোমটার নামমাত্র নেই, চুল এলানো, শাড়িটি কাঁধের ওপর দিয়ে নিয়ে এসে কোমরে গাছকোমর করে জড়ানো ; এদিকে মুখটা থমথম করছে একেবারে, চোখ দুটো আসছে ঠেলে, দৃষ্টি স্থির, তাতে—অমন যে বৌ, মাটি থেকে চোখ তুলতে জানে না—তার লজ্জা-হায়ার লেশমাত্র কোথাও নেই, যেন ভাসুর নয়, কে তো কে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বরং দাঁড়িয়ে যে কেউ আছে যেন সে জ্ঞানই নেই।

ঠিক বেলগাছটির নীচে, শনিবারের দুপুর ; চন্দ্রমাধবের আর ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। বৃথা জেনে তবুও জিগ্যেস করলেন—"বৌমা যে ; কোথায় এসেছিলে মা?—ঠাকুরের জন্যে ফুল তুলে রাখতে?"

কার উত্তর দিতে বয়ে গেছে? মাথা চালা সুরু হয়ে গেল আস্তে আস্তে, তার

সঙ্গে ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ করে পান চিবানো, ঠোঁটের কোণ দিয়ে আস্তে আস্তে পিক গড়িয়ে পড়ছে।

"ওঠ মা, বাড়ি চল, লক্ষ্মী মা আমার!"

কার উঠতে বয়ে গেছে? চন্দ্রমাধব বাড়ি এসে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন —"নাকে তেল দিয়ে সব ঘুমোচ্ছ, ওদিকে বাগানে দেখ গিয়ে কি কাণ্ড, ক'নে বৌ, তাতে আবার…তাকে অমন করে একলা ছেড়ে দেয় এ শনিবারের দুপুর বেলা!… বেরিয়ে এস সব, দেখ গিয়ে দক্ষিণের বেলতলায়; আমি ছুটি মাখন রোজার ওখানে…জানি একদিন একটা কাণ্ড ঘটবে…"

নাকে তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিল না কেউই, এই সবে খেয়ে-দেয়ে কেউ নভেল নিয়ে শুয়েছে, কেউ তাস পেড়েছে, কেউ কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে; বড় গিন্নীর খাওয়াও হয় নি, কর্তার জন্যে মনে মনে বুলি শানাচ্ছেন; চেঁচামেচি শুনে সবাই ছুটল বাগানে। চন্দ্রমাধব খবর দিয়েই আবার বাগানে চলে গিয়েছিলেন, এরা সব গিয়ে পৌছুতে তিনি গামছাটা আবার ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে মাখন রোজার বাড়ি ছুটলেন। এ সময় বাড়িতে এক তিনি ছাড়া পুরুষের পাট আর থাকে না।

দেখতে দেখতে পাড়াব লোকও ছুটে গেল। নানারকম প্রশ্ন, নানারকম মন্তব্যেজায়গাটা গমগম করতে লাগল। মেয়ের দলই বেশি, প্রাচীনা নবীনা, সব বয়সেরই। সনাতন চৌধুরীর মেজ নাতবৌটি গ্রাজুয়েট, পানের ডিবে হাতে করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ বুদ্ধিমানের মত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মত দিল—"এ হিস্টিরিয়া বাপু, তোমরা যাকে মিরগি বল, রোজার বদলে বরং ডাক্…"

এক ধমক—"পান দিবি, না, মুড়ুলি করবি দাঁড়িয়ে?"

চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠেছে। নাতবৌয়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, চেষ্টা সত্ত্বেও দু পা পিছিয়ে পড়েছিল, ডিবেটা খুলে বাড়িয়ে ধরে বলল—"তা পান খান না যত ইচ্ছে।" দুএকজনের মুখের দিকে একটু অপ্রতিভ ভাবে চেয়ে নিয়ে বলল—"হিস্টিরিয়াতে কিন্তু পান খায় না বাপু।"

একটু চাপা গলাতেই বললে, কিন্তু এত চাপা নয় যে রোগী শুনতে না পায়; মিনিট খানেক ইতস্তত করে দাদাশ্বশুরের একটা কাজের ছুতো করে সরে পড়ল।

এর পর মতামতের পাট চুকে গেল, প্রশ্নও কেউ করতে সাহস করলে না। যতক্ষণ না রোজা এল, ক'নেবৌ কথা কইলে মাত্র ঐ একবার।

২

মাখন রোজা বড্ড কড়া রোজা ; তখনও সামনে হয় নি, হাঁক দিলে—"ছাড়বি বৌমাকে, না, আসতে হবে আমায় ?"

ছাড়বে ! ছোটবৌ আরও নড়েচড়ে গুছিয়ে বসল। মাথা চালাটা গেল বেড়ে ! মাখন এসে সামনে দাঁড়াল।

"বলি যাবি, না, আমায় নিজমূর্তি ধরতে হবে ? না ধরা পর্যন্ত চিনতে পারছিস না, না ?"

ছোটবৌ এতক্ষণে কথা কইলে—ছোটবৌই বল বা যে ভর করেছে সেই বল—"যাব না বলছি ? তুইও যা তোর ঘরে, আমিও যাই আমার ঘরে।"

"ও ! বস হয়েছে ?···তা বেশ, তোর ঘর কোথায় আগে তাই বল্ শুনি।"

"কেন, চোখ নেই ? দেখতে পাচ্ছিস না ?"

সবার দৃষ্টি মাথার ওপর বেলগাছের দিকে গেল। মাখন একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—"বুঝলুম। তা ঐ কচি বৌটাকে ঐ গাছের ওপর নিয়ে যেতে হবে, না ? মগের মুল্লুক পেয়েছিস !"

"নিয়ে তো গিয়েছিলুম।"

চন্দ্রমাধব বললেন—"বললুম না তোমায় ?—কি যেন ধপাস করে পড়ার শব্দ হল, তাইতেই তো চেয়ে দেখি বৌমা বেলগাছের নীচে পড়ে রয়েছেন।··· অপরাধ হয়েছে বাবা, আপনি যেই হ'ন, দয়া করে ছেড়ে দিন বৌমাকে আমার। ছেলেমানুষ, কিছু···"

মাখন একটু ধমকের স্বরেই বললে—"তবেই হয়েছে বাবাঠাকুর, কাকুতি মিনুতি করলে যদি ওরা ঠাণ্ডা হত, তাহলে আর আমাদের অমন করে বছরের পর বছর গুরুর দোর ধরে পড়ে থাকতে হত না।"···

হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করলে। তারপর ছোটবৌয়ের দিকে কড়া চোখে চেয়ে বললে—"একটি একটি করে জবাব দে, যা জিগ্যেস করি।"

"দিলুম না, করবি কি ?"

"দেখাচ্ছি কি করব।"

চন্দ্রমাধবের দিকে চেয়ে বললে—"একটা শিল, একটা ঝাঁটা আর একমুঠো সরষে।"

মেয়েদের দুতিন জন আনতে গেল।

মাখন বললে—"প্রথমে ভালমানুষের মতনই বলছি, উত্তর দিয়ে যা, নৈলে…"

"দিলুম না উত্তর।"

সরষে এসে গেল। মাখন আঙুলে করে দুটি নিয়ে মন্ত্র পড়ে যেই ছুঁড়ে মারতে যাবে ছোটবৌ হাতটা তুলে আতঙ্কে বলে উঠল—"উহুহু-হু…বলছি, বলছি, কর্ জিগ্যেস।"

"কেন একে ধরেছিস?"

ছোটবৌ রেগে উঠল।

"ধরব না? ফুল তুলতে এসেছিস, ফুল তোল, প্যাচ করে কিনা আমার গায়ে পানের পিক! ভারি পান খাওয়া হয়েছে! ঐ দেখ, এখন পর্যন্ত বেলগাছের গুঁড়িতে লেগে রয়েছে। ও তো বেঁচে গেছে। ওকে আমি মগডালে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখান থেকে আছাড় দিতুম…"

আপসাচ্ছে। শ্রোতাদের কারুর মুখে একটু রা নেই, একটা সূচ মাটিতে পড়লে শোনা যায়। মাখন একটু ব্যঙ্গভরেই প্রশ্ন করল—"তা দিলি না কেন? দেখতাম মুরোদটা।"

"ঐ যে চন্দোরঠাকুর গঙ্গা নেয়ে দশরথের বেটার নাম করতে করতে আসছিল, চোখ পড়ে যেতে ফসকে গেল হাত থেকে। আগে তো ভর করি নি, তুলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিতুম।…আমি ব্রাহ্মণ, আমার গায়ে পানের পিক!"

মাখন পর্যন্ত চুপ করে গেল একটু। তারপর বললে—"আচ্ছা, না জেনে একটা অপরাধ করে ফেলেছে ছেলেমানুষ; ছেড়ে দাও।"

"হ্যাঁ, অপরাধ পেয়ে ধরেছি, দিলুম ছেড়ে অমনি! আমি এখন ওর শরীর দিয়ে খাব-দাব, আরাম করব কিছুদিন।"

"করাচ্ছি আরাম, জেতে বামুন কিন্তু ত্যাঁদড়ামি যায় নি তোমার!"

আবার দুটিখানি সরষে নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে যেই ছুঁড়ে মারতে যাবে, ছোটবৌ আবার আঁতকে—"যাচ্ছি! যাচ্ছি!"—বলে হাত তুললে।

এই সময় বাড়ির একটি মেয়ে বড় গিন্নীর কানে কানে কি বললে, বড় গিন্নীও কর্তার কাছে এসে ফিস ফিস করে কি বললেন, কর্তা মাখনকে বললেন—"জিগ্যেস কর উনি কে, কদ্দিন থেকে এখানে আছেন।"

মাখন বললে—"আবার কথা বাড়াবেন? এরা তো ঐ চায়, যতক্ষণ থাকতে পারে।"

ছোটবৌয়ের দিকে চেয়ে বলল—"শুনছ ? পরিচয় দাও কর্তাকে।"

"ভূতের আবার পরিচয়।"

"দেখছেন তো ? বললুম না, খালি কথা বাড়াবার ফিকির।"

হাতের সরষেতে ফুঁ দিয়ে যেই তুলেছে, ছোটবৌ আবার হাত তুলে—"বলছি! বলছি!" করে উঠল।

"বেশ, বল। নিজের ইজ্জৎ নিজেরই কাছে।"

"দু'শ বচ্ছর আগে তোমাদের পৃথিবী ছেড়ে এসেছি, থাকতুম গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়, নাম ছিল মুরারি ভট্‌চাযি্য, এখন বংশ লোপ। আগে ড্যারা ফেলেছিলুম রাস্তার ধারের অশথ গাছটায়, সেটা বাজ পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে বেলগাছটায় আস্তানা নিয়েছি। হল ?"

"হল ; তা অ্যাদ্দিন ছিলে তো ছিলে, এবার যেতে হবে।"

"কেন ? ক্ষেতি কি করেছি ?"

"একটা কচি বৌ, তাকে নাকাল করছ, এ যদি ক্ষেতি নয় তো ক্ষেতিটা কাকে বলে শুনি ?"

"ও কেন পিক ফেলতে গেল ?"

"ওদের বাগান, ওরা যা খুশি তাই করবে।"

"আমারও বেল গাছ, আমি যা খুশি তাই করব।"

"তবে রে!"—বলে যেই হাতের সরষে তুলেছে, ছোটবৌ তেমনি আতঙ্কে হাত তুলে "থাম্ থাম্, যাচ্ছি!" করে উঠল।

মাখন হাতটা নামিয়ে নিতে, বললে—"তা এদের বৌকে ছেড়ে যাচ্ছি, বেল-গাছ কিন্তু ছাড়তে পারব না আমি।"

"বটে! এ তল্লাট ছেড়ে যেতে হবে তোমায়, ফলফুলের বাগান, কে কখন্ দুটো ফল নিতে আসুক, কি ফুল তুলতে আসুক, একটা কিছু ছুতো করে উনি চেপে ধরুন! এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমায়, না যাও তো তাও বল—আমার নাম মাখন রোজা—হাঁ!"

ভয়ানক ঝুলোঝুলি, ভূতও বেলগাছ ছাড়তে চায় না, মাখনও রেহাই দেয় না। কত রকম ভয় দেখায়, খুঁটিতে বেঁধে রাখবে, ভাঁড়ের মধ্যে বন্ধ করে নিয়ে গাঙের জলে ডুবিয়ে দেবে, ভূত কিন্তু কিছুতেই মানে না! যখন সুবিধে পায় চোখ রাঙায়, যখন বেগতিক দেখে নাকী কান্না সুরু করে। শেষে যখন কিছুতেই কিছু হয় না, মাখন বললে—"র'স তুমি!"

মাটির ওপর দাগ কেটে মূর্তি আঁকলে, তারপর তার চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিড বিড করে কি একরাশ মন্ত্র পড়ে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে তার ফলাটা খুলে ছোটবৌয়ের দিকে চেয়ে বললে—"কি? বল্ এবার!"

ছোটবৌয়ের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, কিছু উত্তর না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"বল্ যাবি।"

উত্তর নেই, শুধু চোখে কান্না ঠেলে আসছে। এমন করুণ দৃশ্য যে ভূতবিদায় হলেও বর্ষীয়সীদের দু'একজন একটু চাপা ফোসফোসানি সুরু করে দিলে, 'আহা ব্রাহ্মণই তো!' বড গিন্নী কর্তার কানের কাছে ফিস ফিস করে কি বললেন, কর্তা মাখনকে বললেন—"বলছে—থাক্, যদি উনি কথা দেন কোনও অনিষ্ট করবেন না, বেহ্মদত্যি বেলগাছটি আগলে আছেন…"

মাখনের তখন কিন্তু খুন চেপে গেছে, একটা শক্তি-পরীক্ষাব ব্যাপার কিনা, গুরুর ইজ্জতের কথা একেবারে।

"তবে ডাকেন কেন মাখন রোজাকে ঠাকুর?"—চন্দ্রমাধবকে একটু ধমক দিয়েই—"তা হলে এই দেখ্"—বলে ছুরিটা মাটিতে আঁকা মূর্তিটার গলাব নীচে শুধু ঠেকিয়েছে, বসায়ও নি, ছোটবৌ ঠিক সেইখানটাতে হাত দিয়ে—"উঃ মলুম! গেলুম! যাচ্ছি, যাচ্ছি!" করে চীৎকার করে উঠল।

"যা; বড্ড চটিয়েছিস!"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি!"

"যাবি যে, কি করে টের পাব?…বেলগাছের একটা ডাল ভেঙে দিয়ে যা।"

"বামুনকে বেলগাছ ভাঙতে বলিস নি।"

"তবে একটা কাঁটালের ডাল কি একটা পেয়ারার, কি একটা আমের।"

"বলিস নি, এ বাগানের অনিষ্ট করতে বড মায়া হচ্ছে আমার। আমি বামুন, কথা দিয়েছি যখন, যাচ্ছি।"

"তাহলে এই শিলটা দাঁতে করে বাড়িতে নিয়ে চল্।"

"তা রাজি আছি কিন্তু ওদের বৌয়ের দাঁত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওরা রাজি আছে?—জিগ্যেস কর্।"

কেউ রাজি হল না। ঠিক হল, হাতে করেই নিয়ে যাবে।

শিলটা হাতে করে হন হন করে ভিডের মধ্যে দিয়ে একরকম ছুটেই ছোটবৌ উঠানের মাঝখান পর্যন্ত এসেই অজ্ঞান হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

ুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাতাস করতে যখন জ্ঞান হল, বড়ঠাকুরের মুখের নজর পড়তেই জিভ কেটে একগলা ঘোমটা!

গোবিন্দমাধবকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছিল, সন্ধ্যার সময় এসে উপস্থিত বধূর সঙ্গে সবিস্তারে কথাবার্তা হল রাত্রে।

"আর ঢ্যাং ঢ্যাং করে মাঝদুপুরে বনে-বাদাড়ে ও-রকম করে ঘুরে বেড়িও বাপু। তোমার সেই পাড়াগেঁয়ে রোগটা এখনও গেল না।"

বধূ হেসে বললে—"যাবেও না।"

"তবে ধরুক ভূতে ঐরকম করে।"

"কে বললে ভূতে ধরেছিল? এমন ঢের ভূত দেখা আছে আমার।"

গোবিন্দমাধব বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল; জিগ্যেস করল—"তবে?"

বধূ নেমে গিয়ে টেবিলে দেরাজ থেকে একটা নিটোল হলদে পেয়ারা বের র নিয়ে এসে হাতে দিয়ে বললে—"খাও।...নিশুতি দেখে আস্তে আস্তে বরিয়ে গিয়ে গাছে উঠে পড়েছি—কে জানে বড়ঠাকুরেরও আজ ঐ রাস্তা দিয়েই াসবার তাগিদ পড়ে যাবে.. এসে গেলেন বলে পেয়ারা-তলায়! আর উপায় ই দেখে পেয়ারাগাছের ডাল থেকে বেলগাছের ডালে নেমেই লাফ!...সঙ্গে উদিকে মাথায় মতবলও...জেঁকে..."

াচলে মুখ চেপে চাপা হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল। গোবিন্দমাধবের ও বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নি—

"আর বড়দার সামনে ও রকম কবে ঘোমটা খুলে...অতক্ষণ ধরে ভূতের ভর য়ার নকল...অত লোকের মধ্যে.. হ্যাঁগো, তোমার একটুও লজ্জাও..."

"চুপ কর বাপু, বেয়াক্কিলের মতন কথা ব'ল না—ক'নে বৌ গাছে উঠে ারা পাড়ছে দেখে ফেলতেন—তাও আবার কে? না বড় ভাসুর!...নাঃ; াতে তো লজ্জার কিছু থাকবার কথা নয়!—যত লজ্জা..."

আর কিছু বলতে না পেরে হাসির দমকেই বিছানায় মুখ গুঁজড়ে লুটিয়ে াড়ল।

—শেষ—